শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক

মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)

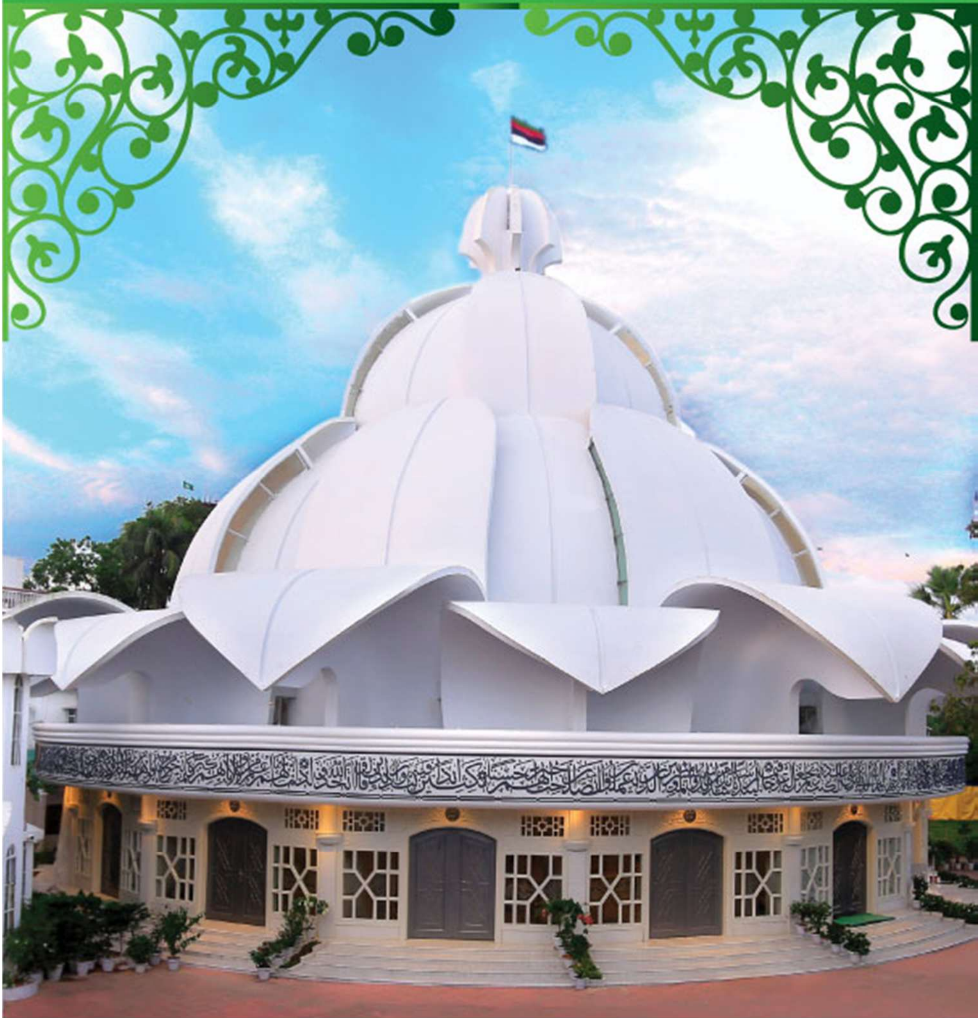

জামাল আহমদ সিকদার

“ফিত্‌রাতাল্লা-হিল্লাতী ফাতারান্না’সা আলাইহা”

“তা-ই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত (প্রকৃতি) যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে”।
– সূরা রূমঃ ৩০।

শাহানশাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

ফিত্‌রাত ও সিফত

বিংশ সংস্করণ

জামাল আহমদ সিকদার

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর পক্ষে
মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা **'আলোকধারা বুক্‌স'**।

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট

প্রথম প্রকাশ: ১০ পৌষ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রি.
বিংশ প্রকাশ: ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

ISBN: 978-984-8083-07-9

মুদ্রণে :
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ

জিয়াউল হক

মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার
স্বরূপ উন্মোচক,
খাদেমুল ফোক্বারা,
জ্ঞান ভাণ্ডার,
প্রেরণার উৎস

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র

পবিত্র
পদ-যুগলে নিবেদিত

আমার চেতনার
প্রথম প্রয়াস।

জামাল আহমদ সিকদার

আহ্বান আসিল মোরে মর্তুজা হইতে।
নূরে চেরাগে আহমদ মোস্তফা হইতে ॥
পুরাতন দিনগুলির সাজসজ্জা তুমি।
আমার ডাক আমার ঢোল আমার বোল তুমি ॥
আনন্দে নৃত্য কর আপন জন মনে।
গোলাব আম্বর গন্ধ দাও সর্বজনে ॥
সামনে আছে কাবা আমার পেশ কদমে চলেছি।
দেমাগেতে সুন্নার 'সানা' সূক্ষ্ম মাথা গড়েছি ॥
পরনেতে অলির পরন পন্থা নির্দেশ দিতেছি।
অনর্থেরী পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি ॥
ধৃতি স্নায়ী দুখ বেদনায় কতই ভাবে দেখেছি।
তুমি আমার প্রাণের সখা বহুরূপে পেয়েছি ॥
ধন্য ধ্যানে প্রাণে-রূপে কতইভাবে বুঝেছি।
সর্বস্থানে তোমার রূপ আমার ভালে দেখেছি ॥
তুমি আমার আমি তোমার সর্বস্থানে জেনেছি।
তাই বুঝি তুমি ছাড়া অন্য হাস্তি বিনাশী ॥
হোসাইন তোমার পাগল পারা সর্বস্থানে বিরাজমান।
এ'দিক ও'দিক দু'দিক ছেড়ে জোড় কদমে আগুয়ান ॥

খাদেমুল ফোক্বারা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

প্রকাশকের কথা

শুকরিয়া মহান আল্লাহ্।

উনবিংশ সংস্করণ নিঃশেষিত হলে চাহিদা পূরণে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। আশা করি, আগ্রহী পাঠকের প্রয়োজন মিটবে।

বইয়ের প্রাণ পুরুষের নির্দেশে ফিত্‌রাত (প্রকৃতি বা স্বভাবগত) ও সিফাত (গুণ বা কার্যাবলি) বিভাগপূর্বক বইটি দু'পর্বে প্রকাশিত।

জ্যোতির্ময় নূরী ফিত্‌রাতের পবিত্র রক্তবীজ হতে যাঁর জীবন গঠিত তাঁর সিফাত সমকালের সকলকে ছাড়িয়ে কালজয়ী অবস্থান নেবে তাইতো স্বাভাবিক।

পাঠকের সেবায় নিবেদিত আমাদের সর্ব প্রয়াস।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন

গাউসিয়া হক মন্‌জিল

দরবার-ই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী

মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম

ম্যানেজিং ট্রাস্টি

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পরম করুণাময় চিরন্তন প্রেমময় স্রষ্টা – অদৃশ্য যে সত্তায় মানুষ বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসবোধ স্রষ্টার প্রেরিত পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট। আশৈশব চরিত্রবলে তাঁরা মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসভাজন। স্রষ্টার বাণী ও স্বীয় আচরণে যুগে যুগে তাঁরা মানবজাতিকে উন্নত চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেন। নবিযুগের পর অলি উল্লাহ্‌রাই ধর্মের যুগভিত্তিক সংস্কারক। যাঁরা আল্লাহ্‌ অতি নিকটতম বন্ধু। তাঁরা স্রষ্টার রহস্য-জ্ঞানের অধিকারী। যে রহস্য-জ্ঞান শিক্ষার জন্য হযরত মুসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত খিজির (আ.) এর নিকট। পবিত্র কোরআনে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।

অলি উল্লাহ্‌রা প্রেরণাভাণ্ডার। নিজ আচরণ, কাল উপযোগী ধর্ম ব্যাখ্যা ও নিত্য নতুন কেরামত (অলৌকিক ঘটনা) দ্বারা মানুষকে তাঁরা আল্লাহ্‌ পথে আকৃষ্ট করেন। নির্জীব আত্মাধারীকে স্রষ্টাপ্রেম প্রেরণায় সজীব করে পূর্ণ মানবে উন্নীত করেন। প্রেরণার উৎস সন্ধানে তাঁদের জীবনী পাঠ তাই একান্ত প্রয়োজন।

জীবন শেষে রচিত গ্রন্থ পাঠে বর্ণিত পুরুষকে জানা সম্ভব। কিন্তু জানার সুযোগ থাকে না পাঠক মনে সৃষ্ট কোন প্রশ্নের জবাব। থাকে না দেখা সাক্ষাতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের কোন উপায়। পাঠকের এসব চাহিদা পূরণে আমাদের উপহার 'শাহানশাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী'। মাইজভাণ্ডার শরিফের তিন মহান আধ্যাত্মিক পুরুষের সার্থক উত্তরসূরি, স্থলাভিষিক্ত যোগ্য প্রতিনিধি, যুগ প্রবর্তক এ বিশ্বঅলি।

কৃপা ব্যতীত অলি-বুজুর্গের জীবন-রহস্য প্রকাশ সহজসাধ্য নয়। অনুমতি চাইতে তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র দুই ব্যাটারীযুক্ত একটা ছোট টর্চলাইট কেন জ্বলে না দেখতে দেন। পরীক্ষা করে ব্যাটারীতে চার্জ নেই বলে জানালে দোকান থেকে চারটা জি.ই.সি. ব্যাটারী কিনে আনতে বলেন। পুরাতনগুলো বদলিয়ে নতুন ব্যাটারী লাগানো হলো – তবুও জ্বলে না। অতঃপর দোকানদারের নিকট দেখিয়ে আনতে পাঠালেন। দেখলেন বাল্ব নষ্ট। নতুন বাল্ব লাগিয়ে দিলে বাতি জ্বলে উঠে। তিনি সেটা খাটের খুঁটির উপর উর্ধ্বমুখী করে জ্বালিয়ে রাখেন। অনুমতি দিতে আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী হতে বলেন, "ফাজ্ কুরুনী আজ্ কুর্‌কুম" 'আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো' –(সূরা বাক্বারা : ১৫২)। এই আশ্বাস বাণীই অযোগ্য লেখকের মহামূল্য সম্বল।

প্রগাঢ় ভক্তি ও সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে এ বই পাঠ করুন। হয়তো কোন সৌভাগ্যের দুয়ার খুলতে পারে। প্রথম প্রয়াস বলে এ বই পূর্ণতার দাবী করে না। পাঠকের সন্তুষ্টি অর্জনে সমর্থ হলে কৃতার্থ হবো। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার আবেদন রইলো।

শ্রদ্ধেয় সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্, বন্ধুবর কাজী ফরিদ উদ্দিন, সাংবাদিক বন্ধু মো. মাহবুব উল আলম, মাওলানা কাজী হারুন-উর-রসিদ, মাওলানা ফরিদুল আবছার আমিরী ও আলহাজ্ব মাওলানা কামাল উদ্দিন সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ। তথ্য-দাতাদের প্রতিও ঋণী।

শত চেষ্টার পরও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ আশা করি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন।

জামাল আহমদ সিকদার
গ্রাম: ছোট ছিলোনিয়া, ডাক: পাইন্দং
উপজেলা: ফটিকছড়ি, জেলা: চট্টগ্রাম।

পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের ভূমিকা

অযুত মানুষের তীর্থভূমি মাইজভাণ্ডার শরিফ। অভিন্ন স্রষ্টার বিশ্বাসে সমমর্যাদা, সহাবস্থান ও সম্পদ বণ্টনে উদার নৈতিকতা অনুসরণে মানব মুক্তিদিশারী একটি দর্শনকেন্দ্রিক উদার সংস্কৃতির নাম ভাণ্ডারী বা মাইজভাণ্ডারী। বিপুল হৃদয়ের পবিত্র উচ্চারণে মুখরিত ও মানবতার নিত্যপদ আশ্রয় মাইজভাণ্ডার। এখানে বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা, স্মরণের ঐকান্তিকতা, আচরণের সংযম ও ত্যাগের অনুশীলন পতিত ও দুর্বলকে করে শক্ত-সবল, হতাশকে করে আশায় উদ্দীপ্ত, পাপীকে করে সাধু, তাপীকে করে তাপস, ভাবুককে করে ফকির-মস্তান, আশেক দিওয়ানাকে করে ইন্‌সানে কামিল। প্রেমের পুষ্পিত পরশে এখানে নিত্য ফোটে শতফুল।

ধর্মে মূলধারার ভূমিকা, মৌলিক প্রতিনিধিত্ব, আমানত রক্ষার সংগ্রাম, খোলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী যুগে প্রশাসনিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কোরবানী, ইসলাম ও মুসলমানের পরবর্তী দুর্ভোগের ইতিহাস বিশ্বস্ততায় বর্ণিত। মূলধারার বিকাশেই বাংলাদেশে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা-দর্শনের উদ্ভব। মাইজভাণ্ডারী পবিত্র রক্ত ও আধ্যাত্মিক শরাফতের প্রদীপ্ত সূর্য যা শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

পঁচিশ বছর ধরে যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ, মতবিনিময়, অনুশীলন ও দীর্ঘ চিন্তা-চেতনার ফসল এই বইয়ের পরিপূর্ণ রূপ। মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়নসহ সৃষ্টি জুড়ে পার্থিব-অপার্থিব তাবৎ কর্মপ্রবাহ যে চিরায়ত সত্য ও শক্তির দান, সে সত্য-

সুন্দরের অনুভব বইয়ের প্রতি পাতায় বিধৃত। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ জ্যোতির অধিকারী অলি-আউলিয়া আর সাধারণ আলেম উলামা জ্ঞানী-গুণীরা এক বরাবর নন। সাগর-নদী-পুকুর জলে আকাশের চাঁদ-সূর্যকে একরকম দেখালেও প্রতিবিম্ব যথার্থ জ্যোতিহীন।

জানালায় দাঁড়িয়ে মহাকাশ দেখার মতো এ বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রকাশের দীনতা নিশ্চিতই লেখকের। পাঠক মননে ন্যূনতম সাড়া জাগাতে সমর্থ হলে ধন্য হবো। বইয়ের অতীত অসম্পূর্ণ সংস্করণগুলোর স্খলন-ত্রুটি এই সংস্করণে সংশোধিত। উদ্ধৃতি ও গবেষণায় এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণই আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণের অনুরোধ রইলো।

জামাল আহমদ সিকদার

“ফিত্‌রাতাল্লা-হিল্লাতী ফাতারান্না’সা আলাইহা” – সূরা রূমঃ ৩০।
“তা-ই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত (প্রকৃতি) যার উপর মানুষকে
সৃষ্টি করা হয়েছে”।

ফিত্‌রাত (প্রকৃতিগত)

বংশ পরিচয়

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার

প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী

আওলাদে রাসূল (দ.) ইমামুল আওলিয়া খাতেমুল অলদ গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

জন্ম: ১৫ জানুয়ারি ১৮২৬। **বেসাল:** ১০ মাঘ ১৩১৩, ২৩ জানুয়ারি ১৯০৬

↓

একমাত্র পুত্র

বেলায়তে মা'আব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক ফানা-ই ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৮৬৫-১৯০২ইং

↓

পুত্র

হযরত সৈয়দ মীর হাসান মাইজভাণ্ডারী **জন্ম:** ১৮৯১, **বেসাল:** ১৯০৬	**অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)** **জন্ম:** ১৩ ফাল্গুন ১২৯৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ **বেসাল:** ২ মাঘ ১৩৮৮ ১৬ জানুয়ারি ১৯৮২ ১৯ রবিউল আউয়াল

↓

স্ত্রী

শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন (র.)

বেসাল: ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন ১৯৬৭, ৯ রবিউল আউয়াল

[তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) দ্বিতীয় কন্যা]

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

ও

শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন (র.)

৫ পুত্র	৬ কন্যা
১. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) **জন্ম:** ১০ পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ ১২ রজব ১৩৪৭ হিজরী **বেসাল:** ২৬ আশ্বিন ১৩৯৫ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৮ ১ রবিউল আউয়াল	২. শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল হক মাইজভাণ্ডারী (র.) ৩. শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) ৪. শাহ্ সুফি সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) ৫. শাহ্ সুফি সৈয়দ শহীদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.)

স্ত্রী

উম্মুল আশেকীন মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম (র.)

বেসাল: ৬ অক্টোবর ২০২১ ইংরেজি, ২৯ সফর, ১৪৪৩ হিজরী, ২১ আশ্বিন ১৪২৮ বাংলা, বুধবার।

[ফটিকছড়ি উপজেলাধীন দাঁতমারার বিশিষ্ট জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সিকদার সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা]

একমাত্র পুত্র	**কন্যা**
হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী **জন্ম:** ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ৫ পৌষ ১৩৭৬	১. সৈয়দা জেব-উন-নাহার বেগম **বেসাল:** ১১ অক্টোবর ২০২৪ ইংরেজি, ২৬ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা, শুক্রবার ২. সৈয়দা হুমায়রা বেগম ৩. সৈয়দা কুমকুম হাবীবা ৪. সৈয়দা উম্মে মুনমুন হাবীবা ৫. সৈয়দা নূরে আসমা কানিজ ফাতিমা

না বুঝিলে এই মূল

কিছুই যখন ছিল না। জগত-জীবন, আকাশ-মাটি, সাগর-পাহাড়, দিন-সময় সৃষ্টির বহু বহু কাল আগে, অনাদি অনন্তব্যাপী ছিল শুধু ঘনঘোর অন্ধকার। আরবি ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'আল্ আমা'। এ অবস্থা কত দীর্ঘস্থায়ী ছিল তা অজ্ঞাত। শুভক্ষণে এক আচানক ঘোষণা 'কুন্' – হও। অমনি অন্ধকারে ঝল্কে উঠে এক নূর তাজাল্লা-আলোকধারা। আল্লাহ্‌র গুপ্ত ও জাতি নূরের প্রথম প্রকাশ। আহাদ হতে আহমদী নূর; নৈরূপ (ঐক্য শক্তি) হতে স্বরূপ (ঐক্য সূত্র)। হাদীসে কুদ্সীতে রাসূলের মুখে আল্লাহ্ বলেন, 'আমি ছিলাম গুপ্ত ধন ভাণ্ডার, নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম এবং বিশ্ব সৃষ্টি করলাম'। অন্য হাদিসে বলেন, আমি ছিলাম গুপ্ত ধন, ভালবাসাতে আত্মপ্রকাশ করলাম'। রাসূল (দ.) সম্পর্কে হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ বলেন, 'সৃষ্ট জগতে আপনিই আমার সবচেয়ে প্রিয়তম। আপনারই মাধ্যমে আমি দান করি, আপনারই মাধ্যমে আমি গ্রহণ করি এবং আপনারই মাধ্যমে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি'। নূর নবি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ পরিচয় দিতে বলেন, 'তিনি (আল্লাহ্) আমার মধ্যে ছিলেন যার উপরে নীচে যখন কোন সৃষ্টি ছিলনা'। আমি আল্লাহ্‌র নূর হতে সৃষ্ট; আমার নূরে সর্বসৃষ্টি। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার শুরু সম্পর্কে মাইজভাণ্ডারী সাধক হযরত আবদুল মালেক শাহ্ (র.) কাঞ্চনপুরী তাঁর গানে বলেন, 'জজ্‌বার গুণে সৃষ্টি কৈল্যা আঠার আলম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জজ্‌বা (দীপ্তিশিহরণ) হতেই আঠার হাজার জগতের সৃষ্টি। এই অরূপ-স্বরূপ সম্পর্কে প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা বজলুল করিম (র.) তাঁর মাইজভাণ্ডারী গানে বলেন–

রূপ মনোহর, নৈরূপ বরণ, নৈরূপে পরিয়ে, রূপ আবরণ,
বহুরূপী রূপে, নিত্য নব সাজে, দেখাও রূপেরি শান।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বলেন,

আহমদের ঐ মীমের পর্দা উঠিয়ে দেখরে মন
আহাদ সেথা বিরাজ করেন হেরে গুণীজন।

এই বিশ্বের এক মহাস্রষ্টা আছেন। তিনি নিরাকার, অনির্দিষ্ট, অসীম, অনন্ত, গায়েব। তিনি অদৃশ্য অবস্থা হতে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য নিজের জাতি নূর থেকে এক খণ্ড নূর নিয়ে সর্বপ্রথম যে মহান সৃষ্টির সূচনা করেন তার নাম নূর নবি, নূরে মোহাম্মদী বা আহমদী।

মহা স্রষ্টার 'কুন্' এর কুনকুনি অর্থাৎ হও ঘোষণা, নিত্য নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এইটি সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রবাহ। ধ্বংসের এক অর্থ পরিবর্তন – এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। বিশ্বস্রষ্টা তাঁর মহাশক্তি নিয়ে অনন্ত অন্ধকারে বা তার পূর্বে কী করেছিলেন সে বিষয়ে জানতে প্রায় সকলে আগ্রহী।

মারফতী ফকির দরবেশ তত্ত্বজ্ঞানীরাই এ ব্যাপারে যৎসামান্য বলেছেন। শরীয়তপন্থী আলেমগণ দুর্জ্ঞেয় ও জটিল এ বিষয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলেন। মরমী ফকির লালন শাহ্ তাঁর গানে বলেন–

অন্ধকার ধন্দকার হয়, কুহকারে নৈরাকার হয়,
শুনেছি চার কারের আগে, আশ্রয় করে ছিলেন রাগে
না ছিল সেই আকার-সাকার, থাকেন 'সু' কারে সাঁই একেলা।[১]

তাঁর মতে শুরুতে অর্থাৎ অন্ধকার, ধন্দকার, কুহকার ও নৈরাকার এই চার কার বা অবস্থার পূর্বে আল্লাহ্ 'সু' আকারে রাগ বা প্রেম ভাব-বিভাব অবস্থায় ছিলেন। এটাকে চেতন-অবচেতন অবস্থা বা মগ্ন চৈতন্য বা বিঋণলাও বলা যেতে পারে। তখন কোন কার বা স্তর ছিল না। তারপরে অন্ধকার ও জাত-সিফাতের মধ্যবর্তী অবস্থা বা স্তর। যেখানে তিনি অনাগত 'বিশাল সৃষ্টি জগতের ভাবনা বা পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন'। সংক্ষেপে বলা যায়, 'তিনি প্রথমে ছিলেন ধ্যান, তারপরে জ্ঞান'। কোনকাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে মানুষ যে চিন্তাভাবনা করে সেটা স্রষ্টার আদি গুণ। সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ধারণা তত্ত্ব এবং লালনের মরমী দর্শনের নির্গমন তত্ত্ব প্রায় অনুরূপ। মুসলিম মরমী দার্শনিকের মধ্যে মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবি (র.) যাকে 'আয়ান' বা বহুত্ব সৃষ্টির প্রায় অপ্রকাশ অবস্থা বলেন। তাঁর মতে আল্লাহ্ কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না, আল্লাহ্ স্বয়ং সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হন, যেহেতু তিনি ছাড়া সৃষ্টির শুরু শেষ – কোনটাই সম্ভব নয়। "লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ্" অর্থ– আল্লাহ্ ছাড়া সকল অস্তিত্ব বা সৃষ্টি মিথ্যা

অর্থাৎ অসম্ভব। যেমন 'এক বিনা দ্বিতীয় নাস্তি' (নাই) – বেলায়ত ঘনিষ্ঠ প্রধান ভাবধারা। বৈদিক দর্শনের সাথে এই দর্শনের মিল আছে, এর বিপরীত "হামা আজ্‌উস্ত" সমস্তই তিনি (স্রষ্টা) হতে সৃষ্ট; এই মতবাদ গঠিত হয়। এর নাম শহুদীয়া সুফি দর্শন। সৃষ্টিধারা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলে, "তিনি (আল্লাহ্) আকাশমণ্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন" (সূরা ফোরকান : ৫৯)। এই দিন সম্পর্কে কোরআনে কোথাও এক হাজার বছর কোথাও ৫০ হাজার বছর বলে বর্ণিত (সূরা হজ্ব : ৪৭, সূরা মায়ারিজ : ৪)। প্রখ্যাত সাহাবা হযরত জাবের (রা.) বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূল (দ.) সবকিছুর আগে আল্লাহ্ তায়ালা কোন্ বস্তু প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন?" তিনি বলেন "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নূর হতে তোমার নবির নূর সৃজন করেন। সেই নূর আল্লাহ্‌র শক্তি দ্বারা তাঁরই ইচ্ছায় আবর্তিত হচ্ছিল। তখন লওহ, কলম, দোজখ-বেহেশ্‌ত-ফেরেশ্‌তা, আকাশ-পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ সেই নূরকে (প্রথম সৃজিত নূরে মোহাম্মদী) চার ভাগে বিভক্ত করলেন, প্রথম ভাগ হতে আরশবাহী ফেরেশ্‌তাগণ, দ্বিতীয় ভাগ হতে কুরসী, তৃতীয় ভাগ হতে বাকী ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করলেন। অত:পর চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম ভাগ হতে সাত স্তর আকাশ, দ্বিতীয় ভাগ হতে সাত স্তর পৃথিবী এবং তৃতীয় ভাগ হতে বেহেশ্‌ত ও দোজখ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবারও চার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম ভাগ হতে ঈমানদারদের দৃষ্টিশক্তি, দ্বিতীয় ভাগ হতে তাদের হৃদয়ের নূর (মারেফাত), তৃতীয় ভাগ হতে আল্লাহ্‌র তাওহীদের (একত্বের) নূর সৃজন করেন" (আল-হাদিস/মুসান্নেফে আবদুর রাজ্জাক)।

প্রথম যুগের কামেল সুফিদের লিখিত গ্রন্থে সৃষ্টিধারা সম্পর্কে আরো জানা যায়, প্রথম সৃষ্টি নূরে আহমদীকে আল্লাহ্ তায়ালা ময়ূর আকারে 'সজ্‌রাতুল ইয়াক্বীন' – বিশ্বাস বৃক্ষে স্থাপন করেন। অনন্ত অসীম জুড়ে ছিল বিশ্বাস বৃক্ষের বিশালতা। লক্ষ কোটি বছর ধরে আহমদী নূরের প্রশংসায় মুগ্ধ সৃষ্টিকর্তা আপন প্রখণত্বের আয়না সে নূরের সামনে ধরলে ময়ূরাকৃতির নূর আয়নাতে নিজের অনুপম সৌন্দর্য দেখে আনন্দে বিভোর হলে যে পবিত্র ঘাম ঝরে – তাতে সৃষ্টিজগত সয়লাব হয়ে যায়, তখনও সাত স্তর আকাশ, সাত স্তর জমিন ও দুনিয়ার সীমানা

অগঠিত। অত:পর “আহসানে তাক্বভীম” সেই উত্তর কাঠামোর নূরী মানবের পায়ের পাতার উপরের গিরা হতে ঘামে সৃষ্ট বিশাল জল:ধিতে নেমে আসে উজ্জ্বল আলোকধারা। ফলে পানি গরম হয়ে যে বুদবুদ সৃষ্টি হয়, তা হতেই বাতাস ও মাটির শুরু। যেখানে প্রথম আলোর পরশ নেমে আসে, সেটা জগতের মধ্যস্থান, যেখানে পবিত্র কাবা ঘর নির্মিত। হাকিকতে নূরে মোহাম্মদীর প্রতি সমর্পণই মানব জাতির সিজদার প্রথম কিবলা ঘর, অনন্তকাল ধরে যার মর্যাদা সংরক্ষিত। আরবি ভাষায় কা'বা শব্দের এক অর্থ 'পায়ের গিরা'। এভাবে সৃষ্টি হয় চার মূল উপাদান– আলো, পানি, বায়ু ও মাটি। এসব উপাদানে নিত্য-নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে জগত জুড়ে মোহাম্মদী প্রশংসাধারা নিরবধি চলছেই।

আল্ কোরআনে আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, 'ওয়ামা আরসাল্নাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল্ আ'লামীন' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)। অর্থ: “হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র সৃষ্টি জগতে রহমত বিতরণের জন্যেই আপনাকে প্রেরণ করেছি”। সমুদয় সৃষ্টিকে শূন্য অবস্থা হতে সৃষ্টি করা, লালন-পালন করা, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তর করা ইত্যাদি যাবতীয় কিছু হাকিকতে মোহাম্মদী বা নূর নবির মধ্যস্থতায় ধারাবাহিকভাবে চলছে। হযরত শায়খ আবদুল ওহাব শারনী (র.) তাঁর রচিত 'তাবাকাতকুল কুব্রা' গ্রন্থে বলেন, “হে রাসূল (দ.) আপনি সেই নিপুণ মণি, যার উপর ঘুরছে সমস্ত সৃজনের চক্র। আপনি সৃষ্টির প্রথম, বিকাশের শেষ, তত্ত্বের দিক হতে গোপন এবং নূরের মাধ্যমে প্রকাশ্য”। এই মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূল (দ.) নিজে বলেছেন, “আমার নূর আল্লাহ্র নূরের আবরণ স্বরূপ। এই আবরণের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র নূরের প্রখর তেজ হতে সংরক্ষিত। আল্লাহ্ তায়ালা যদি এই নূরকে অপসারণ করতেন, তা হলে সমস্ত জগত নিমিষেই পুড়ে যেত”, (এই হাদিস হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; সহী মুসলিম প্রথম জেলদ ৯৯ পৃষ্ঠা)। “ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবি, ইয়া আয়ুহাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তসলিমা; নিশ্চয় আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তাগণ (যথাক্রমে দাতা ও বাহক হিসেবে) রহমত বা করুণাধারা প্রেরণ করেছেন তাঁর নবি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি। তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণের আবেদন করতে থাকো, যেন তোমরা তাঁর মাধ্যমে রহমত লাভে সমর্থ হও এবং তাঁকে সর্বদা আনুগত্যের সালাম দাও[২] (সূরা আহ্যাব : ৬৫)। স্রষ্টার

অবিরাম রহমত ছাড়া অনন্ত আকাশ, বিশাল সাগর, অদৃশ্য বায়ু, সুফলা মাটি, দীপ্ত সুরুজ, মায়াবী চাঁদ, এমনকি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ, অণু-পরমাণু পর্যন্ত কোন কিছুই সজীব সচল থাকা অসম্ভব। তাই পবিত্র কোরআনে অবিরত রহমতের জন্য বিরামহীন প্রার্থনার নির্দেশ।

নূর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই নাম আহমদ ও মোহাম্মদ। 'আহমদ' সৃষ্টির আদিতে গুপ্ত সুপ্ত সূক্ষ্ম জগতে সৃষ্টি রহস্যের মূলাধার রূপে বিরাজমান ছিলেন। 'মোহাম্মদ' বিশ্ব জগতে মঙ্গলময় ত্রাণকর্তা রূপে বিকাশ লাভ করেন। হযরত মূসা নবি (আ.) 'আহমদ' কে তা জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ্ বলেন, "আমার মর্যাদা ও উজ্জ্বলতার শপথ করে বলছি, তিনি ছাড়া আমার নিকট অন্য কেউ বেশি সম্মানিত নন। যাঁর নাম আমার নামের পাশে আরশের ওপর আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টি করার বিশ লক্ষ বছর পূর্বে লিখে রেখেছি। এই জগতে আহমদের দ্বিতীয় জন্ম। তাঁর নূরী জাতের মধ্যে শত শত কিয়ামত (বিবর্তন) নিহিত"[৩]।

বাংলার মরমী সাধকদের গানে আল্লাহ্ ও নূর নবির নূর বিকাশের তেরটি ধারা বা অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে– সুকার, নৈরাকার, অন্ধকার, বন্ধকার, ধন্ধকার, কুয়াকার (কূহূকার), নূরাকার, ধর্মাকার, নীরাকার (জলাকার), বিম্বকার, ডিম্বাকার, মীনাকার, নূরাকার (আত্মা-আকার, রুহুকার) তাঁদের মতে এই তেরটি কারের মধ্যে সৃষ্টিধারা বা নির্গমন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গন্জে রাজে মসনবি গ্রন্থে আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.) বলেন, "আহ্মদের নূরের উজ্জ্বলতায় আদমের অস্তিত্ব বিকশিত, আল্লাহ্ তায়ালা এই প্রকৃতির স্রষ্টা এবং নিজেই বিকশিত"। খোদায়ী শিক্ষা পেয়ে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) লাভ করেন জগত শ্রেষ্ঠ আসন – 'আশরাফুল মখ্লুকাত'। তাই আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশ্তাদের সিজদা পেয়ে খোদায়ী সম্মানে ভূষিত হলেন। আর যে সিজদা করে নাই সে তো আল্লাহ্র রহমত (দয়া) হতে বিতাড়িত – শয়তান। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, "যখন ফেরেশ্তাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিশ ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো" (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ৩৪)।

আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে প্রেরণের জন্য। যথাসময়ে আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট ও ভয় বার বার তাঁদের স্মরণ করায় সৃষ্টি সময়ে আল্লাহ্‌র পরম সান্নিধ্যে লালিত পালিত হবার অবস্থানকে। দীর্ঘ ইবাদত (স্মরণ) রিয়াযতে (দুঃখ-কষ্ট) আল্লাহ্‌র নূরের পূর্ব সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। আল্লাহ্ তাঁদের মাধ্যমে মানুষের বংশবৃদ্ধি ও ধর্মের বিধান দিলেন, যাতে লোভ লালসায় পথহারা মানুষ পুনঃমুক্তির পথ খুঁজে পায়। হযরত আদম (আ.) হলেন দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রচারক প্রথম নবি। সংসার-মায়া-মোহ ও লোভ-লালসায় মানব অন্তর হতে আল্লাহ্‌র নূরের জ্যোতি চলে গেলে অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। নিরবধি স্মরণ ও কষ্টকর সাধনায় নিজের মধ্যে স্রষ্টার প্রেমের আগুন জ্বালাতে পারলে খোদায়ী নূরের সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত সুফি সাধক আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (র.) তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ মসনবিতে বলেন, "প্রেমের দ্বারা সকল নবিগণ আল্লাহ্‌র দিদার (মিলন) ও মারফত (পরিচয়) লাভে সমর্থ হয়েছেন"। জগতে আল্লাহ্‌র নূরের প্রকাশস্থল হচ্ছে নূর নবি হযরত মোহাম্মদ (দ.) এবং এ মূলধারা হতে সমগ্র জগতব্যাপী হেদায়তের নূর বিকশিত হতে থাকবে।

নূরনবির নূরের সংযোগপ্রাপ্ত মাটির মানুষও নূরের দেহে পরিণত হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা নূরের ৩৫নং আয়াতে বলা হচ্ছে, "আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের নূর" (আরদ্ ও সামাকে অনেক বুজর্গানে দ্বীন দেহ ও মন হিসেবে উল্লেখ করেছেন)। "তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেমন একটি প্রদীপদানী, তার মধ্যে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের ভেতরে। কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকার মত। প্রজ্জ্বলিত হয় বর্ধিষ্ণু একটি জয়তুন বৃক্ষ হতে, যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়। ইহার তৈল অবিরাম আলো দান করে, যদিও অগ্নি উহা স্পর্শ করে না। নূরের উপর নূর। আল্লাহ্ তাঁর নূর যোগে হেদায়ত করেন অবিরামভাবে এবং আল্লাহ্ মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র নূরের বিকাশ অথবা মানুষেই যে আল্লাহ্‌র নূরের যথার্থ ধারক সেই কথাই বুঝানো হয়েছে। মানুষ নামক শ্রেষ্ঠ উন্নত জীব সত্তা আত্মশুদ্ধির দ্বারা বস্তু নিরপেক্ষ স্বর্গীয় যে নূরে নূরান্বিত বা সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে তা-ই আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র নূরের বিকাশস্থল।

আল্লাহ্ নূরাকারে মানুষের দেহ ও মন (আরদ্, সামা) উদ্ভাসিত হয়ে উঠার একটি দৃষ্টান্ত বা মেসাল প্রদীপদানীর মধ্যে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর একটি উজ্জ্বল প্রদীপ তথা তারকার মত। এখানে আল্লাহ্র নূরে নূরান্বিত মহামানবকে উজ্জ্বল তারকার সাথে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তারকা আল্লাহ্র নূর অর্জন করেছেন বর্ধিষ্ণু একটি জয়তুন বৃক্ষ হতে। পরিশুদ্ধ একজন মহাপুরুষই হচ্ছেন ঐ জয়তুন গাছ। তাসাওউফ (ত্বরিকত) পন্থীগণ তাদের ঊর্ধতন পীর মাশায়েখগণকে শাজরা শরিফ অর্থাৎ শাজ্বারাতিম মুবারাকাতিন যাইতুনাতিন, অর্থ– শুদ্ধচিত্ত ভদ্র বৃক্ষরাজি বলে থাকে। হাদীসে কুদ্সীতে আরও বর্ণনা আছে– বান্দা নফল (অতিরিক্ত) ইবাদতের দ্বারা আমার (আল্লাহ্) দিকে অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি এবং যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই-যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই-যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার মুখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে কথা বলে, আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে অর্থাৎ সাধক এমন এক স্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে তার সমস্ত কাজ আল্লাহ্র হয়ে যায়। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিনের অন্তরই আল্লাহ্র আরশ বা সিংহাসন। সুতরাং মুমিন অর্থাৎ অলি উল্লাহ্গণের অন্তরেই আল্লাহ্ তাঁর আপন স্বভাবে বিরাজ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বাণী, "ফিত্রাতাল্লাহিল লাতী ফত্বারান্নাসি আলাইহা"। তা-ই আল্লাহ্র ফিত্রাত (প্রকৃতি বা স্বভাব) যার ওপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা রূম : ৩০)।

"আমার চিহ্ন বা নিদর্শনসমূহ জগতে ও মানুষের শরীরে দেখাবার জন্য প্রকাশ করেছি; যাতে আল্লাহ্র প্রকৃত সত্য তাদের কাছে প্রকাশ পায়" (সূরা হা-মীম-সিজদা : ৫৩) ইলমে মারফত অর্জন ব্যতীত কেউ যদি হাজার বছরও ইবাদত করে, সে ইবাদত আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না –আল হাদিস।

"প্রত্যেক মানব সন্তান বিশুদ্ধ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, পরে পিতা মাতা তাকে ইহুদী খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসক বানায়" –হাদিস। অর্থাৎ শিশুরা সাধারণত পিতা-মাতার বিশ্বাস বা ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। আবার পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জৈবিক চাহিদা বেড়ে-উঠা শিশুর বিশুদ্ধ স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্তন করলে খোদায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়[৪]।

'ফিত্‌রাত' বা আরবি 'ফাতির' শব্দমূল বা ধাতু নির্মিত। যার অর্থ কোন বাধা অতিক্রম করা বা করানো। ফিত্‌রাত এমন একটি শক্তি যা কোন কিছুতে লুকানো থাকে এবং প্রয়োজন হলে বেরিয়ে আসে। যে গুণ কোন পদার্থের জাত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেটাই সে পদার্থের ফিত্‌রাত বা প্রকৃতি।

নবি রাসূল, অলি উল্লাহ্‌দের স্বভাব চরিত্রে আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাতই প্রকাশিত। মহান সাধক হযরত মনসুর হাল্লাজের (র.) তাওহীদি চিৎকার 'আনাল হক' সেই ফিত্‌রাতেরই বহিঃপ্রকাশ। আরবি 'আনাল হক' অর্থ আমিই চির সত্য। শরীয়তের আলেম ও আব্বাসীয় খলিফা মহাবিপ্লবী মনসুরের দেহকে শূলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়ে, পোড়া ছাই নদীর পানিতে ফেলেও অবিনাশী আত্মার তাওহিদি চেতনাকে বিনাশ করতে পারে নাই। বরং শাস্তিদাতারা বারংবার পরাজয়ে পর্যুদস্ত ও লজ্জিত। মহাত্মা মনসুর হাল্লাজের খোদায়ী ফিত্‌রাত চির অপরাজিত। যে মানুষ আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত অর্জন করেন তিনিই 'আশরাফুল মাখ্‌লুকাত' সৃষ্টিসেরা। মানুষ মাত্রই 'সৃষ্টির সেরা' বলে যে অহংকার করা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ ভুল। এ যেন পশুকে সাধু মানা অথবা কুকুরের গলায় মুক্তার হার পরানো। হযরত আদম নবির মত যে মানুষ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহামহিম আল্লাহ্‌র মহান জ্যোতি অর্জন করেন তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের ভক্তি শ্রদ্ধার সিজদাকেন্দ্রে পরিণত হন।

সুফি জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বলেন,

মানুষ অতি সরল সোজা, নহে মোটেই আঁকাবাঁকা
উলট্‌-পালট্‌ করে দেখা আলিফ লাম মিম লেখা।
আপন চিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নূরের খনি।
সকল আঁধার দূর হয়ে যায় মানুষ হয় অন্তর্যামী[৫]।

'আলিফ লাম মীম' এই তিনটি আরবি সাংকেতিক বর্ণ, মহাগ্রন্থ কোরআনের শুরুতেই রয়েছে। তিনি বলেন, আলিফ অর্থ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌। দুহাত শরীরের সাথে লাগিয়ে দাঁড়ালে মানুষ আলিফের রূপ ধারণ করে। লাম অর্থ অহীর (অভিজ্ঞান) বাহন শক্তি ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল-স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির যোগাযোগ। এক পা উঠিয়ে দাঁড়ালে লাম বর্ণের রূপ লাভ করে। মিম অর্থ সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্‌র

দৃশ্যমান করুণা ভাণ্ডার – হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। মুখমণ্ডল সহ মানুষের উপরের অংশ মিম আকৃতির। এই তিন বর্ণে আল্লাহ্ ও মানুষের গোপন রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত। পবিত্র হাদিসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ বলেন, 'মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য'। জপ স্মরণ (ইবাদত) ও কষ্টকর চেষ্টা সাধনায় (রিয়াজত) মানুষ জৈবিক চাওয়া-পাওয়া ভুলে নিজ অন্তরের (কল্ব) প্রতি একনিষ্ঠ বিভোর হলে অন্ধকারের সকল পর্দা উঠে গিয়ে তথায় খোদায়ী জ্যোতির বিশাল সমাবেশ ঘটে। অলি-উল্লাহ্র এই জ্যোতিও অনিশেষ। যুগকাল সংখ্যা অতিক্রম করে চলে এই খনির বিলি বিতরণ ধারা অন্তর হতে অনন্ত রাজ্যে। সৃষ্টি জগতের বহমান শুভাশীষ মোহাম্মদী অবকাঠামোতে সৃজিত মানুষের মধ্যে মহান অদৃশ্য আল্লাহ্ তাঁর জাতের জ্যোতিঃ ও ওহীরূপী সংকেত সংযোগে (এল্কা এল্হাম) যুগে যুগে ঝল্কে উঠেন। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্বের অদৃশ্য স্টেশনের শব্দ, ছবি ও রংয়ের সৌন্দর্য যেমনিভাবে টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠে। আল্ কুরআনের ভাষায় মোত্তাকী-কষ্ট স্বীকারীদের জন্য এটি পথ নির্দেশক, এই কিতাবে কোনই সন্দেহ নেই। (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ২)। সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর সতর্ক বাণীতে সুফি জ্ঞানভাণ্ডার হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) আরও বলেন– 'হইবে মহা ভুল – না বুঝিলে এই মূল'।

তথ্য নির্দেশঃ

(১) লালন শাহের মরমী দর্শন – মো. সোলাইমান আলী সরকার।
(২) হাকিকতে মোহাম্মদী ও মিলাদে আহমদী, মাওলানা বেশারত আলী মেদিনীপুরী।
(৩) বেলায়তে মোত্লাকা–মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)।
(৪) সকল ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) – প্রবন্ধ ঃ সৈয়দ গোলাম মোরশেদ, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।
(৫) এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক – মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

সংকেত সমূহঃ

'কু' – সংকেতে পবিত্র কোরআন। দ. – দরূদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)।
ক. – কাদ্দাছাছিরুরাহুল আজিজ। রা. – রাদিআল্লাহু আনহূ। র. – রহমতুল্লাহি আলাইহি।

বর্ণক– বর্ণনাকারী, বর্ণক শূন্যস্থানে বইয়ের লেখকই অনুচ্চারিত বর্ণনাকারী।

খোদার আসন আরশ ছেদিয়া

মানুষ আসছে, বৃষ্টির ফোঁটার মতো। লাখো লাখো কোটি কোটি। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। এসেছিল আগেও। এদের ইহকাল ও পরকালের শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে এসেছেন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি-নবি ও রাসূল। এখনও আসছেন খোদায়ী সুপথ দিশারী সাধক, মহাপুরুষ, অলি-আউলিয়া। সৃষ্টির প্রথম মানব-মানবি হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) দীর্ঘ বিরহের পর আরাফাতের মাঠে মিলিত হন (যেখানে হজ্বের প্রধান সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়)। শুরু হয় মানুষের সংসার জীবন। বাড়তে থাকে মানুষের সংখ্যা। বর্ধিত মানুষের এক শাখা আরব অঞ্চল (মধ্যপ্রাচ্য) হতে ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সভ্যতার ইতিহাসে এদেরকে বলা হয় সেমিটিক গোষ্ঠী। অপর এক শাখা ইরান, পাকিস্তান, ভারত হয়ে ছড়িয়ে যায় চীন জাপানসহ এশিয়ার দেশে দেশে। এরাই নন-সেমিটিক গোষ্ঠী। সেমিটিক গোষ্ঠীতে আগত নবি-রাসূলদের পরিচিতি উজ্জ্বল। যেহেতু যবুর, তাওরাত, ইন্‌জিল (বাইবেল) ও কোরআনে তাঁদের অনেকের ঘটনাবলি ও পরিচয় লিখা রয়েছে। হযরত ঈসা নবির (আ.) আগমনের হাজারো বছর পূর্ব হতে ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীয় মতবাদ চালু ছিল এবং এখনো রয়েছে। আরবে তখন অন্ধকার যুগ – আইয়ামে জাহেলিয়াত। সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রভূমি রোম, পারস্য, গ্রীস, মিশর ও ভারতবর্ষ নীতিহারা পশু স্বভাবের অনুগত। দুনিয়াব্যাপী মূর্তি, মানুষ, আগুন জীব-জন্তু মানুষের উপাস্য দেবতা। লোভ-লালসা, হত্যা-জিঘাংসা, লুণ্ঠন-ব্যভিচারের অবাধ রাজত্ব। পৃথিবী তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ শূন্য। জগতের এমনি অবস্থায় পবিত্র মক্কা নগরে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত রূপে আসেন বিশ্ব নবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)[১]।

জাতিভেদ হিংসাদ্বেষ করতে মোচন
দ্বৈতবাদ, বহুবাদ, করতে খণ্ডন,
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, একেশ্বরবাদ
ঘোষিতে এলো মহানবি মোহাম্মদ[২]।

সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি বয়ে আনলেন মুক্তির শুভ সংবাদ –আল্ কোরআন। ঘোষণা করলেন, "সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। সমস্ত সৃষ্টিজগত মানুষের সেবার জন্য, মানুষ সৃষ্টির সেরা"। নবুয়তের মাত্র তেইশ বছরে বিশ্ব মানবের জন্য দিয়ে গেলেন ব্যক্তি মর্যাদা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ ও বিচার ব্যবস্থাসহ সর্ব কল্যাণকর এক উন্নত জীবন বিধান – ইসলাম। ইহ ও পর উভয় জগতের সকল সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্য সর্বশেষ নবি হয়েও তিনি নবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে বিশ্বমানব সভ্যতা কোথায় যে পিছিয়ে থাকতো কল্পনাও করা যায় না।

প্রথম সৃষ্টি নূরে মোহাম্মদী। আল্লাহ্র নিজ নূরে প্রেমের প্রথম ফসল। শুরু হয় স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে রহস্যময় প্রেমলীলা। প্রেমের এ সম্পর্কই বেলায়তের উৎস। উদ্দেশ্য প্রেমের মাধ্যমে প্রভুত্ব বিস্তার। মোহাম্মদী নূরে সৃজন করলেন সমগ্র সৃষ্টিজগত। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদই (দ.) হলেন একমাত্র সম্পর্কসূত্র। এ সম্পর্ক আবিষ্কারেই হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দীর্ঘ কঠোর ধ্যান সাধনায় তিনি লাভ করলেন মহান স্রষ্টার মহাবার্তা – ওহী।

আপনার সে প্রভুর নামে পড়ুন – যিনি (সব) সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানবকে ঘনীভূত রক্ত (পিণ্ড) হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, মহামহিম প্রভু লেখনী দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দেন, মানুষ যা জানেনা উহাও (সূরা আলাক : ১০)। এই প্রথম ঐশীবাণীতে মানুষকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয়, মানব সৃষ্টির রহস্য ও মানব শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান দান করা হয়। বিদ্যাশিক্ষায় লেখনির অর্জিত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক রহস্যজ্ঞান বলে মানুষ সৃষ্টির সেরা। ইলমে মারেফত এমন জ্ঞান যা অর্জন করতে কোন স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ জ্ঞান লাভ করে হযরত মোহাম্মদ (দ.) সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। এটা আল্লাহ্র সেরা নেয়ামত (উপহার), আত্মার মাঝে পরমাত্মার মহামূল্য দান।

প্রখ্যাত পয়গম্বর হযরত মুসা (আ.) প্রার্থনা করলেন, "রাব্বি আরিনী" – 'প্রভু হে দেখা দাও'। প্রভুর পক্ষ হতে উত্তর আসে "লান তারানী" – 'না দেখতে পাবেন না'। বার বার আবেদনে একবার সাড়া দিয়ে আল্লাহ্র হাজার হাজার জালওয়ার (সৌন্দর্য) একটা ঝলক মাত্র দেখেই হযরত মুসা (আ.) বেহুঁশ, সিনাই পর্বত পুড়ে ছাই; ভাগ্যে জুটে নাই প্রভুর দর্শন, মিলন যে কল্পনারও বাইরে!

অপরদিকে পরম করুণাময় স্রষ্টা প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)কে নিজেই আহ্বান জানালেন, "আসুন, একান্ত মিলনে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করি"। হিযরতের এক বছর পূর্বে সাতাশে রজব (চান্দ্র মাস) রাতে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হানির (রা.) ঘরে বিশ্রামরত ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বোরাক নামক স্বর্গীয় বাহন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। বোরাকে আরোহণ করে নূরনবি প্রথম এসে পৌঁছেন হযরত সোলায়মান (আ.) নির্মিত মসজিদুল আকসায় – যা ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানের পবিত্র উপাসনা গৃহ। তাঁর ইমামতিত্বে আগের নবিদের সঙ্গে সেখানে দু'রাকাত নামায পড়লেন। অতঃপর ঊর্ধ্বজগত অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ঊর্ধাকাশে বিভিন্ন স্তরে সাক্ষাত হলো যথাক্রমে হযরত আদম (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইয়াহিয়া (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.), হযরত হারুন (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা নামক স্বর্গীয় বৃক্ষের নিকট হযরত ইব্রাহিম (আ.) নবির সঙ্গে বিনিময় হলো প্রীতি সম্ভাষণ এবং লাভ করলেন সাদর অভ্যর্থনা। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে – "তাঁর (আল্লাহ্‌র) মহিমা যিনি তাঁর অনুগৃহীত [মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)]কে এক রজনীতে পবিত্র মসজিদ হতে দূরতম মসজিদে পরিভ্রমণ করিয়েছেন। আমার নিদর্শনাবলীর কতিপয় নির্দশন তাঁকে পরিদর্শন করার জন্য, এর চতুস্পার্শ্বেই আমি (আল্লাহ্) দয়া করেছি" (সূরা বনি ইসরাইল : ১)।

নূর নবি হযরত (দ.) এ পুণ্য রাতে পরিদর্শন করলেন পুণ্যবানদের জন্য স্রষ্টার পরম পুরস্কার তুলনাহীন সুখ ও শান্তির আবাস বেহেশ্‌ত। হৃদয়হারা সুন্দরী সেবিকার দল হুর, সেবক দল গেল্‌মান, সুপেয় দুধ, মধুর স্রোতধারা, সুভাসিত নয়নভোলানো সুন্দর ফুল, সুমিষ্ট ফলাহার, মসৃন মখমলের তৈরি তুলতুলে নরম বিছানা, এমনি সুখ-শান্তির বিপুল আয়োজন দেখে তিনি বলে উঠেন, "হে খোদা! তোমার অসীম দয়া"।

কঠোর কঠিন শাস্তির কেন্দ্রস্থল দোযখও তিনি পরিদর্শন করেন। বীভৎস জন্তু-জানোয়ারের বিরতিহীন দংশনে পাপীরা জর্জরিত। মুখে পুরে দেয়া হচ্ছে গল্‌গলে আগুন। লাল আগুনের শলাকা ঢুকানো হচ্ছে কারো চোখে, কারো মুখে, গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে আগুনের মালা, খাবার হিসেবে দেয়া হচ্ছে পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি। নরকে অসংখ্য পাপীদের আর্তচিৎকারে মহানবি

কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করেন, "আর্তনাদ যে সইতে পারি না খোদা, হে পরম দয়ালু, ওদের অপরাধ কি ক্ষমা করা যায় না? আমার অনুসারী উম্মতদের এমন কঠোর কঠিন শাস্তি দিওনা, প্রভু"। সুন্দর-অসুন্দর সমস্ত সৃষ্টি পরিদর্শন করে সাত আসমান পেরিয়ে যান মহান 'আরশে' – যেখানে স্রষ্টার মহিমান্বিত অবস্থান। বিদ্রোহী কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম এই মেরাজ সম্পর্কে যথার্থই বলেনঃ

"বল! মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর"।

এরূপেই ঘটে মহামহিম স্রষ্টা প্রভু ও সৃজিত মানবের অপূর্ব মিলন–মেরাজ। এই মেরাজ খুলে দিলো স্রষ্টা প্রভু ও সৃজিত মানুষের মিলন দরোজা। নীতি ও পদ্ধতির প্রচারের আর বিশেষ প্রয়োজন রইল না। তাই রেসালত ও নবুয়ত চিরতরে বন্ধ হলো। খোলা রইল আহমদী প্রেমের একমাত্র চিরস্থায়ী মিলন পথ–বেলায়েত। এই পথ কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি মহানবির (দ.) আংগুলের একটুখানি ইশারা। দু'খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল দু'লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার মাইল দূরের আলো ঝলমল চাঁদ। খুলে গেল চন্দ্র অভিযান গ্রহ-নক্ষত্রে গমনের নুতন পথ–আধুনিক বিজ্ঞান যে পথে ছুটে চলেছে। আবু জেহেলের মুষ্টিবদ্ধ হাতে কী আছে–জিজ্ঞাসার জবাবে হাতের পাথরই বলে উঠলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ – আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। বেলায়তের এমনি সর্বজয়ী শক্তি যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে চলেছে।

তথ্য নির্দেশ:

১। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ঊষালগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। (আরবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।)

২। মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঙ্গীর নগরী রচিত 'নবি শ্রেষ্ঠ' বই হতে।

অপরকে বাঁচাতে নিজে পরবাসী

৬০ হিজরী। নবি করিম (দ.) এর ওফাতের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রিয় নানাজান, পিতা ও বড় ভাইয়ের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য তখন ইমাম হোসাইনের কাঁধে। প্রিয় নানাজানের প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করার মহান দায়িত্বও তাঁর। তাঁর নেই কোন অর্থবল-সৈন্য সামন্ত। জনগণ তাঁর জন্য অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কখন ইমাম ডাক দেবেন অসত্য, মিথ্যা, অবিচার, জোর জুলুমের বিরুদ্ধে হক ও ইনসাফের জন্য জেহাদের। কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রতিটি ভিত্তিমূলই ছিল উমাইয়াদের দখলে। ইতোমধ্যে সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গকারী নানাজান ও পিতার সহযোগী বীর মর্দে মুজাহিদরা প্রায় শাহাদাতবরণ করেছেন।

৬০ হিজরী সালে রজব মাসে আমিরে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করে। অতঃপর সে মদিনায় গভর্নর ওলীদ ইবনে ওকবার নিকট ইমাম হোসাইনের (রা.) বায়াত আদায় করার জন্য লিখে পাঠায়। ইমাম হোসাইন, ইয়াজিদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ৪ শাবান মদিনা ত্যাগ করেন। মদিনাবাসী যদিও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু স্বৈরশাসনের দাপটে কেউ তাঁর সাথী হতে রাজী হলেন না। অনেকে এ রকমও মত প্রকাশ করলেন যে, ইমামের যথাশীঘ্র মদিনা ত্যাগ করা উচিত; অন্যথায় তাঁর কারণে মদিনাবাসীরা আক্রান্ত নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হবে।

ইমাম হোসাইন (রা.) মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মক্কায় আগে থেকেই আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিও ইমামের মক্কায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে করলেন না। কাবা আক্রান্ত হবে এবং হোসাইনের রক্তে কাবা শরিফ রঞ্জিত হবে এ আশঙ্কায় তিনিও ইমামকে মক্কা ত্যাগ করতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাছাড়া হজ্বের সময় কিছু গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা ইমামকে হত্যা করার ইয়াজিদী একটি কথা ইমামও জ্ঞাত হলেন। ইয়াজিদের রাজদরবারের সুবিধাভোগী আলেমগণ ও কতিপয় নামকরা ব্যক্তি ফতোয়া দেয়, 'ইমাম হোসাইন রাষ্ট্রদ্রোহী। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাঁকে হত্যা করা জায়েয (বৈধ)'।

কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা

এদিকে কুফাবাসী ইয়াজিদকে খলিফা মানতে অস্বীকার করে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-কে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের নেতা মনোনীত করে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করে প্রায় দেড়শত পত্র প্রেরণ করে। বিপুল সংখ্যক পত্র পেয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কুফা যেতে মনস্থ করলেন। বহু আত্মীয়-স্বজন তাঁকে কুফা যেতে নিষেধ করেন। চাচাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রা.) মদিনা হতে পত্র মারফত অনুরোধ জানালেন যে, "এই পত্র পাওয়া মাত্র আপনি কুফা গমন স্থগিত রাখুন, কেননা এ পথে আপনার বিপদ অনিবার্য। আপনি শহীদ হলে সারা দুনিয়ার মুসলমান খোদায়ী আলো হতে বঞ্চিত হবে"।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মুসলিম বিন আকীলকে তাঁর পক্ষে কুফাবাসীদের বায়াত গ্রহণের জন্য পাঠালেন। হযরত মুসলিমের কুফায় আগমনের সংবাদ শুনে দলে দলে লোক এসে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করতে শুরু করে। এতে প্রায় ৪০ হাজার লোক তাঁর দলভুক্ত হয়। কুফাবাসীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা দেখে মুসলিম (রা.) হযরত ইমাম হোসাইনকে পত্র যোগে জানিয়ে দিলেন যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে আপনি এখানে আগমন করুন। আপনাকে কাছে পেলে জনসাধারণ জালেমদের হাত হতে রক্ষা পাবে।

এদিকে কুফার নবনিযুক্ত গভর্নর ইবনে যিয়াদ সুকৌশলে নানা প্রলোভনে মুসলিমের পক্ষ সমর্থনকারী লোকদেরকে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ফলে মুসলিমের সঙ্গ ত্যাগ করালো। শেষ পর্যন্ত হযরত মুসলিম (রা.) এর পক্ষে একটি লোকও বাকী রইলো না। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণিত যে, দেড় হাজার বছরেও ইরাকীদের চরিত্রের চঞ্চলতা ও অস্থিরতার কোনই পরিবর্তন হয় নাই।

প্রিয়জনের জানাযার বিনিময়ে

হযরত মুসলিম (রা.)-এর পত্র পেয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীদের নিয়ে হিজরী ৬০ সনের ৩ জিলহজ্ব কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে ঐ দিনই হযরত মুসলিম (রা.) ও তাঁর দুই পুত্রকে ইবনে যিয়াদ নির্মমভাবে হত্যা করে। বকর বিন সাদী পথিমধ্যে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)

এর সাথে সাক্ষাৎ করে সকল ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। কুফাবাসীর এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শুনে সকলেই দারুণভাবে মর্মাহত হলেন এবং ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু মুসলিমের ৩ ভাই ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুফা যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। হযরত ইমাম হোসাইন অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্তে চলতে চলতে কারবালায় এসে তাঁবু খাটালেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সঙ্গে শিশু ও মহিলাসহ সর্বমোট ৮২ জন সঙ্গী ছিলেন। অপরদিকে ইয়াজিদের সেনাপতি ইবনে যিয়াদের ২২ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। যিয়াদের নির্দেশে ইবনে সাদ পূর্ব থেকেই একদল সৈন্য নিয়ে ফোরাত নদী অবরোধ করে রাখে। ইমাম শিবিরে পানির অভাবে হাহাকার শুরু হয়। ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে বারবার ইমাম হোসাইন (রা.)-কে ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করার প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছিল। যাঁর শরীরে মহানবি হযরত মোহাম্মদ (দ.) ও শেরে খোদা হযরত আলীর (ক.) রক্ত প্রবাহিত, তিনি কী করে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবেন? একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হয়ে কী করে ইয়াজিদের মত একটা লম্পট, মদ্যপ ও দুরাচারী ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করতে পারেন? তাই তিনি ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচু রাখার উদ্দেশ্যে শত্রুদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যখন বুঝতে পারলেন যে, শত্রুদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাঁকে হত্যা করা। তখন মহিলা ও শিশুদের কী অবস্থা হবে ভেবে তিনি রণক্ষেত্রে গিয়ে শেষবারের মত ইয়াজিদ সমর্থকদের লক্ষ্য করে বললেন, 'হে প্রতিপক্ষ দল! জেনে রাখ, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম। তাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের কারো সাথে আমার কোন শত্রুতাও নাই। আমাকে হত্যা করে তোমাদের কী লাভ! এ কাজ করলে পরকালে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তোমাদের আহ্বানেই আমি এখানে এসেছিলাম। আমার আগমনে তোমরা সন্তুষ্ট না হলে আমি যেখান থেকে এসেছি, আমাকে সেখানে ফিরে যেতে দাও অথবা ইয়াজিদের সাথে সরাসরি আলাপ করার সুযোগ দাও'। কিন্তু হায়! ইমাম হোসাইনের (রা.) কোন প্রস্তাবেই কুচক্রীরা কর্ণপাত করলো না। তিনি তাঁবুতে ফিরে এসে সঙ্গী ও পরিবারবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন– 'শত্রুদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাকে হত্যা করা। আপনারা অযথা আমার জন্য প্রাণ দিবেন কেন? আপনারা এখান থেকে চলে যান। কেউ

আপনাদের বাধা দিবে না'। এ কথা শুনে ইমাম শিবিরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইমামকে ছেড়ে চলে যেতে কেউই রাজী হলেন না। বরং সকলেই হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং সাথে সাথে সকল বয়স্ক পুরুষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। অতঃপর পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তিনি এ বলে প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ্‌, পরিণাম কী হবে তা তুমিই ভাল জান, কিন্তু আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সঙ্গীগণ আমার সঙ্গ ত্যাগ করলনা। আমার ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি সকলই তোমার জন্য কোরবান হোক। হে সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক, আমার এ নগণ্য কোরবানী তুমি কবুল কর। আমার এই প্রার্থনা, সন্তান-সন্ততির মহব্বত যেন আমাকে দুর্বল করতে না পারে। আমার শৌর্য-বীর্য ও সাহস উন্নত কর। আমাকে তৌফিক দাও যাতে শত্রুর সামনে বীরের মত প্রাণ দিতে পারি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনের জানাযা সম্পন্ন করতে পারি। আমার মুখে তোমার কৃতজ্ঞতা ও সবরের (ধৈর্য) কালাম ব্যতীত অন্য কোন কিছু যেন উচ্চারিত না হয়'। (সির্‌রুশ্‌-শাহাদাতাইন এর বাংলা অনুবাদ হতে উদ্ধৃত)।

কারবালা – হায় কারবালা

আরবি 'কুরবা' হতে কুরবানী শব্দ গঠিত। কুরবা শব্দের অর্থ নৈকট্য। চরম ত্যাগের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভই কুরবানী। এক নজিরবিহীন কুরবানীর ঘটনাই কারবালায় ঘটেছিল।

পরদিন ফজরের নামাযের পর ইমাম হোসাইন তাঁর ৭২ জন সৈনিকের দলটিকে নিয়ে তাঁবুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। ৩২ জন অশ্বারোহী ও ৪০ জন পদাতিক, যার মধ্যে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ মুসলিম বিন আওসাজা থেকে চৌদ্দ বছরের কাসিম বিন হাসান পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিরা ছিলেন। তাঁবুর পেছন দিকে কাঠের স্তুপে আগুন জ্বালিয়ে পশ্চাৎভাগে সুরক্ষিত করা হয়। তিনি সৈন্যবাহিনীকে দুভাগে ভাগ করেন। ডানদিকের নেতৃত্ব দেন জুহাইর বিন কাইনের হাতে, বাঁদিকের নেতৃত্ব দেন হাবিব বিন মুহজিরকে এবং পতাকা হাতে দিয়ে সমস্ত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করেন তাঁর ভ্রাতা আব্বাস বিন আলীকে। ইমাম হোসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই হযরত আব্বাস (রা.) যিনি ছায়ার মত বড় ভাই ইমাম হোসাইনকে অনুসরণ করতেন। তিনি ইমামকে 'আকা' বলে ডাকতেন।

তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও শক্তিশালী ছিলেন। যার কারণে তাঁকে সবাই বনি হাশিমের চাঁদ বলে ডাকতেন।

অতঃপর ইমাম হোসাইন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন– ‘হে জনগণ! একটু থাম। আমার কথা শোন। আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে চাচ্ছি। তোমরা আমার কথা শুনলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, না শুনলেও আমার কোন ক্ষতি নেই। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পর তোমাদের যা খুশি করতে পারবে। হে জনগণ, তোমরা চিন্তা করে দেখ আমি কে? তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, আমাকে হত্যা করা কিংবা আমার সম্মানে আঘাত হানা তোমাদের জায়েয হবে কি না? আমি কি তোমাদের নবির প্রিয় দৌহিত্র নই? আমি কি তাঁর চাচাতো ভাই আলীর সন্তান নই? সাইয়িদুশ্ শুহাদা হামযাহ্ কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না? শহীদ জাফর তাইয়্যার কি আমার চাচা নন? আমি ও আমার সহোদর হাসান সম্পর্কে কি মহানবি বলেন নাই – হাসান ও হুসাইন হচ্ছে বেহেশ্তী যুবকদের সর্দার?

তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। প্রাচ্য-প্রাতীচ্যে আমি ব্যতীত নবির আর কোন দৌহিত্র তোমরা খুঁজে পাবেনা। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ? আমি কি তোমাদের কাউকে হত্যা করেছি? আমি কি তোমাদের কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছি? আমি কি তোমাদের কাউকে আহত করেছি? অতঃপর তিনি কুফার কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোকের নাম ধরে ডেকে বললেন, তোমরা কি আমাকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দাও নি? তারা অস্বীকার করলে তিনি বলেন– নিশ্চয়ই তোমরা তা দিয়েছ। কিন্তু এখন আমার এখানে আসার বিষয়টি তোমরা পছন্দ করছ না। সুতরাং তোমরা আমাকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে দাও। কুফাবাসীদের পক্ষ হতে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো– আপনি কেন আবদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন না? তিনি জবাব দেন– ‘আমি নীচু প্রকৃতির লোকদের মত আমার হাত দুরাচারের হাতে সঁপে দিতে পারি না। যে কেউ এমন শাসনকর্তা যদি দেখতে পাও যে, অত্যাচার করে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অন্যায় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ রাজত্ব করে আর এরূপ দেখার পরও যদি কথা ও কাজে তার বিরোধিতা না করে, তা হলে তার পরিণাম শুভ হয় না। আল্লাহ্ সেই অত্যাচারী শাসকের সাথে তাকেও দোজখে পাঠাবেন। চারিদিকে অন্যায় অত্যাচার চলছে।

জাতীয় সম্পদ, গণিমতের মাল ওরা অন্যায়ভাবে গ্রাস করছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হালালকে হারাম ও হারামকে হালালে পরিণত করা হয়েছে। অন্যায় ও অসত্যের উপর প্রকাশ্যে আমল করা হচ্ছে। এমন কেউ কি নেই যে, আজ সত্যের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেবে? জালিমের সাথে জীবিত থাকাই মহাপাপ। আমি শহীদের মৃত্যুই কামনা করি'। তাঁর এই হৃদয়গ্রাহী ভাষণেও তাদের মন বিগলিত হয়নি।

একদিকে মা ফাতেমার বীর দুলালী হোসেনী সেনা
আর এক দিকে যত তখ্‌ত বিলাসী – লোভী এজিদের কেনা। –নজরুল।

১০ মহর্‌রম সকাল হতে যুদ্ধ শুরু হয় এবং একদিন ব্যাপী এই যুদ্ধে কোন সময় দ্বৈত আবার কোন সময় সমষ্টিক যুদ্ধের মধ্যে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত চলতে থাকে। উমাইয়ার অসংখ্য অশ্বারোহী এবং ৫০০ তীরন্দাজ ইমামের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালাতে থাকলো। ইয়াজিদের বিশাল সৈন্যবাহিনী সম্মুখযুদ্ধে হোসাইনী সেনাদের সাথে টিকতে না পেরে ইবনে সাদ ডান দিক থেকে তাঁদের ধ্বংস করার জন্য একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। পাপিষ্ঠ সীমার একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইমাম ও তাঁর স্ত্রী পুত্রদের তাঁবু জ্বালিয়ে দিতে কাপুরুষের মত অগ্রসর হলে সঙ্গীদের ভর্ৎসনা খেয়ে লজ্জায় ফিরে আসে। দুপুর বেলা হোসাইন (রা.) ও তাঁর অনুসারীরা সালাত-আল-খাওফ (দুরবস্থায় পতিত হলে যে নামায পড়তে হয়) এর রীতিতে যোহরের নামায আদায় করেন। বিকেলের দিকে সংঘর্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে।

ইমামের সঙ্গীরা যতক্ষণ জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ ইমাম বংশের কাউকেও তাঁরা যুদ্ধ করতে দিলেন না। আসহাবগণ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন। অতঃপর ইমাম (রা.)-এর ছেলেরা বাহুবলের পরিচয় দিয়ে শাহাদত বরণ করলেন। প্রথমে প্রাণ বিসর্জন দিলেন ইমাম হোসাইনের পুত্র আলী আকবর, তারপরেই যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন মুসলিম-বিন-আকিলের ভাইয়েরা। হযরত আব্বাস তিন সহোদরকে জেহাদে পাঠাতে বললেন– 'দেখ, ভাইয়েরা আমার, তোমাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই, এগিয়ে যাও জেহাদের ময়দানে, মরণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হও, আমি মনে করবো, তোমরা রাসূল (দ.)-এর হক আদায় করেছ'। একে একে তিন সহোদর মরণপণ লড়াই করে শাহাদত বরণ করলেন। পিতার আদেশ পাওয়া মাত্রই হযরত

আব্বাস (রা.)-এর ৮/৯/১০ বৎসরের তিন পুত্র মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ ও ওবাইদুল্লাহ্ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে সবাই অসহনীয় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। শহীদ হলেন ইমাম হাসান (রা.)-এর পুত্র কাসিম (রা.)।
এভাবে শহীদের সংখ্যা যখন পঞ্চাশের বেশী হয়ে গেল তখন ইমাম হোসাইন চিৎকার করে বলে উঠলেন– কে আছ এমন যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সাহায্য করবে? আছ কি কোন সহৃদয়, যে নবি করিম (দ.)-এর পরিবারের পুণ্যবতী নারী ও শিশুদের সাহায্য করবে? হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর উদাত্ত আহ্বানে ইয়াজিদ পক্ষের হোর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ইমামের (রা.) দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে ইবনে রাসূল (দ.) আমিই প্রথম আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলাম, এখন আমিই সর্বপ্রথম আপনার পক্ষে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলাম। হে ইমাম, আমাকে আদেশ করুন, আপনার জন্য প্রাণ বিসর্জন করি। এ উসিলায় কাল কিয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর শাফায়াত আমার ভাগ্যে জুটে যাবে।

ইমামের নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত হোর তাঁর দলবল নিয়ে আমর ইবনে সাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে অনেক ইয়াজিদী সৈন্য হতাহত করে তিনি শহীদ হলেন। নিজ শিশুপুত্র আলী আজগর পানির পিপাসায় জিভ বের করে দিলে ইমাম হোসাইন (রা.) দুশমনদের কাছে শিশুটির জন্য এক ফোঁটা পানি চেয়েও পেলেন না, বরং ইয়াজিদ সৈন্যরা ইমামের (রা.) কোলে শিশুটির শুষ্ক কণ্ঠে তীরবিদ্ধ করে পানির সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিল।

অবশেষে ক্লান্ত, অবসন্ন, ব্যথাহত, শোকাহত, রক্তাপ্লুত হযরত ইমাম হোসাইন একাকী বিশাল ইয়াজিদ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চতুর্দিক হতে ইমামের উপর তীর, বর্শা নেজার আঘাত আসতে শুরু করলো। ইমামের সম্মুখে আসার সাহস কারো ছিল না। তারা শুধু দূর থেকেই ইমামকে আক্রমণ চালায়। অবশেষে ইমাম অনেক শত্রুসৈন্য হতাহত করে চতুর্দিক হতে আক্রান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে জমিনের ওপর পড়ে গেলেন। নবি বংশের নারী ও শিশুরা বেদনাপ্লুত ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সে মর্মান্তিক দৃশ্য। ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্কে এ ভয়ঙ্কর অবস্থায় শিবিরের মহিলারা ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁবু থেকে গোলার মত ছুটে এসে তিনি তাঁর চাচাকে রক্ষার করার জন্য দু'হাত

বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন। শত্রু সৈন্যদের তরবারীর নির্মম আঘাতে ক্ষুদ্র বালকের হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সিনান বিন আনাস আমর তরবারীর আঘাতে হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে – (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, ৩৫০)। সেদিন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ৫ মাস ৫ দিন। মুসলিম সমাজে বহুল প্রচারিত যে, সিমারই হযরত ইমাম হোসাইনের হত্যাকারী। আসলে সে ছিল নির্দেশদাতা সেনাপতি, সরাসরি হত্যাকারী নয়।

এভাবে যখন সংঘর্ষ পরিসমাপ্ত হল তখন ইয়াজিদ সৈন্যরা নবি বংশের শিবির লুটপাট ও তছনছের দিকে মনোনিবেশ করলো। ইমাম হোসাইনের শরীরের কাপড়-চোপড়, তরবারী ইত্যাদি সবই ছিনিয়ে নিল। মহিলাদের অলঙ্কার, মালপত্র এমনকি তাদের নেকাব পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়। নবি বংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন, যিনি মারাত্মক অসুস্থতার জন্য যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। তিনি একটি চামড়ার উপর শায়িত ছিলেন, সে চামড়াটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর সিমার তাঁকে তরবারী দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হলে হযরত জয়নাব এসে তাঁর ওপর হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় এবং ইবনে সাদ এসে শিমারকে নিরস্ত্র করায় নবি বংশের শেষ চেরাগটি রক্ষা পায়।

যুদ্ধ পরবর্তী রাসূল পরিবার

১১ মহর্‌রম ইবনে সাদ ইয়াজিদ পক্ষের নিহত সৈন্যদের জানাযা পড়ে তাদের সমাহিত করলো। ইমাম হোসাইনের পক্ষের শহীদদের মস্তকবিহীন লাশ পড়ে রইলো।

১২ মহর্‌রম সকালে কারবালা হতে এক অদ্ভুত শোভাযাত্রা বের হল। প্রথম সারিতে ৭২ জন সৈনিকের বর্শার চূড়ায় আওলাদে রাসূলের কর্তিত মস্তক আর তার পেছনে উটের উপর নবি পরিবারের নারী এবং শিশুরা। পিছনে বিশাল উমাইয়া বাহিনী।

চোখের সামনে উন্মুক্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একান্ত আপনজনদের লাশগুলোর করুণ দৃশ্য দেখে মর্মভেদী আহাজারিতে যে করুণ দৃশ্য হয়েছিল তা এমনকি তাদের শত্রুদের চোখেও পানি এনে দিয়েছিল। আবু মিখনাফের

বর্ণনাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, একজন ইয়াজিদী সৈন্য নিজে বলেছে, আমি কখনোই সে মর্মাহত বেদনা ভুলতে পারবো না। যখন হোসাইনের বোন জয়নব তাঁর ভাইয়ের ছিন্ন ভিন্ন দেহ অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন– হে মোহাম্মদ (দ.), হে মোহাম্মদ (দ.), আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশ্তারা তোমার ওপর দরূদ ও সালাম পাঠায়। আর এই তোমার আদরের হোসাইন কী ভীষণভাবে লাঞ্ছিত, অবহেলিত, রক্তাপ্লুত খণ্ডিত লাশ হয়ে আছে। হে মোহাম্মদ (দ.)! তোমার কন্যারা আজ বন্দিনী, তোমার জবাই করা পরিবার-পরিজন আজ অপেক্ষা করছে পূবের হাওয়ার জন্য, কখন ধুলো এসে তাঁদের ঢেকে দেবে।

১২ মহর্‌রম যখন ইয়াজিদ বাহিনী কারবালা ত্যাগ করে তখন পার্শ্ববর্তী গ্রাম গাদিরিয়া থেকে বনু আসাদ গোত্রের লোকজন এসে ইমাম হোসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের মস্তকবিহীন লাশগুলো সেখানেই কবর দেয়। আশেক ভক্তেরা সেখানেই গড়ে তুলেছে শহীদদের সুদৃশ্য রওজা শরিফ।
কুফায় পৌঁছার পর ইবনে যিয়াদের নিকট কর্তিত মাথাগুলো এবং বন্দীদের উপস্থিত করা হয়। বিভিন্ন অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ও অগণিত দর্শকদের এক আনুষ্ঠানিক সমাবেশের আয়োজন কর হয়। তথায় একটি খোলা পাত্রে ইমাম হোসাইনের মাথা মোবারক তার সম্মুখে রাখা হয়। পাপিষ্ঠ ইবনে যিয়াদ উদ্ধতভাবে একটি লাঠি দিয়ে ইমামের পবিত্র ঠোঁটে আঘাত করছিল। রাসূলের এক বৃদ্ধ সাহাবা ইমাম হোসাইনের চেহারা চিনতে পেরে মর্মাহত ও শোকাহত হয়ে গর্জে উঠে বললেন– হে ইবনে যিয়াদ, এই পবিত্র ওষ্ঠযুগলে আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (দ.) চুমু খেতে এবং জিহ্বা ঘষতে দেখেছি। রাজধানী দামেশ্‌কে ইয়াজিদের কাছে পাঠানোর আগে কয়েকদিন যাবৎ ইমাম হোসাইনের কর্তিত মাথা জনসাধারণের প্রদর্শনীর জন্য রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। মদিনা এবং কুফার গভর্নরের কাছে পাঠানো ইয়াজিদের নির্দেশ ছিল। হয় ইমামের আনুগত্য আদায় করতে হবে না হয় তাঁর মস্তক নিতে হবে। এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই ইমামের কাটা মস্তক তার সামনে পেশ করা হয়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে ইসলাম তথা দুনিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক কারবালা ট্র্যাজেডির।

মক্কা ও মদিনায় ইয়াজিদী তাণ্ডব

কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড মক্কা ও মদিনাবাসীদের অন্তরে কঠিন আঘাত হানে। তারা ইয়াজিদ কর্তৃক নবিবংশ ও শেরে খোদা হযরত আলীর বংশধরের উপর কৃত জুলুম অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করে। মদিনার গভর্নর আবদুল্লাহ্ কারবালার নিষ্ঠুরতম ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মক্কা ও মদিনাবাসী মুসলমানেরা তাঁকে সমর্থন জানালেন। জনগণ ইয়াজিদের পদত্যাগ দাবি করে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ইয়াজিদ ৬৩ হিজরীতে (৬৮৩ খৃ:) মুসলিম ইবনে আকাবার অধীনে ১২০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মদিনায় প্রেরণ করে। হার্‌রা নামক স্থানে দু'দলে যুদ্ধ হলে ইয়াজিদ বাহিনী জয়লাভ করে। মদিনা নগরে এরা অত্যাচার, অনাচার, জুলুম, নির্যাতন ও উৎপীড়নের এমন ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যার ফলে মদিনাবাসীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ইয়াজিদ সেনারা প্রায় ১০,০০০ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করে। তন্মধ্যে রাসূলের সাতশত সাহাবাও ছিল। তারা পবিত্র মসজিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করে। তিনদিন পর্যন্ত কোন মুসল্লী এই মসজিদে নামায আদায় করতে সাহস করে নি।

মদিনা নগরীতে চরম অত্যাচারের পর ইয়াজিদ বাহিনী পবিত্র মক্কায় পৌঁছে যন্ত্রের সাহায্যে হেরম শরিফের উপর পাথর বর্ষণ করে। নিক্ষিপ্ত পাথরে খানা-এ-কাবার আশপাশ পরিপূর্ণ হয়ে ঘরের স্তম্ভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা কাবাঘরের গিলাফ জ্বালিয়ে দেয়, ইয়াজিদের সৈন্যরা যেদিন আল্লাহ্‌র ঘরের উপর এ জঘন্য হামলায় লিপ্ত হয় সেদিনই ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর ঘোড়া থেকে পড়ে ইয়াজিদের মৃত্যু হয়। সে ৩ বছর ৬ মাস অবৈধ রাজত্ব করেছিল।

পাপের ন্যায্য প্রায়শ্চিত্ত

মাওলানা মুফ্‌তি মোহাম্মদ শফী ওকাড়ভী (র.) নিজ পুস্তক 'দেওবন্দ হতে করাচি-পাকিস্তান'-এ লিখেছেন– ইমাম যুহরী (র.) বলেন, যে সমস্ত লোক হযরত হোসাইনের হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একজনও এমন ছিল না যে দুনিয়াতে শাস্তি পায় নি। কাউকে হত্যা করা হয় আবার কারো কারো চেহারা কুৎসিত অথবা বিকৃত হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে তাদের রাজত্ব কেড়ে নেওয়া

হয়। আর এটা স্পষ্ট যে, এগুলো এদের কৃতকর্মের আসল শাস্তি নয়, বরঞ্চ এটা ছিল নমুনা মাত্র। যা মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে দেখানো হয়েছিল।

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার মাত্র পাঁচ বৎসর পর হিজরী ৬৬ সালে কুফাবাসী বিশিষ্ট সাহাবী যিনি হযরত ওমরের (রা.) খেলাফতকালে জসর বা সেতুর যুদ্ধে শহীদ হযরত আবু ওবায়েদের পুত্র রাসূল প্রেমিক মুখতার যখন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের বদলা (কেসাস) গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন সর্বসাধারণ তাঁকে বিপুল সমর্থন করে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিপুল শক্তি অর্জন করে কুফা ও ইরাকের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর সহচর ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন যে, ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পরিবারের হত্যাকারীদের ছাড়া বাকী সবার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হল। অপরদিকে হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে এক একজনকে বন্দী করে হত্যা করেন। ৬৮৬ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে কারবালা যুদ্ধে ইয়াজিদের প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ জার নদীর তীরে এক যুদ্ধে মুখতার বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হয়। এমনকি একদিনে ২৪৮ জনকে এ অপরাধে হত্যা করা হয়। এরপর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান ও বন্দী করার কাজ শুরু হয়। আমর ইবনে হায্যার যুবাইদি উষ্ণতাবোধ ও পিপাসা নিয়েই পালিয়েছিল। পিপাসায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলে তাকে জবাই করা হয়। সিমার ইবনে যিল জওশন নামক যে ব্যক্তিটি হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর ছিল তাকে হত্যা করে তার লাশ কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে উসাইদ জুহানী, মালেক ইবনে বশির বদি এবং হামল ইবনে মানিককে অবরোধ করা হয়। তারা ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করলে উত্তরে মুখতার বলেন– জালিমের দল, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর দৌহিত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন কর নি, তোমাদের প্রতি কিভাবে দয়া প্রদর্শন করা যেতে পারে? অতঃপর সকলকেই হত্যা করা হয়। মালিক ইবনে বশির হযরত হোসাইন (রা.)-এর টুপি খুলে নিয়েছিল, তার উভয় হাত ও পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে ময়দানে রেখে দেওয়া হয়। সে ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। মুসলিম ইবনে আকিলের হত্যায় সহযোগিতা করেছিল উছমান ইবনে খালেদ

এবং বশির ইবনে সমীত। তাদেরকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উমর ইবনে সাদ নামক যে ব্যক্তিটি হযরত হোসাইন (রা.)-এর মোকাবেলায় সৈন্যদের পরিচালনা করেছিল, তাকে হত্যা করে তার মাথা মুখতারের সামনে উপস্থিত করা হয়। এদিকে মুখতার পূর্বেই তার ছেলে হাফেজকে দরবারে বসিয়ে রেখেছিলেন। উমর ইবনে সাদের মাথা দরবারে উপস্থিত করা হলে, মুখতার হাফেজের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি কি জান এটা কার মাথা? সে বলল হ্যাঁ জানি আমার পিতার। অতঃপর তাকেও হত্যা করা হয়। ইয়াজিদের পদলেহী ক্ষমতা ও বস্তু পুজারীদের এভাবেই করুণ পরিণতি ঘটেছিল।

‘কারবালায় পুনঃ উড্ডীন ইসলামের বিজয় কেতন’

১০ মহর্‌রম কারবালার জমিনে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে নবিজী ওয়াকিবহাল ছিলেন। বায়হাকী শরীফের হাদিসে হযরত উম্মে ফজল (রা.) [যিনি সম্পর্কে নবি করিম (দ.) এর চাচী] বলেন, এক রাতে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখেন যে, মহানবির শরীর থেকে এক টুকরা মাংস কেটে তার (উম্মে ফজল) কোলে রাখা হল। মহানবি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, চাচী আম্মা! আপনি খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছেন। আমার মেয়ে ফাতেমা এখন গর্ভবতী। তার কোলে একটি ছেলে সন্তান আসবে এবং ওই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েই প্রথমে আপনার কোলে আসবে। অতঃপর উম্মে ফজল (রা.) বলেন, সত্যি সত্যি একদিন ফাতেমার একটি ছেলে সন্তান জন্মলাভ করল এবং আমি ওই সন্তানকে কোলে নিয়ে নবিজীর দরবারে হাজির হলাম। ওই শিশুকে দেখে মহানবির চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে গেল। উম্মে ফজল আরও বলেন, কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম, নবিজীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চাচী আম্মা! এইমাত্র জিব্রাঈল (আ.) এসে আমাকে জানালো, আমার এ নাতিকে আমারই নামধারী উম্মত কারবালার জমিনে শহীদ করবে (মিশ্‌কাত শরিফেও এ হাদিসটি বর্ণিত আছে)। শুধু নবিজীই নন বরং ইমাম হোসাইন যে কারবালার জমিনে শহীদ হবেন এ কথা হযরত আলী (রা.), মা ফাতেমা (রা.) সহ বড় বড় সাহাবীরা জানতেন। কাজেই প্রশ্ন আসতে পারে ইমাম হোসাইন (রা.) এর জন্য তো আল্লাহ্‌র নবি প্রাণ রক্ষার দোয়া করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না কেন?

যে নবির হাতের আঙ্গুলের ইশারায় লাখো লাখো মাইল দূরের আকাশের চাঁদ টুকরা হয়, যে নবি হুকুম করলে পাথর কলেমা পড়ে, যে নবির জবানের ইশারায় বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে নবিকে সালাম দেয় সেই নবিয়ে পাক আল্লাহ্‌র দরবারে প্রাণ রক্ষার আবেদন করলে তা নিশ্চিতরূপেই কবুল হতো। কিন্তু সেটি মহানবির শিক্ষা নয়। আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (র.) বলেছেন– এক হাজার কাবার চেয়ে আল্লাহ্‌ওয়ালা একটি দিলের দাম অনেক বেশি। সুতরাং বলা যায় একজন ওলির কল্‌বের দাম যদি এক হাজার কাবার চেয়ে বেশী হয় তবে আউলিয়া সর্দার ইমাম হোসাইনের দাম তো আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কোটি কাবার চেয়ে বড়। কাজেই কাবা রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌ যদি আসমানে থেকে ছোট ছোট পাখি পাঠিয়ে দিয়ে আবরাহা বাদশাহ এবং তার হাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারেন (সূরা ফিল দ্রষ্টব্য) সেই মাবুদ, রাব্বুল আলামীন কারবালার জমিনে ইমাম হোসাইনকে জীবিত রেখে দিয়ে এজিদের ২২০০০ সৈন্যকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক কুদরতের ক্ষমতা দেখালেন না বরং ইমাম হোসাইনকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম হোসাইনের (রা.) জন্য কারবালার জমিন ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করা যেমনি অবৈধ তেমনি কারবালার জমিনের পরীক্ষা কেন্দ্রে ইমাম হোসাইনকে সহযোগিতা করাও আল্লাহ্‌র নবির জন্য সমীচীন হতো না। তাই তো কবি বলেন, 'প্রেম-রূপের শোভাস্থলে রণক্ষেত্র তপ্ত হলো / কারবালার ওই ময়দানে আহলে বাইতের যাচাই হলো'।

কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে অনেক গ্রন্থ ও পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়েছে। এদের কোথাও কারবালার ঘটনা অতিরঞ্জিত হয়েছে, কোথাও ইসলামের শত্রুদের পদলেহন করতে গিয়ে ইমাম হোসাইনের পূতঃপবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করা হয়েছে, কোথাও বা ইয়াজিদের মতো ফাসেক লোককে নিষ্পাপ বলতেও কুণ্ঠাবোধ করা হয়নি। প্রকৃত ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কারবালার ঘটনার ওপর যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম হোসাইন (রা.) কারবালার জমিনে নিজের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামের বাগানকে তাজা করেছেন। কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আল্লামা ইকবালের সুমহান বাণী–

'নক্‌শে ইল্লাল্লাহা বার সাহারা নবিস
সাতরে উনুয়া মে নাজাতে মা নবিস'

ড. আল্লামা ইকবালের মতে, ইমাম হোসাইন (রা.) ৬১ হিজরীর ১০ মহর্‌রম কারবালার জমিনে ইল্লাল্লাহ্‌র এমন একটি নক্‌শা অঙ্কন করেছেন, যে নক্‌শা আঁকার জন্য হোসাইনের কাছে কোন কাগজ ছিল না, কারবালার জমিনকে কাগজ বানিয়েছেন, কোন কলম ছিল না কিন্তু নিজের কল্‌বকে কলম বানিয়েছেন। কোন কালি ছিল না, কিন্তু নিজের রক্তকে কালি বানিয়ে এমন এক নক্‌শা এঁকেছেন যে নক্‌শা অনুযায়ী এখনও পৃথিবীতে আজান হচ্ছে, নামায হচ্ছে, হজ্ব-যাকাত হচ্ছে, ইসলামের বিজয় কেতন উড়ছে; কেয়ামত পর্যন্ত উড়তে থাকবে।

অবিনাশী মওলায়ী ধারা

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শাহাদাতের পূর্বে খোদায়ী নূরের যে মওলায়ী আমানত তাঁর কাছে ছিল তিনি তা পুত্র হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনকে (রা.) অর্পণ করেন। তিনি রোগশয্যায় শায়িত না হলে কারবালায় মুছে যেতো খোদায়ী নূরের মওলায়ী ধারা। নবি বংশের শাসন ক্ষমতা হারালেও এই কিশোরের পবিত্র রক্তধারা জগতব্যাপী শত দুঃখ কষ্ট হত্যা নির্যাতন সত্ত্বেও জারি রয়েছে। নতুবা খোদায়ী রহমতের সংযোগ হারা চরম বিভ্রান্তির অন্ধকারে বহুকাল আগেই জগত ডুবে যেতো। এই রক্তবীজ হতে পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে তাওহীদের একত্ব মহিমা ও জলওয়ায়ে নূরে মোহাম্মদী বিকশিত হয়ে চলেছে। এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া।

নক্ষত্ররাজি হলো পৃথিবীবাসীদের নিরাপত্তা স্বরূপ। যখন আকাশের নক্ষত্ররাজি থাকবেনা, আসমানবাসীরাও থাকবেনা, আর যখন আমার আহলে বাইত পৃথিবীতে থাকবে না তখন পৃথিবীবাসীর অস্তিত্বও টিকে থাকবে না (সূত্রঃ মুসনদে আহমদ ও মিরকাত শরহে মিশ্‌কাত)।

ইতিহাসের সেরা কোরবানী

প্রায় ৬০০০ বছর পূর্বে আল্লাহ্‌র স্বপ্ন নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম নবি (আ.) বালক পুত্র হযরত ইসমাঈলকে (আ.) মক্কা নগরীর মিনা নামক স্থানে জবেহ করতে নিয়ে যান। স্নেহের পুত্রকে জবেহ করতে মানসিক দুর্বলতা হতে পারে মনে করে পিতা কাপড় দিয়ে দু'চোখ বেঁধে ফেলেন। অতঃপর জবেহ সম্পন্ন হলে দেখা যায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে একটি দুম্বা জবেহ্ হয়েছে। এই পরিবর্তন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ঘটেছিল। পিতাপুত্রের এই আত্মোৎসর্গকে পবিত্র কোরআনে 'বিজব্হীন আযিম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জবেহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও মূল জবেহ বাকি থেকে যায়। এই ঘটনার স্মরণে প্রতি বৎসর জিলহজ্ব মাসের ১০-১৩ তারিখে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য উট, দুম্বা, গরু, ছাগল জবেহ করে কোরবানী বা ঈদুল আজহা পালন করা হয়।

মিনার ঘটনায় পিতৃস্নেহের দুর্বলতায় কাপড়ের পট্টি বাঁধা হয়েছিল। কারবালায় মওলা ইমাম হোসাইন (রা.) নিজ সন্তান, আত্মীয় পরিজন এমনকি দুগ্ধপোষ্য সন্তানসহ ৭১ জনকে কোরবানীর উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দিয়েছিলেন খোলা চোখে, দৃঢ় চিত্তে, কোন প্রকার দ্বিধা দুর্বলতা তাঁর কাছে ছিলনা। অবশেষে নিজেও শহীদি কাফেলায় শরিক হলেন। তাই এটাই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কোরবানী। এভাবে নবি ইব্রাহিম (আ.) ও নবি ইসমাঈল (আ.)-এর অপূর্ণ জবেহের পূর্ণতা দিলেন তাঁদেরই পবিত্র বংশধর মহান ইমাম পরিবার তথা আহলুল্ বাইত। কোরবানী সম্পর্কে আল্লামা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এক আলাপে বলেন, হযরত আদমের (আ.) সময়কাল হতে মানুষ হত্যা ধর্মে নিষিদ্ধ। স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে একজন নবি তৎপুত্রকে জবেহ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকরী করার জন্য উদ্যত হতে পারেন না। বরং মহাজ্ঞানী পিতা পুত্রকে ইনসানে কামেল রূপে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সে কোরবানী ছিল রূপক। আল্লাহ্‌র পবিত্র কাবাঘর নির্মাণের জন্যই এই পবিত্রতা অর্জন জরুরি প্রয়োজন ছিল। [সূত্রঃ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) যেমন দেখেছি - মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। মাসিক আলোকধারা, জানুয়ারী ১৯৯৯]।

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন রাসূলুল্লাহ্ (দ.) হতে মওলারূপী খোদায়ী নূরের যে প্রতিনিধিত্ব হযরত আলী (ক.) পেয়েছিলেন তিনি তাঁরই পুত্র হযরত ইমাম

হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) নিকট তা আমানত রেখে যান। এই খোদায়ী আমানতদারী কোন জাগতিক পরাশক্তি বা মহাশক্তির নিকট মাথানত করতে পারেন না। এজন্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এই পবিত্র মহান আমানতের মর্যাদা রক্ষায় নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পরিবার পরিজনসহ সামনে অগ্রসর হয়েছেন; সকলকে নিয়ে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করেছেন। তবু অধার্মিক অপশক্তির সাথে আপোষ রক্ষা করে বাঁচতে চান নি, তাই তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সংশপ্তক – শ্রেষ্ঠতম শহীদ। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর রূপক ঘটনাকে পবিত্র কোরআনে শ্রেষ্ঠ জবেহ বলে উল্লেখিত। মূল জবেহ কী বলে সংজ্ঞায়িত হওয়া উচিত বিজ্ঞ আলেম সমাজ ও সত্যদর্শী জ্ঞানী গুণীদের নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। সে নিরিখে ঈদ-উল আজহার মত গুরুত্বের সাথে পবিত্র মহর্‌রম পালন মুসলমানদের জন্য জরুরি ঈমানী দায়িত্ব।

যে ট্র্যাজেডির মহাকাব্য নেই

কত দেশের কত ভাষায় অনুজ্জ্বল কত ঘটনা নিয়েও কত মহাকাব্য রচিত হয়েছে। হিন্দু কুরু বংশের এক বীর মেঘনাদ হত্যাকে কেন্দ্র করে মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাংলা ভাষায় রচনা করেন তাঁর অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'। অথচ ১২৫ কোটি মুসলমানের শতাধিক ভাষার কোনটিতে কেউ চৌদ্দশ বছরেও কারবালার মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিকে নিয়ে কোন মহাকাব্য রচনা করে নি, কিছু মর্সিয়াই দৃষ্টিগোচর হয়। মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ফকির গরীবুল্লাহ্ রচিত জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা পুঁথি এবং তৎপরবর্তীকালে মীর মোশাররফ হোসেন রচনা করেন 'বিষাদ সিন্ধু'। এটিও উপন্যাস ধাঁচের মর্সিয়াই। এত বিষাদময় ঘটনাকে মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বলেও মনে হয় না। ১০ মহর্‌রম আশুরাকে বিশ্ব মুসলিম সমাজ সর্বজনীন ধর্মীয় দিবস হিসেবে পালনও করে না। অথচ নামাযের প্রতি দুই রাকাত আদায়ের পর বসে যে দরূদ পাঠ করা হয় তাতে 'ওয়ালা আ'লে মোহাম্মদ' বলে হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর বংশধরকে সালাম দিতে হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের দীর্ঘ অপপ্রচারে কারবালা ট্র্যাজেডি শ্রেষ্ঠতম কোরবানীর পবিত্র ধর্মীয় গুরুত্ব হারিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ ঘটনার ইতিহাসে রূপ নিয়েছে। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে?

অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ফরজ

ইমাম পরিবার কুফায় গিয়েছিলেন ধর্মীয় দাওয়াতের আহ্বানে, শান্তি ও নিরাপত্তার খোঁজে। সৈন্যবাহিনী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে কোন সামরিক অভিযানে নয়। মহিলা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে কেউ কি যুদ্ধ করতে যায়? স্বৈরাচারী ইয়াজিদ নিজ শাসন ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য কারবালা ছিল আরোপিত অসম যুদ্ধ। যুদ্ধের সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে পরিবার পরিজন ও শিশু কিশোরসহ নির্বিচার হত্যার এক কুখ্যাত নজির এই নৃশংস ঘটনা। খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে রাসূলের আবির্ভাব না হলে আরব উপদ্বীপের বাসিন্দারা আরও কত দীর্ঘকাল বর্বর লুটেরা ডাকাত পরিচয়ে পরিচিত হতো তা ধারণাও করা যায় না। রাষ্ট্র-জাতিবিহীন যাযাবর আরবকে যে রাসূল বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে সুগঠিত একটি সভ্য রাষ্ট্র দিয়ে গেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অসহায় শিকার হলেন তাঁরই পবিত্র পরিবার পরিজন। জগত সভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। কারবালার ঘটনা প্রকৃত ধর্ম ও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়।

কারবালা ছিল মূলত: আদর্শের যুদ্ধ। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম-সেমিটিক/ননসেমিটিক ঐতিহ্যবাহী এই তিন জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)। যে কারণে নমরূদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে, যে কারণে হযরত মুসা (আ.) তাঁর একমাত্র সহোদর ভ্রাতা হারুনকে সাথে নিয়ে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, যে কারণে মহানবি হযরত মোহাম্মদ (দ.) মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী নেতৃবৃন্দ আবু জেহেল, আবু লাহাব ও আবু সুফিয়ানদের সাথে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেই একই আদর্শিক কারণে রাসূলের নয়নমণি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজিদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়ের পতাকা উত্তোলন করেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য চৌদ্দশ বছরেও বিশ্বের কোন দেশে রাসূলের আদর্শের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। আজ পর্যন্ত আরবের কোন দেশে রাসূলের আওলাদগণ শাসন ক্ষমতার ধারে কাছেও নেই। তাই আদর্শের সে সংগ্রাম এখনো চলছে, চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতেই থাকবে এবং নবি পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় আসলে তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

কারবালার প্রতিবাদ সংগ্রাম ছিল সুসংগঠিত বিশাল স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে আদর্শবাহী মুষ্টিমেয় মানুষের। ইমাম হোসাইনের এই স্বৈরাচার ও অগণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম যুগে যুগে দেশে দেশে সংগ্রামী মুক্তিকামী মানুষকে প্রেরণা যোগাবে। কারবালা প্রান্তরে ইমামের একটি বাক্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইয়াজিদের সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে একজনও কি মুসলমান নাই'? অর্থাৎ বিরাট ইয়াজিদ বাহিনীর সকলেই নকল মুসলমান। এই একটি মাত্র বাক্যে তিনি গোটা মুসলিম মিল্লাতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন অসত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য – ফরজ এমনকি একা হলেও। এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যই কারবালার মহতী শাহাদাত।

ঐশী প্রেমে নূরের খনি

হযরত আবুজর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবি করিম (দ.)-কে কা'বা ঘরের দরজা ধরে বলতে শুনেছি, "নিশ্চিত জেনে রাখো, আমার আহলে বাইত [রাসূল (দ.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত আলী (ক.), হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)] নূহ নবির (আ.) নৌকার মত। যারা সে নৌকায় আরোহণ করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে; যারা পিছন ফিরেছে অর্থাৎ নৌকায় উঠেনি তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত (মিশ্‌কাত)। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, হযরত মহানবি (দ.) ফরিয়াদ করেন, হে আল্লাহ্ হাসান ও হোসাইনকে যারা ভালবাসে, তুমি তাদের ভালবাসো (মিশ্‌কাত)।

সত্য ন্যায় ও ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদের রক্তে সেদিন কারবালার ধূসর মরু প্রান্তরের একই সাথে রঞ্জিত হয়েছে সেকাল ও অনন্তকালের কোটি কোটি বিশ্বাসী মুসলমান এবং মানবতাবাদী সকল ধর্মের মানুষের অন্তরও। এ মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা যখনি তারা শুনবে অথবা পাঠ করবে দুঃখ ক্ষোভ ও বেদনায় তাদের হৃদয় হবে ভারাক্রান্ত। দু'চোখে নামবে আবেগের অশ্রুধারা। ব্যথার অশ্রুতে নাইয়ে কোটি কোটি পাপী হবে পরিশুদ্ধ পুণ্যবান, হাজারো পুণ্যাত্মা হবেন ঐশী প্রেমে নূরের খনি। কিয়ামত পর্যন্ত এই মহান ভালবাসার দান-প্রতিদানে মানবতা হবে সমৃদ্ধ ও বিকশিত।

“সাফা-মারওয়া পাহাড় দু'টি এবং কোরবানীর পশুকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত” বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা বাক্বারা : ১৫৮) ত্যাগের অপূর্ব মহিমায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপরে বর্ণিত খোদায়ী নিদর্শনসমূহের চেয়ে নিঃসন্দেহে ত্যাগের মহীমায় উজ্জ্বল। তাই কারবালার শহীদানের স্মরণ আল্লাহ্‌র ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ আরও ঘোষণা করেছেন– “যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ স্মরণ করবে এটা হবে তাদের অন্তরসমূহের তাক্‌ওয়া” –(সূরা হজ্ব : ৩২)।

অনন্ত মিছিলে অংশ চাই

মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর রচিত বহুল প্রচারিত বাণী, “কত্‌লে হোসাইন আসল্‌মে মর্‌গিয়ে ইয়াজিদ, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ”। অর্থ– হোসাইনকে খতম করতে প্রকৃতপক্ষে ইয়াজিদেরই মৃত্যু ঘটল। ইসলাম ধর্ম নবজীবন লাভ করে কারবালার মত ত্যাগের অপূর্ব মহিমায়।

ইমাম হোসাইন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য সত্য ও ন্যায়ের জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে রইলেন (শহীদ অর্থ সাক্ষী)। আল্লামা জামী (র.) বলেন– মোহাম্মদ জানে আলম আস্‌তজানী ওয়া হোসাইন বিল আলী জানে মোহাম্মদ।

অর্থাৎ জান কি জামী? সমস্ত সৃষ্টি জগতসমূহের প্রাণ হলেন মোহাম্মদ (দ.) আর মুহাম্মদের প্রাণ হলেন ইমাম হোসাইন (রা.)। আল্লামা ইকবাল (র.) কত সুন্দর ভাষায় না বলেন–

দর্ মিয়ানে উম্মতে আ কিউরা জনাবে, হামচু হরফে কুল্‌হু আল্লাহু দর্ কিতাব। সির্‌রে ইব্রাহিম ওয়া ইস্‌মাইলে বুদ্, ইয়ানি ইজমালেরা তফসীরে যুদ্। রম্‌যে কুরআঁ আয় হুসাইন আ মুখ্‌তমি, যে আতশে ও শোলা হা আন দুখ্‌তীম।

ভাবার্থঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) উম্মতে মোহাম্মদীর মাঝে ঐ মর্যাদায় ভূষিত যেমন পবিত্র কোরআনে কুল্‌হু আল্লাহ্ শরিফ। হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাঈলের ঈমানী পরীক্ষার মূল রহস্যও তিনি। পবিত্র কোরআনের অন্তর্নিহিত মর্ম তাঁর পবিত্র শাহাদত থেকেই পেয়েছি। তাঁরই প্রেমের অগ্নিকুণ্ড হতে প্রেমের অগ্নিশিখা লাভ করেছি।

জগতশ্রেষ্ঠ অন্যতম সাধক হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি আজমিরী (র.) বলেন, কারবালার ঘটনা আসল ও নকল মুসলমান চিহ্নিত করার আয়না বিশেষ। ধর্মীয় গুরুত্ব বাদ দিয়ে যারা এই ঘটনাকে নবি পরিবারের ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা বলে অপবাদ ছড়ায় তারাই নকল মুসলমান। জগতশ্রেষ্ঠ শহীদ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে তাঁর ফার্সি ভাষায় রচিত কবিতাংশঃ

"শাহ্ আস্ত হোসাইন, বাদশাহ্ আস্ত হোসাইন,
দ্বীন আস্ত হোসাইন, দ্বীনে পানাহ্ আস্ত হোসাইন।
সরু নাদ্ দাস্তে ইয়াজিদ / হাক্কাকে বানায়ে লাইলাহা আস্ত হোসাইন।
জানে মান্ আবাদ বেনামে হোসাইন / মানবে গোলামানে গোলাম হোসাইন"।

অর্থঃ 'হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অদ্বিতীয় মহৎ মহান, হোসাইন-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, হোসাইন-ই ধর্ম, হোসাইন-ই ধর্মের একমাত্র অবলম্বন। প্রাণ দিলেন তবু তাগুতি অপশক্তি ইয়াজিদের নিকট মাথা নত করলেন না। তাই হোসাইন চির সত্য কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অবিনাশী পতাকা। হোসাইনের পবিত্র পদপ্রান্তে আমি মনপ্রাণে উৎসর্গিত। আমি তারই দাসানুদাস হতে চাই যিনি হোসাইনের অনুগত দাস'। হে আল্লাহ্, কারবালার অনন্ত বিজয় মিছিলে অংশীদার করে আমাদের জীবনকে আপনি সফল ও ধন্য করুন। আমিন!

একটি মাত্র কারণেই

চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার হাজীপাড়ার আশেকানে আউলিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বশর হক্কানী এক আলোচনায় বলেন– প্রত্যেক কিছুর একটি চালিকা শক্তি রয়েছে। যেমন মানব দেহে প্রাণ, তেমনি ধর্মেরও রয়েছে প্রাণশক্তি। যে শক্তির অভাব হলে দেহ যেমন অচল তদ্রুপ ধর্মও ঠিকমত চলে না, চলতে পারে না। বিশ্বব্যাপী মুসলমানেরা কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত পালন ও আদায় করে থাকে। এগুলো আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হচ্ছে কিনা কোন খবর কেউ জানে না। একটি মাত্র কারণে ধর্ম বর্তমানে অনুষ্ঠান সর্বস্ব গতানুগতিকায় রূপ লাভ করেছে। ধার্মিক ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র নেই, তাই মুখের কথার কোন প্রভাব নেই। যেরূপ নবি অলিদের থাকে। একটিমাত্র কারণটি হলো আল্ কোরআনে বর্ণিত– রাসূলের আহ্‌লে বাইতের প্রতি মুয়াদ্দাৎ বা ভালবাসার অভাব। যতদিন এই প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা

না যাবে ততদিন ইসলামের মরু প্রান্তর আর কখনও সবুজ বাগানে রূপান্তরিত হবে না। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেন, দুনিয়ার কোথায়ও আহ্‌লুল্লাহদের সত্যিকার ভালবাসা অর্জনের তেমন কোন গরজ বৃহত্তর মুসলিম সমাজ উপলব্ধি করছে না। তাই অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর বড় কোন জাগরণ আশা করা যায় না।

বিশ্বদিশারী পূরবী সূর্য

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী। ধর্মীয় ব্যাখ্যায় আলেম সমাজ বহু দলে বিভক্ত, একই সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন সমাধান। প্রত্যেক দল কর্তৃক তাদের মতকেই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা। ফলে বাক-বিতণ্ডা ঝগড়া-সংঘর্ষ চলতেই থাকে। মারোয়ান চক্রের ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) মুসলিম বিদ্রোহীদের হতে শহীদ হওয়া, চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (ক.) শাসনকালে কুফার (সিরিয়া) গভর্নর আমীরে মুয়াবিয়া ও খারেজীদের বিদ্রোহ, তাঁর পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক কারবালায় নবি দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সহ পবিত্র নবি বংশের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ক্ষমতা দখলে আব্বাসীয়দের নির্বিচারে মুসলিম হত্যা ইসলামের শান্তির ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত করে। পরে মুসলিম জাতি স্রষ্টা প্রেম-প্রেরণা হারিয়ে নির্জীব ও শাসকের তোষামোদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রবুবিয়াত ও রিসালতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শাসনামলের পতনের পাঁচশ বছরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামী মূল্যবোধে প্রবেশিত অনাচার ও ভ্রান্তি দূর করতে একজন কালজয়ী ধর্ম-সংস্কারক প্রয়োজন হয়। রাহমাতুল্লিল আলামীন মহানবির (দ.) প্রতিনিধিত্ব বরিত হয়ে তাই আবির্ভূত হন গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.)। তিনি বলেন, 'সমস্ত অলিগণ আমার পদাংক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র নবির পদাঙ্ক অনুসারী'। বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী বা শরীয়তী নীতি-বিধানে শৃঙ্খলিত বেলায়তী শক্তি দ্বারা তিনি আলেম সমাজ ও ইসলামের অনৈক্য দূর করে নির্জীব আত্মাধারীদের খোদায়ী প্রেম-প্রেরণায় পুনরুজ্জীবিত করেন। এজন্য তিনি মুহীউদ্দিন বা ধর্মের পুনঃজীবনদাতা বলে খ্যাত। তাঁর সময়কালে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছিল।

অতপর ছয় শতাধিক বছরে নিজেদের ভুলের দরুণ মুসলিম জাতি সম্প্রদায় পৃথিবীর দেশে দেশে শাসন ক্ষমতাচ্যুত হয়। বিশ্ব মানব সমাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নিগড়ে অসহায় বন্দী। জগতের বুকে ন্যায়-সাম্য প্রভৃতি স্রষ্টা প্রদত্ত অধিকার হতে বঞ্চিত মানবজাতি। আল্লাহ্ প্রেমিক অলি বুজর্গদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার ও হত্যার দরুণ স্রষ্টা প্রেম-প্রেরণা হারিয়ে সমগ্র মানব আত্মা পুনঃনির্জীব হয়ে পড়ে। নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানবতা অন্ধকারের মাঝে আলোর প্রত্যাশায় দিন গোনে। তাই বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য আর একজন ধর্ম সংস্কারক বিশ্বঅলির আগমন সুনিশ্চিত হয়। নূরনবি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বংশজ্যোতি আলেম, পীর ও হেদায়েতকারীরা উন্নত জীবন বিধান – ইসলামের শান্তি ও মুক্তির বাণী বহন করে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েন। পাঠান ও মুগল যুগে ভারত শাসকদের আমন্ত্রণে দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন শহর ও জনপদে তাঁদের বহুল পদার্পণ ঘটে। ধর্মশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা, মসজিদের ইমামতি ও বিচার কাজে কাজীর পদে নিয়োজিত হতেন। তাঁদের এক শাখা তৎকালীন নবাবের আমন্ত্রণে বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে পৌঁছেন। এই শাখার এক কৃতীসন্তান সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড় নগরে কাজীর পদ অলংকৃত করেন। পরে ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে তিনি গৌড় নগর ত্যাগ করে পরিবার পরিজন সহ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কাঞ্চন নগরের ফইল্লাতলীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে সেখানে হাইদগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে। তাঁর এক পুত্র সৈয়দ আবদুল কাদের মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব নিয়ে ফটিকছড়ি থানার আজিমনগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর প্রপৌত্র মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ্ মাইজভাণ্ডার গ্রামে হিজরত করেন। চাটগাঁ-বদর শাহের চাঁটির আলোর মেলা। ভূমণ্ডলীয় বিষুব রেখার পূর্বে, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল জাতির মিলন ভূমি। সাগর পর্বত শ্যামল প্রকৃতির অপূর্ব মিতালী। অগণিত সাধক মহাপুরুষ অলি উল্লাহ্র সাধনা ও সমাধি ক্ষেত্র। প্রিয় বন্ধুর জন্য মহাপ্রভুর সাজানো স্বাগতিক সমাবেশ। মহানবির আবির্ভাব পূর্বে আরব দেশে যেমন ঘটেছিলো বহু নবির আগমন। বার'শ তেত্রিশ বাংলা সনের পহেলা মাঘ ঐতিহাসিক চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারে উদিত হলো অনাদিকালের কাঙ্ক্ষিত এক পূরবী সূর্যময় ব্যক্তিত্ব। নূরনবির বেলায়তী আদি নাম আহমদ ও ইস্‌মে আযম আল্লাহ্ শব্দযুক্ত আহ্‌মদ উল্লাহ্ – আল্লাহ্র প্রশংসিত বন্ধু (১৮২৬–১৯০৬)।

গ্রাম্য মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১২৬৮ হিজরীতে মাদ্‌রাসার শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১২৬৯ হিজরীতে তিনি যশোর জেলায় বিচার বিভাগে কাজীর পদে যোগদান করেন। অপরাধীকে দণ্ড দানে তাঁর মন বিচলিত হয়ে পড়লে তিনি এ পেশা ত্যাগ করে কলিকাতার মুন্সি বুঁ আলী মাদ্‌রাসায় প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন হতে অত্যধিক ইবাদত বন্দেগীতে রাত কাটাতে লাগলেন। এসময় তিনি অন্তর চক্ষুধারী এক কামেল অলি উল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পতিত হন। এই মহাত্মা গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর বংশধর ও কাদেরিয়া ত্বরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত সর্ব ভারতীয় প্রতিনিধি গাউসে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু সাহমা মোহাম্মদ সালেহ্‌ আল্‌ কাদেরী লাহোরী (র.) সাহেবের নিকট তিনি বায়াতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। পীর সাহেবের বড় ভাই খোদার ভাবে চিরকুমার হাজীউল হারামাইন হযরত শাহ্‌ সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ (র.) সাহেবের নিকট হতে লাভ করেন কুত্‌বিয়াতের জজ্‌বাতি ফয়েয (অনুগ্রহ)। এইভাবে গাউসিয়াত ও কুত্‌বিয়াতের পূর্ণ ফয়েজ লাভে তাঁর মধ্যে খোদায়ী জজ্‌ব ও সলুক (দীপ্ত ও শান্তভাব) প্রকাশ পেতে থাকে। হযরত আদম (আ.) হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.) পর্যন্ত সকল নবিই নিজ পরিচিতি ও মর্যাদা নিজেই ঘোষণা করেছেন। হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ, বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধ, চীনের কনফুসিয়াস, শিখদের গুরু নানক প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় ধর্মগুরুরাও আত্মপরিচয় দানে মানুষকে স্বীয় ধর্মে আহ্বান জানান। তদ্রুপ উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন আউলিয়ারাও নিজেরাই নিজেদের পরিচিতি প্রকাশ করেন; যাতে মানুষ তাঁদের নিকট হতে হেদায়তের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজ মর্যাদা ঘোষণায় বলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.) গাউসুল আজমিয়তের দুই তাজের (টুপি) একটি আমার মাথায় এবং অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের মাথায় দিয়েছেন। আমার নাম পীরানে পীর সাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর সাহেব একদা কাবা শরিফে ঢুকে রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.) সদর মোবারকে (বক্ষস্থল) ডুব দিলাম, দেখলাম সেটা এক অনন্ত দরিয়া"। এই ঘোষণায় পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি এবং বড় পীর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) উভয়েই নূরনবি হযরত

(দ.) হতে মেহেরবানীপ্রাপ্ত ওয়ারেসে নবি বা নবির যোগ্য উত্তরসূরি। উভয় গাউসুল আযম তৌহিদের জিম্মাদার ও রাসূলুল্লাহ্ (দ.) অনন্ত রহস্যজ্ঞানের অধিকারী। এ দু'জন ছাড়া জগতে অন্য কেউ গাউসুল আজমিয়ত দাবি করেন নি।

হযরত মুহিউদ্দিন ইব্নুল আরাবী (র.) আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান মনীষী, দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ফসূসুল হেকম' অনাগত কালের তথ্যের সঙ্গে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর বিবরণ সম্পূর্ণ মিলে যায়। ফলে নিশ্চিত যে, তিনিই সে অধ্যাত্ম পুরুষ। তাঁর জন্মের ৫৮৬ বছর পূর্বে হযরত ইবনুল আরাবী (র.) লিখেন, "ইনি বংশগত ও দেশগত হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। ৫৯৬ হিজরী সনে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁর শরীরস্থ মোহরে বেলায়েতের চিহ্ন তিনি আমাকে দেখান। তাঁর খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী সাধারণ লোকেরা স্বীকার করবে না। যদিও তাঁর খাতেমে বেলায়তের চিহ্ন লোকচক্ষুর অন্তরালে তথাপি তিনি আমার জামানাতেও বিদ্যমান ছিলেন" (ফসূস ৯৩ পৃষ্ঠা)।

খাতেমুল আউলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (দ.) অলিয়ে ওয়ারেস – উত্তরাধিকারী হন। বুযুর্গ হিসেবে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি 'নিস্বতাইনে আদমী' – বিগত ও অনাগতকালের বেষ্টনকারী হন। কামালিয়াতের কোন কিছু তাঁর বুযুর্গীতে বাদ পড়ে না। যদিও তাঁর এসব গুণাবলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে বা বিচার বুদ্ধিতে অথবা শরামতে ভাল বা মন্দ। এই সর্ববেষ্টনকারী বেলায়েত 'আহ্মদ ও আল্লাহ্' নামবিশিষ্ট আউলিয়ার জন্য নির্দিষ্ট" (ফসূস ১১১ পৃষ্ঠা)।

হযরত খিজির (আ.) এর রহস্যময় জ্ঞান, হযরত দাউদ (আ.) এর অবলুপ্ত সুরের মোহিনী প্রকাশ, হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাজকীয় ঐশ্বর্য, হযরত ঈসার (আ.) প্রেমের বাণী, মহানবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) বেলায়তী শানে-আহমদী নামের যুগোপযোগী পদচারণা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রার (রা.) না বলা অনেক কথার কথক, মহর্ষী মনসুর হাল্লাজ (রা.) এর তাওহিদী চিৎকার এবং বিপ্লবী সারমাদ শহীদের বিদ্রোহী ভাষাকে অবলম্বন করে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সৃষ্টি করেন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও দর্শন।

কিছু মানুষের সংশয় জিজ্ঞাসা– পৃথিবীতে এত ধর্ম দর্শন এমনকি ইসলাম ধর্মেও বহু ত্বরিকা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও মাইজভাণ্ডারীয়া নামে আর একটি ত্বরিকার প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষত্ব কোথায়?

মানবজাতির আদি পিতা-মাতা হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) এ পৃথিবীতে আগমনের সময়কালে তাঁদের জন্য সুন্দর জীবন যাপন পদ্ধতি ধর্মও এসেছিল। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের জীবন চাহিদা। সুখ-স্বাচ্ছন্দের দাবি মেটাতে মানব চরিত্রে প্রকাশ পায় লোভ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত। এই অপরাধ প্রবণ মানব জাতিকে বস্তু বা সংসারের মায়া মোহ হতে মুক্ত করে স্রষ্টা সংযোগ পুনঃ স্থাপনে অসংখ্য নবি, পয়গম্বর ধর্মদাতা যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করেছেন। ত্বরিকা ও দর্শন কোন ধর্মের উন্নত সাধন পদ্ধতি। সঠিক ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের অভাবে মানুষের যুগ জিজ্ঞাসা ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে আবির্ভাব ঘটে নতুন ধর্ম দর্শন ও ত্বরিকার। বাসগৃহ বা ভবন জীর্ণ হলে যেমনি সংস্কার কিংবা পুনঃ নির্মাণ করতে হয়।

সকল ধর্মে মানুষে মানুষে সদ্ভাব প্রীতি ভালবাসার নীতি-নির্দেশ থাকলেও ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে বহু দ্বন্দ্ব সংঘাত ও যুদ্ধ হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। নিজেদের ধর্ম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় জগতে কত লক্ষ কোটি মানুষের জীবন ও কি বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়েছে হাজার হাজার গবেষক নিয়োগ করেও সঠিক তথ্য উদঘাটন অসম্ভব। ইউরোপে মধ্যযুগে খৃষ্টান মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত তিনটি ক্রুসেড যুদ্ধের ভয়াবহতা ঐতিহাসিক প্রমাণ। শুধু ভিন্ন ধর্মীদের মধ্যে নয় – স্ব স্ব ধর্মের আন্তঃবিরোধে, ধর্ম ও পুরোহিত শাসিত সমাজ রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব সংঘাতে বিপুল রক্ত ঝরেছে। বিশ্বাসবোধের ভিন্নতার জন্য বার বার বিপন্ন হয়েছে সমাজ সভ্যতা ও মানবতা। ব্যথিত মানব সম্প্রদায় এহেন অবস্থার পরিবর্তন কামনা করেছে।

স্বার্থ, সম্পদ ও প্রাপ্য বিলি-বণ্টনে সবল সর্বদা দুর্বলকে ঠকিয়েছে, বঞ্চিত করেছে, প্রতারিত করেছে। নিজ অথবা আপন জনের ভাগ বড় করেছে। লক্ষ কোটি মানুষকে ন্যায্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত করে অল্প সংখ্যকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করা হয়েছে। নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম, আইন, রাষ্ট্র, সমাজ কেউ ঠেকাতে পারে নি। গোটা পৃথিবী জুড়ে চলেছে অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন। নিপীড়িত মানবাত্মা ফরিয়াদ করেছে, মুক্তি চেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্র বিজ্ঞানের বিকাশমান পরিবেশে হযরত গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আবির্ভাব ও বিকাশ। তাঁর জন্ম শতাব্দীতে বিশেষভাবে তাঁর জীবনকালে বিশ্ব মানব সমাজে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে সব ঘটনায় বিশ্বমানব সভ্যতা বার বার আলোড়িত হয়েছে এবং বিপুল কল্যাণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম ট্রানজিট খাল সুয়েজ খনন হয় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে পূর্ব-পশ্চিম নিকটতর হয়ে বিশ্ব নৌপথ বদলে গেল স্থায়ীভাবে এবং দ্বিতীয় ট্রানজিট খাল পানামা খনন হয় ১৯০৫-এ। বৃটিশ ভারতে একই সালে বৃহত্তর বঙ্গদেশ ভেঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় স্বতন্ত্র প্রদেশ। এই প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। সুবিধাভোগী হিন্দুদের আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে আসাম ছাড়া এই খণ্ডিত বঙ্গই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ ও সর্বশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হয়। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' বঙ্গভঙ্গের সময়ে রচিত।

এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই

"এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশিকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে" (সূরা আল্ ইমরান, আয়াত : ১০৩)। সুফি মতবাদী তফসিরকারকদের অভিমত এই যে, ইবাদত রিয়াযতে (স্মরণ সাধনায়) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগপ্রাপ্ত অলি-উল্লাহ্‌গণই সৃষ্টি জগতের ঐক্যসূত্র। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) ছিলেন তাঁর সময়কালের বিশ্ব ঘটনাবলীর আধ্যাত্মিক নিয়ন্তাশক্তি।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও দর্শন মুক্ত মানবতার ধারক এবং বিকাশক। এই ত্বরিকা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নীতি-নৈতিকতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেহেতু চরিত্র পরিশুদ্ধ করে মানুষকে পবিত্র করাই ধর্ম দর্শন ও ত্বরিকার মূল উদ্দেশ্য। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সকল ধর্মের ঐক্য বা সহ-অবস্থান নীতি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দ.) ঐতিহাসিক মদিনা সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল-কোরআনের কিছু আয়াতে এই সত্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

“যারা খোদা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেয়ীন যে কেউ হোক না কেন যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তাদের পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট সংরক্ষিত। তাদের জন্য না আছে কোন ভয় কিংবা অনুতাপ” – (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ৬২)।

“তোমরা কি খোদার কোন কিতাবকে বিশ্বাস কর এবং কোন কিতাবকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে এরকম যারা করে বা কর তারা এ বিশ্বে অপমান এবং কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি পাবে। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয় সব জানেন” – (সূরা বাক্বারা : ৮৫)।

“যারা বলে বেহেশ্তে শুধু খৃষ্টান ও ইহুদী ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারবে না; এটা তাদের মনগড়া কথা। বলুন হে মোহাম্মদ (দ.) তোমরা যদি সত্য হও, প্রমাণ উপস্থিত কর” – (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১১১)।

“বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকাজ করে তার জন্য তার প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে। এমন লোকের কোন ভয়ভীতি ও শোক-অনুতাপ থাকবে না” – (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১১২)।

“প্রত্যেকের জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ও ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির পথ নির্ণয় করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ যা কিছু তোমাদের দান করেছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে অগ্রসর হও। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পর বিরোধ সম্বন্ধে উচিত খবর দিবেন” – (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৪৮)।

“যদি এক সম্প্রদায় দ্বারা অন্য সম্প্রদায়কে দমন করা না হত, তবে উপাসনালয়গুলো ধ্বংস হয়ে যেতো; যেখানে খোদার নাম অধিক স্মরণ হয়” – (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৪০)।

আমি (রাসূল) জ্ঞানের শহর আলী তার দরজা – আল হাদিস। হযরত রাসূলে খোদার (দ.) ইলমে মারফতের খনি হযরত আলী (ক.) হতে যে বেলায়েতী ধারা গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানীর (ক.) কাদেরিয়া ত্বরিকা ও আতায়ে রাসূল, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশ্তির (ক.) চিশ্তিয়া ত্বরিকার মূল নির্যাস হতে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার উদ্ভব। সুফি সাধক

হযরত জালাল উদ্দিন রুমীর (র.) মৌলবীয়া ত্বরিকার সাথেও এই ত্বরিকার মিল রয়েছে।

বাংলাদেশে বহু ধর্ম, দর্শন ও ত্বরিকা প্রচলিত থাকলেও সবগুলো বহিরাগত। একমাত্র মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকারই এ দেশের মাটিতে জন্ম। এই ত্বরিকার মুরিদ ও ভক্ত করার পদ্ধতি বিভিন্ন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) ছিলেন মজ্জুবে সালেক অলি উল্লাহ্। অর্থাৎ তিনি কখনো ছিলেন দিঘী-পুকুরের জলের মত শান্ত, কখনো সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত বিক্ষুব্ধ। কখনো থাকতেন মগ্ন-চৈতন্য অবস্থায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোককে প্রচলিত পদ্ধতিতে মুরিদ করেছেন। মহানবি (দ.) হযরত ওমরকে (রা.) যেভাবে দৃষ্টিপাতে কাবু করেছেন তদ্রুপ তিনিও বহু লোককে দিল ঘায়েল করে ভক্ত মুরিদ করেছেন। বহু লোককে রহস্যপূর্ণ বাক্যালাপে অথবা কোন দ্রব্যসামগ্রী তাবার্রুক দান করে আশেকভক্ত করেছেন। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে বিপদ হতে মুক্ত করে, আশাবাদী মানুষের আকাঙ্ক্ষা-ফরিয়াদ-আবেদন পূরণ করে অসংখ্য মানুষকে কাছে টেনে আশেক ভক্ত করেছেন। সুদূর চীন হতে বাগদাদ পর্যন্ত তাঁর অসংখ্য খলিফা প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

যার যা প্রাপ্য দাও তারে

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির কল্যাণে আকাশ পাতাল ও ভূমিতে বিপুল সম্পদের সমাবেশ করেছেন। এসব সম্পদের মধ্যে আলো, বাতাস, পানির মত কিছু সম্পদকে সকলের জন্য করেছেন অবারিত। কৃষিজ, খনিজসহ বহু সম্পদের উৎপাদন ও বিলি-বণ্টনের অধিকার দিয়েছেন মানুষের এখতিয়ারে। এই বিলি-বণ্টনে মানুষ নিজ বা আপন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারায় বিশ্বজুড়ে যত অশান্তি অসন্তোষ বিবাদ সংগ্রাম যুদ্ধ ইত্যাদি। এমন ঘটনা সভ্যতার প্রথম হতে অদ্যাবধি চলে আসছে। মানবজাতিকে এই মহাসংকট হতে মুক্তি দিতে তিনি আল কোরআনের আদলে মোত্লাক বা ন্যায়নীতির অনুসরণে মানুষের প্রাপ্য অধিকার নির্ণয় ও বণ্টনের আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়ে ন্যায্য ভাগের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে আপোষ করার উপর জোর দেন।

হযরত মুসা (আ.) কে আল্লাহ্ তায়ালা দশটি অনুশাসন বিধি দান করেছিলেন যা 'টেন কমান্ডমেন্টস' হিসেবে পরিচিত। মাইজভাণ্ডারী দর্শনে সাতটি ধাপ বা সিঁড়ি রয়েছে যা 'উসুলে সাব্আ' বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি নামে অভিহিত। আসলে এসব নীতি পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। এটা কোরআন, হাদীস ও সূফিবাদের মৌল নির্যাস থেকে আহরিত। ব্যক্তি জীবনে এই নীতি-আদর্শ চরিত্রগতভাবে অর্জিত হলে সাধক খিজরী শক্তিসম্পন্ন অলি-উল্লাহ্র মর্যাদায় উন্নীত হয়। এমন সাধকের নিকট জীবন জগতের যাবতীয় রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত 'কুন্ ফায়াকুন' শক্তির অধিকারী হয়ে 'না হওয়া' 'না পাওয়া' কোন কিছুকে তাঁদের ইচ্ছা শক্তিতে করতে সক্ষম। এই কর্মসূচি শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বলয়েও ফলপ্রসূ হতে পারে। এই দর্শনের 'উসুলে সাব্আ' – সপ্তকর্ম পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: (১) ফানা আনিল খালক্ বা আত্মনির্ভরশীলতা (২) ফানা আনিল হাওয়া বা অনর্থ পরিহার (৩) ফানা আনিল এরাদা বা প্রবৃত্তি প্রসূত ইচ্ছা শক্তির বিনাশ (৪) মাউতে আবইয়াজ বা সাদা মৃত্যু (৫) মাউতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু (৬) মাউতে আহমর বা লাল মৃত্যু (৭) মাউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু।

(১) ফানা আনিল খালক্ – আত্মনির্ভরতা

ব্যক্তি জীবনে: কারো কাছে কিছু চাওয়া বা প্রত্যাশা করা ভিক্ষার মত হীন কাজ। এতে স্রষ্টা প্রদত্ত সহজাত শক্তি বিকশিত না হয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে নৈতিক উদ্যমতা, সৃজনশীলতা, স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়। এইজন্য সবকিছুতেই পরনির্ভরতা বর্জন করে আত্মনির্ভর হতে বলা হয়েছে। ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে এটা ছাড়া উন্নতির কোন বিকল্প নেই।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: জাতীয় সম্পদ ও শ্রমশক্তির যথাযথ ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিদেশী ঋণ নির্ভরতা পরিহার করা। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত গবেষণা খাতে মনোযোগী হওয়া। জাতীয় কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন। মৌলিক ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বিত করে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে "ওয়ার্ল্ড স্টেটস্ কো-অপারেটিভ ব্যাংক" বা "বিশ্ব রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করা। এতে জাতীয় আয়ের অনুপাতে সদস্য চাঁদা নির্ধারণ করে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে সহজ শর্তে ঋণদান করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।

(২) ফানা আনিল হাওয়া – অনর্থ পরিহার

ব্যক্তি জীবনে: পরনিন্দা, গীবত, চোগলখোরী, অপব্যয়, অপরের কাজে কর্ণপাত করা, সামর্থ সত্ত্বেও কর্মহীন জীবনযাপন করা, বিশৃংখলার আশঙ্কা আছে এরূপ কাজ বর্জন করা অর্থাৎ উপকারহীন সকল কাজ ও কথাবার্তা বর্জন করা। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এ তিনটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। এরপর স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বর্তমান যুগের মানুষ শুধু এগুলোতে সন্তুষ্ট নয়। জীবনে তারা আরো অনেক কিছু চায়। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের ভোগের নানা উপকরণ সৃষ্টি করে জীবন পদ্ধতি গতিশীল করেছে। কিন্তু কতেক ভোগ্যপণ্যের লোভ সারা বিশ্বের মানুষকে পাগল-প্রায় করে তুলেছে। তাই মানুষে-মানুষে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে একে অপরকে ঠকানোর নানা ফন্দি-ফিকির, বিশ্বব্যাপী এতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত-যুদ্ধ ও হত্যা ইত্যাদি। এজন্যে গাউসিয়ত নীতি মানবজাতিকে আহ্বান জানায় "সাধারণ চাহিদার অতিরিক্ত সব অনর্থ পরিহার কর"। এ পথেই সম্ভব প্রকৃত শোষণহীন সুস্থ সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা "যে কেউ অনর্থ পরিহার করে সে নিশ্চিত স্বর্গবাসী"।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: পারমাণবিক দ্রব্য আমদানী ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধ করা। মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি পরিহার করা। রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ জনগণের অংশীদারিত্বে আনা। তার অপচয় বা অপব্যবহার ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে ব্যবহার না করার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রীয় সর্বক্ষেত্রে অপচয় রোধের নিশ্চয়তা বিধান করে জবাবহিদিতার আওতায় আনা।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটঃ পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈবিক অস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধ করা। মজুদকৃত সকল মারণাস্ত্র ধ্বংস করে ফেলা।

(৩) ফানা আনিল এরাদা – প্রবৃত্তিপ্রসূত ইচ্ছার বিনাশ

ব্যক্তি জীবনেঃ নিজের প্রবৃত্তিপ্রসূত ইচ্ছাকে বিলীন করে স্রষ্টার ইচ্ছা ও তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। দুঃখ কষ্ট ও রোগ শোকে দিশেহারা হয়ে মানুষ বিমর্ষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে। অথচ এভাবে সমস্যার কোন সমাধান হয় না, বরং দুঃখই বাড়ে। মানুষের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু হয় না। যেহেতু তার শক্তি সীমাবদ্ধ, তাই অনন্ত অসীম স্রষ্টার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছাশক্তির নিকট নিজ স্বার্থ ও ইচ্ছাকে অবনত করে ধৈর্যধারণ করতে গাউসিয়ত নীতি নির্দেশ করে। পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে “নিশ্চয়, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন”। ব্যক্তি জীবনে প্রথম স্তরের এ তিন কর্মপন্থা পাপ বিতাড়নকারী।

জাতীয় প্রেক্ষাপটঃ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় তহবিল, মালামাল বা সুযোগ সুবিধা ব্যবহার না করা। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করা। প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে নিজ ক্ষমতাকে ব্যবহার না করা। যে কোন পরাজয়, বিফলতা, অনাস্থা ও জনমতকে উদার চিত্তে গ্রহণ করে নেয়া।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটঃ যে কোন রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সামরিক জোট না থাকা।

(৪) মউতে আবইয়াজ – সাদা মৃত্যু

ব্যক্তি জীবনেঃ নিজের মধ্যে সৃষ্ট বাসনা-কামনার ক্ষতিকর প্রভাবকে আয়ত্ত্ব করার জন্য সংযম প্রয়োজন। উপবাস বা রোজা সংযম সহায়ক পদ্ধতি। উপবাসে আত্মায় সাদা মৃত্যুর আলো অর্জিত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন, “আমি উপবাসে আলো পাই”।

জাতীয় প্রেক্ষাপটঃ রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে ও জনগণের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। অপচয় ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: জাতিসংঘের উদ্যোগে পালিত বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবসকে বর্ধিত করে একমাস ব্যাপী সমগ্র পৃথিবীতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধনের অনুশীলন করা, সামরিক ব্যয় হ্রাস করার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা।

(৫) মউতে আসওয়াদ – কালো মৃত্যু

ব্যক্তি জীবনে: আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি, বিদ্বেষ, ক্ষোভ দমন ও নিয়ন্ত্রণ। অপরের সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিজের দোষত্রুটি খুঁজে দেখা এবং দোষ মুক্তির চেষ্টা করা। শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে মানুষ সাধারণত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ফলে ঝগড়া বিবাদ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়ে সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হয়। অথচ শত্রুতা, নিন্দা ও সমালোচনার কারণ খুঁজে নিজে সংশোধিত হয়ে গেলে বহু বিরোধীয় পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব। এতে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে। বিনা কারণে নিন্দা-সমালোচনা এবং শত্রুতা সৃষ্টি হলেও ধৈর্যধারণ করাই গাউসিয়ত নীতি। ধৈর্যের ফলে পরবর্তী কোন সময়ে বিরোধীরা নিজেই দুর্বল হয়ে নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। কাউকে আর শত্রু নয়, সকলকে বন্ধু বলে মনে হবে। এটাই কাল মৃত্যুর গুণজ প্রকৃতি অর্জন।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমে গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার নিশ্চিতকরণ। সরকারি দলের একক কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা না করা। জাতীয় প্রশ্নে বিরোধী দলের যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গ্রহণ করা ও সরকারের ভুল ত্রুটির প্রতিবাদ, আন্দোলনের জন্য দমন নীতির আশ্রয় না নিয়ে ভুল স্বীকার ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা। এভাবে গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংঘঠিত সাম্প্রদায়িক-জাতিগত দাংগা, নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ, দেশ থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি রোধকল্পে প্রচলিত জাতিসংঘের নিন্দা প্রস্তাবকে আরো কার্যকরী করে একে 'বাণিজ্যিক ও সামরিক অবরোধের প্রতীক' হিসেবে গণ্য করা, যাতে এসব অমানবিক আচরণ দ্রুত বন্ধ হয়।

(৬) মউতে আহমর – লাল মৃত্যু

ব্যক্তি জীবনে: লোভ, লালসা, কামনা-বাসনা দমন ও সংযতকরণ। কামভাব ও লালসা মানুষকে পাপ পঙ্কিল পথে ঠেলে দেয়। বর্তমান যুগে কামভাব ও লালসার কারণে অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা সমাজে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করছে। নিজের মধ্যে সৃষ্ট কামভাব ও লালসার ক্ষতিকর শক্তিকে দমন অথবা ধ্বংস করতে পারলে লাল মৃত্যুর গুণ অর্জিত হয়। এই স্তর পর্যন্ত অর্জিত হলে সে ব্যক্তি অলিয়ে কামেল বা সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে গণ্য হবেন।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: চরিত্র হননকারী দেশী-বিদেশী কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রুচিবিরুদ্ধ অপতৎপরতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ে নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করার আন্তর্জাতিক কনভেনশন স্থির করা। যথেচ্ছাচারী সমকামীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদান বন্ধ করা।

(৭) মউতে আখজার – সবুজ মৃত্যু

ব্যক্তি জীবনে: অল্পে তুষ্ট থাকার মাধ্যমে স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বাহুল্য পরিত্যাগ, নির্বিলাস জীবনযাপন। বর্তমান সভ্য জগতে বিলাসবহুল জীবন যাপনের হাতছানি মানুষকে ধন-সম্পদ লাভে, অর্থ উপার্জনে বেপরোয়া করে তুলেছে। এজন্য বিশ্বব্যাপী ঘুষ, দুর্নীতি, জালিয়াতি, অপরের সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবণতা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে সরকার পরিবর্তন নানা পদ্ধতির প্রচলনেও এ সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে শুধুমাত্র মানুষ নিজেই করতে পারে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। সমাজ ও দেশের অধিকাংশ লোকের এমন জীবনধারা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে অনন্ত সম্ভাবনাময় সত্যিকারের কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত সবকিছু বর্জনে মানব অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। এটি বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। শেষের এ চার পদ্ধতিই পবিত্র হাদিসের "মূতূ-ক্বাব্‌লা আন্‌ তামোতু" – মৃত্যুর পূর্বে মরণের সারকথা। এগুলো রিয়াজত বা সাধনা কর্মপদ্ধতি, যা মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধনায় সুফি কর্মপন্থা।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: সরকারি অফিস আদালত ও বাসগৃহে জমকালো সাজসজ্জা, বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ পরিহার করা। সরকারি বেসরকারি বিলাসবহুল সাজসজ্জার ওপর ট্যাক্স আরোপ করা।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: দাতা দেশগুলো কর্তৃক চড়া সুদে দরিদ্র দেশগুলোকে দেয়া ঋণের সুদ মওকুফ করে দেয়া। মহাশূন্য, ভূমি ও ভূগর্ভে সঞ্চিত আল্লাহ্‌র সকল সম্পদ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করা।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, শুধু ব্যক্তি জীবনের উন্নয়ন নয়, মাইজভাণ্ডারী দর্শন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বলয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। মাইজভাণ্ডারী দর্শন একটি পরাবাস্তব বা ভাববাদী দর্শন নয় বরং জীবনে জগতের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান দিতে সক্ষম একটি বাস্তব জীবন দর্শন। বর্তমান সমস্যাসংকুল বিশ্বে আত্মবিনাশী মানবজাতিকে এই গাউসিয়ত নীতিই পারে মুক্তির সুপ্রভাতে পৌঁছাতে।

উপরোক্ত সপ্ত পদ্ধতি কোরআনী হেদায়ত ধারা। মানবের জন্য এক নিখুঁত, সহজ সরল ও স্বাভাবিক পথ। ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার এটাই মূল দর্শন। শুধু মুসলমান নয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে এ মুক্ত-স্বাধীন বেলায়তের সুধা পান করে স্রষ্টার নৈকট্য লাভে অমর হতে পারেন। মাইজভাণ্ডারী শিষ্য, অলি ও সাধকগণ ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিশেষ করে এ প্রান্তে সরব ও সমপ্রিয়। হিতকামী লোকেরা তাঁদের দরবারে সর্বদা ভিড় জমায়। বিপুল লোক সমাগমে তাঁদের স্মৃতি বার্ষিকী-উরস শরিফ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

তালে গানে ইবাদত

এ মহাপুরুষের জন্মলগ্নে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের খুঁটি রূপে জমিদার শ্রেণির প্রতাপ ছিল ভীষণ। তাদের শক্তির উৎস ছিল বৃটিশের সরকারি ছত্রছায়া ও নিজেদের সৃষ্ট লাঠিয়াল বাহিনী। গরীব-কৃষক-প্রজা পীড়ন করে বৃদ্ধি হতো তাদের আয়। বিনাশ্রমে অর্জিত এই আয় তাদেরকে পাপ পঙ্কিল পথে ঠেলে দেয়। ফলে জলসা ঘরে চলত বাঈজীর নূপুর নিক্কন নাচ ও গান। নাচের তালে মদ খেয়ে মাতাল হতো জমিদার ও তার অনুগৃহিত সঙ্গী সাথীরা।

বাঈজীরাই শুধু জৈবিক ক্ষুধার শিকার ছিল না, জমিদারের দৃষ্টিতে পতিত সুন্দরী পল্লীবালাদেরও ধরে আনতো লাঠিয়াল বাহিনী। লোকসমাজে প্রচলিত ছিল ঘেঁটু নাচ, গাজীর পালা ও ডোম নাচ প্রভৃতি কুরুচিপূর্ণ নাচ লোকগীতি আসর। যেগুলো জৈবিক ক্ষুধার প্রেরণা জাগাতো। এছাড়া প্রচলিত ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় কীর্তন ও বৌদ্ধদের পূর্ণিমা পর্বাদির সংকীর্তন সঙ্গীত আসর। সেগুলোর প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সময়ের দীর্ঘ দূরত্বের দরুন ও যুগভিত্তিক ধর্ম সংস্কারকের অভাবে এসবের প্রেম-আকর্ষণ কমে যায়। জটিলতর পদ্ধতির জন্য সাধারণ মুসলমানেরাও ধর্মীয় জিকির অনুশীলনে ছিল উদাসীন এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সকল ধর্মাবলম্বীদের অন্তর প্রায় স্রষ্টাপ্রেম শূন্য হয়ে পড়ে। ঘেঁটু নাচ থেকে সংকীর্তন সবখানে গানের সঙ্গে ঢোলও ছিল সঙ্গী। দো-তারা বেহালা হাতে বাংলার হাটে ঘাটে-মাঠে অসংখ্য বাউল মরমী গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতো। বিয়ে-শাদী, পালা-পার্বণেও বসতো গানের আসর। গান বাদ্যের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ লক্ষ্য করে এ যুগ সংস্কারক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির পদ্ধতি অনুমোদন করেন। যেমন আগে থেকে প্রচলিত কাবাঘর চক্রাকারে প্রদক্ষিণ বা তাওয়াফ ইসলামও অনুমোদন করেছে। কিন্তু বাতিল করেছে নগ্ন দেহে তাওয়াফ ও কাবাঘরে মূর্তি রাখা। পবিত্র কোরআনও ঘোষণা করে, "ভাল উপদেশ ও কৌশল বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে (মানবজাতিকে) তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো"। হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশ্‌তি (র.) ভারতবাসীকে সঙ্গীতপ্রিয় দেখে তাদের রুচি অনুযায়ী সঙ্গীতকে ত্বরিকতের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সহজেই তিনি নিজ ধর্ম প্রচারে সক্ষম হয়েছিলেন।

দমে দমে জপরে মন
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
ঘটে ঘটে আছে জারী
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

এমনি তত্ত্বমূলক মাইজভাণ্ডারী গানের কথা ও সুরে বাদ্যের তালে তালে অন্য সবকিছু ঋণলে খোদাপ্রেমে হৃদয় মন উজ্জীবিত হয়। আগুনে পুড়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে লোহার জং ছাড়ানোর মত এই জিকির মানুষকে দুনিয়ার মায়া মোহ মুক্ত করে। এটাই 'হুজুরী ক্বল্‌ব' বা একাগ্রচিত্ততা। যার অভাবে কোন ইবাদত বা

উপাসনা ধর্মমতে সঠিক হলেও আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না। 'সামা' বা এই সঙ্গীতময় জিকির স্মরণ অনুষ্ঠানে ভক্তগণকে 'হাল্কা' বা হেলে দুলে নৃত্য করতে দেখা যায়। ফলে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাগ্রত হয়ে জিকিরে রত হয়। এটি সুলতানুল আজকার বা জিকিরের রাজা। কেউবা 'ক্বল্বী জিকিরে' চুপে চুপে খোদা প্রেমে বিভোর হয়। পবিত্র হাদিসের বাণী "জজ্বাতুম মিনাল্লাহি খাইরুম মিন আমালিস সাক্লাইন" – "খোদায়ী প্রেমের একটি জজ্বা (শিহরণ) উভয় জগতের সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ"। আধ্যাত্মিক মরমী সুরের হাজার হাজার মাইজভাণ্ডারী গান বাংলার লোকগীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব গানের প্রভাবে লোকসমাজ হতে ক্রমে নাচ গানের অশ্লীলতা ও জৈবিক অনুভূতি বহুলাংশে বিদূরিত হয়েছে। 'সামার' ব্যাপারে এই ত্বরিকায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যসব পদ্ধতির জিকিরও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় অনুমোদিত। এটা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। এমন কী ফয়েজপ্রাপ্ত মাইজভাণ্ডারী খলিফাদের কিছুসংখ্যক সঙ্গীতপ্রেমী নন।

সঙ্গীত মাধ্যমে খোদা স্মরণ কিছু আলেমদের দৃষ্টিতে অনৈসলামিক। তারা বুঝতে চেষ্টা করে না দুধ ও মদ পানীয় হলেও ভিন্ন ক্রিয়াশীল। তদ্রুপ খোদা স্মরণ সঙ্গীত ও জৈবিক প্রেরণাদায়ক সঙ্গীতও এক নয়। যেহেতু প্রথমটি হিতকর, অপরটি ক্ষতিকর। কোরআন তেলাওয়াত, মিলাদ শরিফ পাঠ ও আযানে বিশেষ সুর ধ্বনিত হয়। বিশেষ প্রয়োজনবোধ বা কোন কোন অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) গান বাজনা বাধা নয়, বরং উৎসাহ দিয়েছেন। ইসলামের প্রথম যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে সুর দিয়ে কোরআনের আয়াত পাঠ করা হতো। মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মাণকালে এবং খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননে ক্ষুধার্থ পরিশ্রান্ত সাহাবীদের উজ্জীবিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (দ.) স্বয়ং কাজের সাথে সুর করে গেয়েছিলেন – (এটিই সুলতানুল আজ্কার অর্থাৎ জিকিরের রাজা)

"লা আইশা ইল্লা-আইশাল আখিরা
আল্লাহুম্মা আরহামাল আনসারা, ওয়ালা মুহাজিরা"।

'আখিরাতের জীবন ছাড়া জীবন নাইকো আর
আনসার ও মুহাজিরে রহম কর হে পরওয়ারদিগার'।

যুগে যুগে দেশে দেশে রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) বিভিন্ন কাজকে ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব-মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে; উদ্দেশ্য সম্ভাব্য সহজতম উপায়ে মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানো।

'সামা' আরবি শব্দ, যার অর্থ 'শুনা'। সুফি সম্প্রদায় এর অর্থ করেছেন সঙ্গীত। গান এবং বাদ্যযন্ত্রাদির ঝংকারে তাল-মান-লয় সহ সুরের বাহনে ভাবের বহিঃপ্রকাশই সঙ্গীত। ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সুরের মহা উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। নির্মল আনন্দ ব্যতীত এটা অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম দেহযন্ত্রের ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনী জ্ঞানলাভ করতে হলে কয়েকটি বিশিষ্ট দেহযন্ত্রের (ছয় লতিফা) সাহায্য নিতে হয়। এই দেহযন্ত্রগুলি স্বাভাবিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু সুরের মধুর রেশ বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে। অতঃপর রীতিমত চর্চার ফলে এদের অন্তরে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম দিবারাত্র পলে-পলে উচ্চারিত হতে থাকে, যা অন্তকরণকে শয়তানী প্রভাব হতে মুক্ত রাখে এবং সাধকের মহান উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনীয় সাহায্য করে থাকে। সুতরাং এই ছয়টি লতিফাকে অতি সহজে এবং অল্প সময়ে সজাগ করতে সঙ্গীতের মত দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই। তথাপি যারা অন্যায় জিদের বশবর্তী হয়ে সঙ্গীতের মহা উপকারিতাকে অস্বীকার করে এটাকে 'শয়তানী প্রক্রিয়া' বলে আখ্যায়িত করে, প্রকৃত পক্ষে তারা সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব, অসীম শক্তি ও রহমতের প্রতিও আস্থাশীল নয়। সুর ও সঙ্গীতের স্রষ্টাও স্বয়ং আল্লাহ্‌ই; যিনি বিপুল বিশ্বের সবকিছুরই সৃষ্টি করেছেন। মনের ভাব প্রকাশের ভাষা, ভাষার সঠিক প্রকাশভঙ্গি এবং উচ্চারণের তারতম্য সবই যখন তাঁর সৃষ্টি, তখন সুর ও সঙ্গীত যে স্রষ্টারই সৃষ্ট এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

মহাকাশ বিজ্ঞানীরাতো মহাশূন্যে সুরের ধ্বনি শুনেছেন। আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ওহী আসার পূর্বে একটি মৃদু সুরধ্বনির ব্যঞ্জনা হতো। হযরত দাউদ আলাইহিস্‌ সালাম-এর সুমধুর কণ্ঠের যবুর কিতাব তিলাওয়াত শুনে তাঁর নৌকার কাছে মাছেরাও এসে উপস্থিত হতো। আযানও সুমধুর সুরে উচ্চারিত হয় এবং কোরআন তিলাওয়াতও সুমধুরভাবে পাঠ করার নির্দেশ আছে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তির যতগুলো পথ আছে তন্মধ্যে সঙ্গীতের স্থান বহু উর্ধ্বে। তার প্রমাণ স্বরূপ চার ত্বরিকার মহামান্য পীর সৈয়দূত্ তায়েফা হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) বলেছেন, "আল্লাহ্ প্রাপ্তির জন্য সর্বাপেক্ষা কম দূরত্বের পথ হলো সঙ্গীত"। এই নীতিতে বিশ্বাসী ত্বরিকতপন্থী সুফিগণ সঙ্গীতের (সামা) সুর সুধা পানে মত্ত হয়ে পরিণামে আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেয়ে অলি উল্লাহ্ বলে পরিচিত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন।

১০-৭-৮৩ ইং তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'স্থান-কাল-পাত্র' উপ-সম্পাদকীয়তে বাগদাদের এক জিকির অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত। উক্ত সম্পাদকীয় লেখক লুব্ধক ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনায় বলেন, "আমাদের হানিফী মাযহাবের ইমাম হযরত আবু হানিফা (র.) সাহেবের মাযার ও মসজিদ সংলগ্ন মাদ্‌রাসা তারই ভূগর্ভস্থ এক বিশাল কুঠরী। বড়পীর সাহেবের এক অধঃস্তন পুরুষ সেখানে নিয়ে গেলেন। শত শত ইরাকী তরুণ হাতে হাতে তালি বাজিয়ে নেচে গেয়ে গোটা ভূগর্ভ প্রকম্পিত করছে। হাতের তালি বাজানোর সাথে সাথে সবার কণ্ঠে "আল্লাহু" "আল্লাহু" ধ্বনি। আর থেকে থেকে হুংকার উঠছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। আমরা আসরের এক পাশে উপবেশন করেছিলাম। কিন্তু গোটা আসরের জোশ ও জজ্‌বা আমাদের স্থির থাকতে দিলনা। আমরাও তালে তালে তাল বাজিয়ে মাথা দুলিয়ে সবার সুরে সুরে মিলালাম "আল্লাহু" "আল্লাহু"। ভাষার ব্যবধান ঘুচে গেল। দেশকালের দূরত্ব মুছে গেল। কোথায় মিলিয়ে গেল গায়ের রং ও বেশ ভূষার তফাৎ। শুনেছি দূর অতীতে মাওলানা রুমী (র.)-কে কেন্দ্র করে এমনি ধরনের এক জজ্‌বা-জলসা জমে উঠেছিল"।

লেওয়ায়ে আহমদী

হাশরের দিন (শেষ বিচারে) মহানবির (দ.) যে পতাকা উত্থিত হবে তার নাম 'লেওয়ায়ে আহ্‌মদী' বা প্রশংসিত ঝাণ্ডা। বিশ্বঅলি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দাবি "হাশরের দিন লেওয়ায়ে আহ্‌মদীর ঝাণ্ডা উড়িয়ে আমিই প্রথম বলবো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' – আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য"। এটা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র তাওহিদ বা একত্বে বিশ্বাসী সকল মানুষের মুক্তির শুভ সংবাদের ঘোষণা। উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত আর কেউ এমন দাবি করেন নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম, প্রখ্যাত আশেকে রসূল, অলিয়ে কামেল

আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা বলেন, "গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী উম্মতে আহ্‌মদীর আলোক-প্রদীপ। তাঁর ছায়া হুমাপাখির ছায়া স্বরূপ। এই ছায়া যার উপর পড়ে সে চরম দুর্ভাগা হলেও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। তিনি মহামূল্য স্পর্শমণি লাল পাথর; যার স্পর্শে সবকিছু সোনায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর রওজা শরিফ জ্বীন, পরী ও মানব জাতির জন্য ফয়েজ রহমতের ভাণ্ডার। আমি আজিজুল হক তাঁর আদর্শে মনে প্রাণে উৎসর্গীত"। পাকিস্তানের পেশোয়ার নিবাসী প্রখ্যাত পীরে কামেল হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (র.) সাহেব হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, "উন্‌কা বারে মে মৎ পুছ বেটা, আগর না কুছ্‌ বেয়াদবী হো যায়ে। মশ্‌রেকী মুল্‌কমে এত্‌না বড়া হাস্তি আওর নেহি আয়া" অর্থ– তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করোনা, হয়তো কোন বেয়াদবী হয়ে যাবে। পূর্বাঞ্চলে তাঁর মত এত বড় অলি আর আসেন নি'। সামা মাহফিল আল্লাহ্‌র রাসূল ও আউলিয়াদের প্রশংসাগীতি হয় জেনে এক মুরিদকে তিনি সামা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর সাহেবজাদা পরবর্তী পীর আল্লামা হাফেজ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ্‌ (ম.) সাহেব বিভিন্ন সময়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ জিয়ারত করেন।

১০ মাঘ ১৩১৩ বাংলা, ২৩ জানুয়ারি ১৯০৬ খৃস্টাব্দ, ২৭ জিলক্বদ রাত্রি দ্বি-প্রহরে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী স্বীয় ত্বরিকাকে সর্বমাত্রায় পূর্ণতা দিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেন। একমাত্র পৌত্র হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাহেবকে গদী শরিফ ও ত্বরিকা সিল্‌সিলার উত্তরাধিকার রেখে যান। প্রতিবছর এই দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির লক্ষ লক্ষ আশেকভক্ত তাঁর উরস শরিফে সমবেত হন। তাঁর মহান আদর্শে বিমোহিত ভক্তমণ্ডলী প্রেমময় কণ্ঠে ধ্বনি তোলেন : মারহাবা মারহাবা মারহাবা / গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মারহাবা।

জগত জুড়ে করুণাধারা

মাইজভাণ্ডার শরিফ অসংখ্য অলি-উল্লাহ্, সাধক, ফকিরের সাধন-ভজনের তীর্থস্থান। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বেলায়তি ফয়েয বিতরণে স্বীয় বংশেও ক'জন জগদ্বিখ্যাত অলি তৈরি করেছেন। তাঁদের মধ্যে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী অন্যতম। ১৮৬৫ সালে তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফে জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব তিনি পিতৃব্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। হযরত আকদাসও তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। জামাতে উলা পরীক্ষার তৃতীয় দিনে প্রথম আধ্যাত্মিক প্রেরণার সৃষ্টি হলে পরীক্ষা স্থগিত রেখে তিনি বাড়ি চলে আসেন। বাড়িতে কিছুদিন হযরত আকদাসের প্রত্যক্ষ সোহবতে থাকার পর স্রষ্টার অন্তহীন পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণে বেরিয়ে পড়েন। কালক্রমে সাধনার পথে সিদ্ধির চরম সোপান অতিক্রম করে তিনি হযরত আক্দাসের প্রধান খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর বন। সেগুন, শাল, গজারী, জারুল, রকমারী বৃক্ষ, লতা গুল্ম-পুষ্প ফলের বিপুল সমাবেশ। বাঘ-ভালুক-হরিণ-শিয়াল-বানর-হাতী-কাঠবেড়ালী-সাপ-বিচ্ছু-পোকা-মাকড়ের অবাধ বিচরণ ভূমি। ময়না-টিয়া-কাকাতুয়া-মথুরা-সজারু, বন্যহাঁস-বনমোরগ প্রভৃতি রং-বেরং হাজারো পাখির কলকণ্ঠে মুখরিত বনানী। দিনে সূর্যের কিরণে প্রাণবন্ত সজীবতা। রাতে গহীন আঁধারে অচল নীরবতা। কখনো চাঁদের আলোকে রূপের অপরূপ পশরা। কবির কাব্য, লেখকের ভাষা, দার্শনিকের চিন্তা, ভাবুকের ভাব, যেখানে অবাক তাকিয়ে রয়। বাবা ভাণ্ডারী (ক.) তাঁর প্রেমের সোহাগ নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। আপন মনে ঘুরে বেড়ালেন। এ যেন মহানবির হেরা গুহার নির্জনবাস। বিশ্ববাসী জানে, সেখানে তিনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আরো জানে ফেরেশ্তাদের সর্দার জিব্রাঈল (আ.) সেথায় এসেছিলেন। সেখানে আল্লাহ্র বাণী কোরআনের প্রথম পাঠ 'ইক্রা বিস্মি রাব্বিকাল লাজি খালাকা' অবতীর্ণ হয়েছিলো। তার অধিক কিছু কেউ কি জানে? বই-পুস্তকে তেমন গবেষণালব্ধ ফলাফল তো দেখা যায় না। জানেন শুধু আল্লাহ্র অলিরা – যাঁরা গুপ্তরহস্য জ্ঞানের অধিকারী। এখানে দয়াল নবি প্রকৃতি ও নিসর্গকে জেনেছিলেন; তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন; তিনি যে রহমতুল্লিল আলামীন, সমগ্র সৃষ্টি জগতের করুণা-ভাণ্ডার। প্রকৃতি

চলৎশক্তিহীন কিন্তু তাদের প্রাণ আছে। ভাষা নেই, আছে সজীবতা। নিসর্গের (চন্দ্র-সূর্যসহ নক্ষত্র-আকাশ-নীহারিকা নভোমণ্ডলের সবকিছু) গতি আছে। হয়তো প্রাণও আছে। কিন্তু ভাষা নাই; আছে অপরূপ শোভা। হেরা পর্বতে নির্জনে তিনি ভাষাহীন প্রকৃতি ও নিসর্গের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়েছিলেন। এতে তাদের কথা শুনার এবং নিজের কথা শুনাবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এমন দার্শনিক ক্ষমতালাভ করেছিলেন বলেই তিনি কোন মানুষকে একবার দেখেই তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করে স্বরূপ বুঝতে পারতেন। ভয়হীনতা ও অমিত সাহস এখানে বসেই তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। এজন্য গুটিকতেক মানুষ ছাড়া সমগ্র মানবজাতির অসহযোগিতা ও শত্রুতা তাঁকে ভীত-বিহ্বল করতে পারে নি। হেরা গুহার নির্জন বাস রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনে অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল।

স্রষ্টার আর এক অপরূপ সৃষ্টি সমুদ্র। মাটি সৃষ্টির বহুকাল পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে পানি অনন্ত সাগর। সীমাহীন অথৈ জলে ঢেউ-এ ঢেউ-এ নৃত্য চলে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে ফেনিল জলরাশি যেন শ্বেত-শুভ্র জড়োয়া মুক্তার মালা। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্যের এক অংশ খসে পড়ে হাজারো বছরের শীতলতায় গঠিত হয়েছে মাটির এ শস্য-শ্যামল ধরণী। তবু সমুদ্র স্থলভাগের তিনগুণ। স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত বিশাল সাগর। সীতাকুণ্ডের কুমিরায় বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ধ্যানী দৃষ্টিতে বিশাল সমুদ্রে বাবা ভাণ্ডারী কি অসীম স্রষ্টার বিশালতাকে খুঁজেছিলেন?

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে-জঙ্গলে, সীতাকুণ্ড ও দেয়াং পাহাড়ে, বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে বাবা ভাণ্ডারী অর্জন করেন হেরা গুহার সে দুর্লভ শক্তিসম্পদ। যে শক্তিবলে তিনি ভাষাহীনের ভাষা বুঝতেন। জানতেন মানব অন্তরের যে কোন দুঃখ-বেদনা, কামনা-বাসনা সবকিছু। তাইতো নীরব প্রকৃতির মতো ভাষা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নীরব নিথর মূক। নিজের অস্তিত্বে তিনি আল্লাহ্‌কে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই তিনি স্রষ্টার গুণজ প্রকৃতি নীরবতার মাধ্যমে জগতের কল্যাণ সাধন করেছেন। প্রকৃতির অনাবিল দানের মত তিনি বিলিয়েছেন বেলায়তের অমৃত মধুর সুধা। চোখের দৃষ্টিতে, হাতের আঘাতে, স্বপ্নযোগে কতজনকে তিনি অলি বানিয়েছেন কেউ কি তাঁর হিসাব জানে? সামান্য ক'জনের পরিচয় শুধু মানুষের জানা; অসংখ্য রয়েছে মানুষের পরিচিতির অগোচরে।

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর প্রসারিত মোবারক হাতের জলধারা এক মহান করুণা। জলেরই তো অপর নাম জীবন। তদ্রুপ জীবনদায়ী এ জলধারা। চিকিৎসা বিজ্ঞান যেসব রোগের চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে তাঁর এ জল তেমন হাজারো রোগের মহৌষধ। ফলে রোগমুক্ত মানুষগুলো মুক্তির আনন্দে আত্মহারা। চাষীর প্রাণের ফসল পোকায় খেয়ে সাবাড় করে। কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা তেমন ছিলোনা। এ জল ফসলের প্রাণ বাঁচিয়ে চাষীর প্রাণে আনে স্বস্তি। কোর্টে মোকদ্দমা। আসামী নিজেই জানে শাস্তি অবধারিত। নিয়ত করে এ পানি পান করে কোর্টে গিয়ে দেখে আসামী নির্দোষ খালাস। ছেলে মারা গেছে। দাফনের আয়োজন চলছে। বাবা ভাণ্ডারী বলেন, 'ছেলে মরতে পারে না'। এ করুণাধারায় সিক্ত করা হলো। মৃত দেহে ফিরে এলো প্রাণ। এ দয়ার কি তুলনা আছে? তাই আশেক ভক্তগণের নিকট এ জল ছিলো যেন শীত শেষের প্রকৃতি ও চাষীর প্রত্যাশিত মৌসুমী বৃষ্টিপাত। বারিপাতে সজীব প্রকৃতি যেমন বাসন্তী ফুলের সমারোহে সৃষ্টি আকুল করে। আগত ফসলের সুখ-স্বপ্নে ভেজা মাটিতে লাঙ্গল চালিয়ে চাষী আনন্দের গান গায়। এ মহান হাতের পানি খেয়ে কতজনের ভাগ্য খুলেছে। খোদায়ী কুদ্‌রতের এ এক অপূর্ব করুণাধারা।

মাওলানা আবদুল আলী সাহেব জিয়ারত উপলক্ষে দশ মাঘ একবার মাইজভাণ্ডার উরস শরিফে আসেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ। মৌসুমী ফল, গ্রামীণ কুটির-শিল্পজাত জিনিসপত্রের সমারোহ, ভক্তদের গরু-মহিষ-ছাগল নিয়ে স্ব-স্ব গন্তব্যে পৌঁছার জটলা, ছোট শিশুদের খেলনার কেনা-কাটা, আস্তানায়-বৈঠকে ভাণ্ডারী গানের আসর – সবকিছু মিলে এক বিরাট মেলা। ঘুরে ফিরে মেলার দৃশ্য দেখলেন। বাবা ভাণ্ডারীর নাম শুনে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। তিনি তখন হুজ্‌রা শরিফে ছিলেন। তাঁর প্রসারিত একখানা হাতে একজন লোক লোটা দিয়ে পানি ঢালছিল। তিনি নীরব। কোন কথা-বার্তা নেই। মাওলানা সাহেব মনে মনে ভাবলেন, বুজুর্গ বলে শুনেছি; কই? কোন লোকজনকে আদেশ-উপদেশ কিংবা নসিহত কিছুই যে করছেন না; ইনি কেমন বুজুর্গ! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সেখান থেকে বের হয়ে ঘুরে ফিরে পরিশ্রান্ত হলে এক স্থানে বসে হাতে মাথা ঠেস দিয়ে একটু বিশ্রাম নেন। এতে তাঁর তন্দ্রা আসে। এ অবস্থায় তিনি দেখেন এক অপূর্ব দৃশ্য। রাসূলে করিম (দ.) এবং তাঁর চার প্রধান খলিফা আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (ক.) একের পর এক

সারিবদ্ধভাবে তাঁর সম্মুখ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন। সর্বশেষ বাবাজান কেবলা গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান সাহেব (ক.)। তিনি সামনে এসে মধুময় সুন্দর এক হাসি দিয়ে হযরত আলীর (ক.) পিছনে চলে গেলেন। তন্দ্রা টুটে গেলে স্বীয় ভাবনার জন্য অনুতপ্ত হয়ে পুনঃ হুজ্‌রা শরিফে গিয়ে মনে মনে তওবা করে ক্ষমা চেয়ে আসেন।

মানুষের প্রতি এমনি অসংখ্য করুণা বর্ষণে জাগতিক কর্ম শেষে ১৩৪৩ সনের ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল ১৯৩৭ খৃ:) তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন। তিনি চারপুত্র, দুই কন্যা ও বিপুল আশেক ভক্ত রেখে যান। প্রতি বৎসর এই দিনে মহা সমারোহে তাঁর উরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি অধিকাংশ সময় চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতেন। অতি অল্প পানাহার করতেন। মহামহিম আল্লাহ্‌র একান্ত মিলনে ধন্য হলেও নিজের সম্পর্কে কোন কিছুই বলেন নি। ফলে কিছুসংখ্যক লোক তাঁর শান, মান ও মর্যাদা সম্পর্কে নিজস্ব মনগড়া ধারণা প্রকাশ করেন। তাই জ্ঞানী-গুণীরা প্রকৃত সত্য জানার জন্য উদগ্রীব। বাবা ভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক গুরু গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর সম্পর্কে এক উক্তিতে বলেন, ‘উহ্ সাহেবে জালাল হ্যায়, মূল্‌কে এয়ামনমে রাহাতা হ্যায়, আলমে আরওয়া মে সায়ের করতা হ্যায়’। অর্থাৎ– বহু দূরে অতি উজ্জ্বল তাঁর অবস্থান, প্রাণ জগতে তাঁর অবাধ যাতায়াত। এখানে ‘সাহেবে জালাল’ শব্দে অতি নৈকট্য হেতু খোদায়ী জজ্‌বাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সাহেব কেবলার খলিফাদের একজন যাঁকে তাঁর ছয় কিতাবের একটি এবং বার বুরুজের (রাশি) একটি দান করে ধন্য করেছেন এবং যিনি ‘তোহ্‌ফাতুল আখ্‌ইয়ার (আরবি-বাংলা)’ ‘আত্‌তাউজিয়াতুল বহিয়া (আরবি-ফার্সি)’ সহ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কিতাব লিখেছেন। সেই আল্লামা হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.) একদা শুক্রবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ আসার পথে বাবা ভাণ্ডারীর সাথে দেখা হয়। তিনি ফরহাদাবাদীর হাত ধরে পায়চারী করতে থাকেন। এদিকে মসজিদে খোত্‌বা (ভাষণ) শেষ হতে কোন প্রকারে হাত ছুটিয়ে ফরজ নামাযে শরীক হন। নামাযের পর হুজ্‌রা শরিফে আপন মুরশিদের কাছে উপস্থিত হলে হযরত কেবলা জজ্‌বাতি হালে বলতে লাগলেন, ‘মিয়া! তুমি কি নামায জান? তুমি কি নামায বুঝ? তুমি কি নামায চিন? কার হাত থেকে তুমি ছুটে গেলে’? অপরাধী, ভয় ও লজ্জা শংকায় দিশেহারা হয়ে শুধু ক্ষমাই

চেয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহ যে, শরিয়ত-মারফতি জ্ঞানের অধিকারী যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ফরহাদাবাদীর মত লোকও বাবা ভাণ্ডারীর সঠিক আধ্যাত্মিক মর্যাদার সাথে অন্ততঃ তখন পর্যন্ত অপরিচিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার শাহ্‌নগর নিবাসী হযরত সাহেব কেবলার অন্যতম কামেল খলিফা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ রিজওয়ান উদ্দিন শাহ্ (র.) মজ্‌জুবে সালেক অলি উল্লাহ্ ছিলেন। তিনি কখনো বাবা ভাণ্ডারীর নিকট গেলে তিনি ধুমপানরত থাকলে গুরগুরি হুক্কার নলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেন। হযরত রিজওয়ান শাহ্ (র.) নলটিকে সম্মান করে ফেরত দিয়ে বলতেন, 'আপতো সুলতানুস্ সালাতীন, মাইতো দর বদর'। অর্থ– আপনি তো শান্তির মহা সম্রাট, আমার কী আর শান মান! ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) তাঁকে নূরে চশ্‌মে আহ্‌মদ উল্লাহ্ অর্থাৎ– আহ্‌মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর চোখের জ্যোতি বলে কবিতা লিখেছেন। খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন হযরত সাহেব কেবলার পৌত্র, মনোনীত অছি ও সাজ্জাদানশীন এবং বাবা ভাণ্ডারীর দ্বিতীয় মেয়ের জামাতা ও আধ্যাত্মিক ফয়েযপ্রাপ্ত। এ সম্পর্কে হযরত সাহেব কেবলার উক্তি 'আমার দেলা ময়না আমার বাচা ময়নার চেহারার উপর থাকবে', তিনি বাবা ভাণ্ডারীকে 'বাচা ময়না' বলতেন (জীবনী ও কেরামত পৃঃ ২২৭)।

মহাশক্তি তৌহিদী তলোয়ার

ইল্‌মে মারেফাত বা আধ্যাত্মিকতা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার জীবন বিমুখও নয়, বরং কল্যাণমুখী কর্ম প্রেরণার উৎস। কঠোর সংযম ও কর্মসাধনার মাধ্যমে রিপুকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনয়ন পূর্বক জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ বিধানই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মর্মকথা। নবুয়তী ও বেলায়তী ধারার শরীয়ত, ত্বরিকত, হাকিকত এবং মারেফাতের সংমিশ্রণ ও প্রভাবে মহা সমুদ্ররূপী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা। খাদেমুল ফোক্বারা শাহ্ সুফি আল্লামা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর শক্তিশালী লিখনী দ্বারা এই ত্বরিকার স্বরূপ বিশ্ব মানবের সামনে তুলে ধরেছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পুত্র বেলায়তে মা'য়াব শাহ্‌জাদা-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক ফানাফিল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ঔরসে বাংলা

১২৯৯ সনের (১৮৯৩ ইং) ১৩ ফাল্গুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল মাওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ্ মির্জাপুরী (র.) তাঁর মাতামহ। মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেন। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিলো। কোরআন, হাদিস, সুফিবাদ, ইতিহাস, দর্শন ও তর্কশাস্ত্র সহ সর্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন জ্ঞানের এক মহাসাগর। শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি সর্বতোমুখী প্রয়োগ অধিকারী ছিলেন। একই বিষয়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও গন্ডমূর্খকে নিজ নিজ বোধশক্তির পরিমাপ অনুযায়ী বুঝ দিতে সক্ষম ছিলেন। জগত ও জীবনের যে কোন সমস্যা ও বিষয়ে নির্ভয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। জবাব দিতেন নির্ভুল তথ্য ও বোধগম্য উপমা সংযোজন করে। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য শুনেও শ্রোতার আগ্রহ মিটতো না। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ছিলেন বেলায়তের খনি। কেরামত ও রহস্যপূর্ণ বাক্যের আবরণে ঢাকা ছিলো তার বেলায়তী অবদান। এ জ্ঞান তাপস আবরণ খুলে প্রকাশ করেন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার যথার্থ স্বরূপ। যেহেতু তিনি ত্বরিকা প্রবর্তকের অছি-উত্তরসূরি যোগ্য প্রতিনিধি এবং রহস্যময় ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।
হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র কোরআনের দশটি পাতা ছিঁড়ে তাঁকে দেখিয়ে বলেন, "দেখতো দাদা ময়না, কোরআন শরিফের কোন হরফ (অক্ষর) আছে কি? সব উড়ে গেছে। কমবখ্ত মোল্লারা কালামুল্লাহ্ বেচে কলামোলা খেয়েছে।" পাতাগুলো রওজা শরিফ পুকুরে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। পুনঃ সতের পাতা ছিঁড়ে একই কথা বলে পাতাগুলো তাঁর পুত্রের কবরে রাখতে আদেশ করেন। এ রহস্যময় ঘটনার ব্যাখ্যায় অছি এ গাউসুল আযম লিখেন : পবিত্র কোরআন স্রষ্টার রহস্যজ্ঞান ও অফুরন্ত রহমতে পরিপূর্ণ, অথচ আলেমগণ তাবিজ-কবচ বানিয়ে জাগতিক স্বার্থে এর অপব্যবহার করছে। খোঁজেনা আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমত; তাই তারা কমবখ্ত-দুর্ভাগা। জলে ভরা পুকুর তৃষ্ণার্ত পশু-পাখি মানুষ সবকিছুর তৃষ্ণা মিটায়। তেমনি অবারিত হেদায়ত সরোবর মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক শক্তি। যেখান থেকে সকল সম্প্রদায় ফয়েজ রহমত লাভ করে। প্রথম দশ পাতা মানুষের বাইরের পাঁচ ইন্দ্রিয়ে ও ভিতরের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাবের প্রতীক। শেষের সতের পাতার দশ পাতা কবররূপী মৃত আত্মায় কোরআনের 'শিফাউন লিমাফিছ্ছুদুর অন্তরের রোগ মুক্তিকারী,

বাক্যের মর্মমতে প্রাণ সঞ্চারের প্রতীক। যেহেতু গণিতমতে দশ পূর্ণতর সংখ্যা (চরম সংখ্যা) বাকি সাত পাতা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার 'সপ্ত পদ্ধতি' অনুশীলন পদ্ধতির প্রতীক; যে পদ্ধতির পূর্ণ অনুসারী খিজরী মর্যাদার অলিআল্লাহ্ রূপে সৃষ্টি জগতের কল্যাণ ভাণ্ডারে পরিণত হন।

এই মোত্লাক বেলায়ত-মুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির যথার্থ পরিচয় দানে মাতৃভাষায় রচনা করেন 'বেলায়তে মোত্লাকা' নামে ত্বরিকতের মহামূল্য গ্রন্থ। এ বই সম্পর্কে তিনি বলেন, এ বইয়ের সত্য কেউ খণ্ডাতে পারবেনা। বিশ্বের আলেম সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ রইলো। ইহ ও পর উভয় জগতের সকল সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে। গাধার চোখ দিয়ে নয়, অন্তরের চোখ দিয়ে খুঁজতে হবে। আলেমদের শিরোমনি ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) ও মাওলানা ওবায়দুল আকবর সাহেব ঐ গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর রচিত 'বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ' ও 'মানব সভ্যতা' নামে দুটি পুস্তিকায় মাইজভাণ্ডারী সুফি দর্শনের বিশ্বজনীন অবদান বর্ণিত। নফ্স বা প্রবৃত্তির প্রকারভেদ, কর্ম, অবস্থান ক্ষেত্র ও প্রকৃতির পূর্ণ পরিচিতি ও প্রত্যেক শ্রেণীর নির্ধারিত ধর্মীয় বিধান সম্বলিত তার 'মূলত যেন একখানা আয়না'। পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন নিজের যথার্থ নফ্স পরিচিতি এবং প্রযোজ্য ধর্মীয় বিধান ও অনুসরণীয় জিকির পদ্ধতি। একটা ছকে দেখানো হয়েছে কিভাবে মানুষ স্রষ্টার গুণজ প্রকৃতি অর্জন করে রুহানী (আত্মার) উন্নতির চরম শিখরে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই উন্নত মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-আশরাফুল মাখ্লুকাত; আল্লাহ্র প্রতিনিধি। 'মুসলিম আচার ধর্ম' নামে নামাযসহ প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও তিনি রচনা করেন। তিনি আরও লিখেছেন 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লাদে গাউসিয়া' নামক বাংলা ভাষায় মিলাদ, দরুদ ও সালামের সহজপাঠ্য বই। মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকতপন্থীরা এ বই অনুসরণে সামা-জিকির করে থাকেন। মাইজভাণ্ডার শরিফের নেপথ্যের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন 'এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক' নামক পুস্তকে। তাঁর বহু প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীগুলো অনেক মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। যেগুলোর সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও গবেষণার বিষয়বস্তু রয়েছে। এ জ্ঞান তাপস আমৃত্যু জ্ঞানসাধনা করেছেন; বিলিয়েছেন জ্ঞানের অমূল্য রতন।

এ জ্ঞান ভাণ্ডার ছিলেন অধীত ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ। দাদা হযরত কেবলার নির্দেশে হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) নিকট ত্বরিকতের বায়াত ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। ছোট মাওলানা সাহেব বলে খ্যাত এই অলি-আল্লাহ্ হযরতের কুতুবে ইরশাদ – রহস্যময় বাণীর ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন। দফতরখানা নামক কাচারি (চতুরা) ঘরে তিনি হযরতের নির্দেশমত ত্বরিকতপন্থীদের মাইজভাণ্ডারী জিকির-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। হযরতের অনেক কামেল খলিফা এই সামা মাহফিলে অজুদ অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। এই সংসারত্যাগী ফকির হযরতের পূর্বে ইহজগত ত্যাগ করেন। ফলে তিনি দাদা হযরত সাহেব কেবলার নিকট পুনঃ বায়াত গ্রহণ করেন। এই দুই মহাপুরুষের শিক্ষাদীক্ষা, সেবা নৈকট্য ও প্রতিনিধিত্ব লাভে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তিনি সমৃদ্ধ হন। গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) সাহেবের নিকট হতে তিনি লাভ করেন কুরবিয়াতের পূর্ণ ফয়েজ। নিরহংকার ও নির্বিলাস জীবনধারী এ মহান ব্যক্তি শরীয়তের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলতেন। সকলের অগোচরে আজীবন সাধনা রিয়াজতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হন। খাদেমুল ফোক্বারা'র আবরণে ছিলেন লুকায়িত। অথচ কোন কোন মুহূর্তে স্বীয় পরিচয় বর্ণনায় বলেন, "আমার মর্যাদা হযরত আলীর (ক.) অনুরূপ। তিনি যেমন বিশ্বনবির জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রবেশদ্বার, তদ্রুপ আমিও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কৃপাসিন্ধুর করুণা বারি"। তাই অন্তঃচক্ষুধারী সাধক-ফকিরদের নিকট তিনি 'খাদেমুল ফোক্বারা' – মাইজভাণ্ডারী সেবককুলের জন্য অবারিত ঝর্ণাধারা।

এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলেই উনিশ্শ ছেচল্লিশ সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি মীর্জা আবু আহাম্মদ সাহেব ও অন্যান্য মুসলিম লীগ অনুসারীদের বলেছিলেন, 'নামেই যে দেশ বাংলাকে স্বীকার করেনা; সে দেশে বাঙালির স্বার্থ রক্ষিত হবে না। কূটকুশলী জিন্নাহর ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে বাঙালি জাতি একদিন বেড়িয়ে আসবেই। বায়ান্ন সালে বাঙালি জাতিকে পশ্চিমাদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া চাইলে শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি তাঁর কর্মসূচি। শেখ সাহেব বলেন, 'আন্দোলনই আমার লক্ষ্যে পৌঁছার হাতিয়ার। তিনি পুনঃপ্রশ্ন করেন, যদি ব্যর্থ হন? নেতা উত্তর দেন তাহলে অস্ত্র ধরবো'।

কালজয়ী দৃষ্টিতে দেখে তিনি বলেছিলেন– "এ পথেই আসবে বাঙালি জাতির মুক্তি, আমি দোয়া করলাম"।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় জনৈক ভক্ত কাফের ইসরাইলকে ধ্বংস হতে দোয়া চাইলে তিনি বলেন, 'ওরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নয়? বাবুই পাখি বাসায় থাকেনা, তবু তার বাসার ঠিকানা আছে। ওরা তো মানুষ; আরবের আদি বাসিন্দা। ইসলামের বিকাশে টিকতে না পেরে তারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দেশে দেশে। বর্তমানে তারা ঐক্যবদ্ধ। যুদ্ধ নয়; স্বীকৃত সহঅবস্থানেই আসবে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান"। নিজ নিজ স্বার্থে মিশরসহ প্রায় সকল আরব দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংগ্রামী নেতা ইয়াসির আরাফাতও সহঅবস্থান মেনে নিয়েছেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এ পথেই এসেছে রক্তক্ষয়ী প্যালেস্টাইন সমস্যার ন্যূনতম সমাধান (১৯৯৩ খৃঃ)। ফলে ৪০ বছর পর গঠিত হয়েছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র।

বাঙালির মুক্তির প্রতীক সবুজ-হলুদ-লাল রঙে দেশের মানচিত্র খচিত ঝাণ্ডা নিয়ে ২২ চৈত্র ১৩৭৭ বাংলা, ৫ এপ্রিল ১৯৭১ খৃঃ গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর উরস শরিফে আসার অনুমতি দিয়ে ইনিই খোদায়ী রহমতের শক্তিতে মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়মুখী করেছিলেন। তাইতো ষোল ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণে উদিত হয় বাঙালির হাজারো বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা-সূর্য। আবার পঁচাত্তরের ঈদের পর সপ্তাহে বলেন, "দেশে একটা সরকার আছে, অথচ রোজাদারেরা ইফতার করে শরবত খাওয়ার জন্য এক ছটাক চিনি পায় নাই। শবে বরাতের রাতে হযরত কেবলার (ক.) রওজা শরিফে কান্নারত মানুষের সাথে আমিও কেঁদেছি। ১৯৭৪ সালে নভেম্বর মাসে বিপদ আশংকা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে তিনি একখানা চিঠিও লিখেছিলেন। কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ফলে বাঙালির আবেগমথিত প্রিয় নেতৃত্ব চিরতরে হারিয়ে যায়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশনের জন্য তিনি একবার চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পর পর দু'বার অপারেশনে জীবনাশংকায়ও কোন ভয়ভীতি না দেখে কর্তব্যরত ডাক্তারেরা বলেন, নিশ্চয় আপনার কোন মহাশক্তি আছে, না হলে মরণ সংকটে কেউ কি এমন ভয়হীন

অবিচল থাকতে পারে? তিনি উত্তরে বলেন, "যার মহাশক্তি আছে তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমার সংগে থাকেন। বিনয়বশতঃ এভাবে নিজ পরিচিতিকে আড়াল করলেও প্রকৃত সত্য এই যে, পবিত্র রক্তধারা, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, প্রবৃত্তি বা ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী সাধনা ও একনিষ্ঠ ইবাদত রিয়াজতে তিনি খোদায়ী মহাশক্তিকে অর্জন করেছিলেন। এই ক্ষমতাকে তিনি বলতেন, তাওহীদি তলোয়ার। হুজ্‌রা শরিফের নিত্য আসরে দীপ্ত কণ্ঠে বলতেন, আমার মুরিদ ও প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্তগণের কোন ভয় নাই। ইহ-পরকালের সকল বিপদ সংকটে দো-ধারী তাওহীদি তলোয়ার নিয়ে আমি তাদের সামনে আছি। যে তরবারি যেতে আসতে উভয় ধারে কেটে তৈরী করবে তাদের মুক্তি-মঙ্গল পথ। আসলে এই তরবারি আলাদা কোন অস্ত্র বিশেষ নয়। নিজেকেই তিনি একটি প্রতীকে বর্ণনা করেন। তাওহীদি তলোয়ারের প্রকৃত রহস্য বিরাট বিশাল – এখানে সে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

"যে সত্যদর্শী মানুষের খুদী জাগ্রত হলো
সে তীক্ষ্মধার উজ্জ্বল তরবারির মতো।
তার চঞ্চল দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত
প্রতি ক্ষণিকের বুকে প্রচ্ছন্ন প্রোজ্জ্বল শক্তি।
তোমার তুলনা নেই সে মর্দে খোদার সাথে
তুমি দিগন্তের দাস, সে অধিপতি দিগন্তের।" – ইকবাল

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, ঘর সংসার জমি সম্পদ, দোকানদারী, চাষবাস, খামার, মামলা মোকদ্দমা ও সামাজিক কাজকর্মে জড়িত দেখে কেউ কেউ আমাকে কট্টর দুনিয়াদার মনে করে। আসলে এগুলো হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ সৃষ্টির হক বা প্রাপ্য পরিশোধ। আমার বহুকিছু আছে একথা যেমন সত্য আবার আমার কিছুই নাই একথাও সমান সত্য। অন্য কিছু নয়, চাতক পাখির মত আমি সর্বদা আমার মুনিবের মুখাপেক্ষী। আল্লামা রুমী (র.) তাঁর মসনবিতে বলেছেন– স্ত্রী-পুত্র, ধন সম্পদ দুনিয়া নয়, সে সবের মোহে আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকাই দুনিয়া বা পার্থিবতা। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপুল ধন সম্পদ ও বহু মামলা মোকদ্দমায় জড়িত ছিলেন। কিন্তু দুনিয়ার মোহ কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই। যেহেতু ফকিরী আর দুনিয়ার মোহ একসাথে চলতে পারে না। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে না পারলে ধর্ম কর্মে

যতই রত থাকুক সবই অর্থহীন। নির্বিলাস, নির্মোহ জীবন যাপন পদ্ধতির মাঝে আমার জীবন সত্য সতত প্রকাশিত।

এমনি অসংখ্য ঘটনায় নিজেকে প্রকাশ-বিকাশ করে ৮৯ বছর বয়সে ২ মাঘ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৮২ খৃস্টাব্দ শনিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন। এই মহাত্মা পূর্বেই বলে যান, ইদানিংকালের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আমার কবরে গম্বুজধারী রওজা করো না। দুর্বাঘাসে শোভিত শ্যামল প্রকৃতির বুকে আমায় সমাহিত করবে। খেলাফত প্রদত্ত উত্তরাধিকারী বড় পুত্র শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) মাইজভাণ্ডারী সহ রেখে যান পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা। আরো থাকে অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদান। অমূল্য রত্ন হারিয়ে যাদের অন্তর-আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদে।

স্মৃতির মিনার তুমি দাওনি গড়তে তাই
হৃদয়ের মাঝখানে দিয়েছি যে ঠাঁই।
এমন শক্তি কোথা ভাংবে তারে।
মুক্ত আকাশ তলে রওজা তোমার
ঘোষিছে উদারতা মহিমা অপার।
রাজা হয়ে কাঙাল সেজে এ কি দীনতা!
প্রকৃতির মাঝে সে কি চির সজীবতা?
সেথা দুর্বাঘাসে সকাল শিশির বিন্দু
অগণিত ভক্তের যেন সজল নয়ন সিন্ধু।
সবার হৃদয়ে জ্বালো আরো আলো
মুছে যাক যত গ্লানি আর কালো।

মিরাজী বার্তাবাহী মহাদূত

১০ পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
১২ রজব ১৩৪৭ হিজরী।
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খৃস্টাব্দ।
মঙ্গলবার সুবহে সাদেক।

দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে – আলো ও গতির উৎসের উদ্দেশ্যে যেন শ্রদ্ধা জানালো। কেটে গেছে রাতের নিঝুম প্রহর। পূর্বাকাশে ফুটে উঠেছে ঊষার আলো। পাখির কলকণ্ঠে ঘুমন্ত প্রকৃতি ও মানুষ জেগে উঠতে শুরু করেছে। কন্‌কনে শীতে ধান মাড়ানোর জন্য আগেই জেগেছে গ্রামের কিষাণ-কিষাণী। সারা বছরের শ্রমের ফসলে গোলা ভরার আশায়। মৃদু-মন্দ হিমেল বাতাসে টিপ্ টিপ্ ঝরে পড়ছে গাছের পাতায় পাতায় জমা শিশির। ভেসে আসা ভোরের আযান ধ্বনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বিশ্বজনীন আহ্বানের সাথে মাইজভাণ্ডার শরিফে ভূমিষ্ঠ হয় এক শিশু।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে রজব মাসকে অতি সম্মানিত মাস বলে ঘোষণা করেছেন। রা, জিম ও বা – এই তিন অক্ষরে রযব শব্দ গঠিত। 'রা' দিয়ে আল্লাহ্ রহমত, 'জিম' দিয়ে জত্ – উপহার এবং 'বা' দিয়ে বারণ অর্থাৎ অনুগ্রহ বুঝায়। মূলতঃ এ মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র তিনটি কল্যাণই অব্যাহত থাকে। হযরত আকরাম বিন আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসূলে খোদা (দ.) বলেছেন, রযব আল্লাহ্‌র মাস।
হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) আল্লাহ্‌র মাস বলতে কি বোঝায় জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, 'বেহেশ্‌তের একটি নদীর নাম রযব, যার পানি দুধের চেয়ে সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি'। কেউ যদি এ মাসে একটিমাত্র রোজা রাখে তাকে কেয়ামতের দিন ঐ সুস্বাদু পানি পান করতে দেয়া হবে।
এ মাসের সাতাশে রজনীতে মহান স্রষ্টা তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (দ.)কে একান্ত মিলনে আহ্বান জানালেন। এ আহ্বান পেয়ে ফেরেশ্‌তা জিবরাঈলের সঙ্গে বোরাক নামের দ্রুতগতির বাহনে করে তিনি ছুটে যান উর্দ্ধলোকে আল্লাহ্‌র আরশ অভিমুখে। ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদ করে সপ্ত আসমান পেরিয়ে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা নামক স্থানে পৌঁছলে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, 'এখান

পর্যন্ত আমার গতি শেষ। আর কেশাগ্র পরিমাণ উপরে উঠলেই আল্লাহ্‌র নূরানী তজল্লীতে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। এবার আপনার একার পালা'। সে স্থান থেকে রফ্ রফ্ নামক অপর বাহন রাসূলকে (দ.) মহান আরশে নিয়ে পৌঁছায় যেখানে মহামহিম প্রভুর স্বরূপ অবস্থান।

'সহসা খুলে গেলো চির রুদ্ধ দ্বার
স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে হলো মিলন অপার'।

- কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'মেরাজ' কবিতা হতে।

আল্লাহ্‌র অভুতপূর্ব মিলনে ধন্য হলেন নবিশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (দ.)। এই মিরাজ খুলে দিলো স্রষ্টা প্রভু ও সৃজিত মানবের চিরস্থায়ী বাধাহীন মিলন পথ - বেলায়েত। এই মহা মিলন মাসে সম্মানিত বারোর শুভ ঊষালগ্নে এ কোন্ সূর্যোদয়? মিরাজী বার্তাবাহী কোন মহাদূত?

গড্ দা ফাদার, গড্ দা সন এ্যান্ড গড্ দা হলি স্পিরিট (অর্থঃ স্রষ্টাই পিতা, স্রষ্টাই পুত্র এবং স্রষ্টাই পবিত্র শক্তি) এই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী খৃষ্টানদের ত্রাণকর্তা হযরত ঈসা (আ.) এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা ছাড়া মাতা মরিয়মের (আ.) রহস্যময় সন্তান। অসংখ্য মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে আকৃষ্ট করে মানুষকে তিনি প্রতিবাদহীন আত্মোৎসর্গের প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের মতে, এক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় অধর্মী ইহুদীরা তাঁকে ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা করে। মুসলমানদের বিশ্বাস আল্লাহ্ তাঁকে উর্দ্ধে তুলে নিয়েছেন, তিনি চতুর্থ আসমানে এখনো জীবিত। মানুষের মুক্তির জন্য শেষকালে জগতে পুনঃ উদয় হবেন। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ জুড়ে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে তাঁর পবিত্র জন্মদিন খৃষ্টানদের খৃষ্ট দিবসে সর্বত্র অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মোৎসব পালিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে সেই ঈসার (আ.) মহান জন্মদিনে এ কোন্ ঈসা পুনঃ ভবে এলেন?

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ্ কুদ্দাসাসির্‌রাহুল বারীর পৌত্র খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী শিশুর পিতা। হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর দ্বিতীয় কন্যা শাহ্‌জাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন শিশুর স্নেহময়ী মাতা। এমন দুই মহান মর্যাদাবান অলি-

উল্লাহ্‌র পবিত্র রক্তধারার অপূর্ব সম্মিলন বিশ্ব সুফি সভ্যতার ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এ যেন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত দুই সাগরের মিলনস্থল 'মারাজাল বাহ্‌রাইন'। যেখানে ভাজা মাছ তাজা (জীবিত) হয়। হযরত মুসা (আ.) যে স্থানে রহস্যজ্ঞানী অলি-উল্লাহ্‌ হযরত খোয়াজ খিজির (আ.) এর সন্ধান পেয়েছিলেন (সূরা কাহাফ নবম রুকু দ্রষ্টব্য)।

আজি হতে শতবর্ষ পরে / কে তুমি পড়িছ বসে আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে, / আজি হতে শত বর্ষ পরে।
(১৪০০ সাল কবিতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্মের একশত বছর পর এই শিশু তাঁর বংশের উত্তরসূরি। তাঁর দর্শনরূপ কবিতার একনিষ্ঠ কৌতুহলী পাঠক, বংশের প্রোজ্জ্বল আলোক প্রদীপ। তিন বোন জন্মের পর পরিবারের প্রথম পুত্র সন্তান; পরম আরাধ্য ধন। তাই দরবার পাকে আনন্দের বান ডাকে। সপ্তম দিবসে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় নবজাতকের নাম রাখা ও আকিকা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এটাই দরবার পাকের সকল পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সম্মিলিত একক অনন্য প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, তৎকালে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের এন্তেজামে একক দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম সাহেব। শিশুর নাম রাখা হয় 'সৈয়দ বদিউর রহমান'।

এই অনুষ্ঠানের পর স্বপ্নে শিশুর পিতাকে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ভাবগম্ভীর স্বরে বলেন, শিশুর নাম রাখুন জিয়াউল হক। অনুশোচিত পিতা পরদিনই পুনঃ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দু'টা গরু জবেহ করে রাখা হলো স্বপ্নাদিষ্ট পবিত্র নাম। জিয়া শব্দের অর্থ আলো এবং হক শব্দের অর্থ সত্য। সুতরাং সত্যের আলোক – জিয়াউল হক। সত্যের বার্তাবাহক আরেক মহাদূত।

আল্লাহ্ হাজার শোকর

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। নাড়ীরও সাড়া নাই। ঔষধ পথ্য দিয়ে কিছুক্ষণ আগে ডাক্তারও চলে গেছেন। একুশ দিনের শিশু জিয়াউল হক মাতৃরোগে মৃত প্রায়। কাঙ্ক্ষিত ধন পেয়ে হারাবার আশঙ্কায় মা যেন একখানা খোদাই করা পাথর। কোন সাড়া শব্দ নাই। ছেলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বংশের সবাই উদ্বিগ্ন। অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এমন সময় এলেন ছেলের বড় নানী সৈয়দা রাবেয়া খাতুন, মির খাতুনের মা। শিশুর অবস্থা দেখে তিনিও দিশেহারা। শিশুকে কোলে নিয়ে শিশুর পিতার হুজরায় গিয়ে বলেন, 'চলুন তো, বাবা মাওলানা সাহেবের (বাবা ভাণ্ডারী) নিকট গিয়ে দেখি, কিছু হয় কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, 'পুত্রের জীবন ভিক্ষার মত সামান্য কিছুর জন্য আমি তাঁর নিকট যাব না। ইচ্ছা হলে আপনি যেতে পারেন'। বাবা ভাণ্ডারী [গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক).] তখন গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের দক্ষিণে পুরান হুজরায় থাকতেন। সকাল বেলা। শিশুকে নিয়ে হুজরায় উপস্থিত হয়ে সৈয়দা রাবেয়া খাতুন ভাবাবেগে বলতে লাগলেন, 'হযরতের বংশের বাতি নিভে যায় আর আপনি চাদর মুড়ি দিয়ে আরাম করছেন? আপনি না লক্ষ লোকের হাজত রওয়া মুশকিল কোশা! আপনার সম্মুখে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বংশের বাতি নিভে গেলে তাঁকে কী জবাব দেবেন? হাশর ময়দানে আল্লাহ্ ও রাসূলকে কী করে মুখ দেখাবেন'? কোন সাড়া না পেয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতেই থাকেন, 'অসংখ্য কাঁটা বিঁধে যখন পাহাড় থেকে এসেছিলেন, আমিই তুলেছিলাম সব কাঁটা। গরম পানিতে রক্ত-পুঁজ ধুয়ে সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ করেছিলাম। প্রতিদান কিছুই তো চাই নাই। এখন আমার দাবি এই ছেলের জীবন ফিরিয়ে দিতে হবে'। চরম আবেগময় এ আবেদনে বাবা ভাণ্ডারী চাদর সরিয়ে নিলেন। পানি ঢালার জন্য পবিত্র ডান হাত প্রসারিত করলেন। শিশুকে জলধারায় রেখে সাত কলসী পানি ঢালার পর জলধারা বন্ধ করতে ইশারা করলেন। তবু শিশুর দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। সবাই উৎকণ্ঠিত। অবশেষে পবিত্র হাত নিংড়ে দু'তিন ফোঁটা পানি শিশুর মুখে দিলেন। আস্তে আস্তে শিশু চোখ মেলে তাকালো। সৈয়দা রাবেয়ার চোখে নেমে আসে আনন্দধারা। অবরুদ্ধ কণ্ঠে একবার শুধু বললেন, 'আল্লাহ্‌র হাজার শোকর'।

জ্ঞান-প্রদীপের আলোকে

সময় এগিয়ে চলে; দিন-মাস-বর্ষ। শিশু জিয়ার বয়সও চার বছর অতিক্রান্ত। জীবন ও জগতকে জানার প্রয়োজনে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই শিশুর ধর্ম ও বর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। এক শুক্রবার সকালে নতুন জামা-কাপড় পরে মাথায় টুপি দিয়ে, বগলে আমপারা নিয়ে শিশু পাঠ নিতে প্রস্তুত। স্নেহময়ী মাতা একজন খাদেমকে নিয়ে নিজেও অন্দরবাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। মাথায় হাত বুলিয়ে, মুখে চুমো দিয়ে, বাম হাতে পেছন থেকে এগিয়ে যাবার তাড়া দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দেন তার বাবার নিকট। মায়ের আঁচল ছেড়ে শিশু বার বার ফিরে ফিরে তাকায়। পিছনে মায়ের স্নেহের আকর্ষণ, সামনে প্রথম সবক নেবার আনন্দ, দো-টানায় শিশু ধীর গতিতে এগোয়। হযরত সাহেব কেবলার পবিত্র হুজরায় শিশুকে প্রথম পাঠ দেওয়া হয়। ছেলে বাবার মুখে মুখে পাঠ করলেন রাব্বি জিদনী ইল্‌মা – প্রভু হে, আমায় জ্ঞান দাও।

গৃহশিক্ষক মৌলভী মোজাম্মেল হকের নিকট শুরু হয় তাঁর ধর্মীয় কলেমা কালাম ও বর্ণ শিক্ষা। প্রথমে তিনি ভর্তি হন মাইজভাণ্ডার আহ্‌মদিয়া জুনিয়ার মাদ্‌রাসায় (অধুনালুপ্ত)। মা-বাবার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখানে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯৪১ সালে মৌলভী মোজাহেরুল হক (বি.এ.বি.টি) সাহেব ফটিকছড়ি করোনেশান হাই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বড় ভগ্নিপতির সাথে তিনিও ফটিকছড়ি চলে যান। হোস্টেলে উভয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয় সংলগ্ন প্রাইমারী স্কুলে। থানা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় সেকালে সুনামের অধিকারী ছিল। দক্ষিণমুখী বিরাট ভবন, প্রশস্ত খেলার মাঠ, লোকালয় থেকে অনতিদূরে নীরব নিস্তব্ধ শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ। খেলাধুলার সুবিধা ছাড়াও শিক্ষাবিদ ভগ্নিপতির সান্নিধ্যে তাঁর জ্ঞান অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক বছর পর হঠাৎ মৌলভী মোজাহেরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং নানুপুর আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। শান্ত-সুবোধ এই ছাত্রটি নিম্নমুখী হয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করতেন। মেজ ভাই সৈয়দ মুনিরুল হকও তাঁর সহগামী ছিলেন। দুই ভাই একই কক্ষে একসঙ্গে থাকতেন ও পড়তেন। প্রধান বাসগৃহে লোকজনের অত্যধিক যাতায়াত ছিলো বলে গাউসিয়া আহমদিয়া মেহমানখানার দক্ষিণ পশ্চিম রুমে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করেন।

সিংহাসনে যুবরাজ

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বিকেলের রোদ ঝিকমিক করছে পবিত্র রওজার গম্বুজে। পাক দরবারের আওলাদগণ ও তাঁদের আত্মীয় স্বজন সবাই এসেছেন। শিষ্য, ভক্ত-অনুরক্ত এবং পাড়া প্রতিবেশীর বিপুল সমাবেশ। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে আনন্দের মহাউচ্ছ্বাস। সাত বছর বয়স্ক জিয়ার খত্‌নার পরবর্তী বরণ অনুষ্ঠান। সুন্দর জামা কাপড়ে তাঁকে সাজানো হলো, মাথায় পরানো হলো জড়িখচিত তাজ। মুরুব্বীদের কয়েকজন তাঁকে নিয়ে গেলেন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর হুজরা ও রওজায়। পিছনে অসংখ্য অনুগামীর প্রচণ্ড ভিড়। দোয়া-কালাম পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কচি দু'হাতে মোনাজাত ধরলেন। প্রধান খাদেমের নেতৃত্বে পরিচালিত মোনাজাতে হাজারো লোকের 'আমিন-আমিন' ধ্বনিতে দিগ-দিগন্ত মুখরিত। প্রধান ফরিয়াদীর মুখমণ্ডল অন্তরের বিদ্যুৎ আভায় উদ্ভাসিত। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর হুজরায় গিয়ে পবিত্র পদযুগল স্পর্শ করলে নানাজান দৌহিত্রকে মৃদু হেসে যেন অবারিত আশীর্বাদে ধন্য করলেন।

অতঃপর চলে গেলেন অন্দর মহলে। অসংখ্য শিশু-কিশোর, যুবতী, আত্মীয়া ও ভক্ত মহিলারা যেখানে তাঁর স্নেহময়ী মাকে ঘিরে অপেক্ষায়। মায়ের দু-বাহু বাড়ানো স্নেহের আলিঙ্গনে এক অপরূপ দৃশ্য। উপস্থিত সকলের একমাত্র নিশ্চুপ অনুভূতি 'আল্লাহ্ যেন দীর্ঘায়ু করেন'। সবার প্রতি প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে আবার বেরিয়ে আসেন কিশোর জিয়াউল।

অপেক্ষারত সাজানো চৌদুল (বড় পাল্‌কী) ও সুসজ্জিত বাদক দল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকল আওলাদ, নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বিশিষ্ট অতিথিরা। পদধুলি নিতে গেলে বাবা দীপ্ত চোখে কী যেন দেখলেন আপন উত্তরসূরির মাঝে। অন্দর-বাহির সকলের শুভাশীষ মাথায় নিয়ে কিশোর জিয়াউল ধীর পদক্ষেপে উঠে বসলেন অপেক্ষমাণ চৌদুলে। মাইজভাণ্ডারী গানের সুরে অমনি বেজে উঠলো ব্যান্ড। জনতা তোলে জয়-ধ্বনি। সমগ্র এলাকা হয়ে উঠলো আনন্দমুখর। এ যেন যুবরাজের সিংহাসন আরোহণ। জনতার মিছিল এগিয়ে চললো হযরতের রওজার পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকের বড় রাস্তায়। মাইজভাণ্ডার শরিফ ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঘুরানো হলো। পথে উৎসাহী দর্শক সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল। সাদর সম্ভাষণ জানালো হযরত সাহেব কেবলা ও হযরত বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র

রক্তজাত আগামী দিনের প্রতিনিধিকে। তেরশ’ বিয়াল্লিশ সনের তের মাঘ – সেদিন ছিলো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উরস পরবর্তী চার দিনের ফাতেহা।

মুক্তার জড়োয়া মালা

অপরূপ সে দৃশ্য। যেন মুক্তার আলোয় ঝিকিমিকি। হেমন্ত-প্রভাতে দুর্বাঘাসে একটি শিশির বিন্দু। শৈশব এমনি শত মুক্তার জড়োয়া মালা। কত ছবি কত রঙ মনের ক্যানভাসে। সুর হোক বা না হোক কণ্ঠে গুনগুনিয়ে গান আসে। প্রজাপতির পাখনায় চলে মনের গতি। সবকিছু অবাক করা আশ্চর্য সুন্দর!

কিশোর জিয়াও খুঁজে সে আনন্দ ও সুন্দর। কখনো একা একা নীরবে। আবার কখনো দল বেঁধে হৈ-হল্লা করে। একদা দুপুরে বাড়ির সামনে একটা খালি গরুর গাড়ি পড়েছিল। মুরুব্বীরা তখন বিশ্রামে। মনস্থ করলেন গাড়ি নিয়ে খেলবেন। জুটিয়ে নিলেন শিশু কিশোরের দল। প্রস্তাব দিলেন, “আমরা দু’ভাগ হয়ে একদল গাড়ি টানবো, অন্যদল গাড়িতে চড়বো। মসজিদের নিকট পৌঁছলে পালাবদল হবে”। প্রস্তাব মত তিনি টানার দলে; তাঁর মেজভাই মুনির চড়ার ভাগে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলে আরোহীরা নেমে যায়। প্রথমে যারা টানছিলো তাদের চড়ার পালা। ভাই নামতে চাইলে নিষেধ করলেন। ‘এবার যে আপনার আরোহনের পালা’ – মেজ ভাই বলেন। তিনি উত্তর দেন, “তুমি ছোটতো তুমিই থাক”।

বাড়ির পেছনের পুকুরে প্রচুর মাছ। সমবয়সী নিকট আত্মীয়রা বেড়াতে এলে এক সঙ্গে পুকুরে মাছ ধরতে নামতেন। প্রতিযোগিতা চলতো কে কতো বেশি ধরতে পারে। রুই, মৃগেল, কাতাল, শৈল এবং প্রচুর চিংড়ি ধরা পড়তো। কখনো তিনি জিততেন কখনো বা হারতেন। হার-জিতে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া ছিলো না। মাছ ধরার আনন্দটাই প্রধান। বাড়ির পশ্চিমে সংলগ্ন লোহার খালে ছিপ দিয়েও মাছ ধরতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন ছিপটা কখন চুবিয়ে নেবে; আর অমনি মারবেন ‘ছোঁ’।

তখন তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। একদা মাকে বললেন, ‘আমার একটা স্যুট লাগবে’। গ্রামাঞ্চলে তাঁর বয়সী ছেলেরা স্যুটের কথা যখন কল্পনাও করতো না। মা বুঝ দিতে চাইলেন। কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। মায়ের গলা জড়িয়ে বলেন,

“মা, আমি না তোমার আদরের ছেলে”। আবেগময় এ আবেদনে মা সুন্দর একটা স্যুট বানিয়ে দেন।

শবেবরাত, শবেক্বদরের রাতে এবং পরীক্ষা এলে অধিক রাত জাগতেন। রাতে চা পান করা চাই। এতে ঘুমের ঝামেলাটা কমে। মাকে বললে হয়তো বকুনী দেবেন; ‘ছোট ছেলে! বেশী চা খাওয়া ভাল না’। তাই বড় বুবুই ভরসা। চুপি চুপি ডাকতেন। যতবার প্রয়োজন বুবু চা করে দিতেন। কখনো দরদ ভরা কণ্ঠে বলতেন, ‘বুবু’ তোমার সুখের সংসার হবে’। বুবু হাসতেন।

তিনি ফুটবল খেলা ভালবাসতেন। নিজেও খেলতেন। নানুপুর নিবাসী তাঁর সহপাঠি সৈয়দ মোহাম্মদ জাকারিয়া শৈশবের স্মৃতি স্মরণে বলেন, নানুপুর সৈয়দ পাড়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে চাড়ালিয়া হাট ক্লাবের ফাইনাল খেলায় মোহামেডানের পক্ষে সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলোয়াড় অনুপস্থিত। খেলা শুরু হওয়ার ঘন্টাখানিক সময় বাকি। এ পক্ষের সবাই চিন্তিত; নিশ্চিত পরাজয় ভেবে কর্মকর্তা খেলোয়াড় ও সমর্থক সকলের চেহারা মলিন। হঠাৎ আমার মনে পড়ে জিয়াউল হক মামু তো আছেন। অন্যদের বললাম, আপনারা মাঠে চলে যান। আমি মামুকে নিয়ে সরাসরি মাঠে চলে যাব। বিল কোনাকুনি, মাইজভাণ্ডার শরিফ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলে বলেন, সামনের বারান্দায় দেখছেন না বাবা বসে আছেন? ইউনিফরম নিয়ে বের হওয়া যাবেনা; পরনে যে লুঙ্গি কী করে খেলব! বললাম হাফ প্যান্টের ব্যবস্থা করা যাবে চলুন। চাড়ালিয়া হাট স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত খেলায় তাঁর দেওয়া শেষ মুহূর্তের একমাত্র গোলে নানুপুর দল বিজয়ী হয়। মামাকে নিয়ে সে কী আনন্দ উল্লাস! তিনি যে আমাদের বিজয়ের কাণ্ডারী।

প্রীতির অমর বন্ধন

নিঝুম রাত। সবাই ঘুমে অচেতন; একটা ঘরে বাতি জ্বালিয়ে জেগে আছে আসন্ন সন্তান-প্রসবা এক প্রসূতি এবং ধাত্রীসহ দু’জন সেবিকা। প্রসূতি প্রসব বেদনায় কাতর। ধাত্রী চরম মুহূর্তের অপেক্ষায়। সন্তান-সম্ভবা নারীর কাতরতা দেখে সেবিকারাও বেদনার্ত। বোনের এহেন অবস্থায় নিজ কক্ষ থেকে ছুটে এলেন সৈয়দ জিয়াউল হক। তাঁর করণীয় তেমন কিছুই ছিল না। তবু সর্বক্ষণ ছটফট্ করতে থাকেন। সন্তান ভুমিষ্ঠ হলে লোটায় পানি ভরে বুবুর মাথায় পানি ঢেলে

তাঁকে শান্ত করেন। সামাজিক লাজ-লজ্জার বাঁধা প্রীতির অনুভূতির নিকট পরাজিত। সর্বজ্যেষ্ঠা সৈয়দা মোবাশ্বেরা বলেন, 'জীবনে এটাই আমার স্মরণীয় ঘটনা। ছোট ভাই তখন চৌদ্দ বছরের বালক মাত্র'।

ছোট ভাইয়েরা আগেই ঘুমুতেন। লেখাপড়া সেরে তিনি একটু রাত করে শুতেন। শোবার আগে দেখতেন ভাইদের বিছানা-পত্র। কোন অসুবিধা হলে ঠিকঠাক করে দিতেন। বাসায় আগে আসলে নিজেই করতেন ভাইদের নাস্তা-খাবারের ব্যবস্থা। পরে এলে খাদেম আলী আহামদের নিকট খোঁজখবর নিতেন। শহরের পালা-পার্বণ উৎসবে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন। অসুখ বিসুখে মায়ের মত আন্তরিক সেবা শুশ্রুষায় সারিয়ে তুলতেন। তখন দরবারের বাসা ছিল চট্টগ্রাম প্যারেড মাঠের পূর্ব দিকে। একদা বিকেল বেলা ভাইদের নিয়ে সদরঘাট হতে একখানা সাম্পান ভাড়া করে কর্ণফুলী নদীতে নৌভ্রমণ করেন। হঠাৎ ঈশান কোণে মেঘ উঠে বৃষ্টি নামতে দেখে মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে সৈয়দ শহিদুল হকের মাথায়, গায়ের শার্টটি সৈয়দ দিদারুল হককে, গেঞ্জিটি সৈয়দ এমদাদুল হককে এবং রুমালখানা সৈয়দ মুনিরুল হকের মাথা ঢাকতে দিয়ে নিজে উদোম গায়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলেন। ভায়েরা সেসব স্মৃতি কখনো ভুলেন নি।

সবার ছোট শহিদুল হক। পেয়েছেন সকলের অবারিত স্নেহ-মমতা। শহর থেকে বাড়ি যেতে বড় দাদা রঙিন ছবি ছড়ার বই নিয়ে যেতেন। মজার মজার গল্প সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিয়ে পাশে বসিয়ে পড়াতেন। প্রতিদিন সকালে পাঁচটি করে ইরেজী শব্দ শিখাতেন। কোলে নিয়ে এখানে সেখানে বেড়াতেন। খাদেম ওমর আলী ফকিরের ছেলে সোবহান সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আনা-নেওয়া করতো। একদিন দেরি হওয়াতে শহিদুল ছোট্ট এক টুকরো ইট ছেলেটাকে ছুঁড়ে মারেন। এতে ছেলেটার মাথা ফেটে রক্ত পড়ে। ভয় পেয়ে দৌড়ে চাষবাড়ির পূর্বদিকে বাবার নিকট চলে যান। বাবার হাত ধরে শ্রমিকদের মাটি কাটার তদারকি দেখতে থাকেন। অনেকটা নির্ভয় আশ্রয়। কিছুক্ষণ পর বড়দাদা সেখানে উপস্থিত। জোর করে নিয়ে আসতে চাইলে পিতা বললেন, 'থাক না'। তিনি উত্তর দেন, স্কুলে যেতে হবে'। সৈয়দ শহিদুল হক বলেন, 'আমি তো ভাবলাম বোধহয় স্মরণীয় মার দেওয়া হবে'। ঘরে নিয়ে গেলে মা বলেন, "ছেলেটাকে খুন করেছে; ভাল করে শাস্তি দাও"। তিনি মাকে বুঝিয়ে বলেন, "ছোট তো! বুঝে নাই, মাফ করে দেন। আর কখনো করবে না"।

আলো আরো আলো

'জ্ঞান অর্জনে সুদূর চীনেও যদি যেতে হয়, তবু যাও' পবিত্র হাদিসের বাণী। তরবারীর ঝলক নয়, জ্ঞানের মহিমায় মুসলিম জাতি বিশ্বজয় করেছিলো। বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংস্কৃতি জ্ঞানেরই অবদান। মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদান আধুনিক সভ্যতা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। মদিনা, বাগদাদ, বুখারা, কর্ডোভা, কনস্টান্টিনোপল জ্ঞান-গৌরবের ঐতিহ্যে চির অম্লান। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্যে মধ্যযুগে মুসলিম সম্প্রদায় ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধনার সম্পদ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে এ জাতি কতই না পিছিয়ে পড়েছে। ফলে স্বকীয়তা হারিয়ে আজ অপরের মুখাপেক্ষী।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতার ইচ্ছা অনুসারে সৈয়দ জিয়াউল হক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যান। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। মেঝ সহোদর সৈয়দ মুনিরুল হকও একই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে নাম লিখান। উভয়ে এক সাথে হোস্টেলে থাকতেন। কিছুদিন পরে তাঁরা পশ্চিম মাদারবাড়িতে ত্রিশ টাকায় একখানা পাকা ঘর ভাড়া নেন। সে ঘরের মালিক জনাব মীর রশিদ আহামদ মাস্টারের পুত্র মীর জিয়া উদ্দিনকে শ্রেণিবন্ধু হিসেবে পেলেন। এতে মাস্টার সাহেবের পরিবারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা পরবর্তীকালে পারিবারিক আত্মীয়তায় রূপ লাভ করে। ১৯৪৮ সালে তিনি এবং জিয়াউদ্দিন এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। শ্রী অম্বিকা চরণ সম্পাদিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা পাঞ্চজন্য'র ১৫ ভাদ্র ১৩৫৫ বাংলা সন (৩১ আগস্ট) সংখ্যায় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর।

বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব রেজাউল করিম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ভক্ত সৈয়দ আমিরুল ইসলামের কাছে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পুনরায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস চালু হওয়ার পর জনাব সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী সাহেবকে আমাদের সহপাঠী হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাদের সাথে নবম শ্রেণিতে যোগদান করেন। আমরা তাঁকে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও সদালাপী সাথী হিসাবে পেয়েছিলাম। তিনি যে অনেক গুণাগুণের অধিকারী ছিলেন তা তখন থেকে বুঝা যেত। ঐতিহ্যবাহী ওই স্কুলের সকল ক্লাসের ছাত্র ও শিক্ষকগণ

তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন। তখনকার সময়ের একমাত্র ছাত্র ছিলেন যিনি স্কুলে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরে আসলে কোন শিক্ষকই কোন প্রকার কটুবাক্য বলতেন না। আমাদের আরবি শিক্ষক তাঁকে ক্লাসে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করতেন ও তাঁর সামনে আমাদেরকে আরবি পড়াতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর মত একজন আধ্যাত্মিক কামেল ব্যক্তির সাথে একই স্কুলে পড়াশোনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। ক্যাপ্টেন বখতেয়ার সাহেবের পিতা জনাব এয়াকুব দারোগা চন্দনপুরায় নিজ বাসভবনে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পরে চকবাজার প্যারেড মাঠের পূর্বে নিজেদের জন্য বাসা ভাড়া নিলে তথায় চলে যান। এই কলেজ থেকে ১৯৫১ সালে তিনি আই.এ পাশ করেন।

চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতো। সেকালে এই কলেজের শিক্ষার মান ছিলো উন্নত। উচ্চ শিক্ষার্থে সৈয়দ জিয়াউল হক সেখানে ভর্তি হন। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের সাবেক কেরানী সীতাকুণ্ড এয়াকুব নগর নিবাসী মৃত আবদুল মজিদের পুত্র হাফেজর রহমান এক আলাপে বলেন, বি.এ. পড়ার সময় তাঁর জন্য একটি চাকুরি খুঁজতে বলেন। চাকুরি কী জন্য জানতে চাইলে বলেন, ব্যবসা শিখবো। বিষয়টি তাঁর পিতাকে জানালে কোন মন্তব্য না করে, শুধু মৃদু হাসেন। ১৯৫৩ সালে বি.এ টেস্ট পরীক্ষার তৃতীয় দিনে আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন এবং কোন লেখা ছাড়া সাদা খাতাটা জমা দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসেন; ঠিক তাঁর নানাজানের মতো। এভাবে তিনি হযরত বাবা ভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক সুনজর লাভ করেন।

জাগতিক শিক্ষার এখানেই অবসান। অনন্ত রহস্য জ্ঞান-সন্ধানে দুর্গম পথের অভিযাত্রী জিয়াউল হক কানুনগোপাড়া থেকে সোজা মাইজভাণ্ডার শরিফ হেঁটে চলে আসেন। পদ্ধতিগত শিক্ষাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অগ্রসর হলেন মহান শিক্ষকের অনন্ত সত্যকে জানার জন্য।

বাড়িতে আসার পর প্রথম দিকে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে দিন কাটাতেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। মধ্যে মধ্যে ভাব বিভোর অবস্থা – জজ্‌বা-হাল

চরমে পৌঁছত। অনেকে এ অবস্থাকে রোগের লক্ষণ বলে মনে করে তাঁর বাবাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ দেন। তিনি ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথী সর্বপ্রকার চিকিৎসা করান। কোন ফল হয়না; দিন দিন বিভোর অবস্থা বাড়তেই থাকে। লোকমুখে প্রশংসা শুনে মৌং মাহ্‌ফুজুল করিম চট্টগ্রাম শহরের এক নামী কবিরাজ বৈদ্যকে আনেন। রোগী দেখে বৈদ্য রোগীর পিতাকে বলেন, এ রোগ চিকিৎসায় ভাল হবে না। আপনি পাগল করেছেন আপনাকেই ভাল করতে হবে। পিতা বলেন, আপনাকে আনলাম চিকিৎসার জন্য আপনি বলছেন অন্য কথা। ২৫০ টাকা ফিস দেওয়া হলে বৈদ্য মাত্র ২৫ টাকা গাড়ি ভাড়া নিয়ে বিদায় নেন। একদিন তাঁর আম্মাজান চুন্নু মিয়া শাহ্ সাহেবকে ছেলের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। শাহ্ সাহেব বলেন, ‘বড় মিয়াকে একটা ঘরে পবিত্র অবস্থায় রাখবেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেন’। তিনি বুঝতে পারলেন কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপারই হবে।

উত্তম উসিলা ধরে

আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার অফুরন্ত। সে ভাণ্ডার হতে কিছু পেতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত মাধ্যম। বিনা মাধ্যমে প্রাপ্তির আশা বোকার স্বর্গবাস। তাই পবিত্র কোরআনের নির্দেশ, “হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো; আল্লাহ্‌কে চিনবার জন্য একটি মাধ্যম (উসিলা) খোঁজ কর” (সুরা মায়েদা : ৩৫)। সম্মুখের সুস্বাদু খাবারও হাতের সাহায্য ছাড়া মুখে উঠে না। তদ্রুপ মারেফত বা খোদাতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন এবং সূক্ষ্মজগত দর্শনের জন্য আরেফ বা স্রষ্টা তত্ত্বজ্ঞানীর আনুগত্য ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। এই পীর-মুরিদী প্রথা সুন্নতে মোস্তফা রূপে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) হতে চলে আসছে। হিন্দুদের স্বামীজি মহারাজও বলেছেন, “মানুষের মন পাগলা হাতির মতো, যেদিকে ইচ্ছা সব লন্ডভন্ড করে। বন্য হাতীকে বশ মানাতে যেমন মাহুতের প্রয়োজন; সেরূপ মানুষের মনকে শান্ত ও উর্দ্ধমুখী করে তুলতে সৎ গুরুর প্রয়োজন”।

সৈয়দ জিয়াউল হক অনেকবার স্বীয় পিতার নিকট বায়াতের দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। একদা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানাধীন উত্তর ছলিমপুর প্রকাশ ফৌজদারহাটের হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী সাহেব মাইজভাণ্ডার শরিফ যিয়ারতে আসেন। তিনি চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের

খতিব ও ইমাম, ধার্মিক আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা সাহেব তাঁর পিতার সাক্ষাতে উপস্থিত হলে তিনি ছেলেকে বায়াতের 'সবক' পড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। মাওলানা সাহেব বলেন, 'আপনার মত বুজুর্গ থাকতে আমার দ্বারা এ কাজ কি ঠিক হবে'? তিনি উত্তরে বলেন, "আপনি 'সবক'টা পড়িয়ে দেন; বাকি সব আমি করবো"। অতঃপর গাউসে মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র হুজরায় সবক পাঠ করানো হয়।

জন্মের একুশ দিনেই শিশু জিয়া পেয়েছিলেন মৃত্যুর হীম-শীতল স্পর্শ। নিঃশ্বাস কিংবা নাড়ীর স্পন্দন-প্রাণের কোন লক্ষণই ছিল না। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর হাত নিঃসৃত পবিত্র পানিতেই শিশু পুনঃজীবন লাভ করেন। সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রূহে 'ইশ্কে ইলাহী'র প্রচণ্ড গতি সঞ্চালনে স্বীয় প্রাজ্ঞ পিতা অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে 'পীরে ত্বরিকত' এবং নানাজান গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে 'পীরে তাফায়্যুজ' রূপে পেয়েছেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রবর্তক হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রত্যক্ষ সুদৃষ্টিও তাঁর উপর পতিত হয়। ফলে তিন মহান আধ্যাত্মিক পুরুষের সুনজরে অত্যল্প সময়ে তিনি স্রষ্টার গুণজ প্রকৃতি আয়ত্ব করে উচ্চতম শক্তি-সম্পন্ন 'বেলায়তে ওজমা'র অধিকারী বা শ্রেষ্ঠ অলি রূপে গণ্য হন।

কঠোর রিয়াজত-সাধনা

"সাহসী মানুষই খাঁটি মানুষ,
যে আল্লাহ্র মুখোমুখি হবার সাহস করে"। – ইকবাল।

মহাপ্রেমিক স্রষ্টা প্রেমের অস্তিত্বে সৃষ্টির অণু-পরমাণুতে বিরাজমান। পবিত্র কোরআনে তারই ঘোষণা, "আলা ইন্নাহু বিকুল্লি সাইয়ুম মুহিত" (সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৫৪)। আরো ঘোষণা, "আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন, দিবস ও রজনীর পরিবর্তন, মানুষের হিতকর বা প্রয়োজনীয় সম্পদবাহী সমুদ্রে ভাসমান জলযান এবং তিনি আকাশ থেকে যে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেছেন – অতঃপর যার দ্বারা মাটির মৃত উর্বরতাকে জীবিত করেছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন জীবজন্তুগুলোকে মাঠে ঘাটে, বাতাসের আবর্তন-বিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে অবরুদ্ধ

মেঘরাশির মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্‌র একত্বের নিদর্শন রয়েছে” (সূরা বাক্বারা : ১৬৪)। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগত এক মহা পাঠশালা। এ পাঠশালার জ্ঞান অর্জনে কঠোর রিয়াজত বা সাধনার প্রয়োজন। যিনি এ জ্ঞান সাধনায় উত্তীর্ণ হন, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর অনুগত এবং তিনি লাভ করেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন স্রষ্টার বন্ধুত্ব। মানবদেহ জল আগুন মাটি ও বায়ু – এ চার প্রকার পরস্পর বিরোধী পদার্থে গঠিত। এদের চালিকাশক্তি হিসেবে সংযোজিত মহামূল্য সম্পদ – নূর বা আলো। এই পাঁচটি উপাদান হিন্দুদের পঞ্চতত্ব। পদার্থের প্রাকৃতিক গুণজ বৈশিষ্ট্যের দরুণ মানবদেহে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য নামক ছয় রিপুর সৃষ্টি। রিপুগুলো মানুষকে বিপথগামী করে। আবার রিপু দমনের জন্য দেহে ছয়টি লতিফা বা আলোক কেন্দ্র রয়েছে। সাধক কেন্দ্রগুলোতে ধ্যান (জিকির) করে রিপুজাত প্রবৃত্তিকে দমন করেন। বিভিন্ন ধর্মে ধ্যানের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। হিন্দু ধর্ম মতে এটাই ষট চক্রের ভেদ বা যোগসাধন। ষড় রিপুর কর্মক্ষমতা নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন আরো কঠোর-কঠিন সাধনা।

দৈহিক প্রেরণাজাত সকল প্রকার চাহিদা ও ক্ষমতা নির্মূল করার জন্য সৈয়দ জিয়াউল হক কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। ঊনিশ্‌'শ তিপ্পান্ন সাল। ঢাকা হাইকোর্টে তখন হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফের স্বত্বাধিকার মামলা চলছিলো। মামলায় হাজিরার জন্য তিনি ও খায়রুল বশর মাস্টার ঢাকা চলেছেন। রমজান মাস গ্রীণ এ্যারো ছুটে চলেছে ঢাকার পথে। কুমিল্লা অতিক্রম করলে তিনি মাস্টার সাহেবের নিকট সিগারেট ও দিয়াশলাই চেয়ে নেন। তাঁরা পরস্পরের অলক্ষ্যেই ধূমপান করতেন। সেদিনই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো। ট্রেনে অসংখ্য যাত্রী। সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন। কারো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। যাত্রীরা হৈ-চৈ করতে আরম্ভ করলে এক শিক্ষিত বিহারী বারণ করলেন। পথে অসংখ্য ক্যাপস্টান সিগারেট পান করেন। ঢাকা পৌঁছে মিষ্টি খেতে চাইলে মাস্টার সাহেব মিষ্টি এনে দিলে না খেয়ে অনেকক্ষণ শুধু চেয়ে থাকেন। সিনেমা হলে গিয়ে প্রবেশ না করে চলে আসেন। বাড়ি ফেরার পথে মামলার কাগজ-পত্র টাকা পয়সা সবকিছু মাস্টার সাহেবকে দিয়ে দেন। এভাবে দৈহিক প্রেরণাজাত চাহিদাকে দমন করতে আরম্ভ করেন।

অত্যধিক প্রেরণার দরুন ক্রমশঃ তিনি আহার-নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সর্বভোলা হয়ে গেলেন। মাথায় অনেক পানি ঢালার পরও শান্ত অবস্থা ফিরে আসে না। বড় ছেলের এহেন অবস্থায় পিতা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক রাত্রে তিনি চিন্তাযুক্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন হযরত সাহেব কেবলা পার্শ্বে এসে বলছেন, "আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আমার হরিরী রঙয়ের ক'বা অর্থাৎ জুব্বাটা তাঁর গায়ে পরিয়ে দেন"। তাড়াতাড়ি রওজা শরিফ সংলগ্ন স্মৃতি-ঘর হতে জুব্বাটা খুঁজে এনে ছেলের গায়ের উপর চড়িয়ে দিয়ে তিনি আপন হুজরায় প্রবেশ করেন। একটু তন্দ্রা আসলে অনুভব করেন, কে যেন হুজরার দরোজা খুলতে চেষ্টা করছে। উঠে দেখেন ছেলে। কক্ষে ঢুকে তাঁর পাশে শুয়ে পড়েন। রাত গিয়ে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু ঘুম আর ঘুম; জেগে উঠলে তাঁর অবস্থা প্রায় শান্ত। স্নান ও আহার করিয়ে পুনঃ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। এবারও সারারাত এবং পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ। কিছুদিন পর তিনি পুনঃ ভাব-বিভোর হয়ে যান।

তখন হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফে জিকির মাহফিল হতো। সে রাত্রে চট্টগ্রাম হাটহাজারী থানার ধলই নিবাসী মরহুম আবদুল গণি ফকির, মরহুম আবদুর রহমান মুন্সীসহ বহুলোক মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। জিকির শেষ হলে তাঁরা রওজা শরিফে তাযিমী সেজদা করেন। ঠিক সে সময় তিনি রওজা শরিফের দরোজায় উপস্থিত হন। সকলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন 'নামায কালাম না পড়ে কীসের এত নাচানাচি। আবার সেজদা কেন'? বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে যাকে সামনে পেলেন মারলেন। যে যেদিকে পারেন ছুটে গিয়ে তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করেন। তিনি ছেলেকে হুজরায় ডাকেন। হুজরায় সকল দরোজা-জানালা বন্ধ করে দেন। তারপর পিতা-পুত্র প্রশ্ন উত্তরে আলাপ শুরু। পুত্র জিজ্ঞাসা করেন, "হযরত কেবলা কে? বাবাজান কেবলা কে'? পিতা জবাব দেন, "আল্লাহ্‌র অলি – দু'য়ে মিলে এক"। পুত্র আবার প্রশ্ন করেন, "আপনি কে? তিনি উত্তর দেন, 'আমি হযরতের অছি' এবং বাবাজান কেবলার ফয়েজপ্রাপ্ত। তাঁরা আমার মধ্যে আছেন"। পুনঃ কী যেন প্রশ্ন করলেন (অশ্রুত)। এতে পিতা উচ্চস্বরে (রাগত) বলেন, "আমাকে এখনো চিন নি? আমি কে তা কী দেখবে"? তারপর অনেকক্ষণ নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ।

দরোজা খুলে দিলে বাইরে অবস্থানরত লোকেরা দেখে পিতার মুখমণ্ডল রক্তিম লালিমাময়। পুত্র দু'হাতে ভর দিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন, ভীত-বিহ্বল, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। পিতা খাদেমদের নির্দেশ দিলেন, "ওকে আন্দর বাড়িতে নিয়ে যাও"। ধরাধরি করে তাঁকে মায়ের বিছানায় নিয়ে শোয়ানো হলো। ছেলের অবস্থায় মা রুদ্ধবাক্। সেবিকারা মাথায় পানি ঢালতে লাগলো। বহুক্ষণ পর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেন। কিন্তু রাত্রে ঘুম হয় না। এ ঘর ও-ঘর ছোটাছুটি করেন। বাবার হুজরায় গিয়ে বারবার ডাকতে থাকেন। পিতার স্নেহভরা কণ্ঠ, 'ঘুমুতে যাও'।

পরদিন বিকালে তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। প্রায় দু'ঘন্টা মাথা উঠাবার লক্ষণও নেই। বাবা খাদেমদের নির্দেশ দেন, 'উঠিয়ে দোকানের চেয়ারে বসিয়ে দাও'। চেয়ারে বসালে ঢলে পড়তে দেখে ওমর আলী ফকির ও খাদেম হাবিবুর রহমান পাঁজাকোলা করে অফিস কক্ষে এনে শুইয়ে দেন। আন্দরবাড়িতে খবর গেলে মা ও অন্য মেয়েরা কাঁদতে লাগলেন। অফিসের সামনে বহু লোক জমায়েত। সন্তানের এমনি করুণ অবস্থা দৃষ্টে পিতা অঝোরে কাঁদেন। ফলে উপস্থিত লোকেরাও কাঁদতে থাকেন। পিতা আবেগ ভরে বলতে লাগলেন, "আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করাতে মন একটু গরম হয়। যে শক্তি আমি তার উপর ঢেলেছি মণির পাহাড়ে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ঢাললে সে পাহাড় টলে যেতো; সাগরে দিলে সাগর জলশূন্য মরুভূমি হয়ে যেতো। আমার রক্তের বাণ (উত্তরাধিকারী) বলে এখনো টিকে আছে"। মধ্যের কামরায় সারারাত পানির ধারা দেওয়া হয়। সকালে হুঁশ হলে মাকে বলেন, "মা আমার সিনা (বক্ষ) জ্বলে-পুড়ে একেবারে কয়লা হয়ে গেছে"। হযরত সাহেব কেবলার স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি স্বীয় পিতা এভাবে খোদাদাদ শক্তি দ্বারা তাঁর সিনা চাক্ করেন। অজ্ঞাত জ্ঞান ধারণের জন্য প্রত্যেক নবি ও অলির সিনা চাক্ স্রষ্টার এক বিশেষ কৃপা। প্রথম 'ওহী' অবতীর্ণ হবার পূর্বে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত মোহাম্মদ (দ.)-কে আলিঙ্গন করে সিনা চাক্ করেন।

পৌষের কন্কনে শীত; ঠাণ্ডায় মানুষ ঘরে লেপ-কাঁথার ভিতরেও টিকতে পারে না। পৌষ-মাঘের এমনি শীতে আন্দর বাড়ির পুকুরে ঘন্টার পর ঘন্টা কখনো একটানা ক'দিন পানিতে ডুবে থাকতেন। বাড়ির পশ্চিমে লোহার খালেও কখনো

কখনো নাক দেখিয়ে পড়ে রয়েছেন। ছায়াঢাকা ঐ খালে দিন দুপুরেও অত্যধিক ঠাণ্ডার দরুন কেউ নামতে চায়না। দেহকে কন্‌কনে শীতের ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে তিনি কি নিজ ক্রোধের আগুন নিঃশেষ করেছিলেন? আবার জলেরই তো অপর নাম জীবন। তবে কি জলের মধ্যে মহাজীবনের উপাদান খুঁজছিলেন? নাকি নিয়েছেন স্রষ্টার সর্বব্যাপী জ্ঞানের শিক্ষা। যেহেতু কোরআনের ঘোষণা: "তিনি (আল্লাহ্) জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জিনিসে ব্যপ্ত রয়েছেন" (সূরা তোয়া-হা : ৯৮)। অত্যধিক ঠাণ্ডায় শরীর ফ্যাকাসে সাদা হয়ে যেতো। পর পর কয়েকটি শীতকাল তাঁর এমনি কষ্টকর সাধনায় কেটেছে।

আমি কে? এ প্রশ্ন সাধক মনের এক বিরাট জিজ্ঞাসা। যত দুঃখ শোক দৈন্য-অভাব অতৃপ্তি তার মুখ্য কারণ 'আমি বা আমার'। 'আমি' না থাকলে ওসব কিছুই থাকে না। কোরআন শরিফে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, "লিল্লাহি মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্" অর্থ: "বিশ্বের সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র, আমার নয়"। তিনিই সব, আমি (মানুষ) তাঁর আনন্দময় একটি সুন্দর প্রকাশ মাত্র। এই আমিত্বের চেতনা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টাই মহত্ত্বর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সাধক জিয়াউল হক আমিত্ব বর্জনের সংগ্রামকে ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। পৌঁষের এক বিকেল। ঘর হতে বের হয়ে তিনি রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগলেন। গায়ে একটি মাত্র গেঞ্জি। খাদেম আবদুল মালেককে তাঁর পিতা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে বললেন। বড় রাস্তায় উঠে তিনি সোজা পশ্চিমমুখী চলতে লাগলেন। বাড়ি ফিরে যাবার অনুরোধ করলে আজিম নগর পর্যন্ত গিয়ে ফিরবেন বলে জানান। কিন্তু আজিম নগর পৌঁছে হাঁটার গতিবেগ বৃদ্ধি করেন। নাজিরহাটে শত অনুরোধেও ফিরতে রাজী হলেন না। কাটিরহাটে দরবার ভক্ত অনেক লোক বাধা দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন; কেউ জানে না কোথায় তাঁর গমনের লক্ষ্যস্থল। খাদেমও পিছে পিছে ছুটতে থাকে। তীব্র শীত। তার উপর অঝোরে কুয়াশা ঝরছে। পথঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারিয়া মাদ্‌রাসার নিকট পৌঁছলে যাত্রা বিরতি করে খাদেমকে রাস্তায় শুতে বলেন। খাদেম শুয়ে পড়লে তিনি তাকে বালিশের মতো মাথা দিয়ে শয়ন করেন। ঠাণ্ডায় উভয়ে টির্ টির্ করে কাঁপছেন। কিছুক্ষণ পর উঠে হাঁটতে গেলে পা চলেনা, ফুলে গেছে। খাদেম নিজ বাহুতে তাঁর বাহু জড়িয়ে পাশাপাশি ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। হাটহাজারী বাস

স্ট্যান্ডে পৌঁছলে ভোরের আলো ফুটে উঠে। তিনি চা পান করতে চাইলেন। একটা দোকানে সবেমাত্র আগুন জ্বেলেছে। কিন্তু কারো কাছে পয়সা নেই। আবদুল মালেক চা দোকানের মালিকের নিকট মাইজভাণ্ডারীর আওলাদ পরিচয়ে বাকিতে চা চাইলেন, দাম পরে পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। দোকানদার রাজি হয়ে তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে দেন। চায়ের কাপে এক গ্লাস পানি ঢেলে তা পান করেন। দোকানদার শহরে পৌঁছার ব্যবস্থা করে তাঁকে বাসের সামনের আসনে বসিয়ে দেন। হাটহাজারী বাজার থেকে অল্প দক্ষিণে দরোজা খুলে বাস থেকে নেমে আবার হাঁটতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা করেও আর বাসে উঠানো সম্ভব হলো না। হাঁটতে হাঁটতেই বিকাল তিনটার সময় চকবাজার প্যারেড মাঠে গিয়ে বসে পড়েন। বসেছেন তো বসেছেনই; উঠবার নাম নেই। মাঠের পূর্ব কোণায় তাঁদের বাসা। কোন দিকে চলে যাবার ভয়ে খাদেম বাসায় গিয়ে খবর দিতে পারছে না। দরবার শরিফ থেকে তাঁদের দু'জনের কাপড় চোপড় দিয়ে ইতিমধ্যেই দু'জন লোক শহরে পাঠানো হয়েছে। তারা ঘোড়ার গাড়ি–টম্ টম্ নিয়ে সারা চট্টগ্রাম শহরে খুঁজে বেড়ায়। সন্ধ্যা পাঁচটার সময় টম্ টম্ শেষবারের মত বাসার দিকে যেতে দেখে খাদেম আবদুল মালেক ডাক দেয়। সবাই মিলে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বাসায় নিয়ে যান। খাদেমকে আলাদা ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তাঁকে মধ্যের কক্ষে দুজনের পাহারায় শোবার জন্য বিছানা করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যারাতেই তিনি শুয়ে পড়েন। পাহারাদারদের অসতর্ক মুহূর্তে কখন যে তিনি বের হয়ে গেছেন কেউ টেরও পায় নি। খাদেম আবদুল মালেককে জাগিয়ে তোলা হল। সবাই মিলে পরামর্শ করে সবদিকে ছুটলো। ষোলশহর স্টেশনে তিনি ট্রেনে বসে আছেন। ট্রেন ছেড়ে দিতে দৌড়ে হাতল ধরতেই মালেককে জোরসে এক লাথি। হাত ফসকে পড়ে যেতে দরজায় দাঁড়ানো যাত্রীরা তাকে ধরে ফেলে। সুবোধ বালকের মতো আবার যথাস্থানে গিয়ে বসে পড়েন। চৌধুরীহাট স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যান। সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। পা ফেটে রক্ত ঝরছে; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। সন্ধ্যার পূর্বে দরবার শরিফ এসে পৌঁছলে পিতা ছেলের অবস্থা দেখে মহাচিন্তিত।

আরেকবার কাউকে কিছু না বলে একা শহরে চলে যান। খোঁজখবর নেবার জন্য একই খাদেমকে পাঠানো হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নাজিরহাটগামী রাত দশটার ট্রেনে তাঁকে পাওয়া যায়। তখন আষাঢ় মাস, ঝর ঝর একটানা বৃষ্টি

পড়ছে। রাত সাড়ে বারোটায় গাড়ি নাজিরহাটে পৌঁছে। হালদা নদীর পাহাড়ী ঢলে রেল লাইন ডুবে গেছে। ট্রেন থেকে নেমেই তাঁরা হাঁটতে লাগলেন। বন্যার স্রোতে অনেকক্ষণ সাঁতরে নাজিরহাট বাজারে পৌঁছেন। ঘনঘোর অন্ধকার, বন্যা ও বৃষ্টি। কোথাও জনমানবের চিহ্নও নাই। তবুও তিনি হেঁটে চলেছেন। একটা বাতি নিতে চাইলে খাদেমকে প্রহার করতে উদ্যত হয়ে বলেন, 'আল্লাহ্ আছে না, বাতি চাও কেন'? মাইজভাণ্ডার শরিফের অল্প পশ্চিমে লোহার পুলটা পানিতে ভেসে গেছে। এতদূর এসেছেন কোথাও কোমর কোথাও বুক পর্যন্ত পানি ভেঙ্গে। গতি থেমে যায়। বললেন, 'চলো, একসাথে সাঁতার দিই'। অগত্যা তাই করা হলো। শন খোলার পাশ দিয়ে যখন রাস্তায় উঠলেন তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। তিনি বহুবার বাড়ি থেকে পঁচিশ মাইল দূরত্বের চট্টগ্রাম শহরে হেঁটে আসা-যাওয়া করেন। একবার ৫/৬ দিন নিখোঁজ হয়ে যান। ফটিকছড়ি থানার কাঞ্চনপুরে গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ টিলা থেকে খবর পেয়ে তাঁকে আনা হয়।

সাধক জিয়াউল হক ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে সূর্যের প্রখর চোখ ঝলসানো আলোর প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ধ্যানী সাধক সূর্যের মাঝে সন্ধানী দৃষ্টিতে কী খুঁজেছেন? স্রষ্টাকে? হতেও পারে। আবার অঢেল শক্তি সমাবেশ থেকে আপন অস্তিত্বে শক্তি আহরণও হতে পারে। সূর্য থেকে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি গ্রহণ করে তিনি কি নিজেকে আলোর ভাণ্ডাররূপে গড়ে তোলেন?

পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য। আমাদের খাবার-দাবারে যে শক্তি তা সূর্য থেকেই ধার করা। গাছপালায় কাঠে বা পাতায় অথবা কয়লা তেল ও গ্যাসের আকার খনিতে জমা যে জ্বালানি শক্তি, তাও আসলে সূর্য থেকে পাওয়া, রাসায়নিক শক্তির আকারে মাটির নিচে বন্দি। অধুনা সূর্যালোককে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্দি করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার-পদ্ধতি উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

রাতের কালো আঁধারে এবং জোৎস্নায় একা দাঁড়িয়ে অসংখ্য রাত্রি কার অভিসার অপেক্ষায়? ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝাঁঝালো শব্দ অথবা জোনাকির আলো ক্ষণিকের জন্য তাঁর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেও ধরে রাখতে পারে না। দৃষ্টি চলে যায় আকাশের পানে, নীলিমার সীমানা পেরিয়ে তারকাপুঞ্জে-বিচ্ছুরিত আলোর মেলায়, যে নক্ষত্রমালার কসম খেয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বহু সত্য প্রকাশ করেছেন। তবে তারকাও কি মহাসত্যের কোন রহস্য? বিজ্ঞানীরা বলেন, এক

একটি তারকা সূর্যের চেয়ে অনেক বড়। দীর্ঘ দূরত্বের জন্য ছোট দেখায়। আবার এমন তারকাও আছে যাদের আলো এখনো পৃথিবীতে পৌঁছে নি। সাধকের দৃষ্টি আরো উপরে সপ্ত আকাশ ছাড়িয়ে চলে যায় আরশ-আজীমে যেখানে মহা-সত্যের স্বরূপ অধিষ্ঠান।

তথ্যসূত্র: (ক) খাদেম কবির আহমদ, পিতা– মরহুম ফজলুর রহমান, গ্রাম– ফরহাদাবাদ, থানা– হাটহাজারী, জেলা– চট্টগ্রাম। (খ) খাদেম ওমর আলী ফকির, পিতা– মরহুম আব্বাস আলী, গ্রাম– বৈলতলী, থানা– চন্দনাইশ, জেলা– চট্টগ্রাম। (গ) খাদেম আবদুল মালেক, গ্রাম– মোহাম্মদপুর, থানা–রাউজান, জেলা– চট্টগ্রাম।

চরণ সেবায় উৎসর্গ

ভাব-বিভোরতা বাড়তেই থাকে। আত্মীয়-স্বজন পিতামাতাকে পরামর্শ দিলেন, বিয়ে হলে হয়তো ছেলে সংসারমুখী হয়ে উঠবে, কমে যাবে ভাব-বিভোরতা। বিবাহের উপযুক্ত বয়স; তাই বিয়ে করানোও প্রয়োজন। পিতা চিন্তা করলেন, এমন ছেলেকে কে আবার মেয়ে দেবে! তবু খোঁজ খবর নেওয়া হল। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি মেয়ে দিতে প্রস্তাব দিলেন। সেখানে আত্মীয়তায় পরিবারের সকলে রাজি। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে তিনি নিজ মত পরিবর্তন করেন। এ'তে সকলে মনঃক্ষুণ্ন হয়। পরে ফটিকছড়ি থানার দাঁতমারা ইউনিয়নের প্রখ্যাত জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সিকদার সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ মনোয়ারা বেগম সম্পর্কে আলোচনা হয়। এক বৎসর পূর্বে সিকদার সাহেব একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, তাঁর একটা মেয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ বিয়ে দিলে হাশরের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর মুক্তির সুপারিশ করবেন। সে চিঠি তখনই দরবারে পাঠানো হয়েছিল। যোগাযোগের অসুবিধা ও অত্যধিক দূরত্বের জন্য প্রথমে সে চিঠির গুরুত্ব নিয়ে কেউ তেমন চিন্তা করেন নি। অবশেষে মৌং সৈয়দ মাহ্ফুজুল করিম সাহেবের প্রস্তাবে আলোচনা গতিলাভ করে। দৌলতপুর নিবাসী মেয়ের মামা আলতাপ মিয়া চৌধুরীকে সংবাদ দিয়ে আনা হয়। প্রাথমিক আলোচনা শেষে চৌধুরী সাহেব দিন তারিখ ঠিক করে দাঁতমারা গেলেন মৌং মাহ্ফুজুল করিম সাহেবও সঙ্গে যান। এ প্রস্তাব সিকদার সাহেব আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। অলংকারপত্র ও কাবিননামার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে সিকদার সাহেব বলেন, "মুনিবের দরবারে আমার মেয়েটা কবুল হলে অধীন চির-কৃতার্থ

হই। আমার সেবা যেন চিরদিন অটুট থাকে। ভক্তের কিসের দাবী-দাওয়া”। কার্তিক মাসের পনের তারিখ রোববার শুভ-করার (নিশান) অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়। এ আত্মীয়তার ব্যাপারে বরও সম্মত ছিলেন।
সিকদার সাহেব হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর মুরিদ ছিলেন। হযরতের উরস্ শরিফে তিনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দরবারে আসার সময় বিছানাপত্রসহ নিজ প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি সঙ্গে নিয়ে আসতেন এবং পূর্বের চাষ বাড়িতে থাকতেন। হজ্ব করে আসার পর তিনি স্বীয় বাড়ির পরিবর্তে মসজিদের পাশে একখানা পর্ণ-কুটিরে ইবাদত-বন্দেগীতে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। তিনি দৈনিক শুধু একবেলা আহার করতেন। মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবে তিনি ভীষণ ভয় পান। নিজ পীর সাহেব – যাঁকে তিনি আজীবন ‘বাবাজান’ ডেকেছেন, তাঁকে বেয়াই বানিয়ে একই চাদরে বসবেন – এ যে অকল্পনীয়! তাই আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, “হে খোদা, আমাকে বাঁচাও; মুর্শিদকে বেয়াই জেনে আমি যেন দোজখী না হই”। তাঁর আবেদন বৃথা যায় নি। শুভ-করার অনুষ্ঠানের চারদিন পূর্বে এগার কার্তিক, ১৯৫৪ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তারিখ ঠিক রাখার জন্য পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে যান। শোক প্রশমনের জন্য দরবারের উপদেশ মতো এক সপ্তাহ পরে নিশান-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের তারিখ ধার্য হয়– চৌদ্দ মাঘ; তেরশ’ বাষট্টি বাংলা।

আটাশ জানুয়ারি; উনিশ্‌শ’ পঞ্চান্ন সাল, মঙ্গলবার।
বিয়ের দিন বিকাল ২টায় চারখানা মোটর গাড়িতে করে বরযাত্রী রওয়ানা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে নারায়ণ হাটে সকল বরযাত্রী একত্রিত হন। এখানে দরবারের আত্মীয় সালেহ আহমদ চৌধুরী নিজ বাড়িতে সকল বরযাত্রীকে চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তখন রাত নামে। বরকে তথায় চৌদুলে বসানো হয়। চল্লিশটি হ্যাজাক (পাম্প লাইট) বাতি জ্বালিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে দশদিক মুখরিত করে যেন কোন রাজা নৈশ উৎসবে চলেছেন। অগ্রবর্তী দল কিছুদূর যাওয়ার পর খবর আসে চৌদুলে বর নেই। বরের পিতার গাড়িখানা তখন কাদায় আটকে ছিল। গাড়ি তোলার ব্যবস্থা করতে বলে বরের ছোট মামা শাহ্‌জাদা সৈয়দ শফিউল বশর সাহেব ও মৌং মাহ্‌ফুজুল করিম সাহেব টর্চলাইট নিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যান। খুঁজতে খুঁজতে বরকে একটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া যায়।

তিনি জঙ্গলের মধ্যে দিব্যি বসে আছেন। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবাজী এখানে কেন"? তিনি বললেন, "অনেকক্ষণ বসতে বসতে কোমড়ে ব্যাথা লাগছে; তাই হুট করে নেমে পড়লাম"। আবার বর সহ ব্যান্ডের তালে রস-ঘন আলাপনে বরযাত্রী এগিয়ে চলে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় ব্যান্ডের শব্দে রাস্তার দু'পার্শ্বে অসংখ্য কৌতূহলী জনতা দাঁড়িয়ে স্বাগত জানায়। বরযাত্রীরা দাঁতমারা সাহেবের হাটে পৌঁছলে সিকদার সাহেবের বড় পুত্র জনাব আবদুল মালেক চৌধুরী অভ্যর্থনা জানিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান। রাত বারোটার পূর্বে আক্‌দ সম্পন্ন হয়। মৌলভী সাহেব বিয়ের সম্মতি চাইলে বরের কোন সাড়া নাই। তিনি আনমনা, বিভোর। ভগ্নিপতিরা চেষ্টা-তদবির করে অবশেষে সম্মতি নেন। তারপর সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়।

আনন্দঘন পরিবেশে রাত কাটিয়ে সকালে নাস্তা সেরে নববধূ নিয়ে বরযাত্রী দল বাড়ি মুখে রওয়ানা হয়। বিয়ের সাজসজ্জাসহ তিনি রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর দিকে লবণ গুদামে গিয়ে ঢুকেন। কোথায় বর-বধূর প্রথম দর্শন শাহ্ নজর। কোথায় সে শিহরিত পরশ! কুসুমিত মন, সুরঋিণ আনন্দে ভীরু কম্পিত হস্তে যে চরণ ছুঁয়ে আত্ম নিবেদন করবে, সে চরণ যে আলোছায়া! যে চোখে উল্লাসের বিদ্যুৎ চমকাতো, সে চোখে অজান্তেই নামে শ্রাবণের ধারা। নববধূ তবু ভাবে, 'যেখানে যত দূরেই থাকুক, আমি যে তাঁর চরণ সেবায় উৎসর্গ'।

বিয়ের এগারদিন পর নববধূকে বাপের বাড়িতে ফিরতি নাইওর নিতে আসেন বধূর ভগ্নিপতি জনাব বদিউল আলম চৌধুরী। বর বলেন, "আজ নয় কাল যাবেন, আজ ভাল হবে না"। তবু পীড়াপীড়ি করাতে শ্বশুর অনুমতি দেন। গাড়িতে চড়ে মাইজভাণ্ডার শরিফের অল্প পশ্চিমে লোহার খালের পুলে উঠতেই জীপের দু'চাকা রাস্তায় এবং সামনের চাকাগুলো বাইরে পড়তে যাচ্ছিল। চালক কষে ব্রেক ধরে, কিন্তু অনেকটা হুঁশহারা। লোকজন দৌড়ে এসে বড় বাঁশের ঠেস দিলে গাড়ি পেছনে চলে রাস্তায় উঠে আসে। বিপদ কেটে যায়। সেখান থেকে গাড়ি দরবার শরিফ ফিরে আসে। সেদিন আর যাওয়া হল না। পরদিন অনুমতি পেয়ে যান।

স্ত্রীর প্রতি দু'বছর কোন আকর্ষণই ছিল না। সর্বদা দূরে দূরে থাকতেন। তখন তিনি খুবই শান্ত ছিলেন। অনাসক্তির দরুণ স্ত্রীকে ভাইয়েরা কিছুদিন বাপের বাড়িতে আটকে রাখেন। অথচ বোন চলে আসতে আগ্রহী। বড় ভাই আবদুল

মালেক চৌধুরী তখন স্বপ্নে দেখেন, বাবা তাঁকে মারতে দৌড়াচ্ছেন। মাওলানা মাহ্ফুজ সাহেব খবর আনতে গেলে তাঁর সঙ্গে গাড়িতে করে চলে আসেন। তাঁদের প্রথম কন্যা সন্তান হয়। মেয়েটার প্রতি পিতা কখনো ফিরে তাকান নি। কেউ কোলে দিতে চাইলে বলতেন, "পরের মেয়ে কোলে নিয়ে কী লাভ? ওখানে ফেলে রাখুন। উই পোকা খেয়ে ফেলবে"। মেয়েটা মাস দু'য়েকের মধ্যে নানার বাড়িতে মারা যায়। মৃত্যু সংবাদ পৌঁছার পূর্বে তিনি ও মাওলানা শামশুল হুদা (র.) সাহেব একত্রে রওজা শরিফ মাঠে এক টুকরা কাঠের জানাযা পড়ে গর্ত করে লাশের মত দাফন করেন। তাঁদের পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র : সৈয়দা জেব-উন-নাহার বেগম, সৈয়দা হোমায়রা বেগম, সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান, সৈয়দা কুমকুম হাবিবা, সৈয়দা উম্মে মুনমুন হাবিবা, সৈয়দা নূরে আসমা কানিজ ফাতেমা। সকলের ভাল ঘর ও বরে বিয়ে হয়েছে।

দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী নিজেকে মনেপ্রাণে স্বামী সেবায় নিয়োজিত করেন। বেদনার্ত মুহূর্তগুলো স্নেহময়ী শাশুড়ি গভীর মমতায় ভুলিয়ে দিতেন। শ্বশুরের কাছ থেকেও পেয়েছেন অত্যধিক স্নেহ। স্বামী জজ্‌বা হালে থাকলে ভীষণ রাগান্বিত হতেন। আবার শান্ত অবস্থায় সুমধুর ব্যবহারে হৃদয় আকুল করতেন, যা তুলনাহীন গভীর প্রেমময়। কষ্টকর কোন কাজ করতে এবং রান্না ঘরে যেতে নিষেধ করতেন, সব কাজ সেবিকাদের দিয়ে করাতে বলতেন। কখনো চা চাইলেন তো, সারারাত চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিকে খেয়ালই নেই। চোখে ঘুম নামলে কতো অসতর্ক মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়েও গেছেন। স্বামীর খেয়াল হলে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। এ বাড়িতে আসার পর একদা তাঁকে মূল ভবনে থাকতে নিষেধ করে পেছনের স্যাঁতস্যাঁতে নড়বড়ে বেড়ার ঘরে থাকতে বলেন। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা বলে সেবিকা মেয়েদেরও সে ঘরে থাকতে দেওয়া হয় না। তবু স্বামীর নির্দেশ পালন করেন। দু'বছর পর স্ত্রী পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকা পেলে অনুমতি নিয়ে সেখানেই একটি পাকা ঘর নির্মাণ করেন। মা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে ভবনে থাকেন। শত দুঃখ-কষ্ট এভাবেই আশীর্বাদে পরিণত হয়। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে এমনি অসংখ্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছে।

স্বামীর খাদ্য পছন্দের কথা বলতে গিয়ে স্ত্রী বলেন, বড় চিংড়ি মাছ, মিষ্টি আচার, দৈ, মাখন, ভাজা চীনা বাদাম ও ডিমের পুডিং খেতে তিনি ভালোবাসতেন।

স্বামীর বর্তমানে ও অবর্তমানে এই মহিয়সী মহিলা নিজ সন্তানদের লালন পালন, সুশিক্ষা ও পারিবারিক দায়িত্বের সাথে মন্‌জিলের অভ্যন্তরীণ গুরু দায়িত্বও পালন করেন। মেয়ে ভক্তদের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা ধৈর্য সহকারে শুনে সমাধানের সুপরামর্শ দান, দরবারে আর্জি ফরিয়াদ ও দোয়া করেন। শাহানশাহ্ বাবাজানের পরশধন্য এই পূতঃপবিত্র সেবিকা মন্‌জিলে আগত বিপুলসংখ্যক মেয়ে পুরুষদের আদর আপ্যায়ন, থাকা খাওয়া, খোঁজখবর নেওয়া ইত্যাদি হাসিমুখে সম্পন্ন করে মমতাময়ী মায়ের ভূমিকাই পালন করেন। স্বামীর ওফাতের পর ভক্তদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা, বিপুল ব্যয়ে রওজা শরিফ নির্মাণ, মন্‌জিলের প্রচার প্রসার ও উন্নয়নে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও প্রায়োগিক কৌশল এক অনন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সাংগঠনিক গুণ ও অনুপম চরিত্রে তিনি দরবারী মহলে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

এ কন্যার মাধ্যমে পিতার সেবার আর্জি-বাসনা পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ এ অনন্য পিতাকে জান্নাতবাসী করুন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র রক্তের ধারা এ পুণ্যবতী মহিলার মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে। উত্তরসূরিদের মাঝে এই মা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। মহান অলি-উল্লাহ্‌র সহধর্মিণী এই ভাগ্যবতী মহিলা পরবর্তীকালের লক্ষ কোটি মানুষের শ্রদ্ধাস্পদ মহীয়সী মা'জান; অগণিত ভক্তের প্রার্থিত শুভাশীষ।

জীবন মরণ পায়ে দলে

প্রত্যেক কিছুর নির্দিষ্ট গতি ও লক্ষ্য থাকে। সাধকের গতি ও লক্ষ্য স্রষ্টার নৈকট্য লাভ। আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ও নিষেধকে ত্যাগ করে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁদের খেয়াল বন্ধু কী চান? তাঁরা বন্ধুর ইচ্ছাকে সর্বোপরি স্থান দেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনেই রাখেন না। থাকলেও দমন অথবা ধ্বংস করে দেন। কারণ কামনা বাসনার বশবর্তী ইবাদত-বন্দেগী গ্রহণযোগ্য নয়। সাধক প্রেমের সাগরে ডুবে সবকিছু এমন কী নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত ঋণলে যান। গতির পথে সমস্ত সৃষ্টি এমন কি ফেরেশ্‌তারও সীমাবদ্ধতা আছে। কেবলমাত্র মাটির মানুষই শেষ সীমা অতিক্রম করে অসীম স্রষ্টার সাথে মিলতে পারে। এজন্য আল্লাহ্‌র বাণী "সম্পর্ক শুধু তাঁরই (আল্লাহ্) সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন" (সূরা যুখ্‌রুফ : ২৭)।

প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সাধক জিয়াউল হক সসীমতা অতিক্রম করে অসীমে বিলীন হতে চান। একদা প্রজ্বলিত হারিকেনের সল্‌তেটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে খেলা করতে দেখে মা তাঁকে তিরস্কার করেন। এতে আপন কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়েন। খাদেম হাবিবুর রহমানকে সেদিকে যেতে দেখে বলেন, আমার পাগুলো টিপে দাও তো। হাবিবুর রহমান পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠে, যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ। দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে বড় দাদার সমস্ত শিরা উপশিরা উপরের দিকে কিসে যেন টানছে। ছেলের এমনি অবস্থা দেখে মা দিশেহারা। তেল মালিশ করতে কেঁদে কেঁদে তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, 'আমার ছেলে ছোটকাল থেকে কখনো কষ্ট করে নি। আমার পিতার মতো (বাবা ভাণ্ডারী) পাহাড় পর্বত, বন-জঙ্গলে কষ্ট করতে পারবে না। রিয়াযত যা কিছু করতে হয়, আমার সামনেই যেন করা হয়'। মায়ের এ আবেদন বৃথা যায় নি।

দু'শ বিশ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্‌ খেলে মানুষ বাঁচে না। এমন কিছু মানুষও আছেন যাঁরা নিজ দেহে ধারণ করেন বহু ভোল্টের শক্তি। অবশ্য যদি কোন শক্তিশালী কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ থাকে। মাইজভাণ্ডার শরিফ তেমনি এক অনন্ত শক্তিভাণ্ডার। সৈয়দ জিয়াউল হক এ মহাকেন্দ্রের সাথে শুধু সংযুক্ত নন বরং কেন্দ্রীভূত। তাই এ সাধকের সারা দেহ জুড়ে আলোর অনিঃশেষ গতি প্রবাহ।

লবণ গুদামে দাঁড়িয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের দিকে তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। এ সময়ে একটানা দু'দিন চারদিন কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতেন না। কখনো এক পায়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন। সারাদিন কখনো এক হাত বাড়িয়ে কোমর পানিতে ঠেকিয়ে, হাত, পা ও মাথা আলগা করে নৌকাকৃতি হয়ে কত সময় যে কাটিয়েছেন তার হিসাব কারো জানা নেই। আবার দাঁড়িয়ে দেহকে একদিকে বাঁকা করে এবং মাথাকে পায়ের কাছে ঠেস ছাড়া নিম্নমুখী করে শরীরকে নজিরবিহীন কষ্ট দিয়েছেন। তাঁর ধূমপানের অভ্যাস ছিলো। অর্ধদগ্ধ সিগারেট কানে গুঁজে মাথায় রেখে অথবা সিগারেট পুড়তে পুড়তে অবশেষে হাতের আঙ্গুলও পুড়েছে, খেয়াল নেই। কান, মাথা ও হাতে বহু পোড়া দাগ ছিল। কোন্‌

সুন্দরের প্রেমে তিনি এমন বিভোর হয়েছিলেন? সে কোন্ মোহিনী রূপ? নিজ অস্তিত্ববোধও যাতে লোপ পায়। লবণ গুদামে তিনি আট মাস অবস্থান করেন।
একবার নিজ কক্ষে দরোজা-জানালা বন্ধ করে দীর্ঘ আঠার দিন খাদ্য পানীয় ছাড়া কাটিয়েছেন, এমনকি পায়খানা প্রস্রাবও করেন নি। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও বুঝা ভার। মা'র মন কি মানে? ছোট মামা শাহ্জাদা সৈয়দ শফিউল বশর সাহেবসহ অনেক চেষ্টা করে দরোজা খোলা হয়। গায়ের রঙ এক প্রকার হলুদ-বর্ণ ধারণ করে। দেখেই মা কেঁদে উঠে বলেন, এ যে আমার বাবাজান! কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে কোন উত্তর নেই। দাঁতগুলো সেঁটে গেছে। মার সেবা শুশ্রুষায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন।
এক রাত প্রায় দেড়টায় পিতা খেয়াল করলেন, ছেলের কক্ষের দরোজা খোলা। খাদেম মালেক পেছন পেছন ছিল। মালেককে বললেন, বড় মিয়া কী করে দেখতো। ঘরে ঢুকতেই পায়ে ভেজা ঠেকলো। ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেখা গেল পাকা চত্বরে রক্তের ধারা। জিজ্ঞাসিত হলে জানান, পায়খানা হচ্ছে। রক্ত আমাশয়। তখনি আবারও পায়খানা করলেন। পায়খানা হচ্ছে? আমাকে বল নি কেন? পিতার স্নেহপূর্ণ জিজ্ঞাসায় উত্তর দিলেন, দূষিত কী যেন বের হচ্ছে। ভাল হয়ে যাবো। রোগ কবে হয়েছে কেউ জানে না। সকালে ডাক্তার এনে চিকিৎসা করা হয়।
খাদেম ওমর আলী ফকির বলেন, খিরামে খামারের জন্য জমি দেখতে বড় মিঞাও যেতে চায়। পিতা বাড়ির একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রওয়ানা হন। আলমারীর বাসন পেয়ালা ভেঙ্গে তছনছ করে তিনি কীভাবে বের হয়ে হুলস্থুল করলে অন্য একটি গরু গাড়িতে করে খিরাম কাফেলায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। পিতার সন্দেহ কেউ তালা খুলে দিয়েছে। বাড়ি ফিরে পুনঃ তালা দিয়ে চাবি নিজের কাছে রেখে দিলেও তিনি কতক্ষণ পরে বের হয়ে আসেন। অথচ তালা বন্ধই ছিল। কিছুদিন হাতের কাছে যা পেতেন পুড়ে আগুন জ্বালাতেন। ঘরে লেপ-তোষক, কাপড়-চোপড় সবকিছু পুড়ে পুড়ে দেখতেন। কেউ বাধা দিলে পেটাতেন। পিতাকেই শুধু ভয় করেন। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে গেলে কুঁদা দিয়ে বেঁধে রাখা সাব্যস্ত হয়। নানুপুরের ভোলা মিস্ত্রী বলেন, কুঁদা তৈরি শুরু করতে কুড়ালের আঘাতে পা কাটলে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিই। পরে এক হিন্দু মিস্ত্রী কুঁদা তৈরি করে।

সাধনার সব ধাপ পেরিয়ে

"আমার দিগন্ত বিস্তারী উন্মত্ত তাড়নার সম্মুখে
ফিরিশ্‌তা জিব্রাঈল একটি সামান্য শিকারমাত্র।
হে মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষের শক্তিময় প্রকাশ
তোমার ফাঁস দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরো" –ইকবাল

'তুমি যে আমার সকল সাধনা'

নিজ কক্ষের জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর দরদভরা কণ্ঠে সাধক জিয়াউল হক কার সাধনার কথা বলেন? আত্মীয়-স্বজন সবাইতো পাগল ভেবেছে। হ্যাঁ, পাগল বটেই–তবে বদ্ধ পাগল নয়; বন্ধুর প্রেম-পাগল। যে বন্ধু নিজের মোহিনী রূপক কাঠামোতে অপরূপ করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়। নিকট আত্মীয়দের পক্ষ হতে জোর দাবী–তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হোক। ভক্ত পরিচিত ঘরে-বাইরে সকলের একই দাবী। বোয়ালখালী থানার খিতাপচরের ভক্ত ছৈয়দুর রহমান বড় মিঞা আসলে পাগল কিনা জানতে চাইলে পিতা বলেন, 'লোকেরা যে রকম মাথা খারাপ মনে করছে তেমন নয়, আমার বড় মিঞা আল্লাহ্‌র পাগল। সাধনা বলে যেখানে উঠেছেন তার উপরে ইনসানিয়াতের (মানবতার) আর কোন স্তর নাই'। তবে কেন পাবনা পাঠাচ্ছেন অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মা ভাই বোন ও আত্মীয়-স্বজনের মন বুঝানোর জন্য। অবশেষে পাবনা মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। উনিশ্‌শ' সাতষট্টি সালের এপ্রিল মাসে মেজ ভাই সৈয়দ মনিরুল হক, সেজ ভাই সৈয়দ এমদাদুল হক, খাদেম আবদুল মালেক, বোয়ালখালী থানার খিতাপচরের ভক্ত ছৈয়দুর রহমান ও ময়মনসিংহ জেলার ভক্ত আবদুল কুদ্দুস তাঁকে নিয়ে বিকাল ৩টা ৩০ মিঃ বাহাদুরাবাদ ট্রেনযোগে পাবনার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। পরদিন সন্ধ্যায় পাবনা পৌঁছেন। রাত্রি যাপনের জন্য গুলবাগ হোটেলে দু'খানা রুম ভাড়া নেয়া হয়। রাত্রে সবাই উপোষ। হোটেলের ইলিশ মাছ রান্নায় অপরিচ্ছন্নতার জন্য খাওয়া সম্ভব হয় না। সকালে মালেক পাঁচ টাকায় যে পরিমাণ পুরী, মিষ্টি রাজভোগ জনৈক পশ্চিমার দোকান থেকে কিনে আনে, তাতে সকলের তৃপ্তিপূর্ণ নাস্তা সেরে যায়। সকাল ৯টায় অটোরিক্‌শা যোগে হাসপাতাল নেওয়া হয়। এক নম্বর ওয়ার্ডে সাত নম্বর সিট-এ তাঁকে ভর্তি করা

হয়। কর্তৃপক্ষ ঔষধপত্রের জন্য ব্যাংকে প্রয়োজনীয় টাকা জমা রাখার জন্য পরামর্শ দিলেন। সেদিনের মত তাঁকে সেখানে রেখে হোটেলে চলে আসার সময় সকলে কাঁদেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার সিটে বসে পা দোলাচ্ছেন। জানালা দিয়ে ছৈয়দুর রহমানকে একটা ঘুষি দেখান। হোটেলে পৌঁছে সেবা-শুশ্রূষা ও দেখা-শুনার জন্য মালেককে হাসপাতালে রেখে আসা সাব্যস্ত হয়। পরদিন কেবিন ভাড়া করে তথায় স্থানান্তরিত করা হয়। মাসিক পঞ্চাশ টাকা চার্জে ওয়ার্ড নার্স আবদুল গণির সাথে আবদুল মালেকের দুবেলা নাস্তাসহ খাবার ব্যবস্থা হয়। পরদিন অন্যান্যরা চলে আসেন। মালেককে ক'দিন হোটেলে থাকতে হয়। হাসপাতালে আসা-যাওয়ার রিক্সা ভাড়া দু আনা, এক আনা বক্সিস দিলে রিক্শাওয়ালা মহাখুশি।

পাবনা মানসিক হাসপাতাল। শহর থেকে দূরে ১১৪ একরের বিরাট এলাকা জুড়ে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামীণ পরিবেশ। চারিদিকে অলংঘনীয় পাকা প্রাচীর ও কাঁটা তারের ঘেরা। শত শত পাগল ও মানসিক রোগী কেবিন এবং ওয়ার্ডে। সকলে নিজ নিজ ভুবনে মগ্ন। কেউ গান ধরেছে, কেউ অনর্গল বকছে। কেউ নাটকের ভংগিতে বলছে, 'জান, তোমার অপরাধের শাস্তি কী? মৃত্যুদন্ড! সম্রাট আলমগীর কোন অপরাধীকে ক্ষমা করেনা'। আবার একজন এমন হাসি হাসছে যেন তখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। আরেকজন ধ্যানীর দৃষ্টিতে কী যেন চেয়ে আছে। একজন মহিলা বুক চাপড়ে বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'ওরা আমার ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। আমাকে একটু দেখতেও দেয়নি, ওদের কি বিচার হবেনা'? 'আমি বাঁচতে চাইনা; তোমরা আমাকে মেরে ফেল', চিৎকার করে বলছে এক যুবক। সে আবার নীচু স্বরে বলছে, 'যে মাকে ভাত দিতে পারে না, ভাইয়ের পড়ার খরচ যোগাতে পারে না, বোনকে একটা খেলনা কিনে দেবার সামর্থ্য যার নেই; সে বেকারের বাঁচার কিবা অধিকার আছে?; সব মিলে এক বিচিত্র চিড়িয়াখানা। হাসপাতালে সাধক জিয়াউল হক প্রথম দিকে চুপটি বসে থাকতেন। ঔষধ খেতে চান না। ট্যাবলেট মুখে দিলে একপাশে লুকিয়ে রেখে পরে ফেলে দিতেন। সুপারিনটেনডেন্ট রিপোর্ট নিলেন। এরপর ইনজেক্শান দিলেন। শুরু হলো একটানা ঘুম। ঘুম থেকে তুলে কষ্ট করে খাওয়াতে হতো। খাবার দেওয়া হতো কোনদিন ডাটা কদু কোনদিন এক টুকরো মাছ অথবা ডিম। সপ্তাহে একদিন মাংস পরিবেশন করা হয়। সকালে এক টুকরো পাউরুটি, কিছু নরম সুজির

নাস্তা। তিনি এসব খেতে চাইতেন না। মালেক নিজ খাবার তাঁকে খাওয়ায়ে হাসপাতালের খাবার নিজে খেয়ে নিতো। কদিন ইন্‌জেকশান বন্ধ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হলো। হঠাৎ একদিন তিনি কেবিন থেকে উধাও হয়ে যান। নার্সেরা খুঁজতে খুঁজতে গোসলখানায় পেলো। মাথায় বালতি ভরে পানি ঢালছেন। সেখান হতে আনা হলে তাঁর জজ্‌বা হাল বেড়ে যায়। নার্সকে চেয়ার তুলে মারেন। আবার ঘুমের ঔষধ দেওয়া হলো। এভাবে দু'মাস চলে গেলো, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। একদিন সকালে বিনোদন মাঠে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতাল হতে অল্প দূরে সুন্দর বাগান। নানা প্রকার খেলনার সমাবেশ। আরো অনেক রোগী গেছে। নার্সরা খাতা পেন্সিল নিয়ে রোগীদের পিছু পিছু কে কোথায় কী করছে; কী দেখছে ইত্যাদির রিপোর্ট তৈরি করছে। এখানে দু'মাস আনা-নেওয়া হলো। ইনি নিরিবিলি বসে থাকেন। আর বিড় বিড় করে বলেন, 'ওগো বন্ধু তোমাতে-আমাতে পর্দা কেন'? অতঃপর ইলেকট্রিক শক্ দেবার অর্ডার হলো। একদিন সকাল ৭টায় মালেক শক্ দিতে নিয়ে যায়। নিষেধ থাকাতে সকালে কিছু খাওয়ানো হয় না। নিষেধ উপেক্ষা করে মালেক নার্সের সাহায্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে। মেশিনের কাছে একটা বিছানায় উপুড় করে শয়ন করানো হয়। সুইচ টিপতেই মেশিনের একটা যন্ত্র পিঠ বরাবর নামে। পিঠে নামতেই একটা শব্দ করে শরীরটা কুঁকড়ে গেলো। শক দেওয়া রোগী যেমন একটা হিম-শীতল মৃতদেহ, স্ট্রেচারে করে আনতে দেখে মালেক ভয় পেয়ে যায়। যদি ব্যতিক্রম কিছু ঘটে যায়। এ অবস্থা দেখে মালেকের হৃদয় হাহাকার করে উঠে। সেখান থেকে একটা বরফ-ঠাণ্ডা রুমে রাখা হলো। অনেকক্ষণ পর আবার অন্য কক্ষে। ঘরের সকল বৈদ্যুতিক পাখা ছেড়ে দিয়ে বাতাস দেওয়া হলো। দুপুর বারোটার দিকে আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরতে আরম্ভ করে।

শক্ দেবার পর তিনি যেন অন্য মানুষ। জুতা পায়ে দেবার সে কী কসরত! যেন কখনো পায়ে দেন নি। ছোট শিশুর মতো শিক্ষা দিতে হলো। মালেকের কথা সুবোধ শিশুর মতো অজু, গোসল, খাওয়া, শোয়া সবকিছু করতে লাগলেন। ডাক্তার এসে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি বিয়ে করেছেন? জেবু কি আপনার মেয়ে? তিনি উত্তর দেন, সত্যি কি তাই? একদিন পর পর তিনবার শক্ দেওয়া হলো। তিনি মালেককে বলেন– চলো, চলে যাই, কতদিন হয় এসেছি। এখানে খুব কষ্ট। তাঁকে চলে যাবার আশ্বাস দেওয়া হয়। মালেক একদিন দুপুরের ভাত

এনে দেখে তিনি কেবিনে নেই। খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হলো। নার্সরা হাসপাতালে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোথাও পাওয়া গেল না। চারিদিকে দেয়াল; একটা মাত্র গেট। কড়া পাহারা। বাইরে যাবার তেমন সুযোগ নেই। তবু মালেক বের হয়ে সামনের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলো, দাদাকে দেখেছেন? দাদা কিনা জানিনা তবে একজন বেরিয়ে গেছে। আমি অনেক ডেকেছি। কেউ শুনে না – দোকানী বললেন। মালেক দ্রুত দক্ষিণ দিকে ছুটলো। পদ্মার বিরাট চর। এমন ফসল হয়েছে ধান গাছের জন্য মানুষ দেখা যায়না। পথে পথে অনেক দূর গেলে দেখা যায়, তিনি বসে আছেন। আসতে চান না! সেখান থেকেই বাড়ি চলে যাবেন। পরদিন চলে যাবার আশ্বাস দিয়ে পুনঃ হাসপাতালে আনতে হয়। কিভাবে গেলেন নার্সগণ জানতে চাইলে বললেন, নারিকেল গাছে উঠে লাফ দিতেই লুঙ্গিটা কাঁটা তারে আটকে যায়; কেম্‌নে বাইরে চলে গেলাম। পালাবার ঘটনায় পর পর দু'দিন শক্ দেওয়া হল।

প্রথমে পাঁচটা শক্ দেওয়ার পর আবার পাঁচটার অর্ডার হলো। বাড়িতে চিঠি লিখে ও চট্টগ্রাম শহরে ট্রাংক কল করে মালেক সব খবর জানালো। দেখতে গেলেন মেজ ভাই, সেজ ভাই, ভাই ডাক্তার সাহেব ও বরিশালের খাদেম অলিউল্লাহ্। তাঁদের সাথে দেখা করতে তিনি হোটেলে গেলেন। সবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা একদিন পর চলে আসেন। ভাদ্র মাসের শেষ দিকে শক্ দেওয়া শেষ হলো। তখন প্রায় সুস্থ। সাতাশে আশ্বিন বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ শরিফের কথা বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট পনের দিনের ছুটি নেওয়া হলো। ছুটি মঞ্জুর হলে আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহে বাড়ির পথে রওয়ানা।

চট্টগ্রাম স্টেশনে ভাই-বোন আত্মীয় স্বজন সবাই উপস্থিত। আনন্দ-বেদনার এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। বৃষ্টির দরুণ এক রাত শহরে কাটিয়ে পরদিন ট্রেনযোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নাজিরহাট স্টেশনে বহুলোক তাঁকে স্বাগত জানায়। গরুর গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছেন। দীর্ঘ ছ'মাস প্রবাসের পর মাতা-পিতা ও স্ত্রী পরিজনের সঙ্গে মিলিত হলেন। পিতা রাজি না হওয়ায় হাসপাতালে আর যাওয়া হয় নি।

দশটি বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে শরীরকে আগুনে ছেকার মতো ঝলসিয়ে নিলেন; তবু সাধনার শেষ নাই। কঠোর থেকে কঠোরতর সাধনা চলতেই থাকে। বহু রাত মেহমানখানার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফের

দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। চেয়ার দেয়া হলেও চেয়ারে বসেন না, কখনো ঘুরে বেড়ান। ঊনিশ্‌শ’ চুয়ান্ন সাল থেকে ওফাতের সময় পর্যন্ত একটা পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটান নি। সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে সকালের দিকে সামান্য বিশ্রাম নিতেন। বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত-শহর-নগরের সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। একবার আগরতলা দিয়ে ভারতের কিছু অংশ প্রাইভেট কারে ঘুরে আসেন। একটানা ৮/১০ দিন না খেয়ে থাকতেন। এমনি অনন্য সাধনায় তাঁর আত্মা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নয়নের দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানে (মারেফাত) উত্তীর্ণ হন। সাধক সত্তার নির্বাণ লাভে দীর্ঘ প্রত্যাশিত আল্লাহ্‌র সঙ্গ বা মধু মিলনে (ফানাফিল্‌ হাকিকত) ধন্য হলেন। কোরআনের পরিভাষায় ‘ওয়াকুল্‌ যা আল হাককা অ-যাহাকাল বাতিলু’ – ‘এবং বলুন সত্যের আগমনে অসত্যের তিরোধান, (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১)। ফানা বা আত্মা বিলোপের সকল স্তর অতিক্রম করে তিনি স্রষ্টার স্থায়ী প্রেমের বিশুদ্ধ আনন্দবোধের শেষ স্তর ‘বাকাবিল্লায়’ উন্নীত হন।

তিন মহাশক্তির অপূর্ব সমন্বয়

আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী “আমি সূর্যকে অতি উজ্জ্বল করে সৃষ্টি করেছি” (সূরা নাবা : ১৩)। সূর্যের আলোকে অন্ধকার দূর হয়ে জগত আলোকিত হয়। অথচ সূর্য একটি সাধারণ সৃষ্ট বস্তু। সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষও আছেন যাঁরা হাজার সূর্যের চেয়েও দীপ্ত উজ্জ্বল। সূর্যসহ সমগ্র সৃষ্টি তাঁদের আজ্ঞাবহ, মুখাপেক্ষী। রাহমাতুল্লিল আ’লামীন-সৃষ্টির কল্যাণ শক্তি যুগে যুগে দেশে-দেশে অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত, বিকাশিত ও প্রচারিত। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ‘জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, জনাব মৌলানা নুরুচ্ছফা নামক হযরতের এক প্রিয়তম সাহেবে কশ্‌ফ খলিফা দরবার শরিফে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “হুজুর! গত রাত্রে হযরত আকদস আমাকে দেখা দিয়া নির্দ্দেশ দিলেন, মিঞা! আপনি আমার মিঞাকে বলুন তিনি পেরেশান কেন? আমি প্রদীপ প্রজ্জলিত করিতেছি। আপনি তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, জিয়াউল হক আমিই”। ইহা দর্শনে আমি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নির্দেশ পালনে আপনার খেদমতে আসিয়াছি। এই ঘটনার পর

তাহারা প্রত্যেকে দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা আধ্যাত্মিক প্রেরণাধিক্য মাত্র।

অনেক কিছু করার পরও অত্যধিক ভাব-বিভোরতার কোন পরিবর্তন না দেখে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর প্রধান খাদেম শরাফত আলী প্রকাশ লক্ষ্মীর বাপ আবেদন জানালে স্বপ্নে বাবা ভাণ্ডারী বলেন, 'আমি জিয়াউল হক মিঞা ও সামশুল হুদা মিঞাকে আমার পাঠশালায় ভর্তি করেছি। ওসব তুই বুঝবি না'। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত তাঁর পিতার নিকট বর্ণনা করা হয়। অপর ঘটনা, তাঁর বিবাহকালীন সময়ের তৎকালে যোগাযোগের সুব্যবস্থার অভাবে সুদূর দাঁতমারা গ্রামে বিবাহ অনুষ্ঠানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বিয়ের পূর্বরাত্রে বংশধর সৈয়দ আবু তাহের সাব-রেজিস্ট্রারকে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্বপ্নে বলেন, 'জিয়াউল হককে আমি তোমাদের জন্য বাতি জ্বালাচ্ছি'। হযরত সাহেব কেবলার এই নির্দেশে অতঃপর তিনি বিয়েতে যোগদান করেন। অপূর্ব কৃপাপূর্ণ এ তিনটি ঘটনায় শাহানশাহ্‌র যথার্থ পরিচিতি প্রকাশিত।

মাঘ মাসের দুই তারিখ, ষোল জানুয়ারি ১৯৬৬ সাল। হযরত কেবলা স্বপ্নে তাঁর পিতাকে নির্দেশ দেন, জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাঁকে অর্পণ করুন।

৯ মাঘ, তেরশ তিয়াত্তর বঙ্গাব্দ। উরস শরিফ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ দূর-দূরান্ত হতে বহু লোক এসেছে এবং আরো আসছে। পরদিন দশ মাঘ উরস শরিফের প্রধান অনুষ্ঠান। সকাল এগারটায় রওজা পাক গোসল দেওয়া হয়। হযরত সাহেব কেবলার অছি-স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী স্বপ্নের নির্দেশ পালনে রওজা শরিফ স্মৃতিকক্ষ হতে হলুদ ও খয়েরি রংয়ের দু'খানা চাদর খাদেম মালেকের দ্বারা আনয়ন করেন। অতঃপর হযরতের পবিত্র গদি শরিফে দু'পা ঝুলিয়ে রওজামুখী হয়ে বসেন[১]। পুত্রকে আনার জন্য দরবারের প্রধান কর্মকর্তা মাওলানা সৈয়দ মাহ্ফুজুল করিম সাহেবকে পাঠান। তিনদিন হতে যে ঘরের দরজা বন্ধ মাওলানা সাহেব দরজায় পৌঁছামাত্র খোলেন। হযরতের আমানত গ্রহণের জন্য তাঁকে নিতে পাঠিয়েছেন বলে জানালে খুবই শান্তভাবে বলেন, 'আচ্ছাজী, আমি জানি। একটু অজু করে আসি'। হুজরায় গিয়ে পিতাকে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে একটু দূরে নতজানু হয়ে পিতার মুখোমুখি এমনভাবে বসেন যেন হযরত সাহেব কেবলা ও হযরত বাবা ভাণ্ডারীর রওজা শরিফ পিছনে না পড়ে। হলুদ রংয়ের চাদরটা নিজ

গায়ে জড়িয়ে পিতা গুরু গম্ভীর স্বরে বলেন, "হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে পবিত্র মহান আমানত আমার হেফাজতে ছিলো তা আজ আপনাকে অর্পণ করছি; হেফাজত করবেন"। একথা বলে খয়েরি রংয়ের চাদরখানা নিজ হাতে ছেলের গায়ে পরিয়ে দেন। ছেলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ সময়ে হুজরার বারান্দা ও মাঠে উপস্থিত ছিলেন হযরত সাহেব কেবলার খলিফা মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর (র.) পুত্র আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, বাঁশখালীর প্রসিদ্ধ জমিদার হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ফটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামের এডভোকেট আফসার উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজারের জনাব আরহাম আলী চৌধুরী, বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলীর ডা. রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং আরো অনেকে। চাদর পরিয়ে দিলে তাঁর মস্তক ও শরীর হতে বিন্দু বিন্দু ঘাম বের হতে থাকে। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এভাবেই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। পুত্রের ডায়রীতে পিতা-পুত্র সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিত, 'মার্চ মাসের ১৫ তারিখ অলিয়ার প্রতি আমার মন নিবিষ্ট (রুজু হয়) ও বাবাকে চিনি বা চিনতে শিখি। ও মারে মা হেতান (তাঁর) বড় বড় দর্জা (তাজিম) আদব'।

মাইজভাণ্ডার শরিফ রওজা সংলগ্ন মাঠে লাখো জনতার মহাসমাবেশ। সকলের অধীর অপেক্ষা, কবে আসবেন। মাঠের পূর্ব দক্ষিণ কোণায় অপরূপ সাজানো এক মঞ্চ। হঠাৎ মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন হযরত গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারী। তাঁর হাতে স্বর্ণ ও হীরা খচিত একটা অপূর্ব সুন্দর তাজ। কিছুক্ষণ পর হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে সেখানে আনা হলে হযরত সাহেব কেবলা নিজ হাতেই সে তাজ তাঁর মাথা মোবারকে পরিয়ে দেন। উপস্থিত জনতা আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন"। এ স্বপ্ন দেখেন আলহাজ্ব সৈয়দ মোজাহের রাব্বি ১৯৬০ সালে[২]।

১৯৮০ সালের অক্টোবরের ঘটনা। চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইন, শেখ বজলুর রহমান কোম্পানীর বাসা। ফটিকছড়ি থানার বক্তপুর নিবাসী সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ ও দৌলতপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী দীপ্ত কণ্ঠে তিনবার করে বলেন, "আমি হযরত সাহেব কেবলা, আমাকে হযরতের চেয়ে কম মনে করোনা"। ১৯৮২ সালের ৪ মার্চ মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী স্মরণ সেমিনার ও 'জীবন বাতি' প্রকাশনা উৎসব শেষ হলে গভীর রাতে তিনি নিজ হুজরা হতে হেঁটে

গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের মাঠে গমন করে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন। অতঃপর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফে প্রবেশ করে প্রধান দরজা বরাবর সেজদা পেশ করেন। উপস্থিত আশেক ভক্তগণও তাঁর সথে সেজদা করে দক্ষিণের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের খাদেম আবুল কাশেমকে বিশটি টাকা দিয়ে দুই শিশি আতর কিনে গাউসে পাকের পবিত্র হুজরা শরিফে ছিটিয়ে দিতে আদেশ করেন। অতঃপর হযরত সাহেবের রওজা শরিফ দেখে দেখে পুনঃ তিনবার বলেন, "আমাকে চিন? আমি হযরত কেবলা কাবা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোন অংশে কম নই"। সেখানে উপস্থিত বিশ/ত্রিশ জন ভক্তের মধ্যে মির্জাপুরের মৌং মসিউল করিম ও নানুপুরের মীর অলিউল্লাহ্‌ও ছিলেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার করে বলতেন।

মৃতপ্রায় যে শিশু হযরত বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র হাতের জলপানে আরোগ্যলাভ করেছিলেন এবং কালের কঠোর সাধনায় রূহে রহমানিতে উন্নীত হয়ে অর্জন করেন সে মহান অলির কুত্‌বিয়তের পূর্ণ ফয়েজ বা অনুগ্রহ। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অথরিটি জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর নিকট হতে লাভ করেন এত্তেহাদী ফয়েজের (সার্বিক অনুগ্রহ) পরিপূর্ণ দান। এ তিন মহান অলি-উল্লাহ্‌র ফয়েজ বরকতের অধিকারী হয়ে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী 'মহান তিনে মহাশক্তি' রূপে অধিষ্ঠিত হন।

তথ্য নির্দেশঃ

(১) হযরত সাহেব কেবলার ওফাতের পর তিনি এই একবার গদী শরিফে বসেন।

(২) তিনি হাটহাজারী মির্জাপুর দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা অলি-উল্লাহ্ হযরত মাওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ্ (র.) মির্জাপুরীর কন্যা এবং ফটিকছড়ির নানুপুর নিবাসী এস.এম. আবু তাহের সাহেবের জননী। তাহের সাহেব পূবালী ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক ছিলেন।

“তোমরা রব্বানী হয়ে যাও” – (আলে ইমরান: ৭৯)

সিফাত [গুণাবলি]

হাসানবাগ হতে হক মন্‌জিল

হাসান বাগ, রাজফুল গোলাপের বাগান। প্রতি ভোরে এ বাগানের ফুলে সাজানো হতো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা কাবার পবিত্র রওজা ও হুজরা শরিফ। এ বাগানের প্রতিষ্ঠাতা অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী। আপন বড় ভাই হযরত মীর হাসান (ক.) সাহেবের নামে বাগানের নামকরণ। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে পৌত্রটি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পূর্বে কিশোর বয়সে (১৯০৫ খৃ:) ওফাতপ্রাপ্ত হন। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা পূর্বমুখী ছোট্ট একখানা বাঁশছনে নির্মিত ঘরে বাগানের মালি খাদেম ইউনুছ আলী থাকতেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল চাঁদপুরে। বরিশালের আবদুল জব্বার ছিলেন প্রথম মালি।

এই জায়গার দক্ষিণাংশে ছিল ঝোপঝাড়, গড়-খন্দকময় নির্জন এলাকা। দিনের বেলায়ও সুযোগ পেলে পার্শ্ববর্তী গৃহস্থ বাড়ি হতে মোরগ-মুরগি ধরে এনে শিয়ালের দল এখানে ভোজন উৎসব করতো। তাই এলাকাবাসীরা এ স্থানের নাম দিয়েছিল শিয়ালের কুয়া-শিয়াল কুয়ারপাড়। জায়গার মালিক ছিল দুই ভাই – গুরামিঞা ও কালুশা। পুকুরের পশ্চিম-উত্তরে ছিল তাদের কাঁচা বসতবাটি। ১৯২৯ ইং সালে ঘনেশ্যাম কানুনগো ও দেও নারায়ণ তেওয়ারীর জমিদারী নীলাম খরিদ করে মখলেছুর রহমান সারাং (পরবর্তীতে চৌধুরী) মাইজভাণ্ডার মৌজার জমিদারী লাভ করেন। দীর্ঘদিন গুরামিঞা ও কালুশা জমিদারের খাজনা বাকি রাখলে বৃটিশ আইন অনুযায়ী ঐ ভিটে জমি ১৯৫০ সালে নিলামে উঠে। এই খবর শাহ্‌নগর নিবাসী আবদুল মজিদ চৌধুরীর (যিনি জমিদারের প্রধান কর্মকর্তা ও আমমোক্তার ছিলেন) নিকট জানতে পেরে দরবার শরিফ স্টোরের তৎকালীন ম্যানেজার খায়রুল বশর মাস্টার, পিতা-নোয়া মিঞা টেন্ডল, গ্রাম-বড় ছিলোনিয়া, থানা-ফটিকছড়ি, নীলাম খরিদ করে জায়গা দখল নিয়ে কাঁচা ঘর করে বসবাস শুরু করেন।

খায়রুল বশর মাস্টার এই সম্পত্তি পরবর্তীকালে হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ছেলেদের নিকট বিক্রয় করেন। ভিটাস্থ পুকুরের উত্তর-পূর্বাংশে ছিল আবছার আহমদ গংদের চতুরা ঘর। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে

জয়ধন বিয়া ও আবছার আহামদ গং হতে হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের পাঁচ ছেলে যথাক্রমে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক, শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল হক, শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক, শাহ্ সুফি ডা. সৈয়দ দিদারুল হক ও শাহ্ সুফি সৈয়দ শহিদুল হক সাহেবের নামে খরিদ করা হয়। এই জায়গার পূর্ব-উত্তর সীমা বরাবর (বর্তমানে যেখানে ৬ তলাবিশিষ্ট ভবন) ছিল সর্বসাধারণের যাতায়াতের গ্রাম্য পথ। সাধনার এক স্তরে পৌঁছে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী অত্যন্ত জজ্‌বা হালে থাকতেন। তখন সামনে কাউকে পেলে মারতেন। খাদেম, ভক্ত, এমনকি পরিবারের সদস্যরাও রেহাই পেতেন না। এসব ঘটনা প্রবাহে পিতা চিন্তা করলেন, তাঁর অবর্তমানে অন্য ভাইদের সাথে হয়তো কোন অসুবিধা হতেও পারে। তাই এই ছেলেকে বাগানবাড়িতে আলাদা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানা মোহাম্মদপুর নিবাসী নোয়াখালী জেলার মাইজদীতে পুলিশে কর্মরত আবদুর রাজ্জাক ভাণ্ডারী ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে কিছু আশেক ভক্তসহ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ় বৃহস্পতিবার শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সর্বপ্রথম বাগানবাড়িতে পৌঁছিয়ে দেন। পানীয় জল ও ধান রাখার অসুবিধা হলে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ সাহেবের উদ্যোগে ভক্তদের সহযোগিতায় একটি টিউবওয়েল ও একটি শস্য গোলা নির্মাণ করা হয়। সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে আদর্শ পিতা পুত্রদের নিকট দায়িত্ব অর্পণের এক ঘোষণায় বলেন, 'আমার বড় পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে স্বীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রওজা শরিফ পুকুরের পূর্বদিকে বাগানবাড়িতে দুই কক্ষবিশিষ্ট পাকাগৃহ, সেনিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করতঃ পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি এবং তিনি নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত'। এছাড়া ২১×১০ ফুট বাঁশ ছনে একখানা কাচারি ঘর এবং আরও ১টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেন।

৬ এপ্রিল সকাল বেলা ঊনিশ্‌শ চুয়াত্তর সাল। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর উরস শরিফের পরদিন। আগত ভক্ত ও ফকিরেরা নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাচ্ছেন। ঝিমিয়ে আসছে উৎসব-কলরব। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের দক্ষিণের সরু বারান্দায় একখানা আরাম কেদারায় বসে আছেন সাজ্জাদানশীন মাওলানা শাহ্

সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী সাহেব। বিদায় ইচ্ছুক মুরিদান ও ভক্ত ফকিরের দল বিদায়ী সালাম দিচ্ছেন। হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদের বিশিষ্ট মুরিদ সৈয়দ মফিজুল ইসলাম নিজের একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলতে চাইলে অনুমতি দিলেন। ব্যক্তিটি দেখেছেন, হাসানবাগে বর্তমান গাউসিয়া হক মন্‌জিলে অসংখ্য লোক সমাগম হয়েছে। উরস শরিফের অনুষ্ঠান বলে মনে হচ্ছে। স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। হুজুর ব্যাখ্যা দিলেন, 'বড় মিয়ার (শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক) সেখানে ভবিষ্যতে উরস অনুষ্ঠানাদি হবে, এটি তার সুসংবাদ। ডান হাতের অঙ্গুলি হেলিয়ে তিনি আরও বলেন, আপনাকে সেটা দেখতেও হবে করতেও হবে। এটা মুনিবের হুকুম'। লোকটা প্রশ্ন করেন, আমরা তো আপনার মুরিদান; আপনাকে ছেড়ে সেখানে কি করে যাই? গভীর প্রত্যয়ে তিনি বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, বৈশাখের এক তারিখ হতে একটা নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। আমি খেদমতের জিম্মাদারী ছেড়ে দেবো'।

জিম্মাদারী ছেড়ে দেবো – এ ঘোষণায় সর্বত্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। কে নেবে হযরত সাহেব কেবলার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মহান দায়িত্ব? এ বিষয়ে মুরিদানেরা হুজুরের পুত্রদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। মেজ পুত্র সৈয়দ মুনিরুল হক সাহেবের সাফ জবাব এখনো আমি নিজের মধ্যে কোন আলো দেখছিনা, অপরকে আলোর সন্ধান কি করে দেবো? অনেকের মতো কিছু দাড়ি রেখে পীরের লেবাস পরে মানুষকে আমি ধোঁকা দিতে পারবো না। অপর তিন পুত্র নিজেদের বয়স ও পেশাগত দায়িত্বের কারণে অপারগতা প্রকাশ করেন। বিস্তর আলাপ-আলোচনা হলো কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক মূলতবী হয়।

পরদিন সকালে হুজুর বৈঠকখানায় পুত্রদের ডেকে পাঠালেন; বিশিষ্ট মুরিদানেরাও সেখানে উপস্থিত। পুত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। "শৈশবে পিতাকে হারিয়েছি। পাঠ্যজীবনে দাদাকে, তারপর একমাত্র বড় ভাই চিরবিদায় নেন। আপন বলতে কেউ রইলো না। হযরতের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রক্ষার্থে একা একা সংগ্রাম করেছি। সহযোগী হিসাবে যাদের পেয়েছি তাঁরা কেউ নিকট আত্মীয় নয়। বিষের পেয়ালা সবগুলো আমি পান করেছি। তোমাদের জন্য রেখেছি মধুর পেয়ালাগুলো। অংশনামা মূলে সম্পত্তি ভাগ-বন্টন করে দিয়েছি। এই মেয়েটা (সেখানে উপস্থিত) মনার মা (ফুলযান বিবি) বহু বছর ধরে আমাকে

সেবা করছে। কোন আশ্রয় নাই। তাকেও এক কানি জমি দিয়েছি। কিছু জমি আমার নামে আছে। পরে তা যার যার প্রাপ্য মতো ভাগ করে নেবে। করণীয় প্রায় সব কাজ করেছি। তোমাদের কোন অসুবিধা নাই। বড় মিয়া হাল জজ্‌বার মানুষ। তাঁর কাজকর্ম বুঝতে তোমাদের কষ্ট হবে। এজন্য তাঁকে বাগান বাড়িতে আলাদা করে দিয়েছি। ভাই ভাই সদ্ভাব বজায় রাখবে। আমি এখন বৃদ্ধ। দায়িত্ব বহনে পূর্ণ সক্ষম নই। তোমরা দায়িত্ব বুঝে নাও"। পিন-পতন নীরবতা। তিনি আবার বলতে লাগলেন, "আমাকে শুধু জন্মদাতা পিতা হিসেবে দেখো না। আমি নৈতিক অধ্যাত্ম পুরুষও। দিতে এসেছি নিয়ে যাও। না চাইতে দিবার বিধান নাই"। বক্তব্য শুনে পুত্রগণ চিন্তা ভাবনা করার জন্য সময় চেয়ে বিদায় নেন। ইতিমধ্যে এক রাতে হযরত সাহেব কেবলা স্বপ্নে সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার সাহেবকে বলেন, "তুমি আমার জিয়াউল হক মিয়ার সেখানে বাতি জ্বালাও; তাঁর বিকাশের সঙ্গে তুমিও রওশন হবে"। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে হুজুর বলেন– "আমার বড় মিয়ার কাজকর্মের এন্তেজামের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এটা মুনিবের আদেশ। বড় মিয়া মাসুম-বেগুনাহ্‌, দুনিয়াদারীর খবর রাখে না। লোকের নিকট তাঁর গুণগান করবে। দরবার ভক্ত তোমার ঘনিষ্ঠ লোকজন নিয়ে তথায় খেদমতের কার্যাদি দেখবে"। তিনি বর্তমানে থাকতে এ কাজ করলে লোকে দুর্নাম করবে বললে পুনঃ বলেন, "তুমি কি লোকের কথা শুনবে, না পীরের কাজের রহস্য তালাশ করবে? মুগল-আফগান এবং তারও আগে ভারতবর্ষ তো পুরাতন দিল্লী থেকে শাসিত হতো। এখন কি নয়াদিল্লী থেকে শাসিত হচ্ছে না? পুরাতন দিল্লীর ঐতিহ্য বরং নয়াদিল্লীর গর্বের ধন। আমি তো কোন অসুবিধা দেখি না"।

সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ জানতে চাইলেন, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, হযরত বাবা ভাণ্ডারী সহ গাউসে পাকের কামেল খলিফাগণ, এমনকি আপনি পর্যন্ত প্রায় সকলেই আলেম-মাওলানা। বড় মামু (সম্পর্কে মামা শ্বাশুর বলে প্রথম দিকে এভাবেই সম্বোধন করতেন) তো আলেম নন, লোকদের কিভাবে বুঝাবো যে তিনি কামেল অলি-উল্লাহ্‌? মহান অধ্যাত্ম জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বলেন, "এ ব্যাপারে আলেম হওয়া কোন শর্ত নয়, শর্ত হলো আল্লাহ্‌ তলবী হওয়া, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে নিরক্ষরকেও তাঁর বেলায়তের মিরাজ দিয়ে ধন্য করতে পারেন।

আলেমদের সম্পর্কে হযরত সাহেব কেবলা (ক.) বহু পূর্বেই বলেছেন "মোল্লারা কালামুল্লাহ্ বেচে কলা-মোলা খেয়েছে"। তিনি আরও বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ নির্ভরতা ছেড়ে কাম ও কামনার প্রতি ঝুঁকে যাওয়ায় আলেমদের নিকট হতে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ফজিলতে রাব্বানী (স্রষ্টার উচ্চতর অনুগ্রহ)টা কেড়ে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত কোট-প্যান্টধারীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি ও আমি কি কিছু করতে পারবো? তুমি কি তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সাথে হযরত মুসা (আ.) নবির হাজার সওয়াল (প্রশ্ন) করার ঘটনা শুন নাই? "(হযরত) মুসা যখন আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার (তূর পাহাড়) দক্ষিণ প্রান্তের একটি গাছ হতে শব্দ হয় হে মুসা! আমিই আল্লাহ্ বিশ্ব পালনকর্তা" (সূরা কাসাস : ৩০)। 'এখানে গাছ আল্লাহ্ নয়, কিন্তু শব্দ বা আওয়াজটা আল্লাহ্‌র। গাছ লতা পাতা যদি খোদার তজল্লী ধারণ করতে পারে আমার বড় মিয়া কি তার চেয়ে নিকৃষ্ট" গাধার কানওয়ালা লোকদের বুঝানোর দায়িত্ব তোমার নয়। শুধু জানতে আগ্রহীদের নিকটই খোদায়ী সত্য বর্ণনা করবে'। বখ্‌তেয়ার সাহেব পুনঃ প্রশ্ন করলে অছিয়ে গাউসুল আযম বলেন, 'বড় মিয়া (শাহানশাহ্) কামেল কিনা তা কি তুমি দেখতে চাও? তাহলে আজ রাতে হযরত কেবলার রওজা শরিফে ঘুমাবে; কিছু দেখলে সকালে আমাকে বলবে'। রাতে বখ্‌তেয়ার সাহেব স্বপ্ন দেখেন, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফ মাঝখানে দু'ভাগ হয়ে নিচের দিকে একখানা সিঁড়ি নেমে গেছে, সে সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে উঠে আসেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তিনি সিঁড়ি সোজাসুজি রওজামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। তৎপর উঠে আসলেন তাঁর পিতা। তিনি রওজার একটু তফাতে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর শাহানশাহ্'র বুক এমনভাবে ফেটে যায় যাতে একজন লোক অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে একের পর এক উঠে এসে সে বুকে ঢুকতে লাগলেন যথাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (দ.), হযরত আলী (ক.), হযরত গাউসুল আযম বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (ক.), হযরত গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (ক.), হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)। গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) সকলকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অবশেষে তাঁর পিতা খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.)

মাইজভাণ্ডারী। স্বপ্ন হতে জেগে উঠে হুজুরের সাক্ষাতে গেলে দেখেন হুজুর তাহাজ্জুদ নামায পড়তে শয্যা ত্যাগ করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন এখন কি তোমার আর কোন সন্দেহ আছে? বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ জবাব দেন, না। অতঃপর সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার সাহেব কিছু ঘনিষ্ঠ পীর ভাইকে নিয়ে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মন্‌জিলের নাম রাখেন 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল'।

পারিবারিক ও দরবারী প্রয়োজনে কমিটির উদ্যোগে বাবাজানের অনুমতি নিয়ে বাঁশ ছনে তৈরি করা হয় ১টি রান্নাঘর, মহিলা খাদেম ও ভক্তের আবাসগৃহ। পাকা ঘরের সামনের চত্বর পাকা করে উপরে ছনের ছাউনি দিয়ে সামনের বারান্দা করা হয়। পরে সংলগ্ন পিছনে আরও ৩টি কক্ষ ১টি পাকা বারান্দা এবং সামনের বারান্দাকে একটি বড় পাকা কক্ষে রূপ দেওয়া হয়। সংলগ্ন পূর্বদিকে ২টি নলকূপসহ স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়। বড় কাচারির পূর্ব পাশে গাড়ি রাখার গ্যারেজ করা হয়। হুজরার পশ্চিমে ছেলেমেয়েদের পড়ার কক্ষের ছাদ দেওয়ার পূর্বে কাজ বন্ধ করে দেন। সেটি শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম শহরে পাথরঘাটার দরবার ইলেকট্রিকের মালিক টুলুবাবুকে শাহানশাহ্‌ বাবাজান 'সৈয়দ হাসান মন্‌জিল' নামে ছোট্ট ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে একখানা সাইনবোর্ড করে দিতে বললে একদা সেটা তৈরি করে দরবারে নিয়ে আসেন। বাবাজানের নির্দেশে তা কাচারি ঘরের উপরে লাগানো হয়। তাই তৎকালীন এন্তেজামিয়া কমিটির সম্পাদক মফিজুল ইসলাম মন্‌জিলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন, 'হাসান মন্‌জিল' – এতে বখতেয়ার শাহের সম্মতি ছিল না। ১৯৮৫ সালে কক্সবাজার হোটেল সায়মনে মানিঅর্ডারে বিলের বকেয়া টাকা পাঠাতে বাবাজান মন্‌জিলের কর্মকর্তা সৈয়দ ওবায়দুল আকবর সাহেবকে ঠিকানা 'হক মন্‌জিল' লিখতে বললে আবার 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল' নাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা

বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ নবগঠিত গাউসিয়া হক মন্‌জিলকে পশ্চিমমুখী করে কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রার্থী হলে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর পিতা খনার বচন উদ্ধৃত করে বলেন–
‘দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা, উত্তর দুয়ারীর মুখে ছাই, পশ্চিম দুয়ারীর খাজনা নাই’। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ও বাবা ভাণ্ডারীর রওজা শরিফ-হুজরা শরিফ, রওজা শরিফ মাঠ, রওজা শরিফ পুকুর এবং এসবকে কেন্দ্র করে উরস অনুষ্ঠান যিয়ারত ইত্যাদিতে আশেক ভক্তদের সমাগম সমাবেশ ওইদিকে হওয়ায় মন্‌জিলকে পশ্চিমমুখী করার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি আরও বলেন, ওইদিকের মন্‌জিল বহু পুরানো। স্বাভাবিকভাবে হাদিয়া নজরানা ছাগল গরু মহিষ মোরগ ইত্যাদি বেশী আসতে দেখে তোমাদের মন তরপাবে। আর তোমাদের ওখানে হাদিয়া আসতে দেখে ওরাও অস্বস্তিবোধ করবে। ফলে পরশ্রীকাতরতা বশতঃ মনান্তর রেষারেষি সম্পর্ক ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না। বড় মিঞাকে দেওয়া বাড়িটির দক্ষিণে চাঁদা পুকুরের (মসজিদ পুকুর) উত্তর-পূর্ব কোণায় পারিবারিক কবরস্থানে তাদের মায়ের কবর; ক’বছরের মধ্যে আমিও সেখানে যাব। দক্ষিণ দুয়ারী পারিবারিক ঘর করতে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ অনিহা; অথচ উত্তর অথবা পশ্চিমমুখীতে তেমন আপত্তি থাকে না। এই দুইমুখী ঘর পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত নয়। দক্ষিণ দুয়ারী ঘরে অধিক আলো বাতাস পাওয়া যায় বলে বেশী স্বাস্থ্যকর। দ্বিতীয় স্বাস্থ্যসম্মত ঘর হল পূর্ব দুয়ারী।

ইতিমধ্যে বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ তাঁর চট্টগ্রাম পূর্ব মাদারবাড়ির বাসায় ঘনিষ্ঠ দরবারী ভক্তদের একরাতে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। খাওয়ার পরে দরবারের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্যের তুঙ্গ পর্যায়ে নিজের ডান হাতকে মুষ্টিবদ্ধ উর্দ্ধমুখী উত্তোলন করে বলেন– ‘আমি দোজখে গেলে যারা সঙ্গে যেতে রাজি তারা এই হাত ধরে ওয়াদা করুন; ভাবাবেগে উপস্থিত একশজনই তাঁর হাত ধরে শপথ নিলাম। তখন আমার স্মরণ হয় আমাদের প্রিয় নবির (দ.) হাত ধরে মদিনাবাসী মুসলমানদের প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবা শপথের কথা। মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এমন পূণ্যবান ব্যক্তি কখনো দোজখে যেতে পারে না, নিশ্চয় এটা স্বর্গপ্রাপ্তির

কোন কৌশল মাত্র। অতঃপর তিনি বললেন, পিতা যখন জিম্মাদারী ছেড়ে দিচ্ছেন আমরা পুত্রের খেদমতের দায়িত্ব নেবো। নূতন কর্মস্থল কষ্টকর হবে বলে দোজখের তুলনা দিলাম। পীর বেঁচে থাকতে তাঁকে পিছ দিয়ে ওখানে কিভাবে যাব জানতে চাইলে বলেন, তাঁর কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারেন।

একদা আমরা ক'জন পীরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আর্জি করি, আপনি দরবারের জিম্মাদারী ছেড়ে দেওয়ায় আমরা আপনার বড় মিঞার খেদমতে যেতে পারি কিনা। অছিয়ে গাউসুল আযম বললেন, আমার মুরিদেরা উত্তর বাড়ি দক্ষিণ বাড়ি যায় আমি কি কাউকে নিষেধ করেছি? যেখানে ফয়েয রহমত মিলে সেখানে যেতে কোন অনুমতি লাগে না। বড় মিঞার খেদমত আমারই খেদমত। অতঃপর বখ্তেয়ার শাহের নেতৃত্বে আমরা মন্‌জিলের কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করি।

নূতন বাড়িতে বসবাসের প্রথম বছর সেখানে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। পরিবার নিয়ে তিনি একাই ছিলেন। পরের বছর পিতা অছিয়ে গাউসুল আযমের নির্দেশে সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্ (র.) উরস অনুষ্ঠান শুরু করার প্রস্তাব দিলে বলেন, বাবাজান থাকতে এখানে কিসের উরস! ওসব তাল্‌টি ফাল্‌টি আমার এখানে চলবে না। আপনারা চলে যান। ক'দিন পর রাতভর জিকিরে সামা করে আমরা ১২/১৪ জন মফিজ সাহেবের চট্টগ্রাম দেওয়ান হাট মিস্ত্রী পাড়ার বাসায় ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল ৭টার দিকে খট্‌খট্ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে বখ্তেয়ার শাহ্ জেগে উঠে বলেন, তাড়াতাড়ি উঠুন, বাবাজান এসেছেন। বাসায় ঢুকে বললেন, জেবুর মার (নিজ স্ত্রী) পায়ে গরম পানি পরে পুড়ে গেলে বাবাজান (পিতা) দেখতে আসেন। আপনাদের প্রস্তাবের কথা তাঁকে বলেছি। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। আপনারা উরস করতে পারবেন। উনি বলাতে খবর নিয়ে আসলাম। একসাথে চা-নাস্তা সেরে কিছুক্ষণ পর তিনি বিদায় নেন। ২৩ জৈষ্ঠ্য ৬ জুন তাঁর আম্মাজানের বার্ষিক ফাতেহা। বখতেয়ার শাহের উদ্যোগে বোয়ালখালী উপজেলার খিতাপচর নিবাসী ভক্ত ছৈয়দুর রহমান একটি মাঝারী লাল গরু এবং হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদের মফিজুল ইসলাম চাউল মসলা ইত্যাদি যোগান দিলে প্রথম আনুষ্ঠানিক ফাতেহা সম্পন্ন হয়।

একই বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ১৭ আগস্ট ডাকা হয় আশেক ভক্তদের প্রথম সাধারণ সভা। গাউসিয়া আহ্‌মদিয়া মন্‌জিলের ভক্ত মুরিদ অথচ শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন তেমন ক'জনকে সভার দাওয়াত দিতে আমিও বখতেয়ার শাহের সঙ্গী ছিলাম। একজন মন্তব্য করেন, 'পুরান পাগল ভাত পায় না, আবার নূতন পাগল জুটছো বুঝি!' কেউ কেউ বুঝিয়ে বলে– 'হযরতের অছি বেঁচে থাকতে এটা ঠিক হবে না, চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে সফলতার সম্ভাবনা নাই'। বখতেয়ার ও মফিজ সাহেবের ঘনিষ্ঠ লোকজন, ঘরের কর্মীরা, রাজমিস্ত্রীসহ সভার লোকসংখ্যা জনা পঁচিশেক হয়। বাঁশছনের বড় কাচারি ঘরে রাত ৯–১১টায় অনুষ্ঠিত এই প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্বয়ং। তাঁর পরনে ছিল সাদা চেক লুঙ্গি, সাদা সুতি পাঞ্জাবী ও তুর্কি সুলতানী লাল রূমী টুপি। সভায় ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি এন্তেজামিয়া কমিটি গঠন করা হয়। লোকের অভাবে বাকলিয়া নিবাসী রাজমিস্ত্রী আবদুল নবি ও অনুষ্ঠানের পাকের বাবুর্চি ফরহাদাবাদের খায়রুজ্জমা সওদাগরকে কমিটির সদস্যভুক্ত করতে হয়। সভার মাঝামাঝি ও শেষে সভাপতি দুইবার হাত তুলে মোনাজাত করেন।

পরদিন সকালবেলা কমিটির সদস্যরা উরস অনুষ্ঠানের জায়গা দেখতে একত্রিত হলে তিনিও সেখানে এসে হাজির হয়ে আলোচনায় অংশ নেন। রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর পশ্চিমের মাঠের দিকে হাতের ইঙ্গিতে বলেন, 'সব জায়গা আমাদের লাগবে। অতঃপর নিজ মন্‌জিলের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বলেন, দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, আঙ্গুল পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে বলেন, পূর্ব দুয়ারী মোদের প্রজা, উত্তর দুয়ারীর মুখে ছাই, পশ্চিম দুয়ারীর খাজনা নাই। সে বছর ২৭ আশ্বিন বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শুরু হয় মন্‌জিলে উরস উদ্‌যাপন সূচনা।

'স্বপ্ন বুঝা কি অত সহজ? কত বড় বড় নবি অলিরা স্বপ্ন বুঝতে হয়রান হয়েছেন; উনিও স্বপ্ন বুঝেন'। জ্ঞানভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর তীর্যক মন্তব্য। হক মন্‌জিল এন্তেজামিয়া কমিটির তৎকালীন সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান কোম্পানী পর পর দেখা দুটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত তাঁকে জানালে বলেন, আপনাদেরকে তো আমার বড় মিঞার নিকট হস্তান্তর করেছি, সবকিছু সেখানে বলে সমাধান নেবেন। হুজরা শরিফে উপস্থিতদের মধ্যে পীরভাই মফিজুল ইসলাম বলে উঠেন, বাবাজান! স্বপ্নটাতো আপনাকে নিয়ে, অর্থটা আপনি করে দিলে ভাল হয়। এই অনুরোধের উত্তরে হুজুরের তীর্যক মন্তব্য শুনে আমরা হক মন্‌জিলে ফিরে আসি। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে স্বপ্নের বিবরণ জানালে বলেন, "প্রথম স্বপ্নটা খুবই ভাল। পরেরটা গরিবি বুঝায়। মনে হয় গরিবিটা বাবাজান আমাদের দিকেই ঠেলে দিলেন"। আপনার মহান আশ্রয়ে থাকতে ওটা (গরিবি) আমাদের কিভাবে ধরতে পারে? আমিন সাহেবের এই মন্তব্যের উত্তরে বলেন, 'কখনো এমন হয় – এটা বিধানেরই অংশ'। অতঃপর সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.) আর্জি করেন, বাবাজান! আপনি আমাদের পুনঃবায়াত গ্রহণ করুন। পীর পরিবর্তনে যেটা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে। তিনি বললেন, "বায়াত করা মানে স্মরণ রাখা, স্মরণ রাখা বড় কষ্ট। আপনাদের স্মরণে না রেখে আর কাদের স্মরণ রাখবো। এই মন্‌জিলের উন্নয়নে আপনারা বিশ জনে বিশ লাখ টাকা দিয়েছেন। আমি কি আপনাদের ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো?" আমার ধারণা মতে এন্তেজামিয়া কমিটির ২১ জনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশজনের কথাই তিনি বলেন। সাবেক সম্পাদক মফিজুল ইসলাম তার কিছু কার্যাবলীর জন্য সম্ভবত: বাদ পড়েন। মন্‌জিলের সূচনাপর্বে এ ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। সম্ভবত (১) সভাপতি- জনাব সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ – বখতপুর, ফটিকছড়ি (২) সহ-সভাপতি- জনাব আমিনুর রহমান কোম্পানী – উত্তর গুজরা, রাউজান (৩) সাধারণ সম্পাদক- জামাল আহমদ সিকদার – ছোট ছিলোনিয়া, সুন্দরপুর, ফটিকছড়ি (৪) কোষাধ্যক্ষ- জনাব সৈয়দ ওবায়দুল আকবর – বক্তপুর, ফটিকছড়ি (৫) সাজসজ্জা প্রধান- জনাব মাহবুব আলী তালুকদার – পূর্ব ফরহাদাবাদ, ফটিকছড়ি (৬) অভ্যর্থনা প্রধান- জনাব সৈয়দ নুরুল গনি – বক্তপুর, ফটিকছড়ি (৭) হাদিয়া কেন্দ্র প্রধান- জনাব

ছৈয়দুর রহমান – খিতাপচর, বোয়ালখালী (৮) ভাতপাক প্রধান- জনাব মোহাম্মদ নুরুচ্ছফা – ছোট ছিলোনিয়া, ফটিকছড়ি (৯) প্রচার প্রধান- জনাব মৌলানা মোহাম্মদ হাসান – ডাবুয়া, রাউজান (১০) মন্‌জিল সংক্রান্ত- জনাব আবু আহমদ – ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী (১১) জবেহ, মাংস কুটা ও পাক প্রধান- জনাব সৈয়দ জিয়াউল হক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী (১২) সহ-সম্পাদক- জনাব মাওলানা সৈয়দ জহুরুল কাদের আজাদ – মির্জাপুর, হাটহাজারী (১৩) বিক্রয় প্রধান- জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল – সুলতানপুর, রাউজান (১৪) সদস্য- জনাব আয়ুব আলী সওদাগর, ঘোষের চর, গোপালগঞ্জ (১৫) সদস্য- জনাব তাহের উদ্দীন সওদাগর – বাকলিয়া, চট্টগ্রাম শহর (১৬) সদস্য- জনাব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী, হারুয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি (১৭) সদস্য- জনাব কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ – ধলই, হাটহাজারী (১৮) সদস্য- জনাব আবুল খায়ের – উত্তর সর্তা, রাউজান (১৯) সদস্য- জনাব খায়রুল হক – উত্তর সর্তা, রাউজান (২০) সদস্য- জনাব আবদুল শুক্কুর, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র ঘোষণা– 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের আগে ইসলামের জন্য অর্থ ব্যয় করেছ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছ তারা এবং মক্কা বিজয়ের পর যারা একই কাজ করেছ তারা উভয়ে সমান নও। নিশ্চয়ই প্রথমদল দ্বিতীয় দল অপেক্ষা উত্তম, (সূরা– হাদিদ : ১০৩)। আল্‌ কোরআনের এই সত্যের নিরিখে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পুনর্গঠন কাজে যারা প্রথম আর্থিক ও শারীরিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন 'ঋণ অপরিশোধ্য' বলে বাবাজান তাদের কাজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটা বাস্তব সত্য যে, এই মন্‌জিলের প্রথমদিকে সাংগঠনিক খেদমতের দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলের জীবনেই দারিদ্র দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ক'জন গরীব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এদের প্রায় সকলের আত্মার উন্নতি হয়েছে। কামেল পীরগণ খোদায়ী সম্পর্ক হেতু পাপিষ্ঠ মুরিদান ও ভক্তদের পাপমুক্ত করতে শুধু ইবাদত-রিয়াযতের নির্দেশ দিয়ে বসে থাকেন না' দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ চাপিয়ে দিয়েও মুরিদানকে পবিত্র করে নেন। এ পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.) হতে চলে আসছে। আসহাবে সুফ্‌ফা (পবিত্র সঙ্গী) এই প্রক্রিয়ারই ফসল।

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার উত্তর সর্তা গ্রামের মাইজভাণ্ডারী ভক্তরা একটি দরবারী কমিটি গঠনকল্পে আবুল খায়েরের নেতৃত্বে এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌কে অনুরোধ করেন। যে কমিটির ব্যবস্থাপনায় একটি দায়রা শরিফ প্রতিষ্ঠা করে সাপ্তাহিক জিকিরে সামা ও দরবারের উরস অনুষ্ঠানাদির আনজাম দেওয়া হবে। বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ তাদের আর্জি বাবাজানকে জানালে বলেন, "গ্রামে গঞ্জে শহরে এলাকায় এলাকায় দায়রা শরিফ গড়ে তুলুন। আমি সেখানে ২০ ওয়াট, ৪০ ওয়াট ও ৬০ ওয়াট বাল্ব দেবো"। এটি গাউসিয়া হক মন্‌জিল প্রতিষ্ঠার পর প্রথম শাখা কমিটি। ক্রমান্বয়ে দেশে বিদেশে হক ভাণ্ডারীর ভক্তরা অসংখ্য শাখা কমিটি ও দায়রা শরিফ প্রতিষ্ঠা করে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও শাহানশাহ্‌ বাবাজানের শান মান প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত হন। যাদের প্রচেষ্টায় এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তারা বাবাজানের নূরী সংযোগে আলোকিত হয়েছেন। মানুষের আর্জি আবেদন তাদের মাধ্যমে দরবারে গৃহীত হওয়ায় সমাজে তারা বিশিষ্টতা অর্জন করেন। লোকমুখে তারা ফকির নামে প্রশংসিত। অতুলনীয় ত্যাগ ও সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্‌ (র.)-কে নিসবতের (একান্ত নিকট) ফয়েজ দানে 'আল্লাহ্‌র খলিল' এবং আত্মউৎসর্গীকৃত ভক্ত হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দন নিবাসী মহিউদ্দিন হারুন শাহ্‌ (র.)-কে 'বিশ্ব যুব কমপ্লেক্স প্রধান' বলে ঘোষণা করেন।

তাঁর নৈকট্য প্রত্যাশী লোকদের তিনি বিভিন্নরূপে পরীক্ষা করতেন। কাকেও ভয় দেখাতেন, কারো কাছ থেকে বড় অংকের টাকা দাবী করতেন। আবার অনেককে সালাম করার সুযোগও না দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। কারো লোভের বস্তু চেয়ে নিতেন। এভাবে মানুষকে লোভ-লালসা, ভয়ভীতি মুক্ত করে তাদের মধ্যে স্রষ্টানুরাগ জাগ্রত করে চরিত্র শুদ্ধির ব্যবস্থা দিতেন। কোরআন মতে যা ধর্মের মূল দর্শন। তাঁর এ সব কার্যকলাপ বুঝতে না পেরে অনেকে সরেও পড়তেন। খিজরী মর্যাদার আউলিয়াদের রহস্য বুঝা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত নবি হযরত মুসা (আ.) যে রহস্য বুঝতে সক্ষম হন নাই। তাঁর কোন কোন বাক্য বহু বছর পরও ফলপ্রসূ হতে দেখা যায়। তাই ভক্তদের উচিত ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা এবং বাক্য ও স্বপ্ন রহস্যের অর্থ বুঝার চেষ্টা করা। নিজে বুঝতে না পারলে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে জেনে নেওয়া। প্রতিদিন অসংখ্য লোক তাঁর নিকট ভিড় করতেন। একবার উরস উপলক্ষে শহর থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফ

আসতে অনুরোধ জানালে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “লোকেরা আমার কাছে আসে– কার সন্তান হয়না, চাকুরির প্রমোশন কোথায় ঠেকে গেছে, কার ব্যবসা মন্দা, কোন রোগ চিকিসায় সারে না, এসব প্রতিকারের আশায়। আল্লাহ্ তলবী কেউ আসে না। তাই শহরে লুকিয়ে আরামে আছি”।

এ শ্রেণির অলি আউলিয়া রহস্যময় বাক্যালাপে, ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি ও ইশারা-ইঙ্গিতে মানুষকে সুপথ প্রদর্শনে সক্ষম। ইচ্ছা করলে তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দিতেও পারেন। এঁদের সম্পর্কে আল্লামা রুমী (র.) তাঁর মসনবি গ্রন্থে আরো বলেন, “আউলিয়াদের অন্তর হাকিকী মসজিদ। তাই সেটা জগতের সেজদার কেন্দ্র। এমনি অন্তর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করো, হজ্বে আকবর হবে। এ রকম একটি অন্তর হাজার কাবা হতে শ্রেয়”।

হযরত ওমর (রা.) খোলা তরবারী হাতে মাথা কাটতে এসে রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে প্রেমের ছুরিতে নিজ মাথা কেটেছিলেন। আর চুপি চুপি ইসলাম প্রচার নয়। প্রেমাবেগে বীর ওমর আজানের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে খোলা মাঠে নামায আদায় করার সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে বলেন, ‘দুনিয়ার মানুষ দেখুক খাত্তাবের পুত্র ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে’। বেলায়তী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সে তীর-এ-নজর (দৃষ্টি-ছুরি) যোগেই শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তদের ঐশী প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর দীপ্ত চাহনীতে ভক্তদের অজ্ঞান বেহুঁশ হতে দেখা যেতো। মাইজভাণ্ডারী গানের অন্যতম দিকপাল কবিয়াল রমেশ শীল তাঁর গানে বলেন–

এক নজরে হেরে যারে – দিলের পর্দা যায় তার ছিঁড়ে
মুর্দা কলব জিন্দা হয় তার – নূরের তজল্লায়।

এক বাণীতে হক ভাণ্ডারী বলেন, “নিজের ভিতর দৃষ্টি দাও, বহির্জগতের চেয়েও অপরূপ সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে পাবে”। আল্লাহ্‌র নবি অলিরা কত বিচিত্র পথ পন্থায় মানুষের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার সৃষ্টি করেন তার ইয়ত্তা নাই। এক গভীর রাতে তিনি হুজরা শরিফের বারান্দায় পায়চারী করে গভীর দরদী কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন এক জনপ্রিয় গান।

দুনিয়াকো লাথ্ মারো দুনিয়া সালাম করে
যুগ যুগ সালাম করে বিজ্ বিজ্ সালাম করে।
দুনিয়াকি ডরায়গি তো দুনিয়া দাবায়গী।

তিনি বলেন– "মাইজভাণ্ডার শরিফে একটা মোমবাতি জ্বলছে; সে মোমবাতির আলোয় সব জায়গা আলোকিত। সে বাতির আলোয় মানুষেরা পোকার মত উড়ে উড়ে পড়ছে"। এই মোমবাতি হল মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক শক্তির ধারক যুগ প্রতিনিধি অর্থাৎ তিনি নিজে। মোমবাতির মত নিজেকে নিঃশেষে খোদায়ী রাস্তায় উৎসর্গ করে তিনি পরিণত হয়েছেন আলোর কেন্দ্রে। আলো প্রত্যাশী মানুষেরা সবকিছুর মায়া মোহ ছেড়ে তাঁর আলোকিত দয়া পেতে পোকার মত ছুটে আসছে এবং আসবে অনন্তকাল ধরে।

এ দুনিয়া মুসাফির খানা

'মানুষ বলে এটা আমার, ওটা আমার, হে মানুষ, কিছুই তোমার নয়, শুধু যা তুমি খাও, যা তুমি পরিধান কর, যা কিছু সৎ কাজে ব্যয় কর,' – আল্ হাদিস (তিরমিজী)। 'বাবাজান, আপনার নাতিন হয়েছে' একথা বলতেই তিনি যেন জ্বলে উঠলেন, 'কিসের নাতিন-ফাতিন বলছ। তুমি কি বুঝ!' তাঁর বড় মেয়ের প্রথম কন্যা সন্তান তান্‌জিনার জন্মের খবর নিয়ে ব্যাটারী গলির আস্তানায় জানালে উপরের ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণ পর শান্ত হলে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করেন, জেবুর মেয়ে হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ বাবাজান। অতঃপর বলেন, তাই বলুন।

রূপালী ব্যাংকের সাবেক জি.এম. রাউজান সুলতানপুর নিবাসী মোহাম্মদ রাশেদ সাহেব ব্যাংক মামলায় আসামী হলে দয়ার আশায় দরবারে বাবাজানের কাছে আসেন। ঘটনা বর্ণনায় বাবাজানের ছোট ভাই ডাক্তার সাহেবের আত্মীয় উল্লেখ করলে বলেন, 'এখানে আত্মীয়তা কোন ব্যাপার নয়। আপনি যেতে পারেন'। ফলে মামলায় শাস্তি হয়। আল্লাহ্‌র অলিরা পার্থিব কোন বিষয়ে উৎসাহী নয়। ঘটনা দুটো তার নজির হয়ে রইলো।

বর্ণক: মাওলানা মোহাম্মদ হাসান, পিতা- মাওলানা মুফ্‌তি অলি উল্লাহ্, গ্রাম- ডাবুয়া, থানা- রাউজান, চট্টগ্রাম।

স্বার্থের ফন্দিতে বন্দী জগতের মানব সম্প্রদায়। এ যুগের অনেকের বিশ্বাস, অর্থই সকল সুখের মূল। ধর্মের প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকলেও সে বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি নাই। স্বার্থান্ধ মানুষ ভাই বন্ধু পরিজন এমন কি জন্মদাতা মাতা-পিতাকে পর্যন্ত কষ্ট দিতে, হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না। অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ মনে

করে জগতের সকল সম্পদ তাদের জন্য; ঘুষ-দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাকিং, সন্ত্রাস যেভাবেই হোক ধন-সম্পদ কব্জা করো; ধনী হয়ে আরাম আয়েশ করো। এটাই এসব মানুষের লক্ষ্য-আদর্শ। এদের বিশ্বাস চুরির জন্য পাপ হলেও ইবাদত বন্দেগীতে পুণ্য হবে।

পার্থিব কোন কিছুর প্রতি শাহানশাহ্ বাবাজানের লোভ কিংবা মোহ ছিল না। নিজের থাকার ঘরটির কাজও সম্পন্ন করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়। মানুষের কাছ থেকে লোভনীয় বস্তু সামগ্রী অথবা টাকা নিয়ে জমা রাখতেন না। কারো কাছ থেকে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দিতেন। নিজের প্রয়োজনীয় নয় এমন জিনিসপত্রও কিনতেন। এক সাথে পঞ্চাশ হাজার, সত্তর হাজার, একলাখ এমনি করে বিপুল টাকা পুড়েছেন। তিনি বলতেন, 'সব টাকা ভাল নয়, তাই পুড়তে হয়'। একবার চট্টগ্রামের কোন এক ধনী লোককে ঢাকা যাবার সময় চল্লিশ হাজার টাকার একটা আলাদা বান্ডিলসহ এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা সঙ্গে নিতে বলেন। সে ব্যক্তির কার যোগে ফেনী পার হয়ে কুমিল্লা এলাকায় পৌঁছলে বান্ডিলটি নিয়ে রাস্তার উপর ছুঁড়ে দেন। গাড়ি থামিয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিতে চাইলে সে ব্যক্তিকে বলেন, "এ টাকা আপনার নয়; আল্লাহ্‌র টাকা, আপনার কি টাকা! বুঝতে চেষ্টা করুন, নতুবা আমি মারবো"।

কুলালপাড়ার রাজা মিঞা বলেন, একবার পাঁচশ টাকার বিপুল নোট ছিঁড়তে দেখে কাছে গিয়ে সাহস করে বললাম, টাকাগুলো না ছিঁড়ে দাদা, আমরা গরিব দুঃখীদের দিলে ভাল হয় না? উত্তরে বলেন, 'এগুলো হারামি টাকা তাই পুড়তে হয়, ছিঁড়তে হয়, ওসব তুমি বুঝবে না'।

গাউসে ভাণ্ডারীর মত তিনিও এক টাকার জিনিস বিশ টাকায় কিনতেন। এক সাথে এক-দুই-তিন লাখ টাকার কাপড়, প্রসাধনী, ইলেকট্রনিক্স খেলনা ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস খরিদ করতেও দেখা গেছে। একবার খামারের সমস্ত জমি কাঞ্চনপুরের জনৈক ব্যক্তিকে স্ট্যাম্প দস্তখত করে দিয়ে দিতে দেখে সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ স্ট্যাম্পখানা চেয়ে নেন। আঠারটা গরু কুলাল পাড়ার লোকদের জেয়াফতের জন্য দিয়ে দেন। অবশ্য পরে ভক্তরা বুঝিয়ে তাঁর অগোচরে গরুগুলো নিয়ে আসেন।

আরেকবার একটা বড় গয়াল জবেহ করে সমস্ত মাংস কুলালপাড়া ও ফরহাদাবাদের দরবারী ভক্তদের বিলিয়ে দেন। আরেকটা গয়াল জবেহ করে মাংসগুলো রোদে শুকাতে নির্দেশ দিলে তা করা হয়। এলাকার গরীবদের চুপে চুপে অনেক টাকা দিতেন। মাইজভাণ্ডার শরিফ মসজিদের দক্ষিণ বাড়ির মাওলানা আবদুল ওয়ারেসের পরিবার তখন বেশী অভাবে ছিল। তিনি কাছে গেলেই হাতে কিছু টাকা দিতেন। বোয়ালখালী থানার প্রখ্যাত অলি হযরত কাজী আছদ আলী (র.) সাহেবের বড় ছেলে মাওলানা কাজী মজহারুল ইসলাম শাহ্, নিজ মেজ বোনের দেবর হাটহাজারী থানার গুমানমর্দন নিবাসী জহুর সাহেব এবং তাঁর এককালের গৃহশিক্ষক ফটিকছড়ি থানার ধর্মপুর নিবাসী আবদুল মাবুদ পোস্টমাস্টারকে মোটা অংকের টাকা দিয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানা যায়। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ ফটিকছড়ি থানার শাহ্নগর গ্রামের নোয়াখালী নিবাসী রাস্তার মাটিয়ালদের ষাট হাজার টাকা দান করেন। ১৩৯৪ সনের শবে কদরের পরদিন সকালে দরবার শরিফ মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম ফোরকানী তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে সাক্ষাৎ করলে ছেলেটার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দেন। রিক্শা, ট্যাক্সী কার ও জীপ চালকদের কত বিপুল টাকা দিয়েছেন সে হিসাব কেউ জানেনা। বাড়িতে পথে ঘাটে শহরে বন্দরে এমনি আরো অসংখ্য লোকজনকে বিপুল টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র সর্বদা দিতেন। একবার উরসের পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা জানালার কাছে রাখলে বাড়ির সামনের এক চা দোকানের কর্মচারী চুরি করে নিয়ে যায়। পূর্ব মাইজভাণ্ডার নিবাসী এক লোকের বিবাহিতা এক মেয়ে দোয়া চাওয়ার সুযোগে হুজরা শরিফ হতে পাঁচ লাখ টাকা চুরি করে। ফলে এ গরীব পরিবারের বাড়ি-ঘরের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং জমি-খরিদ করে সচ্ছল অবস্থায় উন্নীত হয়।

পূর্ব মাইজভাণ্ডার কাজী বাড়ির অধ্যাপক কাজী ফরিদউদ্দিন আখতার বলেন, জীপ গাড়িতে করে আমরা কক্সবাজার হতে ফিরছিলাম। আমিরাবাদে বাবাজানের ইশারায় ড্রাইভার গাড়ি থামালেন। রাস্তার পাশে এক গরীব কিছু ছোট মাছ নিয়ে বিক্রির অপেক্ষায় বসা। বাবাজানের নির্দেশে মাছগুলো একটা পলিথিন ব্যাগে ভরে দিলে লোকটার হাতে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার টাকা) দিয়ে বললেন, তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য। লোকটা আবেগে চিৎকার করে 'আল্লাহ্ আছেন, আল্লাহ্ আছেন' বলে বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে। অতঃপর আমাদের

গাড়ি চট্টগ্রামের পথে আবার চলতে শুরু করে। ঘটনাটি ঘটে ১৯৮২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি।

তাঁর হুজরা থেকে একবার স্থানীয় এক লোক সাড়ে তিন হাজার টাকা ও একটি দামী হাতঘড়ি চুরি করলে এলাকার চেয়ারম্যানকে ডেকে শাস্তি দিতে বলেন। চেয়ারম্যান সাহেব শাস্তির প্রস্তুতি নিলে তিনি এসে বলেন, এই টাকায় একটা নখ উল্টে গেলে তাও ঠিক করা যাবে না, ছেড়ে দেন। চোরকে স্নেহভরা কণ্ঠে বলেন, মামু সাহেব, বাড়ি গিয়ে আরাম করুন। এসব কাজকর্মে অসন্তুষ্ট তাঁর এক আপনজন ক্ষোভের সাথে বলেন, 'বিনা পরিশ্রমে মোটা অংকের টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়ার সুযোগ দিয়ে কিছুসংখ্যক লোককে তিনি অতি লোভী করে তুলেছেন। তাই যেখানে যান মাছির মত ওরাও সেখানে হাজির। অথচ পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচের প্রতি থাকেন উদাসীন। হুজরা শরিফ মোজাইক দিয়ে সুন্দর করে পাকা করার অনুমতি চাইলে বলেন, "কি হবে অত পাকা করে, এ দুনিয়া তো মুসাফিরখানা! হুজরা শরিফ নির্দিষ্ট কোন জায়গা নয়। আউলিয়ারা এক এক সময় এক এক স্থানে বিরাজ করেন"। তাঁর একথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র অবস্থান সম্পর্কিত বর্ণনার সাথে মিলে যায়। যেহেতু অলিরা বাকাবিল্লাহ্ অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে থাকেন "কুল্লা ইয়াউমীন হুয়া ফি শান" অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রত্যহ নিত্য নতুন অবস্থায় বিরাজ করেন" (সূরা রাহমান : ২৯)।

চাষের কর্মচারী জহুর চার বছর দায়িত্বে ছিল। তার ভাষ্য– একবার খুব সকাল বেলায় গরুর গাড়িতে মা জানের আদেশে ভিতর বাড়িতে কিছু মাটি আনছিলাম। গাড়ি হুজরার পাশে আসলে বাবাজান হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে আসেন। আমি গাড়ি থামিয়ে সালাম করলাম। আমাকে বলেন, "কষ্ট করবেন না। কার আদেশে কেন মাটি এনেছেন"। বললাম, মেয়ে মেহমানদের থাকার জন্য একখানা ঘর তৈরি করতে হবে; বখ্‌তেয়ার মামা বলেছেন। তিনি বলেন, "এখানে কেউ মেহমান নয়; রিফুজী চিনেন? আমরা সবাই রিফুজী মাত্র। মিথ্যা বলো কেন? ভয়ে মা জানের কথা বলি নি। "এখানে আমার হুকুম ছাড়া কিছু করবে না। গরুকে মারধর করো?" উত্তর দিলাম, 'জী, না'।

আমার ত্বরিকা দুই পয়সার নয়

দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থল মোহনা-নদী যেখানে সাগরে মিলিত হয়, সে স্থল মাছের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পাশেই গড়ে উঠে পলিময় উর্বর চরাঞ্চল, চাষীর স্বর্ণ-ফসলা ভূমি। আবার যোগাযোগ সুবিধা হেতু সে স্থানেই গড়ে উঠে সভ্যতার কেন্দ্র প্রসিদ্ধ নগর বন্দর। অধ্যাত্মিক শক্তির মিলনও তদ্রুপ। ত্রিধারা শক্তি সমন্বয়ে এ মহাপুরুষ এক অনন্ত আধ্যাত্ম শক্তি কেন্দ্র। তাই বিশ্বব্যাপী তাঁর কার্যকরী প্রভাব প্রমাণিত। তিনি আহমদীয়ুল মসরব মজ্‌জুবে সালেক অলি-উল্লাহ্। দীপ্ত, বিভোর ও শান্ত স্বভাব ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছাগত। চরম জজ্‌বা ও ভাব-বিভোরতা হতে মুহূর্তে স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় আসতে সক্ষম ছিলেন। কুত্‌বিয়ত ও গাউসিয়াত উভয় মর্যাদা অর্জন করাতে তিনি হলেন বেলায়তের সর্বোচ্চ অধিকারী 'সাহেবে মাকাম অলি-উল্লাহ্'। প্রতিদিন শত সহস্র জজ্‌বার দীপ্তিতে তিনি প্রদীপ্ত হতেন।

পিতার নিকট হতে আনুষ্ঠানিক খেলাফত লাভ করে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র হুজরায় শুরু হয় তাঁর বায়াতের (দীক্ষা) কাজ। প্রথম দিন কয়েকশত লোক তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। কুমিল্লা জেলার দোখাইয়া চাঁদপুর নিবাসী খাদেম রুহুল আমিন তাদের মধ্যে একজন। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে আরও কিছু লোক তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। গাউসিয়া হক মন্‌জিলে হিজরতের পর আমাদের জানামতে অনধিক ৫০ জন তাঁর নিকট বায়াত হন। হাটহাজারী থানার মির্জাপুর নিবাসী মাওলানা সৈয়দ জহুরুল কাদের আজাদ, ফটিকছড়ি থানার বক্তপুর নিবাসী সৈয়দ মুজিব উদ্দৌলাহ্ ও সৈয়দ কামরুল আহসান, রাউজান থানার সুলতানপুরের মোহাম্মদ ইসমাইল, গোপালগঞ্জের ঘোষেরচর নিবাসী আয়ুব আলী শেখ মুরিদানের ক'জন। একই দোয়া দরুদ নয় লোকভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে তিনি বায়াত করেন। ১৯৭৮ সালের শেষভাগে এই গতানুগতিক ধারায় বায়াত করা বন্ধ করে দেন। ফলে পরবর্তী সময়ের কিছু ভক্তের ধারণা যে তিনি কখনো সরাসরি বায়াত-মুরিদ করেন নি, আশা করি তারা নিজেদের ভুল শুধরে নেবেন।

মিরসরাই নিবাসী ভক্ত চৌধুরী মোহাম্মদ ইয়াসিন বিল্লাহ্ বলেন, বাবাজান তো বায়াত নেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন আমার কী হবে? একথা মনে ভাবতে ভাবতে

একদা হুজরা শরিফের বন্ধ দরজায় গিয়ে তাযিমী সিজদা আরজ করি। অট্টহাসিতে দরজা খুলে বলেন, "এই দরবারে ভক্তি বিশ্বাসে যারা আসে সবাই মুরিদ"। তখনি বাবাজানের সাক্ষাতে আসেন পূর্ব মাইজভাণ্ডার নিবাসী তাঁর আত্মীয় ও ভক্ত কাজী ফরিদ উদ্দীন, সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.), জনাব এম.এ. মান্নান (গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ১৯৯৬–২০০১), জনাব নুরুল আলম চৌধুরী (১৯৭৩ ও ৮৬ সালে ফটিকছড়ি হতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য) সঙ্গে আরও কিছু লোকজন। আরেকবার মুরিদ হতে আসা একদল লোককে লাঠি হাতে তেড়ে উঠে বলেন, "এখানে আমরা কি শিশুদের মত খেলাধুলা করছি? ওসব মন্ত্রতন্ত্র করার সময় নেই। ভয়, বিশ্বাস ও আদবের সাথে যারা এই দরবারের ঘেরার মধ্যে প্রবেশ করবে; সকলে মুরিদ। বুঝলে?"

তথ্যসূত্রঃ হাজী নছু মিঞা, পিতা- মৃত আমির হোসেন ফকির, কুলালপাড়া, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

ত্বরিকা সম্পর্কে তিনি ডায়রীতে লিখেছেন, "একটি আর্জেন্ট (Urgent) ত্বরিকা নিলাম। আমি যে কাজটা করি কড়াভাবেই করি এবং তাতে উপকার আসে। যেমন কাউকে মারতে ধরলে বেশী মারি খামাকা মারি"। বিশিষ্ট ভক্ত মুরিদ হাটহাজারী উপজেলার ধলই নিবাসী কাজী মোহাম্মদ ইউসুফকে বলেন, 'বুঝিয়ে লোকদের দরবারে আনতে না পারলে ছেঁচে দুকে অর্থাৎ মেরে পিটে হলেও আনবে"।

জীবনী পাঠে জানা যায়, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) অল্প কয়েকজনকে সামনে বসিয়ে মুরিদ করেন। অধিকাংশকে ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে ফয়েজ দান করেন। গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী কোন ব্যক্তিকে দস্তে বায়াত করেছেন বলে জানা যায় না। ফকির রমেশ শীলের ভাষায়, 'ঢেলি চালায় দিলে দিলে' অর্থাৎ স্বপ্ন ও বাস্তবে নানা কৌশলে মানুষকে তিনি সংসার এর মায়ামোহ মুক্ত করেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার কামেল অলিরা মজলিশ মাহ্‌ফিল করে লম্বা চাদর টেনে বায়াত করার আনুষ্ঠানিকতার চাইতে সংসার মায়ায় আবদ্ধ পাপীদের পাপমুক্ত করাতেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আশেক ভক্ত ও অতিথিদের আবাসিক সমস্যা নিরসনে

এন্তেজামিয়া কমিটি ১৯৮৩ সালে একটি পাঁচতলা ভবনের নক্‌শা তৈরি করে বাবাজানকে দেখিয়ে নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলে বলেন, পাঁচতলা নয় ছয়তলা করুন। প্রকৌশলীর পরামর্শে সাময়িক বিরতি দিয়ে সেই নক্‌শা মতোই ছয়তলা নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। বাবাজানের নির্দেশে নির্মিত এই ভবনের ভিত্তি দেন সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.) ১৯৮৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ৯ পৌষ অর্থাৎ বাবাজানের খোশরোজ শরিফের আগের দিন। একই সালে ৯ সেপ্টেম্বর নির্মাণাধীন ভবনের জানালার গ্রীলের নক্‌শা বাছাই করতে দেখা করলে বখ্‌তেয়ার শাহ্‌কে বলেন, ছয়তলা, ছত্রিশ কক্ষ, বাহাত্তর দরজা, নিরানব্বই জানালা করে বিল্ডিংটা তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। নির্মাণ কাজে নিয়োজিত মিস্ত্রীদের এক সকালে দোকান থেকে চা নাস্তা আনিয়ে নিজ কাপের চা প্রত্যেক কাপে কিছু কিছু ঢেলে বাকি অংশ নিজে পান করে বলেন, এটার সাথে লাগিয়ে পশ্চিম পার্শ্বে এমনি আরেকটি বিল্ডিং করলে খুবই সুন্দর রাজবাড়ি রাজদরবার হবে। তিন তলার কাজ চলার সময় জানতে চান বিল্ডিং কি ছয়তলা কমপ্লিট হয়েছে? অতঃপর বলেন, "এ বিল্ডিংয়ের সবখানে আমি থাকবো। এটা ডি.সি. অফিস – ডিভিশনাল কমিশনার অফিস। ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশনাল মার্শাল ল' অফিস"। আল্লাহ্‌র কালামে পাক পবিত্র কোরআন যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময় বাণী গ্রন্থ তদ্রুপ আল্লাহ্‌র অলিদের কথা, ইঙ্গিত ও আচরণ। তাঁদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত উপযুক্ত ব্যক্তিরাই এসবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে পারেন। বাবাজানের প্রধান খলিফা হযরত সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.) এই বাক্যরহস্য উন্মোচনে বলেন, যেহেতু বাস্তবে অতিথি ভবন তেমন নয়; তাই এগুলো বাবাজানের রহস্যময় কালাম। পবিত্র কোরআনে দেখা যায় আল্লাহ্ ছয়দিনে জগতসমূহ সৃষ্টি করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য নামে মানবদেহে ছয়টি রিপু রয়েছে। এই রিপুগুলোকে সাধনাবলে পরিশুদ্ধ করে কাজে লাগাতে পারলে মানব চরিত্র হয় উন্নত সুন্দর অনুপম। মানুষের দেহে ছয়টি লতিফা বা আলোক কেন্দ্র রয়েছে। জিকির বা খোদা স্মরণে সাধক এসব কেন্দ্রে ধ্যান করে থাকে। রূহানী বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য লতিফাগুলো সিঁড়ি বা ধাপ স্বরূপ। সাধক ধাপে ধাপে এসব সিঁড়ি মাড়িয়ে স্বয়ং স্রষ্টা প্রভুর সাথে মিলন আনন্দে ধন্য হন। সঙ্গীতের রাগের সংখ্যাও ছয়টি। বিভিন্ন ধর্মীয় সঙ্গীত চর্চায় সাধকগণ আত্মার উন্নতি লাভ করে থাকেন। সকল ধর্ম সম্প্রদায় বুঝাতে

বাংলা কথ্য ভাষায়, 'ছত্রিশ জাতি' বলে উল্লেখিত হয়ে থাকে। গানের রাগিনীর সংখ্যাও ছত্রিশ। তাঁর দরবার পাকের প্রতি বিশ্বাসী সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের মুক্তির ইঙ্গিতবাহী এই ছত্রিশ সংখ্যা।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, হযরত ঈসা নবির (আ.) উম্মত ৭২ ফের্‌কায় বিভক্ত, আমার উম্মতগণ ৭৩ ফের্‌কায় (দলে) বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে সৎ কর্মশীল একটিমাত্র দল (ফের্‌কা) বেহেশ্‌তী। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) খোদায়ী কুদরতের সাক্ষী, উম্মতের সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। আপন উম্মতকে দলাদলির হলাহল হতে বাঁচাতে এটি নিশ্চিত এক সতর্কবাণী। তিনি পাপী উম্মতের ক্ষমার জন্য একদা পাহাড়ে গিয়ে 'ইয়া উম্মতি' 'ইয়া উম্মতি' বলে ক'দিন ধরে কাঁদতে থাকলে হযরত মা ফাতিমা (রা.) নিজ স্নেহের দু'সন্তানকে পিতার পাপী উম্মতের ক্ষমার জন্য উৎসর্গ করার বিনিময়ে ক্ষমা মন্‌জুর করিয়ে নেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় কারবালার যুদ্ধে শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সহ মোট শহীদের সংখ্যা ৭২ জন। বাবাজান কি কারবালার শহীদদের স্মরণে মুক্তির ইঙ্গিত করেন? এই বাহাত্তর কি মুক্তির বুলন্দ দরওয়াজা? ৯৯ সংখ্যা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূলের (দ.) গুণবাচক নাম। এসব নামের যে কোন একটি পাপীদের মুক্তির উপায় হতে পারে। 'আল্লাহ্' শব্দটি তিনি আজীবন গভীর দরদভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে চিরকালীন মিলনলগ্ন অর্থাৎ ওফাতের সময়ে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন আশেক ভক্তদের আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করতে নির্দেশ দিয়ে নিজেও 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জিকির করতে করতেই 'আল্লাহ্‌র' স্থায়ী মিলনে ধন্য হন। তাই 'আল্লাহ্' জিকির তাঁর আশেক ভক্ত মুরিদানের জন্য সার্বক্ষণিক হওয়া উচিত। তাঁর মহান বাণীর আরও ব্যাপক তাৎপর্য থাকতে পারে যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে বলে আলোচনার ইতি টানেন সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.)।

১৯৯৪ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে একবার দরবারের সাংগঠনিক কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার কয়েকটি গ্রাম সফর করি। সঙ্গী ছিলেন শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফের প্রধান খাদেম হাফেজ মাওলানা আবুল কালাম ও চৌধুরী মোহাম্মদ ইয়াসিন বিল্লাহ্। ওরাইল বাজারে যাওয়ার পথে তিতাস নদী নৌকায় পার করে ১০/১২ বছরের এক কিশোর ও তার বয়স্ক পিতা। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে শুনে কিশোরটি কৌতূহলী হয়ে

জানতে চায়। আমরা কোথা হতে এসেছি কোথায় যাব? চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার শরিফের নাম শুনে বলে উঠে আমরাও ভাণ্ডার শরিফের মুরিদ। হাফেজ সাহেব ভাণ্ডার শরিফ কবে গেছে কার মুরিদ প্রশ্ন করলে বলে কখনো যাই নি। তাহলে মুরিদ কিভাবে হয়েছে পুনঃ প্রশ্ন করলে বলে, নৌকা পারপারে সারাদিন বাপ বেটা যা রোজগার করি কোনরকমে পরিবারের খাওয়া পরা চলে। যাওয়া আসার ভাড়ার টাকা জমাতে না পারায় এখনো যেতে পারি নি। সামনে কোন সময় যাবার আশা। ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করে– যেতে হয় নাকি, বিশ্বাস করে মনে লইলে হয় না? না দেখেই সকলে আল্লাহ্‌কে মানে না, বিশ্বাস করে না? আমরাই তেমনি না দেখেই মজনু বাবাকে (শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী সে এলাকায় এ নামেই অধিক পরিচিত) মনে বিশ্বাস করে মুরিদ হয়েছি। নিরাপত্তার জন্য নৌকা পারাপারে বার বার আল্লাহ্‌ ও মজনু বাবার নাম লই। ছেলের কথার সাথে তার পিতাও মাথা নত হাত জোড় করে বাবাজানের উদ্দেশ্যে ভক্তি জানায়। তাদের ভক্তি বিশ্বাসের বর্ণনায় আমরা কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে পড়ি। কারণ এটা আমাদের জীবনে অভূতপূর্ব ঘটনা। দূর-দূরান্তরে, দেশ বিদেশে কত ভক্ত-আশেক তাঁকে এভাবে মানে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে তা কেউ জানে না। মানব জাতিকে তিনি এই বলে আহ্বান জানান, "আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার এ করুণাধারা জীবন মরণ হাশর পর্যন্ত"।

মধ্য জীবনের সাধনকালে তিনি জজ্‌বাহালে উর্দু ভাষায় বলতেন, "হামারা ত্বরিকা দো পয়সা কা নেহী, বহুত বড়া হ্যায়"। সাধনায় চূড়ান্ত অর্জন শেষে শান্ত অবস্থায়ও প্রায় বলতেন, "আমার ত্বরিকা দুই পয়সার নয়, কোটি কোটি গুণ বড়"।

তথ্যসূত্রঃ ছৈয়দুর রহমান, পিতা- আমির আলী, গ্রাম- খিতাবচর, থানা- বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ– এমনি অসংখ্য প্রশংসামালায় জড়িয়ে যাঁদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়, তাঁরা কোন কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, চিন্তাবিদ অথবা ক্ষেত্র বিশেষের গুণী ব্যক্তিত্ব, সৃষ্টির কণামাত্র সত্যের আবিষ্কারক, দর্শক ও প্রকাশক। অথচ কবির পর আসেন মহাকবি, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোন অজানা সত্য পরবর্তী আবিষ্কারে অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়। উদ্দেশ্য হাসিলে লক্ষ কোটি মানুষ হত্যার নির্দেশদাতা ঘাতক রাজনীতিবিদ

হয়ে যায় বিজয়ী বীর, মহান নেতা। আজকের কোন মহৎ চিন্তাচেতনার ফসল ভবিষ্যতে হয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ বাতিল। তাই নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, "জ্ঞান সমুদ্রের উপকূলে দাঁড়িয়ে সারা জীবন নুড়িই কুড়ালাম মাত্র। অনন্ত সাগরের মণিরত্ন সংগ্রহ ভাগ্যে জুটলো না"। মহাসত্যের যাঁরা দ্রষ্টা, সাধক, তাঁদেরকে করা হয় অবজ্ঞা, অবহেলা। এমনকি অনেকের উপর যুগে যুগে দেশে দেশে চলেছে চরম জুলুম নির্যাতন ও হত্যা। যুগে যুগে এসব প্রতিনিধি (নবিগণ) ও তাঁদের মর্মধারী উত্তরসূরি সাধক আউলিয়ারা নীতিহীনতার ঘোর অন্ধকার হতে মানব-জাতিকে যুগভিত্তিক মত ও পথে মুক্তির করুণালোকে পৌঁছিয়ে দেন। সভ্যতার ভিত্ যাঁদের গড়া সে সব মহাসত্যের নায়কদের মানবজাতি কখনো অভিন্নভাবে শ্রদ্ধা জানাতে পারে নাই। এটা বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। একজন বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা নেতার স্মরণ অনুষ্ঠানে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনা কী তার ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা শ্রেণি। শুধু এঁদের ব্যাপারেই তোলা হয় যত সব বিভেদের প্রাচীর। মত পথ ও বিশ্বাসের ভিন্নতার প্রশ্নে খোঁজা হয় বিভিন্ন অজুহাত, তাঁদের জন্ম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের যুক্তিগ্রাহ্যতা নিয়ে। যে কোন ধর্মানুসারী মাত্রই বিশ্বাস করে মহাপ্রতিপালক প্রভু একক ও অদ্বিতীয়। রাব্বুল আলামীনে বিশ্বাসী মুসলমানরাও স্রষ্টার সর্ব বিরাজমানতার পরিধি অনুসন্ধান করে না। মুসলিম আলেমগণ হাদিসের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, 'শেষ যুগের আউলিয়া ও বনি ইসরাইলের নবিরা মর্যাদায় সমান'। অথচ সে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে চরম অনীহা ও অবহেলা। পবিত্র কোরআনের সূরা মরিয়মে হযরত ইয়াহিয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিবসকে কল্যাণকর ও শান্তিময় দিন বলে ঘোষিত (আয়াত ১৫ ও ৩৩)। নবি অলিদের জন্ম-মৃত্যুর দিন খোশরোজ ও উরস শরিফ কিছুসংখ্যক আলেমের দৃষ্টিতে বেদায়াত। আল-কোরআনেরই ঘোষণা, আল্লাহ্‌র শত পবিত্র নামের এক নাম 'অলিউন' এবং 'কুনু মায়াস্ সদিকিন' – সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। ভিন্নমতবাদী আলেমগণ কোরআনের এসব তত্ত্বের সঠিক অর্থ তালাশ করে না। চির রহস্যময় অদৃশ্য স্রষ্টার বাণীকে জ্ঞানের সন্ধানী আলোকে খুঁজতে হয়।

সকল জাতি ও সর্ব ধর্মের ধর্মীয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার এবং সকলের গ্রহণ উপযোগী সহজতম পথই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার দর্শন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত বন্ধু আউলিয়ারা স্রষ্টার অবারিত কৃপা ভাণ্ডার। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁদের আজ্ঞাবহ ও অনুগৃহীত। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে মানুষের উচিত সম্মিলিত উদ্যোগে

তাঁদের স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ্ মানবজাতিকে শিখিয়ে দিচ্ছেন– 'নিশ্চয় (আমি) আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাগণসহ নবির সম্মানে দরূদ সালাম পেশ করছি; অতএব হে বিশ্বাসীগণ, তোমরাও তাঁর সম্মানে দরূদ সালাম পেশ কর' (সূরা আহযাব : ৫৬)।

১৯৭৬ সালে খোশরোজ শরিফ উদযাপনের প্রস্তুতি পর্বে জ্ঞানভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর অনুমতি চাইলে বলেন, 'মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে আমার বড় মিয়ার অবস্থান। তিনি বাবাজান কেবলার মসলকের অলি। বাবাজান কেবলা গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও মতিউর রহমান শাহ্ সাহেবের (র.) খোশরোজ তো হয়; তাই আমার বড় মিঞার খোশরোজও হতে পারবে'। অনুষ্ঠানে জীবনী আলোচনার অনুমতি চেয়ে জন্মকুষ্ঠি (ঠিকুজি) হাতে দিলে বাংলা বর্ণনাটি পাঠ করে ছিঁড়ে ফেলেন; সংস্কৃত ভাষার বর্ণনাটি আমাদের নিকট সংরক্ষিত। শাহানশাহ্ বলেন– "এসব অনৈসলামী প্রথা, ভাল নয়। আমাকে বুঝতে হলে কোরআন দেখ"। অতঃপর খোশরোজ শরিফের পোস্টার ছাপিয়ে তাঁকে দেখালে পোস্টারের মাঝখান থেকে গুরুগভীর কণ্ঠে প্রথম পাঠ করেন, 'মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে', অতঃপর গোটা পোস্টারটি পাঠ করেন। ১০ পৌষ জন্মদিনের এ অনুষ্ঠান প্রতি বছর উত্তরোত্তর বর্ধিত কলেবরে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

আমার পরে তারা আমার কবিতা পড়বে,
হৃদয়ঙ্গম করবে এবং বলবে;
নিজের খুদীকে জেনেছিল যে মানুষ
পৃথিবীতে সে বিপ্লব এনে দিয়ে গেছে। – ইকবাল

বিশ্ব অর্থনীতিতে গণমুখী সংস্কার

খ্রিস্টিয়ান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীর কিডনীর চিকিৎসার্থে ১৮-৯-৯৯ তারিখে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেলোর পৌঁছি। দু'সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করি। একদা দুপুরে লজের (হোটেল) সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দেখলাম দোতলার চিলেকোঠায় ষাটোর্ধ বয়সী লজের ক্লিনার মহিলাটি কাঁচা মরিচ দিয়ে দুপুরে পান্তা ভাত খাচ্ছে। রুমে গিয়ে স্ত্রীকে মহিলার জন্য রান্না করা মাছ দিতে

অনুরোধ করলাম। 'জাত পাতের বাধা' আমাদের খাবার খাবে না, স্ত্রী আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মহিলা দিনভর লজে ক্লিনারের কাজ করে অপরের জন্য সুন্দর পরিবেশ রচনা করে। কিন্তু তার জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে না। এই পতিত জনগণের সুখী জীবনের কথা বলেই তো ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ভারত দু'দেশ স্বাধীন হয়েছিল। পরাধীন আমলে শিশু বয়সে সে মহিলা হয়তো এর চেয়ে ভাল খাবার খেয়েছে। বয়সের ষাট পেরিয়ে যখন তার খাওয়া-থাকা ও স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চিত নিরাপত্তা প্রয়োজন তখন দিন ভর খেটেও তার জীবন যথার্থ নিরাপদ নয়। ৫০ বছরের স্বাধীনতা এদের জন্য কিছু কি করেছে? ভাগ্য বদলের জন্য ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ওরা ১৩ বার ভিন্ন ভিন্ন দল ও নেতাদের ভোট দিয়েছে। স্বাধীনতা নেতাদের করেছে রাজা-মহারাজা, দুনিয়ার রাজভাণ্ডার তাদের হাতের মুঠোয়। তদুপরি তাদের ব্যক্তিগত বাড়ি, গাড়ি, রাজখানা, আরাম আয়েস সবকিছু হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সকল দেশের অবস্থা প্রায় একই।

পূর্ব থেকে চলে আসা পুঁজিবাদী-অর্থব্যবস্থায় অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত জাতি দেশ সমূহের অবস্থার উন্নয়নে জাতিসংঘের অধীনে পরপর গঠিত হয় ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, ফাও ইত্যাদি সেবামূলক সংগঠন। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য সেবা ও গরীব জনগণের অবস্থার উন্নয়নে এসব সংস্থা দেশে দেশে সরকার ও সরকারি এজেন্সীসমূহকে বিপুল সাহায্য সহযোগিতা, অনুদান ও পরামর্শ দান করে। ১৯৭০ ও ৮০ এর দশকে এসব সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হলে ফলাফল দাঁড়ায় নৈরাশ্যজনক। বিশ্বজনমনে প্রশ্ন সেবা সংস্থাগুলোর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিদেশী সাহায্য কাদের পেটে গেল। তবু কেন পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো দাস – অভাবের, অশিক্ষার, শ্রমের বঞ্চনার ও অবমাননার?

স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি মানুষ। তাই এত বিপুল সংখ্যক মানুষের এই মানবেতর জীবনযাপন নিশ্চয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। কোন ধর্মগ্রন্থে শোষণ লুণ্ঠনের পক্ষে একটি বাণীও দেখা যায় না। হযরত মুসা নবি সম্রাট ফেরাউনের অত্যাচারে স্বদেশ মিশর ছেড়ে আরবের সিনাই উপত্যকায় নিজ গোত্র বনি ইসরাইলীদের নিয়ে হিজরত করলে তাদের কষ্ট লাঘবে পরম করুণাময় আল্লাহ্ বেহেশ্ত হতে সুস্বাদু তৈরি খাবার 'মান্না' ও 'সাল্ওয়া' প্রেরণ করেন। সতর্ক করা হয় যেন এসব খাবারের কোন অংশ জমা করা না হয়। কেউ কেউ লোভের

বশবর্তী হয়ে জমা করলে জমাকৃত খাবার পচে ভীষণ দুর্গন্ধ হয় এবং খাদ্য চালান আসাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খাদ্যের অভাবে তারা দূর-দূরান্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। হযরত ঈসা (আ.) ধন সঞ্চয়ে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেন। ইঞ্জিল শরিফে বলা হয়েছে, 'সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাতায়াত যত না কঠিন তার চেয়ে অধিক কঠিন কোন ধনী লোকের বেহেশ্তে প্রবেশ'।

পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরার প্রথম আয়াত– আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন অর্থ: সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র। যিনি সকল জগতের স্রষ্টা। অন্য কোন ভাষায় আরবি 'রব' শব্দটার এক শব্দে কোন প্রতিশব্দ নাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত লেক্সিকনে এ শব্দটার ভাব ও ব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (Creator, Sustainner, Evolver) সৃজনকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তন কর্তা। তিনটি ধারায় এই সৃজন পালন ও বিবর্তনের কাজ চলছে। (ক) প্রাকৃতিকভাবে জল ও স্থল যে সব উদ্ভিদ গাছপালা, জীবজন্তু, পশু পাখি, শস্য ও ফলাদি জন্মে (খ) মানুষকে প্রদত্ত বুদ্ধি ও কৌশলে এসব কৃষিজ, বনজ, খণিজ ও বায়বীয় সম্পদকে কলে কারখানায় নিত্য নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। (গ) আল্লাহ্র কোন বিশেষ কুদরতি কৌশলে। পবিত্র কোরআনের সূরা সাবা আয়াত ১০–১৩, সূরা হাদীদ ২৫ আয়াত, সূরা নাহল ৮১ আয়াত হতে জানা যায়, আল্লাহ্ তায়ালা নবিদের মাধ্যমে মানব জাতিকে গৃহ নির্মাণ, কাপড় বুনন, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, যুদ্ধের লৌহ নির্মিত বর্ম, মালামাল পরিবহনের জন্য চাকাবিশিষ্ট গাড়ি ও লৌহনির্মিত সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ তৈরিকরণ ইত্যাদি শিল্পকর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। যেখান থেকে পরবর্তীকালে জ্ঞানের বিকাশে মানুষ বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েছে। সৃষ্টির মৌল পদার্থ মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস তো আল্লাহ্রই সৃষ্টি, কোন মানুষের নয়। কৃষি কাজে মানুষতো শুধু বীজ চারা রোপণ ও পরিচর্যা করে, ফল তো আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি। তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তোমরা বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে। আমরা সব হারিয়েছি' (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৬৩–৬৭)। অনুকূল জলবায়ু, খরা, অনাবৃষ্টি, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দাবদাহ ও ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অনুকূল পরিবেশ

প্রতিবেশ কোন অঞ্চল বা দেশের উৎপাদন ও বিলি-বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ এসব দেখে শুনেও সতর্ক হয়না। বরং মনে করে আমার অর্জিত সম্পদ আমি এবং আমার আপনজনেরাই তো ভোগ করার অধিকারী। কেউ কেউ ধর্ম নীতিবাক্য কিছুই মানেনা। যারা ধার্মিক তারাও সম্পদের ভোগ বিলাসের লোভ ছাড়তে পারেনা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট ঘোষণা, "তোমাদের ধনীদের মধ্যে অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় হোক তা আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না" (সূরা হাশর : ৭)। "বলুন ..... আমি (রাসূল) তোমাদের মধ্যে বিচার-বণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আদেশপ্রাপ্ত" (সূরা শুরা : ১৫)। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আদর্শ বাস্তবায়নে রাসূল করিম (দ.) কর্তৃক আরবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পদের উন্নত ভাগ বাটোয়ারার যে নীতিমালা প্রচার করেন তা-ই ইসলামী অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে শুধু পুরুষ নয়, মেয়েদেরকেও পিতা ও স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশীদার করা হয়। ইতিপূর্বে অন্য কোন ধর্মে মেয়েরা সম্পত্তির ভাগিদার ছিল না। এই অর্থনীতিতে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন, সুদের অবৈধতা, এক বছরের অতিরিক্ত সময় জমা থাকা সম্পদের উপর যাকাত নির্ধারণ, দান ও কর্জ প্রদানে উৎসাহিত করা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঘাম শুকানোর পূর্বে প্রদানের নির্দেশ ইত্যাদি এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণার্থে তিনি মসজিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ ছিল মুসলমানদের সামাজিক মিলন কেন্দ্র। বিচার প্রশাসন ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম ছিল মসজিদভিত্তিক। সর্বোপরি গরীব, দুঃখী, অনাথ, পঙ্গু, ভবঘুরেসহ সকল শ্রেণির মানুষের অভাব বিমোচনে তিনি 'বায়তুল মাল'-গণ ধনভাণ্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এভাবে তিনি মানুষের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর আমীরে মুয়াবিয়া কর্তৃক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বায়তুলমালের গণসম্পদ ব্যক্তি সম্পদে পরিণত করেন। ফলে দুনিয়ার বুক হতে বিলুপ্ত হয়ে যায় সর্বকালের সর্বোত্তম সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক এক অনুপম শাসন ব্যবস্থা। এভাবে ব্যর্থ না হলে ক্রমবিকাশমান ইসলামী শাসন ও অর্থনীতির বিলি-বণ্টনে দুনিয়ার গরীব-দুঃখী মানুষেরা কতই না উপকৃত হত! এই প্রকাশ্য ব্যবস্থা লুপ্ত হলেও গোপন আরেকটি ব্যবস্থা বহাল থাকে।

"তোমরা রব্বানী হয়ে যাও" (সূরা আল ইমরান: ৭৯)।

"তোমরা কি দেখনা? মহাকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশের অধীন করেছেন এবং আল্লাহ্র প্রকাশ্য ও গোপন সকল নিয়ামত (দান বা উপহার) তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করেছেন?" (সূরা লোকমান: ২০)। আল্লাহ্র এই আহ্বান সার্বজনীন হলেও সকলে এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনা। কষ্টকর সাধনায় যারা নিজেদের সমস্ত পাপ কালিমা মুক্ত হয়ে পরম পবিত্রতায় উন্নীত হন শুধু তাঁরাই আল্লাহ্র এমন গুণাবলিতে বিভূষিত হন।

পবিত্র বাইবেল ও কোরআনে নবি ও অলিদের এরূপ ক্ষমতার বহু বর্ণনা রয়েছে। মন্ত্রী পরিষদ সদস্য আসেফ বিন বরখিয়া কর্তৃক রানী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে হযরত সোলায়মানের রাজ দরবারে নিয়ে আসা, হযরত মুসা নবির লাঠি সাপ হয়ে বাদশাহ্ ফেরাউনের যাদুর সমস্ত সাপ খেয়ে ফেলা, লাঠির আঘাতে নীলনদ রাস্তা হলে নিরাপদে সগোত্রীয় অনুসারী দলসহ হযরত মুসা (আ.) নিরাপদে পার হয়ে যাওয়া, একই রাস্তায় পার হতে গিয়ে ফেরাউন সসৈন্যে ডুবে মরা, হযরত ঈসার (আ.) হাতের ছোঁয়ায় দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগী ভাল হওয়া এবং হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে টুকরা করা ও মেরাজ ঊর্ধ্বগমনে আল্লাহ্র অপূর্ব মিলনে ধন্য হওয়া এসবের ক'টি। দীর্ঘ নবিযুগের পর আল্লাহ্র অলিদের দ্বারা এই ক্ষমতার ধারাবাহিকতা পরবর্তীকালেও বহাল রয়েছে।

'খোদার সকল রাজ্য আমার
মোর হুকুমে সব তাঁবেদার'।
'আল্লাহ্র এই নিখিল ধরা, ক্ষুদ্র হেরি সর্ষে সম
মিলনক্ষণের আবেশ বেসে, যখন ক্ষেপি দৃষ্টি মম'।

গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) নিজ রচিত কসিদায় এভাবে তাঁর জগতজয়ী খোদায়ী শক্তির বর্ণনা দেন। হাড় মাংস পচে যাদের কবরের কোন চিহ্নও ছিল না তেমন মৃতদের তিনি 'আমার হুকুমে জীবিত হও' বলার সঙ্গে সঙ্গেই জীবিত হয়ে যেত। বার বছর পূর্বে নদীতে নৌকাডুবিতে নিহত বর যাত্রীকে পুনর্জীবিত করা তাঁর এক বহুল আলোচিত কেরামত।

আল্লাহ্‌র অলিদের এই ক্ষমতার বর্ণনাই সুফি কবি ডক্টর আল্লামা ইকবালের কাব্য সুন্দরে স্থান পেয়েছে–

'কব্‌জাতে তোর কুন্‌ফায়াকুন্‌ কিসের দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর
নিজেকে চিনে হওগো তুমি স্বয়ং খোদার ব্যাখ্যাকার'। – (কবি নজরুল ইসলাম অনূদিত)

অলিআল্লাদের এই বিশেষ ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে তার কোন বিশদ বর্ণনা কোথাও দেখা যায় না। আমরা জানি যে, মানুষ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চর্চায় কোন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে নিয়ে আসে সুসমাধান। নতুন কোন আবিষ্কার এভাবেই হয়ে থাকে। যারা যে কাজে সফল হয় সেটা তাদের নিজেদের মেধা শক্তির দান অবদান – একান্তই নিজস্ব। আসলে কি সম্পূর্ণ নিজস্ব? বাইরের কোন শক্তির প্রভাব কি পড়ে না? আজকাল তো প্রায় প্রতিটি বিষয়ে পরিবেশের প্রভাব বহুল আলোচিত। মানুষের সৃজনী অন্বেষায় বাইরের কোন শক্তির প্রভাব পড়ে কিনা জগৎ সভার জ্ঞানী গুণীরা নিরীক্ষা করে দেখলে একটা অজানা রহস্যের সমাধান হতো।

প্রেরণা হতেই মানুষের সকল কাজের সূচনা। কোন কাজের স্বপ্ন, কল্পনা, উদ্যোগ ও বাস্তবায়নে প্রেরণাই মূল শক্তি হিসেবে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে সফলতা এনে দেয়। এই প্রেরণা কিভাবে মন-মস্তিষ্কে আসে সেটি এখনো অনাবিষ্কৃত। আমার নিজের অভিজ্ঞতা জ্ঞানী গুণীদের বিবেচনার্থে বর্ণনা করছি। মাইজভাণ্ডার শরিফ বাঁশ-ছনে নির্মিত যে ঘরে আমি থাকতাম, সেখানে কী যেন লেখালেখির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ১৯৮৫ সালের শীতকালের এক বিকাল। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খাদেম আবদুর রশিদ প্রকাশ রশিদ পাগলা একটু জজ্‌বা অবস্থায় তথায় এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, সিকদার ভাই, বলুনতো জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিভাবে মামলার রায় দেন? বললাম, বাদীর আর্জির পর বিবাদীর জবাব এবং উভয় পক্ষের সাক্ষী ও উকিলের জেরা-জবানবন্দী শুনে কলম দিয়ে কাগজে লিখে রায় দেন। আবার প্রশ্ন করলেন, কলমকে কে লিখায়? বললাম হাতে লিখায়। হাতকে কিসে লিখায়? বললাম, মাথায়। আবারও প্রশ্ন মাথাকে কে লিখায়? কী উত্তর দেব ভাবতে লাগলাম। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে বাল্য শিক্ষা পড়া এক যুবক গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে চাষের কাজের শ্রমিক হিসেবে যোগদান করেন। বাড়ি বরিশালের এক গ্রামে।

এখানে সঙ্গ পেয়েছেন জ্ঞানভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর, তাঁর হাতেই বায়াত গ্রহণ। নিষ্ঠা ও ভালবাসায় ক'বছর পূর্বে প্রমোশন পেয়ে রওজা শরিফের খেদমতের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। নিজেকে ভাণ্ডারী প্রেমে উৎসর্গ করেন। তাই স্ত্রী পরিবার পরিজন কারো সাথে সম্পর্ক রাখেন নি। ফলে সংসার মায়ামোহ মুক্ত। মাঝে মধ্যে জজ্‌বা বেড়ে গেলে অন্যের সাথে তর্ক ঝগড়া এমনকি মারমুখী হন। আমাকে চুপ দেখে ধমকের সুরে বললেন, 'এত কী ভাবছেন? মুরিদ হয়ে এত বছর দরবারে আসা যাওয়া করছেন, এত লিখাপড়া করে কী শিখলেন? এটাও জানেন না? মুনিবই তো চালায় জগত সংসারের সকল মাথা'। এই মুনিব হলো খোদায়ী শক্তির প্রতিনিধি যুগ পরিচালক অলি উল্লাহ্। যিনি মানুষের মনে প্রাণে প্রেরণা ও জ্ঞান প্রজ্ঞার বাঁশী বাজান। দরজা জানালা বন্ধ ভবনে রেডিও টিভির বোতাম ঘুরালে যেভাবে বাতাসের ইথার দ্বারা স্টেশনের খবর বার্তা অনুষ্ঠান শুনা ও দেখা যায় ঠিক তেমনি। আল্লামা রুমীর (র.) মসনবি গ্রন্থে অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ দেখা যায়, তাঁদের কাছে অবস্থার গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।* এ যুগের মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক। বিজ্ঞানকে যত বিশ্বাস করে কোন ধর্ম গ্রন্থকেও তত করেনা। বস্তু, বস্তুকণা বা শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু নিয়ে অর্থাৎ দৃশ্যমানকে নিয়ে বিজ্ঞান এতদিন কাজ করে এসেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান অদৃশ্য প্রতিবস্তু ও তার শক্তি সম্পর্কে জেনেছে। মহাশূন্য গবেষণায় বিজ্ঞানীরা রকেটে প্রতিবিম্ব বা ছায়া থেকে জ্বালানী সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে[১]। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা একাধিক সমান্তরাল মহাবিশ্বের (অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বা ছায়া) অস্তিত্ব মেনে নিতে বলছেন, যদিও এগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য। কোন ঘটনার পেছনে কারণ থাকা এবং কারণের পেছনেও সূক্ষ্ম কারণ থাকার বাস্তবতা বিজ্ঞান ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে। যদিওবা সূক্ষ্ম কারণ প্রায় অদৃশ্যই থাকে। জ্ঞানী-গুণীদের ব্যক্তিত্ব অন্যদের প্রভাবিত করার বিষয় সর্বজনস্বীকৃত; এ ব্যক্তিত্বও অদৃশ্য। বিজ্ঞান খণ্ডিত সত্যের প্রকাশক; অখণ্ড সত্যকে দেখা এখনও তার জন্য দুর্গম দুরূহ। অপরদিকে মানুষ বিশ্বাস করুক বা নাইবা করুক আল্লাহ্‌র নবি ও তাঁর অলিদের বাণীর কোন বিকৃতি নেই।

বিংশ শতাব্দীর ৫০, ৬০, ৭০ ও ৮০-র দশক জুড়ে প্রাচ্যের এই বাংলাদেশে মহান অধ্যাত্ম সাধক শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (১৯২৮-৮৮ খৃ:) বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও রহস্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। এতে খোদায়ী শক্তি ও কর্মধারার ধারাবাহিকতা, তাঁর প্রতিনিধিত্বের পরিধি ও কর্মক্ষমতা বর্ণিত ও প্রদর্শিত। তিনি দাবী করেন–

- রহমতুল্লিল আলামীন রাসূলের (দ.) রহমতের সীমা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মক্ষমতা।
- আমার দরবার আন্তর্জাতিক প্রশাসন অফিস; যেখান থেকে এই বিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।
- এ বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষ আমিই তো চালাই (১৯৮৭ সালের ১০ জুলাই তিনি এই মন্তব্য করেন। ১১ জুলাই বিশ্বের জনসংখ্যা এই অংক স্পর্শ করে। সেদিন ছিল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস)।
- এই বিশ্বের কোথায় কখন কী হয়েছে, হচ্ছে, হবে সব আমার জানা।
- আকাশের উপরে বসে আমি সৃষ্টির কাজকর্ম দেখি; উপরের দিকে আল্লাহ্র সাথে কথা বলি।
- আমার দরবার আন্তর্জাতিক সামরিক আইন প্রশাসক অফিস। দুনিয়ার সবকিছু আমি ভেঙ্গেচুরে ঠিক করি।
- মাইজভাণ্ডার শরিফ – হায়াতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার।

সৃষ্টি জগত ও মানুষের কল্যাণে নিজের বিপুল দান-অবদানকে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (ক.) অসংখ্য বাণী ও প্রতীকী ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। নিকটস্থদের অজ্ঞতা অবহেলা এবং যথাসময়ে সঠিকভাবে সংগ্রহ সংরক্ষণের অভাবে বহু বাণী ও ঘটনা হারিয়ে গেলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সগৃহীত-সংরক্ষিত। অর্থনীতি বিষয়ক ১০টি প্রতীকী ঘটনা এই নিবন্ধে বর্ণিত। প্রতীকী বা নমুনা কোন জিনিসের ডাইয়ের সাথে তুলনীয়। কলে কারখানায় এক নমুনার ডাইয়ে যেমন কোটি কোটি একই জিনিস তৈরি হয় ঠিক তেমনি। আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টিটা যে একটা পরিবার, এই মূলনীতির নিরিখেই শাহানশাহ্ উপরোক্ত প্রতীক ঘটনাগুলো ব্যাপক গুরুত্ব ও অর্থবহ বিচার বিশ্লেষণের দাবী

রাখে। কোন সরকার অথবা অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তা যেমন দায়িত্ব নিয়ে আগে থেকে চলে আসা কর্মপদ্ধতি অনুমোদন করতঃ পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংস্কার বা রদবদল করেন তদ্রুপ অলিরাও করে থাকেন।

এক. লোকমুখে বহু বছর যাবত শুনে আসছি হযরত জিয়াউল হক শাহ্ বান্ডিল বান্ডিল টাকা আগুনে পুড়ে ফেলেন। বিনা কারণে সম্পদ নষ্ট করা কি জায়েয (বৈধ)? অতীতের নবি-অলিদের অনুরূপ কোন ঘটনা আলেম উলামাদের ওয়াজ নসিহতে শুনি নাই; কোন বই পুস্তকেও পড়ি নাই। আপনি তো মন্‌জিলের কার্যকারক, এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য শুনতে চাই, আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ধুরুং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব এমদাদুল ইসলাম চৌধুরী। এক জনসভা শেষে জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব নুরুল আলম চৌধুরীসহ ফটিকছড়ি বিবিরহাটে বজল সাহেবের ঔষধের দোকানে এসে বসলে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এটি ১৯৮৭ সালের ঘটনা। আমি জবাব দেবার পূর্বে সুন্দরপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল বশর চৌধুরী বলতে শুরু করেন। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কে কিছু উৎসাহী লোক আলোচনায় অংশ নিলে আলোচনা হয় প্রাণবন্ত; কিন্তু শেষ হয় না। অবশেষে নুরুল আলম চৌধুরী আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক তো এক একবারে কোটি কোটি টাকা পুড়ে থাকে। বহুল ব্যবহারে নোট পুরানো অচল হলে, বাজারে টাকার সরবরাহ বেড়ে জিনিস পত্রের দাম অতিরিক্ত বেড়ে গেলে, অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে এবং জাল নোট ধ্বংস করতে – এই তিন কারণে যে কোন দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে বিপুল পরিমাণ নোট পুড়ে দেশের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করে থাকে। নতুবা দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন দেশের সরকার কিংবা কেন্দ্রিয় ব্যাংক ইচ্ছা করলেই নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়তে পারে না। প্রথমে নোটের মূল্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা অথবা সরকারি সিকিউরিটি পেপার কেন্দ্রিয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তারপর টাকার নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়তে পারে। এসব বিষয় সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়; জানেও না। তেমনি আল্লাহ্‌র অলিদের কাজ কারবার বুঝাও মানুষের জন্য দুঃসাধ্য। হযরত জিয়াউল হক বাবাজান কতবড় ক্ষমতাধর অলি তা আপনারা যেমন জানেন না, আমিও না। কাছে যারা থাকে, যাদের দয়া করেন, তারাই কিঞ্চিৎ বুঝতে পারেন। আমি তাঁর কয়েকটি কেরামতি ঘটনা দেখেছি। এমনকি

১৯৮৬ সালে আমার এম.পি নির্বাচিত হওয়াও তাঁর দয়ার দান। তিনি অনেক বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়েও মহৎ মহান। এটা নিশ্চিত যে, তাঁর টাকা পোড়ানোর ঘটনাও মানুষের বৃহত্তর কোন কল্যাণের কাজ হয়ে থাকবে। তাঁদের সকল কাজ হয়ে থাকে অর্থবহ, এই বলে চৌধুরী সাহেব আলোচনার ইতি টানলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে কোন কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি এত বেড়ে যায় যে, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নয় চিন্তা ধারণার চেয়েও অতিরিক্ত বেড়ে যায়। শুনেছি যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাপান কোরিয়া ইত্যাদি দেশে নিত্যদিনের খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য বস্তা ভরে টাকার নোট নিয়ে বাজারে যেতে হতো। সাধনার শুরু অর্থাৎ ৫০ দশকের প্রথম হতে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী টাকা পোড়ানো শুরু করেন। আশির দশক অবধি অর্থাৎ বাকী জীবনভর তা চালু ছিল। তিনি নিজেই বলতেন, ‘সব টাকা ভাল নয়, তাই পুড়তে হয়’। কালো টাকা ভাল টাকাকে সঞ্চালন বৃত্ত থেকে তাড়িয়ে দেয় এটা আধুনিক মুদ্রানীতির সংজ্ঞা। হতে পারে টাকা পুড়ে তিনি মুদ্রা সরবরাহ ভারসাম্য রক্ষা করেন। তিনি ডায়রীতে লিখেছেন ‘টাকা তো বানায় আল্লাহ্ দরকারে। যার হাতে যায় তার’। সঞ্চালনবৃত্তে টাকা এক হাত হতে অন্য হাতে ঘুরতেই থাকে।

দুই. দরবারে আগতদের মধ্যে অভাবী, দুঃখী মানুষের সংখ্যাই অধিক। আধ্যাত্মিকভাবে তিনি দৈনিক শত শত মানুষকে দুঃখ, দুর্দশা হতে মুক্তি দিতেন। আবার তিনি যে টাকা ও জিনিসপত্র পেতেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিলি বন্টন করতেন। তাদের মধ্যে দরিদ্র আলেম, অভাবী শিক্ষক, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, গরীব পরিবারের শিশু-কিশোর, কারখানার শ্রমিক, অসচ্ছল কৃষক, অফিসের পদস্থ কর্মকর্তা ও কেরানী, দরবারের নিকট আত্মীয়, সেবক-সেবিকা, ভক্ত, অতি নিম্নশ্রেণীর জেলে মেথর ইত্যাদি। এরা প্রতীকী শ্রেণি প্রতিনিধি (বিস্তারিত এ দুনিয়া মুসাফিরখানা নিবন্ধে বর্ণিত)। প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের হাতে সম্পদের সঞ্চালনই এই বিলি-বণ্টনের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। তিনটি সূত্র হতে তিনি বিপুল অংকের টাকা পেতেন। দরবারে অনুষ্ঠানাদির (উরস-খোশরোজ) উদ্বৃত্ত, আশেকভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত নজরানা এবং কারো কারো কাছ থেকে দাবী করে নেওয়া টাকা। মানুষের কাছে কোন কিছু চাওয়া তাঁর পিতা একেবারেই পছন্দ করতেন না। হক মন্‌জিল এন্তেজামিয়া কমিটির তৎকালীন সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান কোম্পানী মারফত তিনি

একবার এই বলে পুত্রকে খবর দেন যে, 'কোন শরিফ মানুষ কি অন্যের কাছে হাত পাতে? কারো কাছে টাকা চাওয়ার মত লজ্জাজনক কাজ করতে বড় মিঞাকে আমার নিষেধ বলবেন'। একই ব্যক্তির মাধ্যমে পুত্র জবাব দেন বাবাজানকে বলবেন, 'কোর্ট ফি ছাড়া কি আদালত মামলার আর্জি গ্রহণ করে? নিজের জন্য নয়, টাকা দেওয়া নেওয়া করি মানুষের প্রয়োজনে'।

তিন. বাতাসে টাকা উড়ে, জিয়া বাবার দরবারে। হুজরা শরিফের মধ্যের দু-কক্ষের ৪টি জানালা ও সামনের কক্ষের লোহার গ্রীলের ফাঁক গলিয়ে আশেক ভক্তগণ প্রচুর টাকা, সিগারেট (প্রধানতঃ ক্যাপস্টান), দিয়াশলাই ও নানা মূল্যবান দ্রব্যাদি নজরানা দিতেন। উপর নিচের ফ্যানের বাতাসে টাকার নোটগুলো ফাগুনের ঝরা পাতার মত সারা ঘরে উড়তো। আগত লোকদের কিছুসংখ্যক এ দৃশ্য দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে সুযোগ মত হাত গলিয়ে ও বাঁশের কাঠির মাথায় আঠা-গাম লাগিয়ে কিছু কিছু চুরি করে নিয়ে যেতো। দরজা খোলা পেয়ে আর্জি আবেদন জানাবার জন্য যারা ভিতরে ঢুকতো, কোন কাজে যাদেরকে ভিতরে ডাকা হতো, সুযোগমত তাদের কেউ কেউ প্রচুর টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যেতো। শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এই অপসুযোগ গ্রহণ করতো। দারোয়ান বা বিশ্বস্ত কেউ দেখে ফেললে চোরদের শাস্তিও হতো। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারে উদাসীন। ঘরে থাকলেও কখনো বাধা দিতেন না। খাদেমা বেলুর মা বলেন, 'তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও, বেলুর মা আসছে,' বাবাজানের চাপাকণ্ঠের শব্দ শুনে হুজরায় গিয়ে দেখি ট্রানজিস্টারসহ মূল্যবান কিছু দ্রব্য খোয়া গেছে। চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়া ব্যাটারী গলি আবদুল গণি সওদাগরের স্ত্রী সৈয়দা রিজিয়া বলেন, এখানকার আস্তানা থেকেও কত মূল্যবান জিনিসপত্র ও বিপুল টাকা লোকেরা নিয়ে গেছে। যে ঘরে তিনি থাকতেন সংলগ্ন মাঠে বহুবার লোকেরা বান্ডিল বান্ডিল টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে।

দুনিয়ার সকল দেশে আর্থিক লেনদেন দুভাবেই হয়ে থাকে। একটি বৈধ অপরটি অবৈধ। কোন কোন দেশে সরকারের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের চাইতেও বেশী লেনদেন হয় অবৈধ অর্থনীতিতে। ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও মজুদদারী ইত্যাদিতে যে লেনদেন হয় সেটাই অবৈধ অর্থনীতি।

সরকারের অগোচরে সকল দেশে যে অবৈধ অর্থনীতি চালু রয়েছে উপরোক্ত ঘটনা তার প্রতীকী স্বীকৃতি বলে আমাদের ধারণা।

চার. পেশা নির্বিশেষে লোকদের তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের তাগিদ দিতেন। একবার চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক প্রশাসন মোহাম্মদ গোলাম রসূল সাহেবের বাসায় উপস্থিত একদল লোকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কাজের জন্যই জগত জীবন ও আল্লাহ্ রাসূলের বিধান। উৎপাদন ও সৃষ্টির কাজ উত্তম ইবাদত। অলস হয়ে বেকার বসে থেকোনা'। কালুশাহ্র বাড়িতে কৃষি কাজ সম্পর্কে বলেন, 'হযরত আদমও চাষ করতেন। আমার বাবাজানও করেন। আমরাও করি, জহুর দেখাশুনা করে। আমাদের প্রিয় নবিও চাষ করেছেন। এতে অগৌরবের কিছু নেই। কাজের লোক ঠিকমত কাজ করেনা, তাই ভালমতে তদারক করবেন। যে কোন ভালকাজ আল্লাহ্র ইবাদত'। তিনি নিজেও দিবারাত্র কাজ করতেন। গোটা রাত জেগে সূর্য উঠার পর ঘন্টা দু'ঘন্টা বিশ্রাম নিতেন। কখনও তাও নিতেন না। পরিবারবর্গকে পিছনের বাঁশছনের কাঁচা ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে পাকা একতলা ভবনের সব কক্ষকে (৫টি) তিনি নিজ কাজের ওয়ার্কসপ বানিয়ে নেন। যেখানে ছিল নানা রকমের বহু হাতঘড়ি, গ্যাস লাইটার, চশমা, কলম, ছাতা, লাঠি, চেয়ার-টেবিল, ফ্যান, টিভি, ট্রানজিস্টার, ফোনোগ্রাম, গ্রামোফোন, ব্যাটারী চালিত খেলনা অস্ত্র, গাড়ি, পুতুল, ইলেকট্রিক চার্জলাইট ও রোবট ইত্যাদি[৩]। এগুলোর কোন কোনটি নিয়ে দেখা যেতো তাঁর একনিষ্ঠ ব্যস্ততা। জজ্বাহালে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি, 'ঠিকতম কাজ না করলে আমি রোবট দিয়ে করাবো'। চট্টগ্রাম শহরে পাঠানটুলী খান বাড়ির আলহাজ্ব আকমল খানের সাথে যে যুগল ছবি রয়েছে তাতে তাঁর গায়ে ছিল একটি গার্মেন্টস পুলওভার। দরবারে অফিসিয়াল ব্যবহারের জন্য একটি ইংরেজি টাইপ মেশিন ও একটি কম্পিউটার কিনতে আদেশ করেছিলেন।

সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা পরিপূরণ ও সৃজনশীলতা বিকাশে মানুষের কাজের কোন বিকল্প নেই। বিশ্বঅলি হিসেবে মানুষের কাজের গতিশীলতা ও পরিধি সম্প্রসারণ ছিল তাঁর কর্মকর্তৃত্বের অধীন। পাশ্চাত্য অর্থাৎ, পশ্চিমা বিশ্বে জনগণ আগে থেকেই কর্মে গতিশীল। লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রাচ্যের জনগণও অতিদ্রুত কর্মে গতিশীল হয়ে উঠছে। বিকাশের ধারায় মানবিক শক্তির অক্ষমতায় নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে মানুষ

পারে না এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রোবট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমুদ্রে ডুবুরীর কাজ করা মানুষের জন্য সামুদ্রিক হিংস্র জীবজন্তুর দ্বারা জীবনাশংকা, তাছাড়া অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলেও জীবন নাশের ভয়। এখন মানুষের সে সব ঝুঁকিপূর্ণ সূক্ষ্ম কাজও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট মানুষের চেয়েও সাফল্যের সাথে করছে। সার্জিস্কোপ নামের রোবট চালিত সার্জারী মেশিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ পেরিয়ে ইতিমধ্যে চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হোন্ডা কোম্পানী কর্তৃক ১৯৯৮ সালে তৈরি করা ব্যাটারী চালিত রোবটটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি দু'পায়ে হাঁটতে পারে। অবশ্য ১৩০ কেজি ওজনের রোবটটির হাঁটার বেগ ঘন্টায় মাত্র ২ কিলোমিটার। রোবটটির অন্যান্য গুণের মধ্যে আছে কথা বলা এবং করমর্দন করা। সাংবাদিক সম্মেলনে চীনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি পাঙ এর সাথে হাত মেলাতে দেখা যায়।
হোন্ডা কোম্পানীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, প্রায় মানুষের আকৃতির এমন একটি রোবট তৈরি করা যা নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং বাড়িতে একজন সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতে পারবে। এছাড়াও মহাশূন্যে এবং বিষাক্ত বর্জ্যপূর্ণ স্থানে মানুষের পরিবর্তে যেন একে ব্যবহার করা যেতে পারে [তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, দৈনিক সংবাদ ০৬-১০-১৯৯৮]। ২০০১–২০০৪ সালে আমেরিকার মহাকাশ স্টেশন হতে চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে রোবট পাঠিয়ে সাফল্যজনকভাবে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ কর হয়।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত ও কার্যকরী যন্ত্র কম্পিউটার প্রথম আবিষ্কার হয়ে প্রায় ৪০ বছর অতিমূল্য ও বৃহৎ আঙ্গিকের জন্য আটকে ছিল। ১৯৩৭ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড আইকনস ও আইবিএম কোম্পানীর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক অটোমেটিক সিকোয়েন্স কনট্রোল্ড ক্যালকুলেটর নামে একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার তৈরি করেন। সংক্ষেপে যাকে (ARKI) বলা হয়। সাড়ে চারশ বর্গফুট জায়গার উপরে বিরাটাকার এই কোটি টাকা দামের কম্পিউটার দশ সংখ্যার গুণ দশ সেকেন্ডের কম সময়ে করতে পারতো। এতে প্রায় ৭,৬০,০০০টি বিভিন্ন সুইচ, টিউব ইত্যাদি এবং ৫০০ মাইল লম্বা তার লাগানো ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটিকে বহু কাজে লাগানো হয়[৪]।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগ সংস্কারক এই বিশ্বঅলির দয়ার দানেই জীবন জগতের অতি প্রয়োজনীয় এই কম্পিউটার সময় ও মূল্যের বন্দীদশা হতে মুক্ত

হয়ে মাত্র কয়েক হাজার টাকা দামে ১৯৭৭ সালে বাজারে আসে। আইবিএম'ই আবার এই পারসোনাল কম্পিউটারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। তারা সবার চেয়ে দ্রুততম কম্পিউটার উদ্ভাবন করেছে। যেটি আগের তুলনায় বহু বহু গুণ শক্তিশালী। অফিস আদালতে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হলে কোটি কোটি লোকের চাকুরি হারানোর সংবাদ বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হলে জগতব্যাপী চাকুরিজীবি ও তাদের পোষ্যদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সে অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রমাণিত করে কম্পিউটার জগতব্যাপী বিশাল কর্মক্ষেত্রে বিপুল লোকের কর্মসংস্থান করে চলেছে। এই কম্পিউটার প্রযুক্তি ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলো এশিয়া আফ্রিকার গরীব দেশগুলোর কয়েক কোটি লোকের কর্মসংস্থান করে আরো বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে।

১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবেরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলে জর্দান, সিরিয়া ও মিশরের বিশাল ভূখণ্ড ইসরাইলীদের জবর দখলে চলে যায়। ইসরাইল মদদদাতা আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী অক্ষ শক্তি। বারংবার পরাজয়ে আরবদের প্রতিশোধ স্পৃহা তীব্র হয়। তারা তেলকে পাশ্চাত্য শক্তিজোট ও মারণাস্ত্রের বিপরীতে অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করে। ফলে দুনিয়ার প্রায় সকল দেশের অর্থনীতি লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে। তেলের মূল্য এক লাফে প্রতি ব্যারেল ৯ ডলার হতে ৪৫ ডলারে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে তেল সমৃদ্ধ আরব দেশ সমূহের আয় ধারণাতীত বৃদ্ধি পায়। কৌশলে প্রাপ্ত বিশাল তহবিল তারা স্ব স্ব দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ করলে বিশ্বের গরীব দেশসমূহ হতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সেসব দেশে কর্মে নিয়োজিত হয়। ধু ধু মরুর বুকে মাথা তুলে নূতন নূতন শহর বন্দর আবাস। ফলে এককালের গুরুত্বহীন আরবেরা বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নূতন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ. ভক্তদের নিকট শাহানশাহ্ হুজুরের নানা দয়ার কথা শুনে নিজের এক সমস্যা সমাধানের আশায় একদা ভাণ্ডার শরিফ গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে শুনলাম তিনি ঢাকায় আছেন, ঠিক কোথায় আছেন কেউ বলতে পারলেন না। সম্ভাব্য ৫টা ঠিকানা নিয়ে ঢাকায় ফিরলাম। অবশেষে মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডের এক বাসায় খোঁজ পেলাম। সফরে ক্লান্ত শ্রান্ত দেখে উপস্থিত ভক্তরা আমাকে বাসায় বিশ্রাম নিয়ে পরে দেখা করার পরামর্শ দিলেন। হুজুরের অবস্থান

কক্ষের দরজা নাকি তিনদিন ধরে বন্ধ। কৌতূহল বশত: উক্ত কক্ষের সামনে যাওয়া মাত্র দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি ব্যাংক থেকে আসছেন? বললাম, আমি ব্যাংকার নই, ব্যবসায়ী – চট্টগ্রাম শহর থেকে আসছি। আমার উত্তর না শুনে তিনি বারংবার বলতে লাগলেন, ‘আপনি তো ব্যাংক থেকে এসেছেন’। তাঁর এ কথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে এবং কিছু বলার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুন্ন মনে বাসায় ফিরি। ঘটনাটি আশির দশকের প্রথম দিকের।
বর্ণক: আরিফুর রহমান, ১৫৬ নং আজিমপুর, ঢাকা। গ্রামের বাড়ি- নোয়াখালী জেলার রায়পুর।

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় দেশে আশির দশকের শুরুতেই আরব বাংলাদেশ ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাক লিঃ, আল্ বারাকা ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকারি ব্যাংকের মধ্যে পূবালী ও রূপালী ব্যাংকও বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। নব্বইয়ের দশকে আরও কয়েকটি ব্যাংক সরকারি অনুমোদন লাভ করে। ইতিমধ্যে ক’জন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আরিফ সাহেবকে নূতন একটি ব্যাংক করার প্রস্তাব দিলে ঐক্যমত হয়। এ সময়ে শাহানশাহ্ বাবাজানের উক্তি তাঁর স্মরণ হয়। সরকারি অনুমোদন পেতে দেরী হওয়াতে তিনি আমার (জীবনীকার) সাথে আলাপ করলে দরবারে কিছু মানত করতে বলি। অবশেষে ২০০০ সালের শেষভাগে তাদের যমুনা ব্যাংক লিমিটেড সরকারি অনুমোদন লাভ করে। অতঃপর তিনি মানত পূর্ণ করেন।

আল্লাহ্‌র অলিরা না হওয়া, না পাওয়া, সম্ভাবনাহীন বিষয়কে বাস্তবায়ন করতে ক্ষমতাবান। আরিফ সাহেবকে ব্যাংক থেকে আসছেন কিনা জানতে চাওয়া একটি প্রতীকী ক্রম বিকাশের ঘটনা। এজন্য যমুনা ব্যাংক প্রথম দিকে অনুমোদিত নয়। এইটি একমাত্র ঘটনা হলে মন্তব্যের সাথে সাথে কার্যকরী হতো। শুধু বাংলাদেশে নয় সমাজতান্ত্রিক শাসনের পতনে অন্যসব দেশেও বেসরকারি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ও স্টক এক্সচেঞ্জ দ্রুত গড়ে উঠেছে। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এসব প্রতিষ্ঠানের বিকল্প কোন কিছু এ পর্যন্ত গড়ে উঠে নি।

ছয়. কন্সাইজ ইলাস্ট্রেটেড এটলাস অব দ্যা ওয়ার্ল্ড (Concise illustrated atlas of the World) ভূমণ্ডলীয় মানচিত্রের এই বইটির পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী গভীর ধ্যানী দৃষ্টিতে দেখতেন, কোন কোন পাতায় আঙ্গুল ঠেকিয়ে ভাবতেন, চোখের নানা ভঙ্গিতে নীচু স্বরে কী কী যেন বলতেন। অন্য কোন বই নয়, এই একটি মাত্র বই নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে তাঁর কার্যক্রম দেখে মনে হতো যেন কোন স্থপতি প্রকৌশলী নিত্য নতুন পরিকল্পনা রচনায় মহাব্যস্ত। মহাশূন্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবীর ইতিহাস, বিশ্ব ভূপ্রাকৃতিক গঠন, সাগর মহাসাগর, সমুদ্র সম্পদ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, ভূমণ্ডলীয় জলবায়ু, বিশ্বের সকল জাতি গোষ্ঠী, তাদের ভাষা সংস্কৃতি, বিশ্বের দেশ মহাদেশ সমূহের রাজনৈতিক, যোগাযোগ, ভূপ্রকৃতি, সংরক্ষিত সম্পদ, জলবায়ুর ভিন্নতাসহ গোটা মানব সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর সচিত্র বিবরণ বইটিতে লিপিবদ্ধ। পবিত্র হাতের ছোঁয়া ধন্য এই ঐতিহাসিক নিদর্শন হুজরা থেকে পরে স্মৃতি কক্ষে সংরক্ষিত। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস চৌবাচ্চায় গোসল করতে গিয়ে ভারী লোহা যে পানিতে ভাসতে পারে, এই একটি মাত্র সূত্র পেয়ে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' অর্থাৎ 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে চিৎকার করে দৌড়াতে দৌড়াতে যখন রাজ দরবারে পৌঁছেন তখন আনন্দে আত্মহারা বিজ্ঞানী ছিল সম্পূর্ণ নেংটা। সমগ্র সৃষ্টি সূত্র নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত মহাবিজ্ঞানী শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর কার্যপরিধি ও আনন্দধারা কত যে ব্যাপক বিশাল এই ঘটনার নিরিখে পাঠক তা অনুমান করতে পারে মাত্র। প্রত্যেক বস্তুর মত জগত জীবন চলারও দৃশ্য অদৃশ্য খোদায়ী কিছু নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। চলমান নিয়ম পদ্ধতি যুগ চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে প্রয়োজন হয় সংস্কার। ভূমণ্ডলীয় মানচিত্র নিয়ে মোজাদ্দেদে জামান (যুগ সংস্কারক) শাহানাশাহ্ হক ভাণ্ডারী বিশ্বনীতির সেই প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করেন। অদৃশ্য বাতাসের ইথার তরঙ্গ ও উপগ্রহ যেমন রেডিও, অয়্যারলেস, টিভি, টেলি যোগাযোগ, ইন্টারনেট ইত্যাদি গণমাধ্যমের ভিত্তি, জগত জীবনের ব্যাপারে বিশ্বঅলির ভূমিকা প্রায় অনুরূপ। চুয়াত্তর সাল থেকে আটাশির শেষভাগ পর্যন্ত বর্ণিত ভূচিত্রাবলী নিয়ে তাঁর ব্যস্ততা অব্যাহত ছিল। বিগত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বিজ্ঞান, অর্থনীতি মুদ্রানীতি ও যোগাযোগ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে কিছু কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে মানব জীবন অতীতের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশী গতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। 'মেরাজ' রাতে

আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত গোপন রহস্যময় যে মহা জ্ঞানভাণ্ডার হযরত রাসূলে করিম (দ.) লাভ করেছিলেন সে কল্‌বী জ্ঞানের অংশবিশেষ ছিল এই কর্মপ্রবাহ। যুগশ্রেষ্ঠ খোদায়ী নির্দশন এই মহাজ্ঞানীকে পরবর্তীকালের জ্ঞানীগুণীদের নিকট পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যেই ঘটনাটির যৎকিঞ্চিত প্রকাশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা হলেন মানব জাতির পক্ষ হতে সাক্ষী বিশেষ।

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডের ড্যাভোসে বিশ্ব অর্থনীতি সম্মেলন হয়ে গেল। অর্থনীতিবিদ ছাড়াও এই সম্মেলনে আরও যোগ দেন পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, আমলা, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও স্ট্যাটেজিস্টরা। লন্ডনের টাইমস ম্যাগাজিনের নেওয়া বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারে একুশ শতকের প্রথম দশকের চমৎকার সব তথ্য তাতে বেরিয়ে এসেছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মূরের নিয়ম বলে একটি তত্ত্ব চালু আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই নিয়ম অনুযায়ী আগামী এক দশকে মাইক্রোচিপের কেরামতির গুণে ভোক্তারা ক্রমশ: সস্তায় সবকিছু ভোগ করবে। এই মাইক্রোচিপের গুণে মানুষের জ্ঞানের পরিধিও বহুদূর প্রসারিত হবে। জনতন্ত্রের হাইটেকের অগ্রগতির পাশাপাশি জটিল কঠিন রোগবালাই নিরসনের ক্ষেত্রে অনেক ‘লোটেক’ চিকিৎসার উদয় হবে। এমনকি ঔষধপত্র ছাড়া শুধু পরামর্শ অনুসরণে রোগমুক্তি ঘটবে। সকল যন্ত্রপাতির মর্মমূলে আশ্রয় নেবে কম্পিউটার। কম্পিউটারগুলো চারপাশের পরিবেশকে অনুভব করা, দেখা, শুনা, বলা ও নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। নূতন নূতন প্রযুক্তির প্রভাবে দুর্নীতি ও অপরাধ করে কেউ বাঁচতে পারবে না। বিভিন্ন কারখানা হতে নির্গত ক্ষতিকর মিথেন গ্যাস হতে উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড, শর্করা (চিনি) ও প্রোটিন। এসব থেকে পুনঃ তৈরি হবে খাদ্য ও সার।

১৯২০ এর দশকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিজ্ঞানীরা কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন নির্মিত তথ্যে বলেন, একটি কণা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করতে পারে। যার ভিত্তিতে একটির পরিবর্তে একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে বলে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা দাবী করেন। দীর্ঘ দিন একই অবস্থানে আটকেপড়া কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ১৯৮৫ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী ডেভিড ডয়েশ একটি শর্ট এক্সপেরিমেন্টের প্রস্তাব করেন। এটি হবে একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার। যেটি সমান্তরালভাবে অসংখ্য হিসাব নিকাশ করতে পারবে এবং এনে দিতে পারবে অদৃশ্য সমান্তরাল জগতের খবরাখবর।

ইতালির আলবার্তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডনপেজ বলেছেন সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব যাচাই করার একটি পদ্ধতি তিনি পেয়ে গেছেন। আগামী দশকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর লাভের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটবে। ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব আমাদের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন ঘটায় নি, কিন্তু বিজ্ঞানীদের নিত্য নতুন আবিষ্কারে মহাজগতে আমাদের অবস্থান আমুল পাল্টে গেছে। ১৯৮২ সালে আবিষ্কৃত হয় শক্তি ও সম্ভাবনার আরেক বিপুল উৎস কোয়ান্টাম তরল[৫]। এই আবিষ্কার বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করবে বলে বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস। জীবন জগতের এই গতিশীলতা নিশ্চিতভাবে ঐশ্বরিক মহাপরিকল্পনারই বাস্তবায়ন।

সাত. ১৯৭৬ সালের ঘটনা। এক মধ্যরাতে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম শাখার তৃতীয় তলার বাসভবনে গিয়ে ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) খলিলুর রহমানকে হুকুম দিলেন, ব্যাংকের বন্ধ দরজা ও টাকার ভল্ট খুলে দাও। পূর্বপরিচিত বলে, ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে হুকুম তামিল করেন। এই ঘটনা কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে ম্যানেজার অবশ্যই চাকুরি হারাতেন। বাবাজানের সঙ্গে ছিলেন পূবালী ব্যাংক পাথরঘাটা শাখার ম্যানেজার কাজী ফরিদ উদ্দীন ও আইস ফ্যাক্টরী রোডের ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী গোপালগঞ্জ জেলার ঘোষের চর নিবাসী আয়ুব আলী শেখ। এই ব্যবসায়ীর প্রতি ইঙ্গিত করে খলিল সাহেবকে বললেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস চালানোর জন্য এদের অল্প অল্প কর্জ দিলে ভাল হয়না'? ম্যানেজার সাহেব ভাল হবে বলে সম্মতি জানালে পুনঃ বলেন, 'জামানত টামানত দিতে পারবে না, ওদের তেমন কিছু নেই। কর্জ দিবেন তো'! বলে জানতে চাইলে ম্যানেজার উত্তর দেন, আপনি যখন বলছেন অবশ্যই দেওয়া হবে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রিয় ব্যাংক হওয়ায় সরাসরি কোন ঋণ দিতে পারে না। তবে এই ব্যাংক সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ দিলে অন্য ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে পারে। প্রতীকী এই ঘটনাও পরবর্তীকালে ফলপ্রসূ হয়েছে।

জমি, বাড়ি, সোনা-গয়না অথবা মূল্যবান কোন সম্পদ বন্ধক রাখা না হলে ব্যাংক থেকে কর্জ বা ঋণ পাওয়ার কোন সুযোগ এদেশে কেন পৃথিবীর কোন দেশেই ছিলনা। অথচ গ্রাম সমাজের দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদে উৎপাদক, গৃহস্থালী ও কৃষি নানাবিদ ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির মেরামতি কারিগর, হাঁসমুরগী, গরু, ছাগল পালন এমনি নানাবিধ পেশার লোকদের পেশাগত ও

পারিবারিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য কর্জ না নিয়ে উপায় থাকেনা। তাই সুদখোর মহাজনের দরজায় ধর্ণা দিতে হতো। শতকরা ১০% ভাগ সুদের চক্রবৃদ্ধি শোষণ গরীব কর্জ গ্রহীতাকে ইক্ষুর ছোবড়ার মত সর্বস্বান্ত জমিহারা, বাড়ি ছাড়া ছিন্নমূল করে শহরের বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করে অথবা গ্রামে গ্রামে ভবঘুরে হয়ে ভাসমান জীবন অতিবাহিত করে। অথচ ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপি হয়েও নানা কায়দা কৌশল ও প্রভাব খাটিয়ে বার বার ঋণ পায়, স্ফীত হয় ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের অংক। দুনিয়াব্যাপী হাজার হাজার অর্থনীতিবিদ, অর্থশাস্ত্রবিদ, মুদ্রানীতিজ্ঞ গরীবের এই সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পায়না। বিবেকবান সমাজ কিংবা রাষ্ট্র এদিকে দৃষ্টিপাতের ফুরসত পায়না। গ্রামীণ সমাজের এ সংকট হাজারো বছরের।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস এই সমস্যা নিয়ে ভাবলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রাম জোব্‌রা। এ গ্রামের মোড়া তৈরি করা মহিলাদের মধ্যে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পাঁচ টাকার পুঁজি নেই বলে তাঁরা সারাদিনে রোজগার করেন মাত্র দশ আনা, মহাজন থেকে টাকা ধার করে সপ্তাহে দশ শতাংশ এমনকি কখনও বা দিনে বিশ শতাংশ সুদে। নিজের ছাত্রদের সাহায্যে এঁদের সংগঠিত করলেন ড. ইউনুস। ব্যাংক এঁদের টাকা ধার দিতে রাজি হলনা, কারণ জামিন দেওয়ার মত সম্পত্তি এঁদের নেই। প্রথমে নিজের পকেট থেকেই দিলেন ৪২ জনের জন্য মাত্র ৮৫৬ টাকা। জীবন বদলে গেল জোব্‌রার মেয়েদের। মোহাম্মদ ইউনুসেরও। কাজ করতে গিয়ে দেখলেন গ্রামও একটা বিশাল ব্যাপার – বললেন ড. ইউনুস। ঘটনাটি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ পরবর্তী।

ড. ইউনুস নিজে জামিনদার হয়ে জনতা ব্যাংক চৌধুরী হাট শাখা থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছিলেন ১৯৭৬ সালে। এটাই জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়ার নীতিগত স্বীকৃতি। লেনদেনে বিশ্বস্ততা অর্জিত হলে অন্য ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতা নিশ্চিত হয়। এভাবেই সূচনা হয় দরিদ্রের কর্জ পাওয়ার অধিকার বিপ্লব। গ্রামীণ ব্যাংকের মাইক্রোক্রেডিট (সমষ্টিক ঋণ) ধারণা অতি দ্রুত দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ড. ইউনুস বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে অসীম অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আছে তা উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি হল ক্রেডিট বা

ঋণ। গরীব মানুষ কর্জ পাবেনা কেন? তাঁরা তো মাগনা নিচ্ছেন না। এই অধিকার ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়াও অগণিত এনজিও গরীবদের ভাগ্য নির্মাণে নিয়োজিত। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর আরও বহু দেশের সরকারি বেসরকারি ব্যাংক পরবর্তীকালে জামানত ছাড়াই ঋণ দেওয়ার বিধান চালু করেছে। ১৯৯৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে বিশ লক্ষ পরিবারের প্রায় এক কোটি লোককে নিয়ে এসেছে শান্তিপূর্ণ অহিংস সমাজ বিপ্লবের গতিপথে[৬]। এটা নিশ্চিত যে, শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতের ভিত্তির উপরই মাইক্রোক্রেডিট বা সমষ্টিক ঋণের বিশ্বায়ন বাস্তবতা পেয়েছে। ড. ইউনুস তাঁর সে অবদানের জন্য সমাদৃত এবং নোবেল জয়ী হিসেবে ভূষিত।

আট. শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত টেকনাফ, কক্সবাজার, পার্বত্য শহর রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, রাজধানী ঢাকা হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি টাঙ্গাইল বরিশালের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। যখন যেখান থেকে ইচ্ছা কেনাকাটা করতেন। পাড়াগাঁর হাট বাজারের স্বল্প পুঁজির দোকান হতে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, রাজধানী ঢাকার সুপার মার্কেট সবখান থেকেই জিনিসপত্র কিনতেন। প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, শাড়ী, গহনা, কসমেটিক্স, ইমিটেশান দ্রব্যাদি, টর্চলাইট, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, কম্বল, ফার্নিচার, শিশুর পুতুল, বৈজ্ঞানিক খেলনা, খাওয়ার ফলমুল, মিষ্টি, বিস্কিট এমনি হরেক রকমের জিনিস কখনো অল্প, কখনো বিপুল টাকার (২/৩ লক্ষ) কেনাকাটা করতেন। এসবের বৃহদাংশ কাকেও দিয়ে দিতেন অথবা কোথাও রেখে চলে আসতেন। ক্ষুদ্রাংশ কখনো দরবারে নিয়ে আসতেন; তন্মধ্যে কোন কোনটা নিজে ব্যবহার করতেন। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের এসব বাজার করা কোন অর্থহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং সুনিশ্চিত অর্থবোধক।

নয়. একবার দুটি গাড়িতে ১৫–২০ জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার জলদি গ্রামে জমিদার ওয়াজেদ আলী মিয়ার বাড়িতে যান। দূর সম্পর্কের আত্মীয় পরিবারটি তাঁকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। ছাগল, মোরগ জবেহ এবং পুকুর থেকে বড় মাছ ধরে, নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার ও নাস্তার আয়োজন করে। খাওয়ার সময় হলে এক প্রকার জোর করে উপোষ চলে আসেন। পথে

সফর সঙ্গীদের বলেন, 'গরীবদের কেউ ভাল খাবার দেয় না। আমরা না খাওয়ায় চাকর বাকরেরা আজ উত্তম খাবার খেতে পাবে'। শহর গ্রামে বহুবার এমনিভাবে তৈরি খাবার না খেয়ে তাঁকে চলে আসতে দেখা গেছে। ব্যক্তিজীবনে মেহমানদারী ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দরবারেও এটা ঐতিহ্যবাহী রেওয়াজ। প্রাসঙ্গিক এক মন্তব্যে ইংরেজিতে তিনি বলেন, রিমেম্বার! এ ম্যান ক্যান নট লিভ ইন সোসাইটি উইদাউট কো-অপারেশন (A Man Can not live in socity without Co-operation) অর্থঃ মনে রাখবেন, পরস্পর সহযোগিতা ছাড়া সমাজে কেউ একা বাঁচতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে নবি-রাসূল ও অলিদের যে সব লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত তম্মধ্যে 'আদলে মোত্লাক' অর্থাৎ স্বাধীন বা ন্যায় বিচার ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বিলি-বণ্টন অন্যতম। এজন্য সমাজে তাঁরা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। উপরে বর্ণিত ঘটনায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রেওয়াজ বা প্রথার বিপরীত কর্মে এ শিক্ষাই দিলেন যে, আল্লাহ্র নিয়ামতে শ্রমিক, মালিক, ধনী গরীব সকলের সমঅধিকার।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রথের রশি' নাটকে মানব সমাজের অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যত নির্দেশ করেন এভাবে– "কালের রথ একসময় চলত পুরোহিত ব্রাহ্মণের টানে, তারপর চলে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়দের টানে, এরও পরে অর্থ সম্পদের অধিকারী বৈশ্যরাই চালায় সে রথ। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল এদের কারও টানেই রথ চলছে না, 'সবার পিছে সবার নীচে' পড়ে থাকা শুদ্ররা এসে যখন রশিতে ধরে দিল টান তখনই রথ চলল ঘর্ঘর করে"। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম মানব সভ্যতার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্র আঁকেন এভাবে– "ব্রাহ্মণ পাদ্রীর রাজত্ব গিয়াছে, গুরু, পুরোহিত, খলিফা, পোপ নির্বংশ প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধ্বসে পড়েছে। রাজা আছেন নামমাত্র। আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শুদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে নয়, শুদ্রের প্রয়োজনে চলবে সমাজ"। বাঙালির দুই মহান কবির স্বপ্ন পূরণের দায়ভার গ্রহণ করে বাঙালি অধ্যাত্ম সাধক হক ভাণ্ডারী তাঁর বিশ্বজয়ী ক্ষমতাবলে শ্রমিকের প্রাপ্য লাভে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

নিজের জন্য তৈরি খাবার গরীব চাকর বাকরদের খাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তিনি যেন অলক্ষ্যে দুনিয়ার তাবৎ গরীবদের জীবন মান উন্নয়নে ধনী দেশগুলোর

অবদানে গঠন করেন, এনজিও (নন গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশান) সংস্থা। বিগত ক'বছর ধরে বিশ্বের কোটি কোটি গরীব মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এ সংস্থার সংগঠনগুলো বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

দশ. আশির দশকের প্রথমভাগে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী একবার চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ধলই গ্রাম সফর করেন। তাঁর আগমন সংবাদে সর্বশ্রেণির বিপুলসংখ্যক ভক্ত নিজেদের বাড়ি ঘরে নিয়ে যেতে অভ্যর্থনার প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। প্রখ্যাত অলি উল্লাহ্ হযরত শাহ্জাহান শাহ্ (র.) এর মাযারের পূর্বে এমন এক জমিতে গিয়ে তিনি বসে পড়েন যা ছিল দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত। স্থানীয় এক প্রবীণ ব্যক্তি সবিনয়ে আরজ করেন, 'এ জমি অমুকদের বিরোধীয়'। ভদ্রলোকের কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনি প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠেন, 'আমি আল্লাহ্র জমিতে বসেছি, অন্য কারো জমিতে নয়'। সেখানে তিনি ক'দিন অবস্থান করেন। নির্দেশ পেয়ে ভক্তরা একটা গরু জবেহ ও প্যান্ডেল করে মাইক লাগিয়ে ফাতেহা-মিলাদ মাহ্ফিল করেন। দিন দিন ভক্ত দর্শনার্থীর ভিড় বাড়তে থাকে। বাবাজান সেখানে অবস্থান দীর্ঘ করবেন ভেবে আস্তানা করার জন্য জমির মালিক দু'পক্ষের অনুমতি নিয়ে ভক্তরা মাটি ভরাট শুরু করেন[৭]। সে ধারণাকে কোন আমল না দিয়ে একদিন তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ফিরে আসেন। সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে বিরোধ মানব সভ্যতার শুরু থেকে চলে আসছে। এই বিরোধ ভাইবোন, স্ত্রী পুত্র, মাতাপিতা, পাড়া-প্রতিবেশী, এক সমাজ অন্য সমাজে, এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে অথবা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যেও হয়ে থাকে। ফলে পরিবার, সমাজ এলাকা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের কারণে মতান্তর, শালিস বিচার, মামলা-মোকদ্দমা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মারামারি, খুনোখুনি, যুদ্ধ ইত্যাদি চলেই আসছে। ফলে সর্বত্র শান্তি বিপর্যস্ত হচ্ছে। সম্পত্তির মালিকানা অর্থাৎ অধিকারকেই প্রচলিত আইনে ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বলে সংজ্ঞায়িত করেছে। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র কোনটি স্থায়ী নয়। সময়ের গতিতে মানুষ তো মরেই রাষ্ট্রও গড়ে আবার ভাঙ্গেও। কাজেই অস্থায়ী কোন কিছুর সার্বভৌমত্ব থাকতে পারেনা। সম্পদের মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র। অন্য ধর্মগ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল্ কোরআনের প্রথম সূরার প্রথম আয়াত বা বাক্য "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন" অর্থ– সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। যিনি

জগতসমূহের মালিক। তার পরের আয়াত “মালিকি ইয়াওমিদ্দিন” – “তিনি বিচার দিনের ও (হাশর) মালিক”। পাঠককে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। যেহেতু তিনি সবকিছুরই একমাত্র মালিক-প্রভু। শুধু তা নয়, মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন সেটার মালিকানাও অন্য কারো নয়। সুতরাং সব কিছুতেই ব্যক্তির মালিকানা বা স্বত্ব যে অস্থায়ী শুধু তা নয় ব্যক্তি নিজেও স্থায়ী নয়, সে শিক্ষাও কোরআনের প্রথমে নির্দেশিত; যাতে মানুষ পার্থিব সম্পদের লোভ মোহে জীবনকে কলুষিত না করে। এই নির্দেশকে মানব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই সালাতের (নামায) প্রত্যেক রাকাতে এই সূরা পাঠ করা অবশ্য পালনীয় বিধান বা ফরজ করা হয়েছে। বার বার স্মরণের ফলে সে শিক্ষা যেন স্বভাবে পরিণত হয়।

দুঃখের বিষয় যে প্রতিদিন নামাযে অনেকবার এ চরম সত্যবাণী পাঠ করেও আমরা তার মর্মকে গ্রহণ করিনা। এজন্যই সমস্ত কিছুর উপর বার বার আল্লাহ্‌র সার্বভৌম মালিকানা স্বীকার করেও টাকাকড়ি, গাড়ি-বাড়ি, জমি-জিরাত, কলকারখানা সমস্ত কিছুর উপর বার বার মালিকানাধীন সম্পদ হিসেবে ভোগ ব্যবহার করে মূলত: আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেই চলেছি। পবিত্র কোরআনে বার বার বলা হয়েছে সম্পদের সকল মালিকানা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র। মানুষ সম্পদের আমানতদার হিসেবে নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহারের অধিকারী মাত্র। আমানতদারীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ব্যাংকের কর্মচারী কর্মকর্তারা কোটি কোটি টাকা লেনদেন করতে পারে কিন্তু বেতন ভাতার অতিরিক্ত এক পয়সাও ভোগের অধিকারী নয়। আবার লেনদেনে ঘাটতি হলে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। অপব্যবহারের কোন সুযোগ তো নয়ই বরং অপব্যয়ীদের শয়তানের ভাই বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘সম্পদের মালিকানা আল্লাহ্‌র’ বলে ঘোষণার দ্বারা দুনিয়ার সকল সম্পদে মানব জাতির যৌথ ভোগ অধিকার নিশ্চিতকরণই উদ্দেশ্য বুঝা যায়। ইসলামী শাসনের প্রথম দিকে ‘বায়তুল-মাল’ তহবিল সে উদ্দেশ্য পূরণেই গঠিত হয়েছিল। সম্পদের মালিকানা ও স্বেচ্ছা বিলি-বণ্টন সম্পর্কিত কোরআনের আরো ক’টি আয়াত ও একটি হাদিস উদ্বৃত করা গেল।

মহাকাশে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের মাঝখানে এবং মাটির একেবারে নীচতল পর্যন্ত সবকিছুর মালিকানা তাঁরই (আল্লাহ্), (সূরা ত্বাহা : ৬)।

আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গণীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্‌র জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; (সূরা আনফাল: ৪১)।

রাতে এবং দিনে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে যারা তাদের ধনসম্পদ দান করে তাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে জমা থাকে। তাদের কোন ভয় কিংবা দুঃখের কারণ নাই। (সূরা বাক্বারা : ২৭৪)

লোকেরা আপনাকে [রাসূল (দ.)] প্রশ্ন করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কত খরচ করবে। বলুন, তোমাদের অতিরিক্ত সবটুকু (সূরা বাক্বারা : ২১৯)।

বসবাসের জন্য একখানা ঘর, পরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়, এক বেলার খাবার ও কিছু পানি আদম সন্তানের জন্য তার চেয়ে অধিক সম্পত্তির মালিক হওয়ার কোন অধিকার নেই – হযরত ওসমান (রা.) বর্ণিত হাদিস (তিরমিজি)। আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল ও অলিদের ইচ্ছা যে, বিত্ত সম্পদ যতই থাকুক মানুষ সংসার মায়া মোহ বা বস্তুনির্ভর না হয়ে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক। তা না হলে খোদায়ী সংযোগ হয় না। যুগে যুগে নবি-অলি প্রেরণ ও সকল ধর্ম দর্শন ত্বরিকার মূল শিক্ষা মানুষকে পবিত্র করে আল্লাহ্‌র খেলাফতের যোগ্য করে গড়ে তোলা। অপরদিকে বিরোধের ফলে সম্পদের অপচয়, অবচয়, পতিত কিংবা সঞ্চালন বৃত্তের বাইরে পড়ে থাকে। 'আল্লাহ্‌র জমিতে বসেছি' বলে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী একদিকে মানুষকে সম্পত্তির নির্ভরতা থেকে মুক্ত করতে এবং পতিত সম্পদকে সঞ্চালন বৃত্তে নিয়ে আসার ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ্‌র সকল নবি-অলিরা স্বেচ্ছায় দরিদ্র জীবন যাপনকে বেছে নেন। জীবনী ও পারিবারিক সূত্রে প্রকাশ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ও শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ভক্তদের দেওয়া নজরানার শতকরা ৫% ভাগও পরিবারের ভোগ ব্যবহারের জন্য না দিয়ে দরিদ্র অভাবী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কুমিল্লার নবাবের প্রেরিত এক থলে স্বর্ণমুদ্রার উপর বাবা ভাণ্ডারী প্রশ্রাব করে দেন। আল্লাহ্‌র অলিদের কাছে এই মূল্যবান সম্পদ পায়খানা প্রশ্রাবের চেয়েও নিকৃষ্ট। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়ত নীতি ন্যায্য প্রাপ্যের কিছু অংশ ছাড় দিয়ে সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশ

দেয়। এতে সাময়িক কিছু ক্ষতি হলেও ব্যক্তি এবং সমাজ সুদূরপ্রসারী লাভবান হয়ে থাকে। নানা কূটকৌশলে বিত্ত সম্পদের আত্তীকরণ নয়, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে দুনিয়ার তাবত সম্পদ সঞ্চালনই শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর উপরে বর্ণিত ঘটনার তাৎপর্য। যেহেতু সম্পদের মূল মালিকানা মানুষের নয়। বিশ্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও গরীব দেশগুলোকে দান খয়রাত কিংবা কর্জ দানের কোনই প্রয়োজন হবে না যদি গরীব দেশের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদকে অর্থনীতির সঞ্চালন বৃত্তে নিয়ে আসা হয়। গরীব দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রেখে, অথবা সৃষ্টি করে কিংবা শক্তির জোরে অবাধ লুণ্ঠন করা যে বেশীদিন চলবে না বিশ্বঅলির ইঙ্গিতময় দাবী তাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঘটনাপ্রবাহ সর্বদা কোন এক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না, বিশ্বের ধনী দেশ ও জাতিগুলো এই সত্য যতশীঘ্র অনুধাবন করবেন ততই সর্বাঙ্গিন মঙ্গল।

তথ্যসূত্রঃ

১। প্রতিবস্তু থেকে জ্বালানী, একুশ শতক বিভাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৬-৫-১৯৯৯।

২। ফটিকছড়ি থানার রোসাংগিরি ইউনিয়নের ছাদেক নগর নিবাসী মফজল আহমদ মেম্বার।

৩। পবিত্র স্মৃতিবহ জিনিসগুলো দরবারের স্মৃতি কক্ষে সংরক্ষিত।

৪। এবাকাস থেকে ইলেকট্রনিক্স শুক্রবারের ম্যাগাজিন আড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ, ১১-১২-৯৮।

৫। বিশ্বকে বদলে দেবে বায়োটেকনোলজি, একুশ শতক বিভাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩১-০৫-৯৮।

৬। ভবিষ্যতের প্রযুক্তি – শিবব্রত বর্মন, একুশ শতক বিভাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ভোরের কাগজ ৪-৭-৯৬। সমান্তরাল মহাবিশ্বের ধাঁধা, দৈনিক ভোরের কাগজ, জুন'৯৯।

৭। সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দৃষ্টিভঙ্গী, মো. মাহবুব-উল-আলম, দৈনিক আজাদী, ২৫-১২-৮৪।

মেহমান গোলাম জীন

কাচারি ঘরে দশ/বার জন লোকসহ বসা ছিলাম। বাবাজান হঠাৎ ডাকলেন, ‘বখ্তেয়ার মিয়া, একটু এদিকে আসুন। দু’টো মেহমান এসেছে’। হুজরায় গিয়ে দেখি, দু’টা বড় জাতের কুকুর বসা। ভিতরে গিয়ে একটা ট্রেতে করে তিনি চা নাস্তা আনলেন। এক কাপ চা একখানা কেক আমাকে দিয়ে দু’খানা কেক কুকুরগুলোকে খাওয়ালেন। চায়ের কাপগুলো সামনে দিলে কুকুরেরা জিহ্বা দিয়ে চেটে চা পান করে। চা কেক খেতে খেতে বলেন; ‘এটা বন্ধু! চিনে রাখুন। কখনো আসলে খানাপিনা দিবেন। মারবেন না। অপরটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন, ‘ওটা গোলাম জীন’। কিছু বললে গর্দান ফিরিয়ে ঘেউ ঘেউ করে; কথা শেষ না হতেই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে আরম্ভ করে। তিনি হুজরা থেকে বেরিয়ে পুকুর পাড়ে গেলে আমিও কুকুরগুলির পেছনে গমন করি, বাবাজী সেখানে দাঁড়ালেন। পায়ের কাছে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কুকুরগুলো যেন তাকে সালাম করলো। তিনি চুক চুক করে কী যেন বললেন। অতঃপর নাজিরহাট মাইজভাণ্ডার রাস্তা ধরে কুকুরগুলো সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেল। তিনি উদাস দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। **বর্ণক: (ক)**

বাংলাদেশ বিপদমুক্ত

“মহাবিপদ সংকেত। বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বিকাল ৪টার মধ্যে দেশের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলে আঘাত হানতে পারে। সেই সঙ্গে বিশ ফুট উঁচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসেরও সম্ভাবনা। উপকূল থেকে ২০০ মাইল দূরে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় একশত মাইল। নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। সকল প্রকার নৌযান, মাছ ধরা ট্রলার ও বাণিজ্য পোতকে বন্দরের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে নোঙ্গর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন”। দুপুর ১২টা থেকে রেডিও বাংলাদেশ বারংবার এই ঘোষণা প্রচার করে। এই ঘোষণা শুনে শহর গ্রামের ব্যস্ত মানুষেরা দ্রুত ছুটে নিজ নিজ আবাসে। সড়ক ও জনপদগুলো প্রায় যানবাহন ও লোকজন শূন্য হয়ে পড়ে।

লোকেরা ভীত ও আতঙ্কিত। অনেকের দৃষ্টিপটে বুঝি ভেসে উঠে ঊনিশ্‌শ’ ষাট, তেষট্টি ও সত্তরের সর্বনাশা তুফান আর গর্কীর দুঃসহ ছবি।
ঘোষিত বিপদ সংকেত উপেক্ষা করে একটি জীপ গাড়ি ছুটে চলে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত অভিমুখে। দমকা ঝড়ো হাওয়া বার বার জীপের গতিকে ব্যাহত করে। তবু কর্তার নির্দেশ ‘চালাও’। সৈকতে পৌঁছেই জীপ থেকে নেমে পড়লেন। তখন বিকেল সাড়ে তিনটা। সাগরের জল ফুঁসে উঠছে। পাহাড় সমান এক এক ঢেউ; সমুদ্র যেন সরোষে গর্জে উঠছে। তিনি দ্রুত সাগরের দিকে ছুটে যান। এক বুক পানিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে আগত ঢেউ রাশিকে উদ্দেশ্য করে হুঙ্কার ছাড়লেন, “খবরদার! খবরদার! খবরদার! কিছুক্ষণ পর উপকূলে ফিরে আমাকে বলেন, ‘মামু সাহেব, চলুন কাজ হয়ে গেছে’। চট্টগ্রাম শহরে দামপাড়া ব্যাটারী গলিস্থ অস্থায়ী আস্তানায় পৌঁছে রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম, ‘বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ভারতের উড়িষ্যার দিকে সরে গেছে। বাংলাদেশ এখন বিপদমুক্ত’।
“মানুষ বিশাল সমুদ্র এক – গতিশীল সমুদ্র তার বিন্দুমাত্র বারিকণা” – ইকবাল।
বর্ণক: (খ)

এক রাতে দুই শহীদ

আটাত্তর সালের বাইশ জানুয়ারি, আট মাঘ। শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী বিকাল বেলা তাঁর জীপ নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন সন্ধ্যার পর। তখন রাত প্রায় সাতটা। অত্যধিক জজ্‌বাহালে গাড়ি থেকে নামতে নামতে তিনি বলতে লাগলেন, ‘আমি জীন রাখবোনা। মেরে ফেলবো। মর্‌, মর্‌’। একথা বলতে বলতে হুজরায় প্রবেশ করেন। এক ঘন্টার মধ্যে হঠাৎ স্টোর রুমের পিছনে লোকজনের শব্দ। আমরাও দৌড়ে গেলাম। খাদেম সোলায়মান বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সবাই ধরাধারি করে স্টোর রুমে আনলেন। সোলায়মান সেখানে কী জন্য গিয়েছিলেন কেউ জানে না। ডাক্তার সৈয়দ দিদার সাহেবকে ডেকে আনা হলো; দেখে মন্তব্য করলেন, ‘মারা গেছেন’। একই রাত এগারোটায় হুজরা থেকে বেরিয়ে তিনি সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার সাহেবকে ডেকে নিলেন। একটা টেলিভিশন বখ্‌তেয়ার সাহেবের মাথায় দিয়ে বললেন, ‘চলুন তো মামা, বাবাজানকে (তাঁর পিতা) একটু দেখে আসি’। বখ্‌তেয়ার সাহেবকে আগে

হাঁটতে বলে তিনি পিছু পিছু চলেন। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে গিয়ে হুজরার দরজার কড়া খট্‌ খট্‌ করে নাড়তে লাগলেন। তথাকার খাদেম, বরিশাল নিবাসী জালাল আহামদ এসে বলেন, 'দাদা! এত রাতে বাবাজানকে বিরক্ত করবেন না; তাঁর অসুখ। এতে শাহানশাহ্‌ হঠাৎ জজবাহালে বলেন, 'হারামজাদা! আমি জীন রাখবোনা। পূর্বের বাড়িতে গিয়ে যে শোবে আর উঠবেনা'। অতঃপর দরোজা খোলা হলে বখ্‌তেয়ার সাহেবকে পালংকের উপর দিয়ে ইলেকট্রিক প্লাগ খুঁজে টেলিভিশনের সংযোগ দিতে নির্দেশ করেন। অছিয়ে গাউসুল আযম পালঙ্কে শায়িত, এজন্য বখ্‌তেয়ার সাহেব ইতস্তত: করলে তিনি ইশারায় অনুমতি দেন। সেদিকে কোন প্লাগ নাই জানালে বলেন, 'ওদিকে ওঠো'। সেখানেও কোন প্লাগ ছিলনা। তাঁর আব্বাজান জিজ্ঞাসা করলেন, 'বড় মিয়া, টেলিভিশন দিয়ে আমি কি করবো'। তিনি বলেন, 'এটাতে সুন্দর সুন্দর ছবি আসবে, গান আসবে, দেখলে আপনার ভালো লাগবে'। হুজুর বলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র আরশের দিকে চেয়ে থাকি। এসব আমার দরকার নেই'। পরে বখ্‌তেয়ার সাহেবকে বলেন, মামা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি একটা মিস্ত্রি খুঁজে আনি। কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে পুনঃ বখ্‌তেয়ার সাহেবকে রওজা শরিফ মাঠে দাঁড় করিয়ে বলেন, 'এখান থেকে দেখবেন যেন দরোজা বন্ধ না করে'। তিনি আর ফিরে না যাওয়ায় রাত বারোটায় বখ্‌তেয়ার সাহেবকে ডেকে খাদেমুল ফোক্বারা বলেন, 'আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। বড় মিয়া এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। তুমি দরোজাটা নিজ হাতে বন্ধ করে দিয়ে যাও। জিজ্ঞাসা করলে বুঝিয়ে বলবে'। দরোজা বন্ধ করে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে ফিরে এসে হুজরার সামনে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি দরোজা খুলে বলেন, 'দরোজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছেন তো? বাবাজানের বেশী ঠাণ্ডা লাগছে, বাবাজান চলে গেলে দরবার শরিফ অন্ধকার হয়ে যাবে'।

রাত একটার দিকে পূর্ব বাড়িতে লোকজনের শোর উঠে। খাদেম জালাল কয়েকবার গলা দিয়ে রক্ত বের হয়ে মারা যায়। এভাবে মৃত দু'জনের মুখমণ্ডল অত্যধিক উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়। সে বছর দশ মাঘ উরস শরিফে লোকজন খুবই ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো। অলি-উল্লাহ্‌দের দৃষ্টির তীর জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। **(গ)**

বর্ণক: (ক,খ,গ) সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌, পিতাঃ সৈয়দ লুৎফুর রহমান, সৈয়দ পাড়া, বক্তপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মক্কা শরিফ-মাইজভাণ্ডার উভয়স্থানে

ঊনিশ্‌শ’ আটাত্তর সালে হজ্ব করার জন্যে মক্কা শরিফ গমন করি। সঙ্গে আমার শাশুড়িও। সেখানে একরাতে আমার শাশুড়ি স্বপ্নে দেখেন, শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী হেরম শরিফের একপার্শ্বে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘বাবাজী আপনি কবে এসেছেন’? উনি জবাব দেন, ‘আমি এখানে (মক্কা শরিফ) ও মাইজভাণ্ডার শরিফ উভয় স্থানে থাকি’। হজ্ব থেকে আসার ক’দিন পর আমার বড় শালা আলী ফকির ব্যাটারী গলিতে গেলে তিনি বলেন, ‘আলী দা নাকি’? ভাই সাহেব কোথায়? আমি বাসায় জানালে আলীকে দশ টাকা রিক্‌শা ভাড়া দিয়ে আমাকে সেখানে নেবার জন্য পাঠান। একই রিক্‌শায় কদম মোবারক বাসা হতে তথায় গমন করি। আমি জুতা খুলে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে বলে উঠেন, ‘জুতা খুলবেন না, আপনি বড় ভাই, জুতা নিয়ে আসতে পারেন’। পৌঁছার সাথে সাথে মিষ্টি আনিয়ে খেতে দিলেন। অতঃপর আমার বাসায় আসেন। মক্কা শরিফ থেকে আনীত জমজমের কিছু পানি এবং কয়েকটি খেজুর তাঁকে দিলাম। এগুলো আমরা দরূদ শরিফ পড়ে খাই। ভাইজান ‘বিসমিল্লাহ্ করুন’ বলার সাথে সাথে বলে উঠেন, ‘ভাই সাহেব, এসব আমি সবসময় খেয়ে থাকি। এগুলো অন্য লোককে দিয়ে দেবেন’। ঠিক তখুনি আমার শাশুড়ির স্বপ্নের কথা মনে পড়ে।

বর্ণক: মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া এম.এ. (আলীগড়)। ভূতপূর্ব সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা। দুর্নীতি দমন বিভাগ, বাসা- কদম মোবারক, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

জীবন-জাহাজ বাঁচে

নানা প্রকারের বহু বর্ণের বিপুল মাছের কেন্দ্র; স্বর্ণগর্ভা বঙ্গোপসাগর। বহুসংখ্যক জেলে দেশী নৌকা, ট্রলার ও ফিশিং বোট নিয়ে মাছ ধরছে। যেন অফুরন্ত সে ভাণ্ডার। জেলেরা জাল টানতে শুরু করলে রোদে চিক্ চিক্ করা শ্বেত শুভ্র মাছগুলো যেন যুবতীর প্রাণখোলা হাসি। ভুলে যাই সাগর বুকের একাকীত্ব। মাছই যেন একান্ত প্রিয় পরিজন। মাছ ধরার মৌসুমে অল্প সময়ে নৌকা ট্রলার ভরে উঠে। কোল্ড স্টোরেজ ভরে তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়। আমি তখন মফিজ সাহেবের এফ.ভি. ভাণ্ডারের দায়িত্বে ছিলাম। মাছ ধরে ঢাকার আড়তে ঢেলে দাম গুণে যত শীঘ্র সম্ভব আবার সমুদ্রে চলে এসেছি। পঁচাত্তর সালের শ্রাবণ

মাস। সাগর শান্ত; মাছধরা যানগুলো এদিক সেদিক যাচ্ছে, আসছে। ঢাকা থেকে মাছ বেচা আশি হাজার টাকা নিয়ে ফিরছিলাম। উদ্দেশ্য আরেক দফা মাছ ধরে সোজা চট্টগ্রামে নোঙর করবো। উপকূল থেকে আমাদের ট্রলার পনের মাইল দূরে। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেলো। সেদিন অমাবস্যার পূর্ণ জোয়ার। পূর্ব-দক্ষিণ দিক হতে শুরু হলো বৃষ্টি ও তুফানের ভীষণ তান্ডব। সকলে ভীষণ জড়সড়। এমনি সময়ে ট্রলারের তলা থেকে এক টুকরো ঢিবির গাছ ছিটকে উপড়ে উঠে এলো। ছিদ্র পথে তীব্র বেগে পানি ঢুকতে লাগলো। কিছুতেই ছিদ্র বন্ধ করা সম্ভব হলো না। পানিতে ইঞ্জিনের গিয়ার বক্স ডুবুডুবু প্রায়। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় কলেমা-কালাম পড়তে লাগলাম। হঠাৎ বাবাজানের কথা স্মরণ হলে বললাম, আমিতো সমুদ্র যাত্রায় আপনাকে বলে এসেছিলাম। আত্মীয়-স্বজনহীন গভীর সমুদ্রেই কি মরবো? একথা বলে অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। চেতনা ফিরে এলে ড্রাইভারকে ইঞ্জিন চালু করতে নির্দেশ দিলাম। একবার চেষ্টা করতেই চালু হলো। এক টানেই পৌঁছে গেলাম নিরাপদ স্থানে। তুফানে অনেক নৌকা ডুবে গেছে। বাবাজানের স্মরণ মৃত্যুর দুয়ার থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনলো।

বর্ণক: ছৈয়দ মছিউদ্দৌল্লাহ, পিতা- মরহুম ছৈয়দ আহমদ হোসাইন, বক্তপুর, ছৈয়দপাড়া, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

আল্লাহ্-আল্লাহ্ করুন

পিতার মৃত্যুর পর চাচার সাথে পারিবারিক ব্যবসা ভাগ হয়ে যায়। ব্যবসায় ক্ষতি বাবদ আমাদের উপর বহু টাকা কর্জ বর্তায়। সংসারের কোন দায়িত্বে ছিলাম না বলে কিছু বুঝতেও পারছিলাম না। ছোট তিন ভাই তখন স্কুলে পড়ে। তাই একাই দায়িত্ব নিতে হয়। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব, ব্যবসার অচলাবস্থা এবং পাওনাদারদের তাগাদায় দোকানে বসা দায়। কয়েক বছর চেষ্টা করলাম। শেষে অবস্থা এমন একস্তরে পৌঁছে যে আর চলে না। দোকান বিক্রি করে দেবো কিনা ভেবেছি। বহুদিন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলাম। বন্ধু-আত্মীয় স্বজন নিকটজনের সাথে আলাপ আলোচনা করলাম। সঠিক সিদ্ধান্ত কেউ দিতে পারে না।

সঠিক সিদ্ধান্তের আশায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর নিকট গমন করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জমি কতো আছে, চাষ ব্যতীত আয়ের অন্য সূত্র আছে কিনা',

সবকিছু তাঁকে জানালাম। তিনি উত্তর দিলেন, 'এত অল্প জমিতে চাষাবাদ করে কি পরিবার চলবে? দোকান বিক্রি করবেন না। দোকানে বসে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করুন'। এটা সাতাত্তর সালের কথা।

নন্দন কানন অপর্ণা চরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম গলিতে রিয়াজউদ্দীন বাজারে আমাদের থান ও শাড়ী কাপড়ের ব্যবসা। একদা এক লোক এসে বলে যে আপনার দোকানের একপাশে কিছু জায়গা ছেড়ে দিলে অস্থায়ী ভাড়া হিসেবে দৈনিক দশ টাকা করে ভাড়া দেবো। আমি কোট-প্যান্ট-শার্টের কাপড় বিক্রি করবো। ছোট ভাইকে সঙ্গে রাখার শর্তে ভাড়া দিতে রাজী হলে লোকটা ব্যবসা আরম্ভ করে। এক বছর ব্যবসা করলে ছোট ভাই সে ব্যবসা শিখে নেয়। তারপর লোকটাকে অন্যত্র জায়গা নিতে বলে বিদায় করি। অনেক কষ্টে কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করে শাড়ী ও থান কাপড়ের ব্যবসা পাল্টিয়ে প্যান্ট শার্টের কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করি।

আস্তে আস্তে ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে। মেজো ভাইকে দুবাই পাঠালাম। দু'বছর পর সেজো ভাইকেও পাঠালাম। আমি ও কনিষ্ঠ সহোদর ব্যবসা চালাচ্ছি। আল্লাহ্র এই মহান অলির প্রত্যক্ষ মেহেরবাণীতে আমাদের পরিবার স্বচ্ছল হয়। বড় ছেলে বখ্তেয়ার লেখাপড়া শেষ করে ব্যবসার দায়িত্ব নিলে বিবাহও করালাম। শহরে বাড়ি করার জন্য জমি খরিদ করেছি।

বর্ণক: সামশুল আলম সওদাগর, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহিম সওদাগর, গ্রাম- সুলতানপুর, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

সৎভাবে জনগণের সেবা

লোকটাকে কোনদিন দেখি নি। সৌম্য দর্শন এক সুন্দর সুপুরুষ। একদা স্বপ্নে সেই অদেখা লোকটাকেই দেখলাম। পরনে একটা সাদা চেক লুঙ্গি গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, ময়লা চিটি্চটে। মুখে সাদা কালো দাড়ি। মাথায় অগোছালো চুল। মুখমণ্ডল দীপ্তিময়। বেশী ফর্সা নয়। যেন কাঁচা হলুদ অথবা পূর্ণিমা চাঁদের আলোর মতো গায়ের রং। দেখে দেখে আমার চোখের তৃপ্তি হয় না। আরো দেখতে ইচ্ছে হয়। ভয়ে শ্রদ্ধায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে?

তিনি জবাব দিলেন– 'জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী'। কোথায় আপনাকে পাবো? "মাইজভাণ্ডার শরিফেও থাকি, চট্টগ্রাম শহরেও থাকি। খোঁজ করলেই পাবেন" তিনি জানালেন। তারপর আস্তে আস্তে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

নিজের মধ্যে একটা দাহ সৃষ্টি হলো। লোকটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। ঘটনাটা আমার স্বামী সালাহউদ্দিন সাহেবকে খুলে বললাম, তাড়া দিলাম সহসা সাক্ষাতে যাওয়ার জন্য। তিনি ব্যস্ত মানুষ। সময় হয় না। চার মাস হয়ে গেলো। অবশেষে অদেখা লোকটাকে দেখার জন্য ছুটলাম। চট্টগ্রাম শহরে এসে সাহেবের বন্ধুর বাসা খুঁজে উঠলাম। তাঁর বাড়ি মাইজভাণ্ডার শরিফ বলে শুনেছি। তিনি বাসায় ছিলেন। তাঁকে স্বপ্নের কথা জানালাম। উদ্দেশ্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লোকটার খোঁজ করা। তিনি জানালেন; 'আপনারা তাঁকে খুঁজে পাবেন না; তাঁর ইচ্ছা হলে হয়তো এখানেও চলে আসতে পারেন। তিনি সর্বদা বাড়ি থাকেন না'। মনটা আশঙ্কায় দুরু দুরু করে উঠলো। চট্টগ্রাম এসেও যদি দেখা না পাই! তবে আমার আসাও বৃথা। তবু অপেক্ষায় রইলাম। ডাক্তার সাহেব আমাদের উত্তম খাবারে আপ্যায়ন করালেন। খাওয়ার পর তাঁরা দু'জনে দুটো সিগারেট আগুন ধরিয়ে মুখে দিতেই দরোজার কড়া নাড়ার শব্দ। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনারা যাঁকে খুঁজছেন তিনি এসে গেছেন'। দরোজা খুলতেই দেখলাম সেই লোকটা। সেই লুঙ্গি, ময়লা চিট্‌চিটে গেঞ্জি, সৌম্যদর্শন সে পুরুষ। তিনি ডাক্তার সাহেবকে বললেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছি। ভালো আছেন'? ডাক্তার সাহেব জবাব দিতেই চলে যেতে উদ্যত হলেন। আমি কেঁদে উঠলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– 'কাঁদে কে'? ডাক্তার সাহেব আমার স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন, 'ইনার স্ত্রী। আপনার সাক্ষাতে এসেছেন'। তিনি বললেন, 'ভালো হয়েছে, আপনার এখানে এসেছেন। নতুবা কোথায় আমাকে খুঁজতেন। এখানে আসাতে তাদের সাথেও দেখা হলো'। ডাক্তার সাহেব বসতে বললে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘরে দুধ আছে"? ডাক্তার সাহেব আছে জানালে এককাপ দুধ দিতে আদেশ করলেন। দুধ খেতে কিছুক্ষণ বসলেন। সালাহউদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করেন? তিনি জানালেন 'সচিবালয়ে চাকরি করি। বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী'। পুনঃজিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘুষ খান? ঘুষ খাবেন না। সৎভাবে জনগণের সেবা করবেন'। ইতিমধ্যে আমি পা ছুঁয়ে সালাম করি। একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ভালো আছেন? খানাপিনা খেয়েছেন'? উত্তর দিলাম। অতঃপর বিদায় নিয়ে বললেন, 'এখন চলে যান, দেখাতো হয়েছে'। ডাক্তার সাহেবের দিকে হেসে বললেন, 'ইনি আমার ছোট ভাই'। ছোট ভাইকে বললেন, 'আপনার টাকা পয়সা আছে? না থাকলে কয়েক হাজার টাকা আমার থেকে

রাখুন’। তিনি প্রয়োজন নেই জানালে বলেন, ‘আমার সঙ্গে আসুন গাড়ি থেকে টাকাগুলো এনে আলমিরায় রাখুন। পরে যখন দরকার হয় নিয়ে যাবো’। ডাক্তার সাহেব এক গাদা টাকা নিয়ে বাসায় ফিরলেন। সবগুলো শতকী নোট। মনে হলো হাজার পঞ্চাশেক হবে। ডাক্তার সাহেব জানালেন– ‘এমনি অনেক টাকা কারো থেকে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেন অথবা পুড়ে ফেলেন’। বিদায় পর্বে বললাম, আপনি উনার ভাই একথা তো ঘূনাক্ষরেও আগে জানালেন না। ডাক্তার সাহেব মৃদু হাসলেন।

সূত্রঃ ডাক্তার শাহ্ সুফি সৈয়দ দিদারুল হক। নায়েবে মোন্তাজেম, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

কিস্তির টাকা পরিশোধ

একাশি সালের দশ পৌষ খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে ষোলশহর বিবিরহাট হতে আহ্লা দরবারের মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের পুত্র মৌলানা জয়নাল আবেদীনের নিকট হতে তিন হাজার একশ’ টাকায় একটা মহিষ খরিদ করি। পাঁচশ টাকা নগদ দান করে বাকি টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা সাব্যস্ত হয়। ৩০শে জানুয়ারি পাঁচশ টাকার কিস্তি দেওয়ার তারিখ। সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করেও টাকা সংগ্রহে ব্যর্থ হই। একদিন শহরে আসলে হক সাহেবের নিকট জানতে পারলাম, বাবাজান আমার জন্য টাকা পাঠিয়েছেন। প্রথমে বিশ্বাস করি নি। বিস্তারিত জেনে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু হক সাহেব লোকটার সঠিক পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। শারীরিক বর্ণনায় বলেন, লোকটা কালো, বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ, মৌলভী সাহেব। এদিকে কিস্তির টাকা প্রদানের তারিখও আসন্ন। এক মঙ্গলবার রাউজান ফকিরহাটে খাসমহালের সামনের ইবাদতখানায় আমরা পাঁচজন মিলে এক ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম করছিলাম। তিন পারা পাঠ করার পর অস্বস্তি লাগলে তথায় শুয়ে পড়ি। তন্দ্রা অবস্থায় স্বপ্ন দেখি, একটা সাদা পর্দা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে গেলো। শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী রোল গোল্ডের চশমা চোখে দিয়ে একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর চেয়ারের পেছনে আবুল কালাম নামক এক লোক চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা করলাম, হক সাহেবের বর্ণনার সাথে লোকটার বর্ণনা মিলে। তন্দ্রা টুটে গেলে আরো কিছুক্ষণ কোরআন পাঠ করে বাকি অংশ পিতার দায়িত্বে দিয়ে ফকিরহাটে আসি। রূপালী

ব্যাংকের সামনে নাপিতের দোকানের বাইরে একটা বেঞ্চে বসলাম। সেখানে বসেই দেখি, স্বপ্নে দেখা লোকটা ব্যাংকের সামনে সাইকেল থেকে নামছে। ডাক দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম বাবাজান তার মারফতে কোন টাকা পাঠিয়েছেন কিনা। লোকটা টাকাগুলো পরিশোধ করে। ফলে কিস্তি দিয়ে ওয়াদা রক্ষা সম্ভব হয়।

বর্ণক: মাওলানা মোহাম্মদ হাসান, পিতা- মাওলানা মুফ্তি অলিউল্লাহ্, গ্রাম- ডাবুয়া, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

একটিমাত্র শব্দে সফলতা

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের কোন এক তারিখে মামু সাহেব (হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী) আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইনস্থ অফিস থেকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। একখানা বেবী ট্যাক্সি ভাড়ায় নিলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাউজান ফকিরহাটে গেলেন। সেখানে একজন ভক্তের বাসায় উঠলেন। আমাকে বারান্দায় বসতে বললেন। আমি বসে থাকলাম। অত্যন্ত স্বাভাবিক নানাবিধ কথাবার্তার শব্দ আমার কানে আসছিল। মাঝখানে একবার এসে আমাকে দেখে যান। রাত প্রায় আটটায় সেখান থেকে বেরুলেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি বসিয়ে রেখেছিলাম। তাকে বলেছিলাম, তোমার ভাড়া যত আসে, আমি দেবো। তুমি কোন প্রকার অসুবিধে মনে করো না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবদুন নূর নামক এক ভক্ত চা দোকানদারকে সঙ্গে নিলেন। ফকিরহাটের উত্তর পার্শ্ব হয়ে উত্তরমুখী রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম। খাল পার হবার পালা। মামু সাহেব বললেন ট্যাক্সি খালে নামাও, সামনে পানি – ড্রাইভার সাহস পায়না। কারণ ইঞ্জিনে পানি ঢুকলে আর চলবেনা। আমি সবিনয়ে সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি চুপ থাকো'। চুপ করে রইলাম। আমরা তিনজনই ট্যাক্সিতে উপবিষ্ট। ট্যাক্সির ড্রাইভার তার আসনে। ধব্ধবে জোৎস্না। খালের পানি চিক্ চিক্ করছে – যেন অনন্ত আলোর এক বহতা ধারা সর্তা খালের বুক চিরে ছুটে চলেছে আলোর মহাসাগর পানে। কিছুক্ষণ পর আমি দ্বিতীয়বারের মতো সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি পূর্বের চেয়ে একটু চড়া স্বরে বললেন, 'তুমি চুপ থাকো বলছি'। আমি চুপসে গেলাম। কিন্তু সমাধানের কোন পথ খুঁজে পেলামনা। আমি

ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে পুনরায় বলার চেষ্টা করতেই তিনি কড়া স্বরে বললেন, 'শাট্ আপ ব্লাডি। যার কাজ সে-ই করবে'। এ ধমক খেয়ে আমার সম্বিত ফিরে এলো। ভাবলাম, আমিতো তাঁকে আনি নি, তিনিই তো আমাকে এনেছেন। সুতরাং ......। এর কিছুক্ষণ পর একটা বাঁশের বঁউক (বোঝা বইবার জন্য দ্বিখণ্ডিত বড় বাঁশের চাঁছা একাংশ) কাঁধে একজন লোক এসে হাজির। পরে জেনেছি, সে নাকি শুনেছে কোন দুবাইওয়ালা ট্যাক্সি করে বাড়ি আসছে। মালপত্র এসেছে। সে জিজ্ঞেস করাতে মামু সাহেবের পরিচয় দিলাম। লোকটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আঁতকে উঠলো। এরি মধ্যে এক এক করে বেশকিছু লোক সেখানে হাজির। প্রথমোক্ত ব্যক্তিসহ সবাই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ভক্ত। তারা শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে ভালোভাবেই চেনেন। কিছুসময় যেতে না যেতেই সকলে ট্যাক্সিটাকে আল্‌গিয়ে পার করে দিলেন।

খাল পার হয়ে কিন্তু সমস্যার শেষ হলোনা। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। খালের পাড়ের অদূরে একটা ভাঙ্গন। সেখানে দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় আল্‌গিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে ট্যাক্সি পার করা সম্ভব নয়। ট্যাক্সি থেকে নেমে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। আমি একবার ট্যাক্সির দিকে একবার তাঁর দিকে চেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম। অবশেষে তাঁকে ধরতে আমার দস্তুরমতো কষ্ট হল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার পর আমাকে বললেন, 'চাঁপা কলা নিয়ে এস'। আমি বললাম, চাঁপা কলা না পেলে অন্য কলা আনব কি? তিনি শুধু গম্ভীরভাবে বললেন, 'চাঁপা কলা'। আমি দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। দোকানে সত্যিই ক্ষুদ্রাকারের এক কাঁদি চাঁপা কলা পেলাম। আমি দর কষাকষি করে দাম কমাবার চেষ্টা করলেও অবশেষে দোকানীর দেওয়া পাঁচ টাকা দামেই কিনতে হলো। কলা হাতে নিয়ে পিছনে ফিরে দেখি, সর্বনাশ মামু সাহেবকে দেখা যাচ্ছে না। আমি অসহায় বোধ করলাম। অদূরে একটা গাছের তলায় পাড়ার লোকেরা বসে গল্প করছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাউকে এদিকে যেতে দেখেছেন কিনা। তাঁরা বললেন, 'না'। আমি তাঁদেরকে মামু সাহেবের পরিচয় দিয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তারাও সচকিত হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ বললেন, ওই পুকুর পাড়ে মসজিদের সামনে 'বড় পীর সাহেবের আসন' আছে। সেখানে গেছেন কিনা দেখা যেতে পারে। এমন সময় দেখলাম, হেড লাইটের আলো জ্বালিয়ে ট্যাক্সিটা সবেগে ছুটে আসছে। দৌড়ে কাছে গেলাম। দেখলাম

মামু সাহেব ট্যাক্সিতে উপবিষ্ট। ট্যাক্সি কীভাবে সেই দুর্লংঘ্য ভাঙ্গন পার হলো সে রহস্য আজো আমার অজানা। কারণ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করার ফুরসত সেদিন যেমন হয়নি, তেমনি আর কোনদিন সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাক্ষাত ঘটে নি।

ধর্মপুরের আজাদী বাজার পার হয়ে নানুপুরের দিকে ট্যাক্সি চলছে। পথে মামু সাহেবের একনিষ্ঠ সেবক সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার সাহেবের বাড়ির কাছে এসে মামু সাহেব নিজেই তাঁকে ডাকতে শুরু করলেন। কে একজন এসে তিনি বাড়ি নেই বলে জানালে আবার ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো। নানুপুর পেরিয়ে নাজিরহাটমুখী সড়ক ধরে পশ্চিম দিকে এগুবার সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের কাছে আসতেই কিন্তু মামু সাহেব একদম চুপ হয়ে গেলেন। এর আগে তিনি নানা প্রকার কথা বলছিলেন। সেসব কথা এখন মনে নেই। আমি মামু সাহেবকে দরবার শরিফে যাবার কথা বললাম। তিনি ফিস্ ফিস্ করে আমাকে চুপ করে থাকতে বললেন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ পেরিয়ে তেলপাড়ই খালের সেতু পার হবার পর তিনি আবার কথা বলতে শুরু করলেন। নাজিরহাট পৌঁছলাম। সেখানে এসে দোকান থেকে রুটি আর গোশ্‌ত আনতে বললেন। পাওয়া গেলনা। চা আর রুটি খেলাম। একটা দোকান থেকে কিছু কেরোসিন মিশ্রিত পেট্রোল কিনলাম। ট্যাক্সি আবার ছুটতে শুরু করলো শহরের দিকে। হাটহাজারী আসতে আবদুল নূর সাহেব সবিনয়ে বাড়ি যাবার অনুমতি চাইলেন। মামু সাহেব অনুমতি দিলে তিনি নেমে গেলেন। সামান্য কিছুদূর এসে মামু সাহেব আবার রাউজান যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, ট্যাক্সি রাউজান চললো। আমরা সেখানে সুলতানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হারুনুর রশীদ সাহেবের বাড়িতে উঠলাম। রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। তবু তাঁরা বেশ খানাপিনার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যায়ে তাঁর জজ্‌বিয়াত দেখা গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির সামনের পুকুরের ঘাটে এসে বসলাম। আমার একটু তন্দ্রা পাচ্ছিল। কারণ একটানা এমন কঠোর পরিশ্রমে আমি অভ্যস্ত নই। ট্যাক্সি ড্রাইভার মাঝে মধ্যে এক আধটু বিরক্তি প্রকাশ করছিল না, তা নয়। তাকে যথোপযুক্ত ভাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠাণ্ডা রাখছিলাম।

মামু সাহেব একসময়ে ঘাটে এলেন। তখনো জজ্‌বিয়াত হাল; খুব বকাবকি করছেন। আমার তখন ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছিল। সোনা

ধরলে ছাই হয়ে যাবার মতো অবস্থা। ক্রমে ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। কেন জানি, মন আমার একটু বেপরোয়া হবার সাহস পেল। আমি মামু সাহেবকে বলে ফেললাম, আমার টাকা চাই, অনেক টাকা। মামু সাহেব চুপ করে গেলেন। আমি নাছোড়বান্দা। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, "হবে"। তারপর তিন/চারদিন যেতেই আমার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক জীবনে শুভ পরিবর্তন আসে, তাঁর দয়ায় তা অব্যাহত থাকে। **বর্ণক: (ক)**

ধমকে ট্যাক্সিতে আগুন

ট্যাক্সি অক্সিজেনের কাছে আসবার পর সে ইঞ্জিনে গোলমালের কথা বলল। রাত তখন প্রায় ৪টা বাজে। আমরা রাস্তায় নামলাম। সে ট্যাক্সিটা সোজা একটা ওয়ার্কশপের সামনে নিয়ে ইঞ্জিন খুলে ফেললো। আমি তার বিলম্ব দেখে সেখানে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা দেখলাম। কারণ ইতিমধ্যে দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। মামু সাহেবকে বললাম ট্যাক্সি ড্রাইভার দিগ্‌দারী শুরু করেছে। মামু সাহেব চট্টগ্রামী ভাষায় বললেন, 'ড্রাইভার। তুমি গাড়ি খুললে কেন'? দ্বিতীয়বার আর একটু চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ড্রাইভার তুমি গাড়ি খুললে কেন'? তৃতীয়বার সগর্জনে বললেন, 'ড্রাইভার তুমি গাড়ি খুললে কেন'? মামু সাহেবের বাক্য শেষ হতে না হতেই আমি বিস্মিত, চমকিত, হতবাক, হতবুদ্ধি হয়ে দেখলাম, একটি প্রচণ্ড শব্দ করে ট্যাক্সির ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ড্রাইভার শঙ্কিত সন্ত্রস্ত। সে মুহূর্তেই আকস্মিকভাবে আমার মনে হলো হায় আমি কি করলাম! কেন নালিশ করে একজন গরীব ট্যাক্সি চালকের সর্বনাশ ঘটালাম। আমি প্রায় বেহুশের মতো মামু সাহেবকে বললাম, 'আপনার অনুমতি পেলে আগুন নেভাই'। মামু সাহেব কঠোর স্বরে বললেন, 'না তুমি কেন নেভাবে'? মন মানছিল না। মিনিট ছয় সাতেক পর আমি আর্জি পেশ করলাম। তিনি আগুন নেভাবার অনুমতি দিলেন। কি আশ্চর্য! ট্যাক্সির কাছে গিয়ে একখানা ন্যাকড়া দিয়ে আগুনের উপর ঝাপটা দিতেই আগুন নিভে গেল। ইঞ্জিনের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না। ড্রাইভারকে ইঞ্জিনের ঢাকনা লাগাতে বললাম। সে জানালো, স্টার্টের সাথে সংযুক্ত তারগুলো সব খোলা। গাড়ি চলবে না। আমি বললাম, ঢাকনা বন্ধ করে স্টার্টার টানো। কি আশ্চর্য! গাড়ি স্টার্ট নিলো। চললো। মামু সাহেবের নির্দেশমতো ব্যাটারী গলিতে মরহুম আবদুল গণি

সওদাগরের বাড়িতে এলাম। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি ড্রাইভারের হাতে দেড়শো টাকা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। তখন ভোর হয়। ড্রাইভার আমাকে সেই টাকা ফেরৎ দিতে চাইলো। আমি বললাম, টাকা আমি দিই নি। যিনি দিয়েছেন পারলে তাঁকে ফেরৎ দাও। মামু সাহেব কিন্তু ঘরে ঢুকেই খিল দিলেন। **বর্ণক: (খ)**

বর্ণক: (ক ও খ) শেখ মতিউর রহমান, পিতা- শেখ বজলুর রহমান, গ্রাম- ধলই, থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমানে- রাজাপুকুর লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শত সূর্যের ঝল্‌কানি

পঁচাত্তর সালের চৌদ্দ অক্টোবর, ২৭ আশ্বিন গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র জন্মদিন–খোশরোজ শরিফ। পূর্বের রাত হতে টিপ টিপ বৃষ্টি। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। সকাল ন'টার সময় বাবাজান হঠাৎ গেটের সামনে আসেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, ডেকোরেশন (সাজ-সজ্জা) হয়নি কেন? গাছগুলিতে রঙিন বাল্ব লাগিয়ে সাজিয়ে দাও'। বিনয়ে জানালাম, বৃষ্টি হচ্ছে বলে এখনো ডেকোরেশানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অত্যধিক জজ্‌বা হালে তিনি বললেন, 'বৃষ্টি! কিসের বৃষ্টি? আমাকে চিন'? একথা বলতেই তাঁর মুখমণ্ডল শত সূর্যের চোখ ঝলসানো আলোতে হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। ভয়ে আতঙ্কে আমার শরীর থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। নিশ্চল হতবাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ। তিনি তাড়াতাড়ি হুজরায় গিয়ে দরোজা বন্ধ করে দেন। জ্ঞান ফিরে আসলে দেখি মেঘ কেটে যাচ্ছে। আকাশ আগের চেয়ে ফর্সা। অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলো। অতঃপর ভালোমতে ডেকোরেশন করে খোশরোজ শরিফের কাজ সমাধা করা হয়।

"যে কলন্দর চন্দ্র-সূর্য-তারকার শাসক
জমানার বাহন নয়, সে তার আরোহী" –ইকবাল।

বর্ণক: মাওলানা সৈয়দ জহুরুল কাদের আজাদ, পিতা- মরহুম সৈয়দ রসুলুল হক, মির্জাপুর দরবার শরিফ, থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম।

রঙের অপূর্ব খেলা

আটাত্তর সালের আগস্ট মাস। কৃষ্ণপক্ষের কালোরাত। সবাই ঘুমে, বাবাজান হুজরা থেকে আস্তে আস্তে বাইরের মাঠে এসে দাঁড়ালেন। দূরের নীলিমায় তিনি যেন তারা গুনছেন। চতুরা ঘরে আমি একা জেগে। আমিও নিঃশব্দ পদচারনায় অতি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হলো তিনি অন্য খেয়ালে। দেখি তাঁর দেহের রং স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে আরো উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে উঠলো। এরপর সে আলো নিভে তামাটে লাল রং ধারণ করলো। অতঃপর পীত-হলুদ এবং অবশেষে নিকষ কালো – যেন আফ্রিকার হাবসী অথবা আমেরিকার কালো নিগ্রো। পরিবেশ, ভূ-গঠন, প্রকৃতি ও জীবিকার প্রভাবে গড়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের শারীরিক রং যেন তাঁর দেহ দর্পণে দৃশ্যমান। অবাক বিস্ময়ে রংয়ের অপূর্ব রোমাঞ্চকর এ খেলা উপভোগ করি। বাবাজান নীলিমায় দৃষ্টি রেখে সিগারেট টানছিলেন। আমাকে সরাসরি না দেখেও (যেহেতু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম) গভীর স্নেহভরা কণ্ঠে ডাকলেন। সাড়া দিতে বললেন, 'আমরা একটু হরলিক্স খেলে ভাল হয় না'? অতঃপর এক প্যাকেট সিগারেট আনতে নির্দেশ দেন। আমি সিগারেট এনে দিতেই বলেন, 'ছেনোয়ারাকে দু'কাপ হরলিক্স করে দিতে বলো'। হরলিক্স পান করতে করতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বড় বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টি অবলোকন করছি। সৃষ্টিকে অবলোকন করবেন, তাতে জ্ঞান হয়'। অতঃপর আমাকে আরাম করার নির্দেশ দিয়ে তিনিও হুজরায় চলে গেলেন। তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়েছে। বাতাসে ভেসে আসে ভোরের আযান ধ্বনি।

বর্ণক: সৈয়দ বদিউজ্জামান, পিতা- মাওলানা সৈয়দ মাহ্‌ফুজুল করিম, গ্রাম- আজিমনগর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

ভাণ্ডারী ডাক যেন টেলিফোন

ফটিকছড়ি বিবিরহাটে মাইজভাণ্ডার শরিফের খামারের গরু বিক্রয় করতে গিয়েছিলাম। আমি যাবার পূর্বেই হাটে গরু আনা হয়েছিল। বাজার মন্দা, ক্রেতা নেই, তাই গরু ফেরত দিয়ে লোকজনকে পায়ে হেঁটে দরবারে চলে যেতে নির্দেশ দিলাম। আমি মোটর গাড়িতে যেতে মনস্থ করি। হাটের দক্ষিণে

বাদামতলের কাছে পৌঁছতেই গাড়িটা উল্টে যায়। সবাই 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জপে বিপদ মুক্তির সাহায্য কামনা করছে। আমি চোখ বন্ধ করে বাবাজানকে স্মরণ করে 'ভাণ্ডারী' 'ভাণ্ডারী' ডাকতে থাকি। হাটফেরত লোকেরা গাড়ির নীচে চাপা পড়া যাত্রীদের টেনে তুললেন। সকলের কিছু না কিছু জখম হয়েছে। রক্ত পড়ছে। কেউ কেউ বাবারে মারে করে চিৎকার করছে। আমি চোখ খুলে একটা পথ পেয়ে বেরিয়ে এসে দেখি আমার শরীরে একটা আঁচড়ও লাগে নি। আহত এক বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করলাম অথচ আহত হলাম। আর আপনি 'ভাণ্ডারী! ভাণ্ডারী!' করলেন, আপনার কিছুই হলো না, কারণ কী'? জবাব দিলাম, আপনাদের আল্লাহ্ ডাকে নৈকট্য বা প্রেমের সম্পর্ক ছিলো কিনা জানিনা। আমি মুর্শিদকে আমার অন্তর চোখে দেখে পূর্ণ বিশ্বাসে ডেকেছি। আল্লাহ্ এত দূরে যে আমরা পাপীরা নাগাল পাই না। তাই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা মাধ্যম দরকার। তাহলে যে কোন আবেদন টেলিফোনের বার্তার মতো দ্রুত আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে কবুল হয়ে যায়। কামেল আউলিয়ারাই সেই মাধ্যম। প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) ও তাঁর এক শিষ্যের নদী পার হওয়ার ঘটনা স্মরণীয়।

বর্ণক: আবু আহামদ, পিতা- মরহুম হাজী জেবল হোসেন, গ্রাম- ফরহাদাবাদ, থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম।

পেট মেজে অপারেশন বাদ

গল ব্লাডার অপারেশন। মেডিকেল বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। জটিল অপারেশন। জীবন-আশঙ্কাজনক। ছোট ভাই ওবেদুর রহমান সওদাগরের বড় পুত্র, পরিবারের আশা-ভরসা। মেডিকেল বোর্ড প্রধান ডা. করিম সম্মতি দানের জন্য একটা ফরম পূরণ করতে দেন। আমি ইতস্তত: করে ফরম পূরণে বিরত থাকি। অতঃপর সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ছেলের পিতা ও ছেলেসহ মাইজভাণ্ডার শরিফ গমন করলাম। চুয়াত্তর সালের নভেম্বর মাস। বিকেল বেলা। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী হুজরার বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসা ছিলেন। আমরা দু'ভাই ও ছেলে একই সঙ্গে তাঁর পদযুগলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রোগমুক্তির জন্য আবেদন জানাতে থাকি।

অনেক্ষণ পরে তিনি বলেন, 'ডাক্তারেরা যখন বলছেন, অপারেশন করালে ভালো হয় না'? আমি বললাম, অপারেশন নয়, আপনি আল্লাহ্‌র অলি; আপনি দয়া করলে ছেলেটা ভাল হবে। আমাদের সকাতর পুনঃ পুনঃ আবেদনে অবশেষে তিনি রাজী হয়ে ছেলেটাকে দাঁড়াতে বলেন। দাঁড়ালে পেট মেজে মেজে হাত নাকে শুঁকেন। এভাবে কয়েকবার করার পর বলেন, 'ডাক্তার ইউসুফ (বিএনপি নেতা, এম.আর.সি.পি) সাহেবকে দেখিয়ে কিছু ঔষধ নিয়ে সেবন করাবেন। ভালো হয়ে যাবে'। আমি বললাম, 'আপনি দয়া করলে আবার ডাক্তার দেখাবার কী প্রয়োজন'? উত্তরে তিনি বললেন 'দুনিয়াবী হিসেবে একটু দেখাতে হয় বৈকি? ঔষধও আল্লাহ্‌র রহমত'। অতঃপর ডাক্তার সাহেবের নিকট গেলে এক্স-রে ও অন্যান্য পরীক্ষার কাগজপত্র দেখে বলেন, 'অপারেশনের সিদ্ধান্ত ঠিকইতো ছিলো। কেন রোগীটা খামাকা নিয়ে এলেন'। উত্তরে জানালাম শাহানশাহ্‌'র নির্দেশে আপনার নিকট এসেছি। আপনি একটু দেখে দেন। অতঃপর তিনি কিছু ঔষধপত্র লিখে দিলেন। সে ঔষুধ সেবনে বাবার সীমাহীন দয়ায় ছেলেটা সেরে উঠে। সে মুমূর্ষু রোগী আবু তাহের পরবর্তীকালে আবুধাবীতে ভালো ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে উত্তর গুজরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

বর্ণক: আমিনুর রহমান কোম্পানী, পিতা- মরহুম আশকর আলী জমাদার, গ্রাম- পশ্চিম গুজরা, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

মৃত্যু সংকটে উপস্থিতি

একষট্টি সালে ভাব-বিভোর অবস্থায় ছোট ভাই আমার শ্বশুর বাড়িতে আসেন। তখন গ্রীষ্মকাল। বাড়ির আন্দর উঠানে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কত ডাকলাম, কিন্তু ঘরে আসেন না। আমার স্বামী মাস্টার সাহেব সেদিন সার্কেল অফিসার ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাস্টার সাহেব এসে অনুরোধ করলে ঘরে এসে কমলার দু'টো কোষ গ্রহণ করেন। পরে খানার ব্যবস্থা করলে কিছুই না খেয়ে উঠে চলে যান। সে রাতে মাস্টার সাহেবের ভীষণ জ্বর হয়। জ্বর পরে টাইফয়েডে রূপলাভ করে। জ্বরের ঘোরে মাস্টার সাহেব প্রলাপ বকতে থাকেন, 'বড় মিয়া সর্বক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই আমি দেখতে পাচ্ছি'। চিকিৎসা-সেবা শুশ্রূষায়

তিনি সেরে উঠেন। সুস্থ হলে বলেন, 'বড় মিয়ার (শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী) মেহেরবানীতে বাঁচলাম। নতুবা আমার জীবনের আশা ছিলোনা'।
মাস্টার সাহেবের মৃত্যুকালীন শেষ বিদায় কালেও বলেন, 'দেখো, এই বড় মিয়া এসেছেন। আমার পাশে বসেছেন'। একথা বলতে বলতে সেদিকে চেয়ে থেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বর্ণক: বড় বোন সৈয়দা মোবাশ্বেরা বেগম, স্বামী- মরহুম আবদুল মজিদ চৌধুরী (মাস্টার), গ্রাম- শাহনগর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

ফকিরী টকিরী চলবে না

খাদেম আবদুল মালেক ছোটবেলা থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ খেদমতে ছিলেন। আন্তরিক সেবাকর্মে তিনি সকলের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর যাবত তিনি দরবারের সেবা করেন। উনিশ্‌শ' তিয়াত্তর সালে শাহানশাহ্ হুজুর তাকে দেখলেই মারবার জন্য দৌড়াতে থাকেন। ভয়ে মালেক পার্বত্য চট্টগ্রামে ময়ুরখিল খামারে চলে যায়। একদা চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান হাট মিস্ত্রিপাড়া নিবাসী আলতাফ হোসেনকে (হাচিমিয়া) সঙ্গে নিয়ে জীপযোগে তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। প্রবীণ খাদেম ওমর আলী ফকির, মালেককে মারতে চাওয়ার কারণ কী জানতে চাইলে, জবাবে বলেন, 'হুকুম হয়েছে তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবার। এক বছর কষ্ট পাবে, মরবে না। যেখানে পাই, তাকে মারব। না মারলে সে যাবে না। তার ফকিরী টকিরী করার দরকার নেই, গৃহস্থী করা দরকার'। মালেক পালিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ চলে আসেন। হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কিছুদিনের জন্য মালেককে বাড়ি চলে যেতে পরামর্শ দেন। বাড়ি গিয়ে দেখেন মায়ের ভীষণ অসুখ। বার্ধক্যজনিত রোগে কিছুদিনের মধ্যে মাতা ইন্তিকাল করেন। মালেক বলেন, 'মারতে না দৌড়ালে মায়ের অন্তিম সময়ে সেবা করার সুযোগ পেতাম না'। ছোটকালে বাবা মারা যান। কোন ভাই বোন নেই। ছোটবেলা হতেই দরবারের খেদমতে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় বাড়ি ফিরেন। সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার সাহেবের উদ্যোগে ভক্তদের সাহায্যে তিনি রমযান আলী হাটে একখানা মুদি দোকান খোলেন। তার বিয়ের খরচও পীর ভাইয়েরা বহন করেন। চুয়াত্তর সালে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে উরস শরিফ উদযাপন করার জন্য প্রথম যে সভা হয়,

তথায় আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন এবং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। সতের আগস্ট অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব ও মোনাজাত করেন শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্বয়ং। পরদিন সকালে ব্যবস্থাপনার জন্য সমগ্র জায়গা ঘুরে ফিরে দেখার সময় হঠাৎ তিনি মালেককে বলেন, 'চাকর ছেলে মালেক তুমি এখানে কেন? এক্ষুণি চলে যাও। না হলে আমি পেট ফেটে ফেলবো'। অতঃপর মালেক ক্ষুণ্নমনে বাড়িতে চলে আসেন। বাড়ি পৌঁছে দেখেন, স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর, ঘরে কেউ নেই একলা। নিজে ধাত্রী ডেকে আনেন। তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ভাণ্ডারীর মেহেরবাণীতে রাউজানে তিনি একটি মার্কেটের মালিক হয়েছেন। তিনি মালেককে প্রায় দেখতে যেতেন এবং উপদেশ দেন 'কৌশলে কঠোর কঠিন কাজও সহজে করা যায়'।

বর্ণক: আবদুল মুনাফ সওদাগর, রমজান আলীর হাট, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

দয়ার সাগর – অন্তর্যামী

আমি শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তাঁর পিতা খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর একজন নগন্য মুরিদ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে শাহানশাহ্'র সংস্পর্শ স্নেহমমতা লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর চালচলন, কথোপকথন সচরাচর সালেক অলিগণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উনার চোখের চাহনী, নিষ্কলুষ রূপক হাসির মাঝে যেন মহান রহস্য লুকিয়ে ছিল। এঁদের সম্বন্ধে খলিফায়ে গাউসুল আযম মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (র.) বলেন–

'মধুর হাসিতে কটাক্ষেরি ভঙ্গে
এ বিশ্ববাসীরে আকুল করিলে
হানিয়ে মদনবাণ'।

নিঃসন্দেহে তিনি একজন অতি উঁচু দরের কামেল অলি-উল্লাহ্। তাঁর অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় আমি পেয়েছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি নেয়ার প্রায় দু'বছর পরও যখন বিভিন্নস্থানে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে বৃত্তিপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করে সফলকাম হচ্ছিলাম না, তখন একবার তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে

আমার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করি। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না'। অতঃপর আমি স্কলারশীপ লাভ করে উচ্চ শিক্ষার্থে থাইল্যান্ড গমন করি।

একদিন তাঁর চৈতন্য গলিস্থ আস্তানায় সস্ত্রীক দেখা করতে গিয়ে জানলাম এক ঘন্টা আগে তিনি কোথায় বেরিয়ে গেছেন। দেখা না পেয়ে মনটা বিষণ্ন হয়ে পড়ে। স্ত্রীসহ ক্ষুণ্ন মনে উক্ত আস্তানা থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে যেতে না যেতেই দেখলাম, উনি আমাদের সামনে একটা বেবী ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সহাস্য বদনে বললেন, 'আসুন, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি'। কালবিলম্ব না করে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। উনিও আমাদের সাথে বসে ট্যাক্সি চালাতে নির্দেশ দিলেন। কদম মোবারক এসে ট্যাক্সি থামান। তাঁর সাথে আমরা একটা বাসায় ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম। দেখি নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার থরে থরে সাজানো। আমরা যেন পূর্ব থেকেই নিমন্ত্রীত। একসাথে তৃপ্তির সাথে খেলাম।

অন্য আর একদিন। রাউজান নিবাসী জনাব শফিউল বশর সাহেবের জামালখানস্থ বাসায় তিনি আতিথ্য গ্রহণ করছেন। আমাকে উক্ত বাসায় ডেকে পাঠালেন। কালবিলম্ব না করে আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। উনার সামনে বসে মনে মনে বললাম, 'ইস্, যদি উনার বুকের সাথে আমার বুকটা লাগাতে পারতাম! তবে কতই না শান্তি পেতাম'। কথাটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আসুন আপনার সাথে একটু আলিঙ্গন করি'। আমি এই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম।

বর্ণক: ড. মুহম্মদ আবদুল মন্নান চৌধুরী, অধ্যাপক – অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সময় নয় আন্দোলন চাই

ঊনিশ্‌শ' তিরাশি সালের ছাব্বিশ জানুয়ারি, বুধবার বিকেল। দশ মাঘ উরস শরিফের পরদিন। এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্'র নিকট হতে বাবাজান বাইশ হাজার টাকা চেয়ে নেন। অতঃপর পূর্ব মাইজভাণ্ডার নিবাসী কাজী ফরিদ উদ্দিন, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম (সিনিয়র সহ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) চান্দগাঁও নিবাসী সামশুল আলমসহ মোট ৫জন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে

প্রাইভেট কারযোগে চট্টগ্রাম শহরে যান। সন্ধ্যায় বিপণি বিতানের দোতলায় ইউনিভার্সেল ওয়াচ কোম্পানী হতে ৫টি হাত ঘড়ি কিনেন। অতঃপর দোকানদার ভূমণ্ডলের ম্যাপ সংযুক্ত একটি ঘড়ি দেখিয়ে বললেন, এই ঘড়ি গ্রীনউইচ, আমেরিকা ও বাংলাদেশী তিনটি সময় নির্দেশ করে। তখন শাহানশাহ্ বলে উঠেন, 'নট্ টাইম, উই ওয়াচ্ মুভমেন্ট – সময় নয়, আমরা গতিকেই পর্যবেক্ষণ করি'। সময় বা কাল সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দ.) ইরশাদ করেন, "সময় ঘুরে ফিরে আসে সে আকারে – যে আকারে তা ছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন" – (সহি বোখারী ৯ম খণ্ড)। এতে বুঝা যায়, সময় স্রষ্টা কর্তৃক একবারে সৃষ্টি এবং বৃত্তাকার ধারাবাহিক পরিক্রমণ তখন থেকেই। টাইম ডাইমেনশন থিওরীতে বিজ্ঞানীরাও সময় সম্পর্কে একই কথা বলেন। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তাঁর বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এ বলেন– আমরা যে সময়কে কল্পনা করি তা কি সত্য? প্রকৃত সময় তাহলে কি? আমরা যদি প্রকৃত সময়ের কথা ভাবি, তার একটা শুরু আছে যা থেকে জন্ম নিয়েছে বিগব্যাং তত্ত্ব – এই বিশ্ব ক্রম প্রসারমান। যার অস্তিত্ব রেডিও দূরবীণে দেখা সুপারনোভায় ধরা পড়ে। আর যেহেতু একটা শুরু আছে – শেষও আছে যেখানে বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রই অস্তিত্বহীন। কিন্তু কাল্পনিক সময়ের কোন সীমারেখা বা সিঙ্গুলারিটি নেই, আমাদের একটা ধারণা থেকে প্রকৃত সময় জন্ম নেয়, যার পরিধি ও ব্যাসার্ধের মধ্যে আমরা একটা বিশ্বকে কল্পনা করতে পারি, যা গাণিতিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, যার অস্তিত্ব আমাদের মনে। এসব কিছুই তো আপেক্ষিক অর্থাৎ আপাত সত্য। তবু মানুষ জানে সময় ছাড়া তার অস্তিত্ব বিপন্ন, তার সভ্যতা নিশ্চিহ্ন, সময়ের মাপকাঠিতে জীবনের সব লেনদেন একদিন এ পৃথিবীতে ফুরোয়। জুলিয়ান বারবোর তাঁর 'দি এন্ড অব টাইম' গ্রন্থে বিজ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক সময় সম্পর্কিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অতীত ও বর্তমানের তফাত মুছে দিয়ে তিনি এক অন্তহীন বর্তমানের জগত মেলে ধরেছেন। হকিংস স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এ তত্ত্ব জড় জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সক্ষম হবে। সময়কে আমরা এখন যেমন করে ভাবি তা যতখানি যুক্তিযুক্ত তাঁর তথ্য ততোটাই যুক্তিযুক্ত। ভারতের নারলিকার একাধিক বিগব্যাং বিস্ফোরণের তত্ত্ব হাজির করেছেন। সুতরাং দিব্যদৃষ্টির অধিকারী শাহানশাহ্ এতে লক্ষ্যণীয় কোন বিশেষত্ব খুঁজে পেতে পারেন না।

সমগ্র সৃষ্টিজগত নিরবচ্ছিন্ন এক গতিশীল আন্দোলনের ফসল। সৃষ্টির সারসত্তা আলোক তরঙ্গ। আলোক সত্তার এই তরঙ্গায়িত ছন্দময় বৃত্তাকার উত্থান পতনই আন্দোলন বা মুভমেন্টের প্রাথমিক অবস্থা। যেমন– আচ্ছাদিত কোন স্থান বা ঘরে কোন ফাঁক বা ছিদ্রপথে সূর্যকিরণ পতিত হয়ে দেখা যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র বিন্দুর মত আলোক কণিকাগুলো উপর-নীচে ছন্দিত গতিতে ঘুরছে। আলোক তরঙ্গের এমনি লক্ষ কোটি বছরের গতিশীল পরিক্রমায় জন্ম নেয় পরমাণু। পরমাণু রূপলাভ করে পানি ও মাটিতে এবং দুয়ের সংমিশ্রণে প্রথম সৃষ্টি হয় জীবকোষ। এ জীবকোষই হাজারো রকম গতিশীল বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। জীবিকা ও পরিবেশের দ্বান্দ্বিক কারণে মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে সৃষ্টির প্রথম থেকে। আবার বৈজ্ঞানিকদের ধারণা সূর্যের এক অংশ খসে পড়ে অসংখ্য বছরের শীতলতায় এই ভূমণ্ডল গঠিত হয়। তাঁদের দাবী সত্য হলেও অগ্নিগোলক অর্থাৎ আলোজাত সত্তার বিবর্তনেই পৃথিবীর জন্ম। এটাও গতিশীল আন্দোলনের ফসল।

পদার্থ জগতে পজিটিভ ও নেগেটিভ (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) দুই বিপরীতমুখী পদার্থের সহ-মিলনে ক্রিয়াশীল পদার্থকে দেয়া যায়। এমনি দুই শক্তির যৌগিক মিলনে বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি কর্মমুখী হয়। এদের একটি ছাড়া অন্যটি অচল। এরূপ দুই বিপরীতধর্মী শক্তির সহযোগে সংঘাতময় কর্ম-প্রতিকর্মে সৃষ্টিজগত নব নব সৃষ্টিতে গতিশীল। দুই বিপরীত শারীরিক গঠনে গঠিত নারী-পুরুষের সহ-মিলনে মানব গোষ্ঠি বংশ রক্ষা করে চলেছে। প্রাণীজগত ও প্রকৃতি (গাছ লতাপাতা) এ দুই শক্তির মিলন পরশে স্ব-স্ব সজীব সত্তা নিয়ে জগতে টিকে আছে। মহাবিশ্বের মূলশক্তি উৎস চারটি বলে স্বীকৃত ছিল। নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিক আবদুস সালামের আবিষ্কার এ সংখ্যা তিনটিতে এসে স্থির করেছে। ফলে মহাবিশ্ব তিন শক্তির অথবা শুধুমাত্র পজিটিভ-নেগেটিভ দুই শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিলনের ফসল কিনা তা এখনো নির্ণীত নয়।

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে আমরা জানি যে, সমস্ত পদার্থই অণু-পরমাণু কণিকা দিয়ে গঠিত। কিন্তু স্ট্রিংতত্ত্ব বলছে, পদার্থের মৌলিক কণা হচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট ফাঁস বা ঐ আকৃতির সুতোর মত যেগুলো দশটি মাত্রায় অবিরাম আন্দোলিত হচ্ছে। এই তত্ত্ব যদি সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে এর দ্বারা পরমাণু

থেকে আরম্ভ করে মহাবিশ্বের গঠন পর্যন্ত সবকিছুরই একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে এবং তা এমন এক মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেবে যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি এবং ধর্মতত্ত্ববিদরা জিজ্ঞেস করে আসছেন। প্রশ্নটি হল পদার্থ এবং শক্তির উৎস কি? স্ট্রিংতত্ত্ব অনুসারে দশ মাত্রায় কম্পমান আন্দোলনই মহাকর্ষ বল থেকে আরম্ভ করে আমাদের চারপাশের পরিচিত পদার্থসমূহ পর্যন্ত বিশ্বের তাবৎ শক্তি ও পদার্থের উৎস। আন্দোলনরত ফাঁসগুলো অবশ্যই দৃশ্যমান নয়। স্ট্রিংতত্ত্বের উদ্ভাবক মার্কিন বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইটেন দাবী করেন আমরা যদি এই বিশ্বকে দশমাত্রার চোখ দিয়ে দেখতে পারতাম তাহলে স্ট্রিংতত্ত্ব অনুসারে প্রকৃতির সকল মৌলিক কণা ও বল যে একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। তবে এই তত্ত্বকে গবেষাণাগারে পরীক্ষা করার জন্য যে প্রযুক্তি প্রয়োজন তা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি[১]।

কম্যুনিজম থিওরীর জনক মনীষী কার্ল মার্কসের মতে পার্থিব বা বস্তুজগতে কোনকিছুই স্থির নয়। সবকিছুই সর্বক্ষণ আন্দোলিত, চলমান ও বিবর্তিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বস্তু জগতের পরিমন্ডলে চরম ও পরম সত্য বলতে কিছু নাই। কোন বস্তু বা ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন ওজন নেই। তার ওজন বস্তু জগতে তার অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের ওজন পৃথিবী হতে অনেক কম হয়ে থাকে। অতীত সমাজ ব্যবস্থায় আপন সহোদরা ভগ্নি ভাইদের আদর্শ স্ত্রী হতে পারতো। প্রাচীন ভারতীয় সভ্য সমাজে দ্রৌপদী ছিল পাঁচ ভ্রাতার একমাত্র সতী স্ত্রী। সামাজিক আন্দোলনের গতিধারা সেদিনের স্বীকৃত সত্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বর্তমান সমাজে তখনকার ব্যবস্থা জঘন্য পাপাচাররূপে ঘৃণিত ও বর্জিত। পার্থিব জগতে বা সমাজে কোনকিছুই চিরন্তন সত্য নয়। এক সের অক্সিজেন ও দুই সের হাইড্রোজেন মিশালে যে পরিমাণ পানি সৃষ্টি হয় তার ওজন স্বাভাবিক নিয়মে তিন সের হওয়া উচিত। বাস্তবে তিন সের থেকে কমই হয়ে থাকে। বাড়তি অংশটুকু শক্তিতে বিবর্তিত হয়। এই গতিশীল বিবর্তন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতুল কুরসীতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বলেন– 'যাঁর ইচ্ছার উপর বস্তু, বস্তুর ধর্ম ও এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন সবকিছুরই নির্ভরশীল"। সৃষ্টির এক একটি পর্যায় অতিক্রমে শত হাজার কোটি বছর লেগে গেছে এবং আরো কত বছর ধরে চলতে থাকবে তা মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে। চির গতিশীল আন্দোলন বা সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলাময় মুভমেন্টে জীবন

জগত তথা স্রষ্টার রূপরহস্যের গতিবিধি নিরূপণই সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী মহান সাধকের যথার্থ কর্ম। এজন্য ইরানী তাত্ত্বিক সুফি কবি হাফেজ সিরাজী বলেন, "পর্দার আড়ালে যে রহস্য তা বিভোর চিত্তদের নিকট খোঁজ কর"।

তথ্য সূত্র: ১। দৈনিক সংবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ২ আশ্বিন ১৩৯৭।
বর্ণক: কাজী ফরিদ উদ্দিন, পিতা- মরহুম কাজী ফজলুল করিম, আরজিয়া খলিল মঞ্জিল, কাজী বাড়ি, পূর্ব মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আলো বাতাস খাও

১৯৮১ সালের রমযান মাস। তখন চট্টগ্রাম শহরে শেখ মুজিব রোডে এক দোকানে কর্মরত ছিলাম। পনের দিনের মধ্যে পর পর দুই শুক্রবার তিনি সেখানে গমন করেন। দু'বারই তিনি বাড়ি চলে যেতে নির্দেশ দেন। শেষের বার জোর দিয়ে বলেন, 'এখনও যাও নাই'? বিনীতভাবে জানাই বাড়িতে আমার মা বাবা কেউ বেঁচে নাই। কোন জমিজমাও নাই, কি করে খাবো? তিনি উত্তর দিলেন, 'আলো-বাতাস খেয়ে থাকবে। আমরা আছি না'?
মানুষের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন, শরীরে রক্ত সঞ্চালন তথা জীবনের অস্তিত্ব বাতাসের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল। নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই জীবনের শেষ পরিণতি- মৃত্যু। খাবার না খেয়েও কিছুদিন বেঁচে থাকা সম্ভব। কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সাধক সন্ন্যাসীরা খাদ্য গ্রহণ না করে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকেন। কিন্তু বাতাস ছাড়া কোন প্রাণী কয়েক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। সুতরাং বাতাসই মানুষ তথা প্রাণীর বাঁচার মৌলিক উপাদান। অথচ তিনি প্রথমে বাতাসের কথা না বলে আলোর কথা উল্লেখ করেছেন। দেখা যাক রহস্য কি?
সৃষ্টির মূল আলোক তরঙ্গ। পবিত্র কোরআন, বাইবেল, বেদ, পুরানসহ সকল ধর্মগ্রন্থে একথা স্পষ্টরূপে ঘোষিত যে, যখন কিছুই সৃষ্টি হয় নাই তখন শুধুমাত্র স্রষ্টার মহাপবিত্র সত্তারই অস্তিত্ব ছিল। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, 'তিনিই আল্লাহ্– যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন" (সূরা সিজদা ৪ আয়াত)। এই ঘোষণা মতে সুস্পষ্ট যে, নভোমণ্ডল অর্থাৎ তারকাপুঞ্জ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি দৃশ্য ও অদৃশ্যমান আলোকিত বস্তু সম্ভারই প্রথম দিকে সৃষ্টি হয়েছে ক্রমিক অনুসারে, তারপর সৃষ্ট ভূমণ্ডল বা পৃথিবী। নভোমন্ডলে আলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে পরমাণু গঠিত হয় বলে

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। আর পরমাণুর ক্রম বিবর্তনের ফলেই সৃষ্ট অথৈ জলাধার। আকাশ হতে সূর্যের আলোকরশ্মি মিলন আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে নীচে জলরাশির উপর। সূর্যের প্রখর তাপে তরল জলরাশি উত্তপ্ত হয়ে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তার ফলেই বায়ুপ্রবাহ ও সামুদ্রিক জলস্রোতের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস। আলো আর জলের জড়াজড়ি কোলাকুলি মিলন আনন্দে সৃষ্ট বায়ুর প্রেম পরশে তৃপ্ত জলধিতে জমে ওঠে ফেনা। পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় গড়ে ওঠে মাটি ও পাথর অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস পৃথিবীর সর্বাধিক উঁচু হিমালয় পর্বতমালাই প্রথম সমুদ্র হতে জেগে উঠেছিল। উক্ত পর্বতের উপরে বড় আকারের মাছের কাঁটা খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে, এমনি ক্রমবিবর্তনে ভূপৃষ্ঠের গঠন হয়েছে। বিশ্বস্রষ্টার "কুন্" (হয়ে যাও) এর নির্দিষ্ট কুন্কুনির গতিময় পর্যায়ক্রম। সমস্ত জগত স্রষ্টার প্রেমময় বিকাশ। পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎসই হল সূর্য। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের খাবারে যে শক্তি বা খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) তা সূর্য থেকে ধার করা শক্তি। গাছের কাঠ বা পাতায় যে জ্বালানী শক্তি তাও সূর্য থেকে নেওয়া। আবার কয়লা তেল ও গ্যাসের আকারে মাটির নীচে খনিতে জমা যে জ্বালানী শক্তি সেগুলোও আসলে সূর্য থেকে প্রাপ্ত; ভূপৃষ্ঠে পতিত সূর্যালোক রাসায়নিক শক্তি আকারে বন্দী। বর্তমান সূর্যালোককে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্দী করে বিকল্প জ্বালানীরূপে ব্যবহার পদ্ধতি উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা বিশ্বজুড়ে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

সৌরশক্তি চালিত প্রথম বিমান ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে জার্মানির স্টুটগার্ট নামক স্থানের আকাশে উড়ে। ইকোয়ার নামক এই সৌরশক্তি চালিত বিমানের নির্মাতা জার্মান বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস সৌরশক্তি জ্বালানী ক্ষেত্রে বিপ্লব বয়ে আনবে।

ভূপৃষ্ঠে সূর্যালোক পতনে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বীজের অংকুর উদ্গমে আলো বা তাপের ভূমিকাই প্রধান। আবার চারার বৃদ্ধি, গঠন ও ফুল-ফসলে মাটি বাতাস ও বৃষ্টিপাতের অবদান থাকলেও সূর্যালোকের অবদানই সর্বাধিক। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য ভাত, রুটি, শাক-সব্জি, মাছ, মাংস ইত্যাদি আলোরই অবদান। এ'তে প্রমাণিত যে, প্রতি মুহূর্তে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে মানুষ বেঁচে থাকলেও বায়ু প্রাথমিক জীবনী খাদ্য নয়। আলোই জীবনী শক্তির মৌল প্রয়োজন মিটায়। মহাবিজ্ঞানী শাহানশাহ্

মাইজভাণ্ডারী যথার্থই বলেছেন, আলো বাতাস খেয়েই মানুষ বাঁচে এবং বেঁচে আছে সমগ্র প্রজাতি ও প্রকৃতি।

বর্ণক: সৈয়দ কামরুল আহসান, সৈয়দ পাড়া, গ্রাম- বক্তপুর, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

আজমিরে ভাণ্ডারী

সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি আজমিরী'র (ক.) রওজা মুবারক যিয়ারত করলাম। বাইরে এসে দেখি একস্থানে কিছুলোক ভিড় করে কি যেন দেখছে। একজনকে ডেকে প্রশ্ন করলাম ওখানে লোকেরা কি দেখছে। লোকটা উত্তর দিল খাজাবাবা সেখানে এসেছেন। আমিও দ্রুত ভিড়ের দিকে ছুটে গেলাম। একবার তাঁকে নয়নভরে দেখবো। জনম সার্থক হবে। ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখলাম আজমিরের মহান সিংহাসনে বসে আছেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে এসেছেন'? আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, আপনি? তিনি উত্তর দেন, 'আমি এখানেও থাকি'।

এই স্বপ্নের কথা তাঁকে জানাবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম। পাঁচ বছর পর এক গভীর রাতে মসজিদের সামনেই পেয়ে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠেন 'হাঁ, হাঁ, আমি সবখানে'।

বর্ণক: মৌলানা নুরুল ইসলাম ফোরকানী, পেশ ইমাম - মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ শাহী জামে মসজিদ, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

স্বামীর অসুখের সময় আজমির শরিফের জন্য কিছু টাকা নিয়ত করি। সেখানে যাওয়ার লোক খুঁজে না পাওয়াতে খুবই চিন্তিত থাকি। স্বপ্নে একটা লোক আমাকে বলেন, 'আজমির শরিফের জন্য আপনি যে টাকা রেখেছেন সেগুলো মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে দিলে হবে'। অথচ তখনও আমি তাঁকে দেখি নাই। এ ঘটনা তিয়াত্তর সালের। অতঃপর টাকাগুলো নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছামাত্র বলেন, 'টাকাগুলো দেন'। আমি অবাক হয়ে তাঁর হাতে টাকাগুলো তুলে দিলাম।

বর্ণক: সৈয়দা আলম আরা বেগম, স্বামী- এডভোকেট খায়রুল বশর, কাজী বাড়ি, পূর্ব মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কয়েক বছর ধরে আমি ১৪ রজব গরীবে নেওয়াজ খাজা আজমিরী (ক.) এর বার্ষিক ফাতেহা করতাম। একবার ছুটি নিতে না পেরে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। যেহেতু তারিখ মত ফাতেহা করা সম্ভব হবে না। কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেছি। সামরিক শাসন বলে ছুটি মঞ্জুর হয় না। চিন্তিত মনে কান্নাকাটি করে রাতে ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি আমাকে বলেন, এতো পেরেশান হয়েছো কেন? নির্দিষ্ট তারিখ মতো করতে না পারলেও তোমার সুবিধামত মাইজভাণ্ডার শরিফ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ওখানে করলে হবে। স্বপ্নের কথা মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি স্বপ্ন নির্দেশ মত করতে বলেন। তখন থেকে জিয়া বাবার খেদমতে আছি। মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (র.) যেন তাই বলেছেন–

তুর প্যালেস্টাইন দামেস্ক মিশরে, মহাসমারোহে মদিনা নগরে;
বাগদাদ আজমিরে পেয়েছি তোমার, অপার করুণা দান।
মাইজভাণ্ডার সিংহাসন অলংকৃত, করেছ দেখিয়ে হয়ে আনন্দিত;
প্রশংসা কীর্তন করিছে করিম, সুরেতে মিলায়ে তান।

বর্ণক: আবদুল রাজ্জাক, দারোয়ান, সরকারি খাদ্য গুদাম, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম।

আগের মতো সুন্দর

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর আমার শরীর অত্যধিক শুকিয়ে চেহারা সুরত একেবারে কালো হয়ে যায়। পরিচিত লোক দেখলেই চমকে উঠে। বহু চিকিৎসা করালাম, কোন ফল হয় না। অবস্থার দিন দিন অবনতি হতে থাকে। এক্স-রেসহ সকল প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। রোগ নির্ণয় করতে চিকিৎসকগণ ব্যর্থ হন। শেষে বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে মৃত্যুর দিন গুণতে থাকি। এক রাতে আমার স্ত্রীকে স্বপ্নে কে যেন আমাকে ডুলাহাজারা হাসপাতালে নিতে বলেন। আমার স্ত্রী বলেন, এত চিকিৎসা করালাম, ভালো হলে তো এখানেও হতে পারে। দান সদ্‌কাও যথেষ্ট করা হলো। আস্তে আস্তে অবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে আমি অচল হয়ে পড়ি, এমন কি দাঁড়াতেও পারিনা। এরকম অবস্থায় আমার স্ত্রী শাহানশাহ্ বাবার দরবারে গমন করে। তখন দুপুর বারোটা, তিনি হুজরায় দরোজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। আমার স্ত্রী পৌঁছামাত্র তিনি দরোজা খুলে বলেন– 'খালা এসেছেন'? আমার অসুখের কথা

জানালে বলেন, 'হায়াত না থাকলে অলি-উল্লাহ্‌রা হায়াত দিতে পারে নাকি'? স্ত্রী বলেন, পারে বলে বিশ্বাস করেই তো এসেছি। তিনি হেসে চুপ হয়ে থাকেন। এরপর আমার স্ত্রী বলে, 'আপনার দয়া না পেলে ফিরে যাব না'। চৈত্রের প্রচণ্ড গরমে তিনি লেপ মুড়ি দিয়ে শয়ন করে বলেন, 'খালা চলে যান'। কোথায় যাব জিজ্ঞাসার জবাবে পুনঃ বলেন, 'বাড়িতে চলে যান। আগামীকাল আবার আসবেন'। একদিন নানুপুর বাপের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন তাঁর সাক্ষাতে গিয়ে দেখি দরোজা বন্ধ। আবেদন জানাতেই খুলে দিলেন, তিনি একবার বসেন, একবার শুয়ে পড়েন। এমনিভাবে অনেকক্ষণ সময় কাটান এবং দ্রুত সিগারেট টানতে থাকেন। তারপর দোকান থেকে কিছু ছোট বিস্কুট আনিয়ে একখানা ঝকঝকে কাগজে বেঁধে হাতে নিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। পুটলিটা পরে ড্রেসিং টেবিলে রাখলেন। কতক্ষণ পরে পুটলিটা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলেন, 'এগুলো মামু সাহেবকে খেতে বলবেন। ডাক্তার আবদুল মান্নান সাহেবকে একটু দেখাবেন। আমার স্ত্রী মনে মনে আরজি করেন, উকিল সাহেবের চেহারা দেখে লোকে যেন বলে তাঁর চেহারা আগের মত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা দরবারে একটা গরু মানত করি। শাহানশাহ্‌ বাবার মেহেরবানীতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমার চেহারা আগের মত সুন্দর হয়েছে।

বর্ণক: এডভোকেট কাজী খায়রুল বশর, পিতা- কাজী খলিলুর রহমান, কাজী বাড়ি, গ্রাম- পূর্ব মাইজভাণ্ডার, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

আতর গোলাপে মাখান

১৯৮০ সালে আমার বড় মেয়ে পুতুল এম.এ. পরীক্ষার্থী ছিল। তাকে, দাদা শাহানশাহ্‌ তাঁর সাথে কক্সবাজার বেড়াতে যেতে বলেন। সামনে পরীক্ষা বলে মেয়েটা যেতে অপারগতা জানাতে তিনি বলেন, 'পরীক্ষাকে ঝাঁটা মারবো'। সেদিন বোন ও ভাগ্নীদের নিয়ে তিনি কক্সবাজার বেড়িয়ে আসেন। পরে দেখা গেল পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। তখন তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন।

আরেকদিন আমার ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন কাপড়-চোপড় কিনে বাসায় নিয়ে আসেন। কিন্তু পুতুলের জন্য কিছুই কিনেন নাই। কাপড় কিনতে যেতে বললে পুতুল অসুখ বলে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে একদা তাঁকে সালাম করতে গেলে মেয়েটিকে এক ধাক্কায় ফেলে দেন এবং বোনকে বলেন, "আতর গোলাপ দিয়ে মেয়েটাকে শোয়ায়ে রাখুন"। এর কয়েকদিনের মধ্যেই পুতুল হঠাৎ

মৃত্যুবরণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের সাথে মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো।

বর্ণক: মীর জিয়াউদ্দিন, পিতা- মরহুম আলহাজ্ব মীর রসিদ আহামদ মাস্টার, ১৬৩ নং পশ্চিম মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম।

শঙ্কার বাজলো ঘন্টা

১৯৭৫ সালের দশ মাঘের উরসের পূর্বে বাড়িতে গেলে দেখি আমার বড় ছেলে মঈনুদ্দীনের ডিপথেরিয়ায় গলা ফুলে গেছে। পরদিন চিকিৎসার্থে শহরে ডা. বণিক বাবুকে দেখানো হয়। তিনি আমার বড় ভাইকে বলেন, 'ছেলের অবস্থা চার ঘন্টার জন্য আশঙ্কাজনক। স্রষ্টার কৃপায় এ সময় পার হয়ে গেলে বাঁচতে পারে'। আমি তখন উরস শরিফের বাজার করার জন্য দেওয়ান হাট ছিলাম। খবর পেয়ে ডাক্তারের সাথে দেখা করলাম। মৃত্যু শংকা জেনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। পঁচানব্বই টাকা করে একটা ইন্‌জেকশানের দাম। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দেন। এরকম দৈনিক একটা করে পাঁচটা দিতে হবে। রাতেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাবাজানের দরবারে উপস্থিত হওয়া মাত্র দরোজা খুলে দিলে আমি পদযুগলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আবেদন জানাই। তিনি জানতে চান 'পঁচানব্বই টাকার ইন্‌জেকশনটা দেওয়া হচ্ছে কি? ভাল হয়ে যাবে। কাল উরস শরিফে আসার সময় নিয়ে আসবেন। আমার হাসান মিয়ার সাথে খেলবে'। রাতে আবার শহরের বাসায় ফিরে দেখলাম ছেলে অনেকটা সুস্থ। পরদিন দরবারে নিয়ে গেলাম। ঔষধপত্রের কথা উরস শরিফের কাজের জন্য ভুলে যাই। তবু তাঁর অফুরন্ত দয়ায় ছেলে দু'দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে।

বর্ণক: সৈয়দ জিয়াউল হক, পিতা- আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম। ফরহাদাবাদ দরবার শরিফ, থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম।

হারিয়ে গেল বস্তুবাদ

১৯৭৮ সাল। আমি তখন সিলেটে অগ্রণী ব্যাংকে চাকুরি করতাম। ঈদে বাড়ি এসেছি। চরম মার্কসবাদী তথা বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং সে নীতির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম। ফলে ধনী-দরিদ্রের বিরাট ব্যবধান সমাজে বিরাজিত বলে আমি পাড়ার মসজিদে নামায পড়তাম না। ঈদের নামায পড়ার জন্য

মাইজভাণ্ডার শরিফ চলে যেতাম। আমি যে নামাযী তা নয়, ঈদের নামায সবাই পড়ে তাই পড়া। দরবারে ফকির মাস্তান তথা প্রায় সকল শ্রেণির লোকের উপস্থিতি আমার ভালো লাগতো। তাই সেখানে যেতাম। ঈদের জামাত শেষে ফেরার পথে মামা ছৈয়দ জাফরের (দুলাল) অনুরোধে হযরত জিয়াউল হক শাহ্'র সাথে দেখা করতে গেলাম। একজন বস্তুবাদী হিসেবে ফকির দরবেশ ও ধর্মের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। তবু যাওয়ার জন্য যাওয়া। হুজরায় পৌঁছে জাফর মামা তাঁর কদমে চুমো খেলেন। মনে মনে ভাবলাম, এসব কি? মানুষ পূজা! আমি মানতে পারি না, ভিতরে চাপা বিদ্রোহ। বস্তুবাদ আমাকে তিরস্কার দিচ্ছে, কেন এখানে এলাম। মামার আত্মীয় শুধুমাত্র এই যুক্তির কারণে হাত তুলে সালাম করলাম। আমাদেরকে দেউড়ি ঘরে বসতে এবং খেয়ে যেতে নির্দেশ করলেন। মামা আমাকে 'হুকুম হয়েছে' বলে জানালেন। আরো জানালেন, উনার দরবারে এসে দরোজা খোলা পাওয়া এবং খাওয়ার সুযোগ পাওয়া এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। মামা অপেক্ষা করতে চাইলে আমিও রাজি হলাম। ইত্যবসরে আমার কেন জানি অজু করে জোহরের নামায পড়তে ইচ্ছা হলো। অজু করতে গিয়ে এবং অজু শেষে দু' দু'বার আমার যেন মনে হলো হাত ঘড়িটা হাতে নাই। খেয়াল করে দেখি এটা মনের খেয়াল। ঘড়িতো ঠিকই আছে। ভীত হলাম; হয়তো পীর সাহেবের 'হিপনোটিজম'ও হতে পারে। একটা ছেলে এসে খাওয়ার জন্য ডাকলো। খেতে লাগলাম। খাবারগুলো খুবই সুস্বাদু মনে হলো। অতঃপর মামা বিদায় নিতে গেলে আমিও পিছু পিছু যাই। এবার আগের মতো আর অনীহা নয়; তবে প্রশ্ন আছে। ঘরে ঢুকতেই আমার মনে হলো সারা শরীর যেন বিদ্যুতায়িত হয়েছে। শরীর কাঁপছে, চেষ্টা করলাম স্বাভাবিক হওয়ার জন্য। না, সম্ভব হলো না। কাঁপছেই। দেখলাম হুজুর শুয়ে আছেন। মামা তাঁর নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করলেন। আমিও তাই অপেক্ষায় থাকলাম। মামা পদ চুম্বন করছেন। আমি নিজের ইচ্ছা শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি যেন আমাকে তেমন করতে না হয়। বস্তুবাদী মন মানুষ পূজা করতে পারে না। তেমনি মুহূর্তে হুজুর বললেন, 'আপনার হাতে ওটা কি ঘড়ি'? ঘড়ির নাম বললাম। মামা ঘড়িটা দিয়ে দিবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করলেন। হুজুর ঘড়িটা চাইলে ভাবলাম, লুকিয়ে রাখা ঘড়ির কথা তিনি কি করে জানলেন? এটাতো 'হিপনোটিজম' হতে পারে না। ঘড়িটা দিয়ে দিলাম। অতঃপর আমার শারীরিক

অস্থিরতা এমন প্রবলভাবে বেড়ে যায় যে, দু'চোখে অশ্রুর বন্যা নামে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলাম, আমাকে ক্ষমা করুন; আমাকে আশ্রয় দিন। তুমি হক; তুমিই সত্য-পরম সত্য; মহাসত্য-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (ক.)।

বর্ণক: সৈয়দ শাহ্নেওয়াজ (বি.এ. অনার্স, এম.এ. অর্থনীতি), পিতা- ডা. সৈয়দ মোহাম্মদ সামসুল আলম, গ্রাম- নানুপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

মহাদূর্যোগেও দুর্গতি নেই

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার দু'দিন পূর্ব থেকে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে শয্যাশায়ী। জ্বর পরে টাইফয়েডে রূপ নেয়। উপর্যুপরি দু'বার জ্বর উল্টে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাবীদের অত্যাচার সন্নিকট মনে করে এপ্রিলের ৯ তারিখে আম্মাকে নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফস্থ নানার ঘরে চলে যাই। চিকিৎসার ফলে রোগ কিছুটা সেরে উঠলে দীর্ঘ ভোগান্তিতে শরীর খুব দুর্বল। এমনকি কোন কিছুর কড়া আওয়াজ মাথায় সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়তাম। অন্যদিকে ব্যাংকের কাজে যোগদানের জন্য সরকার পুনঃ পুনঃ জরুরী তাগিদ দিচ্ছেন। এমনি এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আমি বাবাজান এর শরণাপন্ন হই। তিনি গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিলের মধ্য কামরায় এসে আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পবিত্র কোরআনের আয়াত পড়ে ফুক দিতে থাকেন। অন্ততঃ ৩০/৪০ মিনিট ফুকার পর বললেন, "আমাদের দোকান থেকে ২/৩টা হিমোগ্লোবিন সিরাপ কিনে খান, আর দৈনিক আধ সের দুধ খাবেন। শহরে গিয়ে ব্যাংকের কাজে যোগ দেন। আমি ভাই সাহেব তাহের মিয়াকে (ডিজিএম) বলে দিব"। আমি পুনঃ বললাম, "চতুর্দিকে পাঞ্জাবীরা চরম অত্যাচার করছে"। প্রত্যুত্তরে বাবাজান বললেন, "কেউ আপনার কোন অসুবিধা করতে পারবে না"। আমি মে মাসের আঠার তারিখ চাকুরিতে যোগ দিই। কি অপূর্ব দয়া। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সপ্তাহান্তে শনিবার শহর থেকে নিয়মিত দরবার শরিফে আসা যাওয়া করেছি। এত দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কোনদিন কেউ আমাকে একটা কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই। দয়া দৃষ্টির ফলে বিপুলসংখ্যক ভক্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। **বর্ণক: (ক)**

মাইজভাণ্ডার এক অনন্ত সাগর

১৯৭৮ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোনালী ব্যাংকের রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আঞ্চলিক ম্যানেজার সাহেব এক বন্ধুসহ দরবার শরিফ বাবাজানের নিকট আসেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। সকাল থেকে বাবাজান একটু জজ্‌বা হালে ছিলেন। উনাদের অনুরোধ রক্ষার্থে অনন্যোপায় হয়ে হুজরা শরিফে গিয়ে বাবাজানের সাথে সাক্ষাৎ করি। উনাদের বসাবার হুকুম দিয়ে বাবাজান বলেন, 'চলুন, আমরা একটু রাঙ্গামাটি বেড়াতে যাব'। এতে ম্যানেজার সাহেব খুব খুশী হলেন। বিকেল ৩টা নাগাদ আমরা রাঙ্গামাটির পথে যাত্রা করি। তখন বাবাজান ১৭৪২ নম্বরের জীপ গাড়িটা ব্যবহার করতেন। এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরার পর রাত্রি প্রায় ৮টা নাগাদ আমরা রাঙ্গামাটিস্থ ম্যানেজার সাহেবের বাসায় পৌঁছি। রাত ১০টা নাগাদ খাবার পরিবেশন করলে বাবাজান প্রথমে খাবেন না বলেন; পর মুহূর্তে আমাকে খাইয়ে দেয়ার হুকুম দেন। আমি অনেকটা সংযত ও ভীত হয়ে হাত পরিষ্কার করে বাবাজানকে শায়িত অবস্থায় ৫/৭ গ্রাস মুখে তুলে দিই। এখানে রাত্রি যাপন করে খুব ভোরে হেঁটে হেঁটে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর বাসায় গিয়ে উঠেন। চৌধুরী সাহেব এত ভোরে বাবাজানকে দেখে বিস্মিত হলে বাবাজান বললেন, 'মামু আপনাদেরকে দেখতে আসলাম'। তিনি বাসা থেকে গাড়ি আনিয়ে সোজা রাঙ্গামাটি শহরে প্রবেশ করেন। ড্রাইভারকে একটা পাহাড়ের উপরস্থ বাংলোতে নিতে হুকুম দেন। বাবাজান গাড়ি থেকে নেমে সোজা বাংলোতে গিয়ে উঠেন। ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি চাই? কাকে চাই। ভুলে আমরা বাংলোর পিছনের দিকে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত উনি সামনের দিকে যেতে বললে আমরা ঐদিকে গেলাম। বাংলোর ড্রইং রুমে ঢুকতেই পরিচয় দিলেন তিনি রাঙ্গামাটির এ.ডি.সি (উন্নয়ন)। আমিও বাবাজানকে দেখিয়ে বললাম– আমার পীর সাহেব কেবলা হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর প্রথম পুত্র শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। এ.ডি.সি সাহেব আমাদেরকে বসতে দিয়ে নিজেও বসেন। আমি নীচে কার্পেটে বসাতে উনি উপরে বসতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজান আমার পরিচয় দানে বললেন– 'উনি কাজী ফরিদ মিয়া, আমার ফুপাত ভাই, ব্যাংকের ম্যানেজার'। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ হলো। এক পর্যায়ে এ.ডি.সি সাহেব মাইজভাণ্ডার শরিফ

সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করে বলেন, 'ওখানে নামায-রোজা পালন হয় না। শরীয়ত বিরোধী কাজ চলে ইত্যাদি'। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব বুঝাতে চাইলাম– মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী জামে মসজিদে প্রত্যহ জামাতে বিপুল মুসল্লী সমেত নামায আদায় হয়। পবিত্র রওজায় নিয়মিত নামাযের জামাত হয়। আমি বললাম, মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী যিনি হযরত কেবলার একমাত্র ওয়ারিশ ও আওলাদ–তিনিতো জীবনে কোনদিন নামায কাজা করেন নি বা রোজা ভাঙ্গেন নি। আমরা ওখানকার ভক্তরা নিয়মিত নামায রোজা পালন করি। আপনি কি ভেবে কি চিন্তা করে এসব উদ্ভট বক্তব্য রাখছেন বুঝছি না। তাই অনুরোধ করছি, একদিন গিয়ে দেখুন এবং বিচার করুন। অতঃপর ইংরেজিতে বাবাজান অভূতপূর্ব দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠেন, 'মাইজভাণ্ডার ইজ এ্যান ওশান, ডোন্ট থিংক ইট আদার ওয়াইজ' (Maizbhander is an ocean, don't think it otherwise) – অর্থঃ 'যেমন তেমন ভেবোনা, মাইজভাণ্ডার এক অনন্ত সাগর'। তিনি আরও বলেন, 'খাল নদীনালা দিয়ে কত ময়লা-আবর্জনা মহাসাগরে গিয়ে পড়ে কিন্তু মহাসাগরের কিছুই হয় না। মহাসাগর ঠিকই থাকে'।

এ.ডি.সি সাহেব আমাদের আপ্যায়ন করাতে চাইলেন। বাবাজান কিছুই কবুল না করে আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেদিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা একবার দরবার শরিফ ঘুরে তিনবার চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি আসা-যাওয়া করি।

(খ) বর্ণক: (ক ও খ) কাজী ফরিদ উদ্দিন, পিতা- মরহুম কাজী ফজলুল করিম, আরজিয়া খলিল মন্‌জিল, কাজী বাড়ি, পূর্ব মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

বাসন-চামচ আলাদা

একদা দরবার শরিফ মাঠ দিয়ে যেতে তিনি আমাকে ডাকলেন। নিকটে গেলে বললেন, 'আমাকে এক কাপ দুধ খাওয়াতে পারবেন'? ঘরে গিয়ে মাকে বলে দুধ নিয়ে বের হবার সময় তাঁদের এক কাজের মেয়ে গিয়ে বলে তাঁর দুধ খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই দুধ নিয়ে আর গেলাম না। কিছুক্ষণ পর সেদিকে যেতে ডেকে বললেন– 'মনে সন্দেহ হয়েছে'? উত্তরে বললাম, 'আপনি তো সব জানেন'। এটা তাঁর সাধনার প্রাথমিক কালের ঘটনা। তাঁর চোখ জবা ফুলের

মতো লাল। আমাকে ডেকে তাঁদের অফিস ঘরে বসালেন এবং বলেন, ‘চাচির (আমার মা) থেকে আপনাদের বাসন-চামুচ ইত্যাদি আলাদা করে নেবেন’। কেন জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ‘উনার টি.বি. হয়েছে’। মা তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ছয়মাস পর মার যক্ষ্মা (টি.বি) রোগ ধরা পড়ে। ভগ্নিপতি আবদুল গণি সওদাগর মার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু তিনি সুস্থ না হয়ে সে রোগেই ইন্তিকাল করেন। দুধ চেয়ে নিশ্চয় আমাদের দোয়া করতে চেয়েছিলেন। না দিয়ে ভুল করেছি; তাই আমার জীবনভর অনুশোচনা।

বর্ণক: সৈয়দ মহিউদ্দিন, পিতা- মরহুম সৈয়দ সিরাজুল হক মিয়া, গাউসিয়া আমিন মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

চির চাওয়ার পূর্ণতা

তখনো আমার কোন ছেলে সন্তান হয় নাই। অনেক চেষ্টা তদবীরেও কোন ফল হয় না। আসলে আমার যৌনশক্তি ছিল না। সন্তানের জন্য পাগল-প্রায় হয়ে অনেক পীর ফকিরের মাযারে গেছি। বাইরে যতক্ষণ থাকি সময় এক প্রকার কেটে যায়। ঘরে গেলে মর্মজ্বালায় একশেষ। পুরুষ হয়ে কোন নারীর কাছে একান্ত পরাজয় সে কি বেদনাদায়ক ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যরা বুঝবে না। পৌরুষত্বের পরাজয়ের গ্লানি তিলে তিলে আমায় দহন করছিলো। বউয়ের মুখের দিকে চাইতেই দুঃখ ও বেদনা আমাকে দিশেহারা করে তোলে। বউ কত আর মুখ চেয়ে থাকবে। শুধু খাওয়া-পড়ার জন্য তো মেয়েদের বিয়ে হয় না। তার আরো প্রাপ্য থাকে এবং সেটাই আসল দাবী। বিয়ের পর পাঁচ বছর একাকীত্বে কেটেছে। বউটা মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাতে কোন শিশু পালক নিতে চায়। তাতে আমার মন সায় দেয় না। আবার নাও বলতে পারি না। একদা কথায় কথায় মৌলানা হাসান সাহেবকে বলে সাহায্য চাইলাম। তিনি আমাকে নিয়ে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর দরবারে গেলেন। আবেদনের জবাবে তিনি বলেন, ‘বটগাছে দা দিয়ে এক কোপ দিয়ে যে কষ বের হবে তা নিয়ে সামান্য মিঠা (গুড়) নিয়ে ছোট গর্ত করে তথায় কষ ভরে কোঁত করে গিলে খাবে। ঠিক হয়ে যাবে’। আমি সেরূপ করলাম। আমি যৌনশক্তি পুরুষত্ব ফিরে পেলাম। অবসান হয়েছে আমার মর্মজ্বালা, বউয়ের যন্ত্রণার তীব্র দহন এবং মাতৃত্বের হাহাকার। বাবার দয়ায় দু’ছেলে এক মেয়ে নিয়ে আমরা পরিপূর্ণ সুখী।

বর্ণক: মোহাম্মদ ইউছুপ সওদাগর, পিতা- মৃত আয়ুব আলী, মুন্সির ঘাটা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

বান্দা ছাড়া আল্লাহ্

১৯৭৮ সালে একদা বাবাজানসহ নৌকাযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষীছড়ি বাজারে পৌঁছলাম। খবর পেয়ে সেখানে বহুলোক জমা হয়ে যায়। কয়েকজন পুলিশ ও পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত হলো। পুলিশদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'মানুষের উপকার করবেন'। পরে আরো বলেন, 'লতা কি গাছ ছাড়া উঠতে পারে? আল্লাহ্ কি বান্দা ছাড়া থাকতে পারে'? খুবই শান্ত অবস্থায় কথাগুলো বলেন। নৌকাযোগে ধুরঙ্গ নদী বেয়ে ফেরার পথে দু'জন জুমিয়া দু'আটি কাঠ নিয়ে বসে থাকতে দেখে প্রতিজনকে ২০টি করে টাকা দিতে নির্দেশ দেন। আমি তাদের টাকা লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করে দশ টাকা করে দিতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাকে তো চালাক বলে মনে করতাম – কিন্তু তুমি তো আস্ত বোকা, তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে চলে এসো'। জুমিয়াদের হাতে টাকাগুলো দিলে তারা আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এক সফরে অন্য এক প্রসঙ্গে বলেন, "পকেটে এক টাকা নাই, লাখ টাকার গল্প করে এমন লোক থেকে দূরে থাকবে"। **(ক)**

পিটিয়ে একশিরা শেষ

একবার সাদেক নগরস্থ আমার বাড়ির হুজরা শরিফে শাহানশাহ্ বাবাজান তশরিফ আনেন। এ খবর শুনে অনেক মানুষ বাবাজানকে দেখতে এবং দোয়া চাইতে আসেন। অনেকের মধ্যে মফজল আহমদ প্রকাশ বোলাইয়াও আসে। সে কাছে যাওয়ার সাথে সাথে পাশে রাখা গোলাপদানী দিয়ে পেটাতে আরম্ভ করলেন। মারের চোটে মফজল আহমদের কান ও ঘাড় ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে লাগল। পরে আমার মায়ের কথামত লোকটাকে ঘরে এনে ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিই এবং দশ টাকা হাতে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম "অলি-উল্লাহ্রা অহেতুক কিছু করেন না, হয়ত তোমার কোন উপকার হবে"। ভাত খাওয়ার জন্য অনুরোধ করি কিন্তু লোকটা না খেয়ে চলে যায়। ঘটনার চারদিন পর আবার তার সাথে আমার দেখা হয়। আমি চা খেতে অনুরোধ করি। তখন সে আমাকে বলল, অনেক দিন ধরে একশিরা রোগে কষ্ট পাচ্ছিলাম। বাবাজান ঐ দিন আমাকে মারার পর একশিরা রোগ ভাল হয়ে গেছে। আমি এ কথা শুনে মনে

মনে বাবাজানের কদমে শোকরিয়া আদায় করি এবং লোকটার হাতে আরেকটা ১০ টাকার নোট দিয়ে দরবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে বলি। **(খ)**

বোবার মুখে বাক্য স্বরে

আমার ঘরের পার্শ্ববর্তী আবদুল বারীর ঘর। তার চার কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান। ৪র্থ কন্যা বেবী আক্তার জন্ম থেকে বোবা। এই নিয়ে তাদের অনুতাপের শেষ নাই। বোবা মেয়েটিকে নিয়ে সবসময় চিন্তিত। একবার বেবী আক্তারকে নিয়ে তার মা দরবার শরিফে শাহানশাহ্ বাবাজানের কাছে গিয়ে আর্জি ফরিয়াদ করেন মেয়েটি যাতে ভাল হয়। হুজরা শরিফে নেয়াজের ভাত পাঠানো হয়। ঐ তাবার্‌রুক থেকে বাবাজান বোবা মেয়েটিকে ভাত খাওয়ায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সাথে সাথে মেয়েটির জবান খুলে গেল এবং কথা বলতে লাগল। বর্তমানে সে মেয়ে দুই সন্তানের জননী। **(গ)**

অব্যক্ত দুঃখ-লজ্জার অবসান

আমাদের পূর্ব বাড়ির তফজল আহমদ পিতা মৃত নবিদর রহমান সাং- সাদেক নগর, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে সে পাঞ্জাবে থাকতো। যুদ্ধের ২/১ মাস পূর্বে সে বাড়িতে চলে আসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার মা-বাবার ইচ্ছায় ফটিকছড়ি জাহাঁপুর গ্রাম নিবাসী আমজাদ সাহেবের বাড়ি থেকে তাকে বিবাহ করানো হয়। বেশ ধুম-ধামের মধ্য দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। বিয়ের ৪/৫ মাস পর তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী বাপের বাড়িতে গেলে আর স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসে না। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর গ্রামের লোকজন সালিশের ব্যবস্থা করে। সালিশে তার স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হয়। মেয়েটি আর তফজল আহমদের সাথে ঘর করবে না বলে জানায়। কারণ, তার পুরুষত্ব নেই। বিচারকগণ মুখ নিচু করে মেয়েটির প্রাপ্যতা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় দেয়। উপরোক্ত ঘটনার বেশ কিছুদিন পর শাহানশাহ্ বাবাজান আমাদের বাড়িতে তশরিফ আনেন। ঐখানে কোরবান আলী নামের এক ব্যক্তি তার বোনের বিয়ের জন্য দোয়া চায় এবং ২/৩টা ঘর হাতে আছে বলে জানায়। বাবাজান বলেন, 'ঐগুলো একটাও ঠিক হবে না। তফজলের সাথে তোমার বোনের বিবাহ দাও'। এ কথা শুনে কোরবান আলী যেন আকাশ থেকে পড়লো। বলল, তফজলের

পরিবার থেকে তো কোন প্রস্তাব আসে নি। তাছাড়া কিছুদিন আগে একটা মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় কিভাবে আমার বোনকে তার সাথে বিয়ে দিই। এ কথা বলার পর বাবাজান জজ্‌বা হালে তাকে মারতে চাইলে সে দ্রুত পালিয়ে যায়।

এসব কথা রাত্রে আমার বড় বোনের কাছে শুনে তৎক্ষণাৎ কোরবান আলীকে খবর দিই। সে সকালে আসবে বলে খবর পাঠায়। পরদিন সকালে আমার সাথে দেখা হলে কোরবান আলীকে বাবাজানের হুকুমের উপর রাজী হতে বলি। বললাম, অলি উল্লাহ্‌রা যা বলেন এবং করেন, তাতে আল্লাহ্‌র রহস্য ও রহমত বিরাজিত থাকে। নির্দিষ্ট তারিখে কোরবান আলীর বোনের সাথে তফজল আহমদের বিয়ে হয়। ঐ অনুষ্ঠানে শাহানশাহ্‌ বাবাজানের একমাত্র উত্তরাধিকারী হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) উপস্থিত ছিলেন।১ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার সুখে শান্তিতে রয়েছে। পরিশেষে ভক্ত কামরুলের ভাষায় বলতে হয়–

"কলিজার টুকরা নয়নের তারা, জিয়া বাবা তুমি মোদের সাহারা"। **(ঘ)**

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্তব্ধ

আরেকদিন খেদমতে হাজির হলে দেখি তিনি একটা আপেলকে এক হাতে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারছেন এবং অপর হাত দিয়ে ধরছেন। এভাবে কিছুক্ষণ করার পর হঠাৎ নিম্নগামী আপেলটাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'রোখ্‌ যাও'। সঙ্গে সঙ্গে আপেলটা শূন্যে স্থির হয়ে থাকে। তাঁর জন্য নেয়া সিগারেটের প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই তিনি ডাকলেন। দাঁড়ালাম। আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'মামু সাহেব, আপেল কবুল করবেন? বলে দাঁড়িয়ে শূন্য থেকে আপেলটা নিলেন। আমি কোন প্রকারে 'না' বলে ভয়ে ভয়ে চলে আসি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিজ্ঞানী নিউটনের এক মহা আবিষ্কার। একটা ঢিল উপর দিকে ছুঁড়লে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই সে ঢিল আবার মাটিতে ফিরে আসে। মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমা পেরিয়ে এমন এক স্তর আছে যেখানে গতি নেই, সময়ও নাই। বিজ্ঞানীরা যাকে 'নো টাইম এন্ড স্পেস' বলেন। ইসলাম ধর্ম মতে ওটাই 'লা-মকান'। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলয়ে সমগ্র জগত ডুবে আছে কিছুক্ষণের জন্য

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সে গতিকে স্তব্ধ করে দেন। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত মহানবির মেরাজের ঘটনাকালে জগতে সময়ের গতি তদ্রুপ সাতাশ বছর স্তব্ধ ছিলো। ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যদের মনে হয়েছিল সব ঠিকই আছে। **(ঙ)**

বর্ণক: (ক,খ,গ,ঘ,ঙ) শেখ নুরুল আমিন শাহ্ (কালু শাহ্), পিতা- মরহুম আলহাজ্ব শেখ মতিউর রহমান শাহ্, প্রযত্নে: রহমানিয়া খাজা মন্জিল, গ্রাম ও ডাকঘর- সাদেক নগর, সমিতির হাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

আরো দশ বছর বাঁচুক

১৯৭৫ সালে ছোটভাই সৈয়দ নিজামউদ্দিন আহমদ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। আমার বাসায় তাকে চিকিৎসার্থে রাখি। এক রাতে বাবাজান আমাদের বাসায় এসে সোজা তার বিছানায় শুয়ে পড়েন। নিজাম তখন পাকঘরে ছিল। কিছুক্ষণ পর উঠে তিনি পায়চারী করতে থাকেন। আমি নিজামের রোগ মুক্তির আবেদন জানালে তিনি বলেন, 'নিজাম চলে যাবেন। আর এখানে থাকবেন না। তার জন্য কান্নাকাটি করলে আপনার ক্ষতি হবে'। অল্পদিনের মধ্যে ছোট ভাই নিজাম মৃত্যুবরণ করে। বাহাত্তর সালে আমার ফুফু সৈয়দা লায়লা বেগম বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বাবাজান আমাদের বাসায় আসেন। বাইরে রাখা একখানা চৌকির উপর শুয়ে পড়েন। চাকর-বাকরসহ আমরা সেখানেই তাঁর সেবায় নিয়োজিত হই। আমি দেখতে পেলাম আকাশ হতে একটা স্বর্গীয় আলোর আভা সরাসরি তাঁর উপর এসে পড়লো। এ দৃশ্য আমার ছেলে হামিদকে দেখাবার জন্য ঘুম হতে উঠালে সে বলে– মা এক্ষুণি স্বপ্নে কে যেন আমাকে বললেন, 'তোদের ঘরে আল্লাহ্‌র অলি এসেছেন। তুই এখনো ঘুমে'? ছেলেকে নিয়ে নিকটে গেলে বলেন, 'উনি (লায়লা ফুফু) কোনমতে মরতে চাননা, কী করি, মৃত্যু যে ঠিক আছে। আরো এক বছর থাকলে কি হবে? দশ বছর থাকুক, কেমন'? তাঁর কৃপায় ফুফু সুস্থ হয়ে উঠেন এবং ঠিক দশ বছর পর বিরাশির সেপ্টেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন। ফুফু প্রায় বলতেন, 'জিয়া বাবাজী আমার দশ বছর আয়ু বৃদ্ধি করেছেন'। **(ক)**

সর্ব মুক্তিদাতা

আমার একমাত্র ছেলে আবদুল হামিদ আশি সালে কঠিন পান্ডু (জন্ডিস) রোগে আক্রান্ত হলে ডাক্তারের পরামর্শে প্রায় চৌদ্দটি ৭০০০ এম.জি. স্যালাইন দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। দীর্ঘদিন ঢাকা অবস্থান করে বাবাজান আমার বাসায় ফিরে হামিদের খোঁজে ভিতরের কক্ষে এসে দেখেন তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। দিশেহারা হয়ে আমি তাঁকে সম্মুখে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলি– বাবাজান, এ ছেলে মারা গেলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো। আপনি দয়া করুন। সেদিন তিনটা স্যালাইন চলছিলো। তিনি স্যালাইন খুলে ফেলে বলেন, 'কী অসুখ হয়েছে? কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছেন। আমাকে জানান নাই কেন? আমি তো ছিলাম। কাঁদবেন না। ভাল হয়ে যাবে'। অতঃপর হামিদের পেটে-বুকে-কপালে হাত রাখেন। ডা. কিবরিয়ার কিছু ঔষধ খাওয়াতে পরামর্শ দেন, আমি তাই করলাম। ছেলে সুস্থ হয়ে উঠে।

একমাত্র শিশু সন্তান নিয়ে বিধবা হলে তিনি যে কী উপকার আমাকে করেছেন তার পূর্ণ বর্ণনায় একটা বই হবে। মামলা-মোকদ্দমায় ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবার আশঙ্কাজনক অবস্থায় দয়া করে তিনি আমার বাসায় আসেন এবং প্রায় সাত বছর এখানেই থাকেন। তাঁর অসীম দয়ায় মামলা-মোকদ্দমা জিতে বাসা বাড়ির সব সম্পত্তি ফিরে পেয়েছি। তিনি আমার আশ্রয়, তিনি আমার শক্তি, তিনিই আমার সর্ব মুক্তিদাতা। **(খ)**

বর্ণক: (ক ও খ) সৈয়দা রিজিয়া বেগম, স্বামী- মরহুম আবদুল গণি সওদাগর, ব্যাটারী গলি, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

মৃত্যুর দুয়ার হতে

একদা কিছু লোক পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ আমার কৃষি খামার হতে আমাকে হাত ও চোখ বেঁধে গভীর জঙ্গলে ধরে নিয়ে যায়। প্রায় ৪/৫ ঘন্টা পর অনুভব করলাম, আমাকে একটা বৃক্ষে বা কিছুর সাথে বেঁধে রাখা হচ্ছে। আমি দমে দমে আমার মুর্শিদ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে স্মরণ করতে থাকি। তখন দুপুর গত প্রায়। শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাতের বন্ধন আমাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। বন্ধনের ফলে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ। তাই অসহ্য যন্ত্রণা। হঠাৎ মচ্ মচ্ শব্দে আমি চমকে

উঠি। তাড়াতাড়ি হাঁটু দ্বারা ঘষতে ঘষতে খুব কষ্টে চোখের বন্ধন ফাঁক করে দেখলাম লোকজন নেই। একটা প্রকাণ্ড সাপ ঝোপ হতে বের হয়ে আসছে। আমি বন্দী অবস্থায় প্রাণ ভরে বাবাজানের পবিত্র নাম স্মরণ করি। সাপটি মোড় ফিরে অন্যদিকে চলে যায়। নামের কী মহিমা! পাহাড়ের বিষাক্ত প্রাণীও তাঁর অনুগত। অনাহারে ও বন্ধনের যন্ত্রণায় আমার খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। অতঃপর আমি বন্দী অবস্থায় পাহাড়ের সাথে গা ঘেঁষে বিশ্রাম নিলে কিছুক্ষণ পর আমার চক্ষু মুদে আসে। সে ঘুমে আমার জোহরের নামায কাজা হয়ে যায়। তন্দ্রা ছুটলে দেখি দু'জন লোক আমার হাতের বন্ধনটি খসিয়ে বাহুতে বাঁধছে। তখন অতি মর্মাহত হয়ে চিন্তা করছি– হায়; গত জীবনে কোনদিন পারতপক্ষে নামায কাজা করি নাই। আর বন্ধন শিথিলের সাথে সাথে আমার খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। তারপর তারা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি পুনঃ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি। তখন হক ভাণ্ডারী এসে বলেন, 'চিন্তা করো না'। মনে হলো খালাস দেওয়ার ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর হযরত বললেন– 'আসরের ওয়াক্ত হয়েছে অজু করে আস'। আমি তাড়াতাড়ি অজু করে তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। নামাযান্তে তিনি আস্‌সালামু আলাইকুম বলে ডান ও বাম দিকে সালাম দিতে হঠাৎ কার হস্তস্পর্শে আমার তন্দ্রা দূরীভূত হয়। দেখলাম ক'জন লোক আমার বন্ধন খুলে দিয়ে বলল– 'ভাই তোকে ছেড়ে দেয়ার হুকুম হয়েছে'। আরও বলে– 'ভাই আমরা তোর কোন দোষ করলে মাফ করে দিস্'। অতঃপর আমাকে তাদের দলপতির নিকট নিয়ে গেল। দলপতি আমাকে অতি সমাদরে আহারাদির পর জিজ্ঞাসা করলো, 'কে কে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে'? উত্তরে আমি বললাম, আমার প্রতি কেউ অন্যায় করে নি। অতঃপর দলপতি বলল, তুমি নির্দোষ তোমাকে এখন তোমার খামারে পৌঁছে দিবে। মৃত্যুর দুয়ার হতে কে আমায় ফিরিয়ে দিলো। এ কোন মহান দয়াবান?

বর্ণক: জমিল আহমদ সওদাগর, পিতা- মৃত পছন মিয়া, গ্রাম- মানিকপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

দরবারে দেবতাকে দিস্

জনৈক চাকমা ব্যক্তি ১৩৮৯ বাংলা ১৬ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলার ময়ূরখিলে ভাণ্ডার শরিফ স্টোরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। চাকমা লোকটির হাতে একটি মোরগ। দোকানের সামনে এসে বলে– 'মুরে থোরা পানি দে'। তখন উপস্থিত লোকের মধ্যে একজন গ্লাসে করে তাকে কিছু পানি দেয়। পানি নিয়ে চাকমাটি স্টোরের সামান্য দক্ষিণে গিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে অবনত মস্তকে কী যেন বলে চলে আসলো। তারপর চাকমাটি আমাকে বলে– ভাই, এ মোরগটি দরবারে বড় মিয়া দেবতাকে দিস্। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুই কেন এ মোরগ দিতেছিস? উত্তরে চাকমাটি বলল, ভাই বহুদিন হতে আমার পোষা একটি মুরগী ডিম পাড়ে অথচ ডিমে তা দেয় না এবং বাচ্চাও হয় না। ডিমগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তাই অধীন নিয়ত করলাম, "ফয়া" যদি আমার মুরগীটির বাচ্চা দান করায় তাহলে মাইজভাণ্ডারীর বড় মিয়া দেবতাকে একটি মোরগ দিব। এ নিয়ত করার পর হতেই আমার মুরগীটির ডিম আর নষ্ট হয় না। প্রথম দফার বাচ্চা হতে এ মোরগটি আমার নিয়ত মতে দেবতার জন্য এনেছি। দয়া করে তুই আমার মোরগটি দেবতার দরবারে পৌঁছে দিস্'। মোরগটি গ্রহণ করে আমি ভাবলাম– 'দরবার শরিফ যাওয়ার কোন লোক নাই। অতএব কীভাবে কার মারফত আমানত পৌঁছে দিতে পারি; একথা মনে মনে স্মরণ করতে না করতে দু'জন লোক উপস্থিত হয়ে বলে– আমরা দরবার শরিফ যাব। লোক দু'জনের মধ্যে একজনের নাম মোস্তফা, অপরজনের নাম রশীদ। তারা দু'জনই শাহানশাহ্'র খামারে চাকুরি করে। বেতনের জন্য দরবারে যাচ্ছে। অতএব, আমি একখানা চিঠি দিয়ে তাদের মারফত মোরগটি দরবারে পাঠিয়ে দেই।

বর্ণক: মোহাম্মদ আবুল কাসেম, পিতা- মৌঃ আবদুর রশিদ, গ্রাম- রসিদের ঘোনা, থানা- সাতকানিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম, স্টোর ম্যানেজার, ময়ূরখিল মাইজভাণ্ডারী খামার।

খবরদার! আগুন নিভাবে না

একদা তিনি মানিকপুর নোয়াপাড়া নিবাসী সোলতান আহমদের নৌকায় করে ময়ূরখিলস্থ তাঁদের পুরান খামারে এসে উপস্থিত হন। ঐ সময় আমি এই খামারে কাজের পরিচালক ছিলাম। এসেছেন শুনে আমরা কয়েকজন লোক তাঁকে কদমবুচি করতে ছুটে যাই। খামারের দক্ষিণে পুকুর পাড়ে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আস'। তাড়াতাড়ি একজন লোক চা তৈয়ার করে নিয়ে গেলে চা পান করে পেয়ালাটা সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সোজা অফিস ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। সন্ধ্যাকালে উঠে তিনি খামারের অগ্নিকোণের দিকে যে বিরাট শুকনা খড়ের স্তূপ ছিল তাতে অগ্নিসংযোগ করেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকলে আমি কয়েকজন লোকসহ আগুন নিভাতে ছুটে যাই। কেননা খড় জ্বলে গেলে বর্ষাকালে গরুর খাদ্য সংকট হবে। তখন তিনি বলেন, 'খবরদার! আগুন নিভাবে না। আমি ধুইয্যা খালের ভূত, পেত্নী ও দানব-অসুরদের তাড়িয়ে দিচ্ছি'। এই খালে পূর্বে প্রায় সময়ই নানারকম জন্তু দেখে ভয় পেয়ে বহু লোক পাগল হয়েছিলো। এমন কী অর্ধরাতেও আতঙ্কে হৈ হুল্লোড় পূর্বক নিদ্রা হতে জেগে বহুলোক ঘর হতে বের হয়ে গেছে। তাই খামারে কাজ করতে লোকেরা অত্যধিক ভয় করতো। বাবাজানের খড় জ্বালাবার পর হতে লোকজন কোন রকমের ভয় পায় নি এবং কেউ পাগলও হয় নি। বর্তমানে ময়ূরখিল মৌজা, ধুরং খাল ও ধুইয্যা খালসহ সমস্ত এলাকা শঙ্কা ও বিপদমুক্ত।

বর্ণক: মোহাম্মদ ইদ্রিস, পিতা- আবদুল বারিক, গ্রাম- মাইজভাণ্ডার শরিফ, জেলা- চট্টগ্রাম। ম্যানেজার, ময়ূরখিল মাইজভাণ্ডার এর পুরান খামার, থানা- লক্ষ্মীছড়ি।

আশার দ্বীপ জ্বলে

এম.এ. পাস করার পর রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করি। তখন আমার চাকুরি ছিলো অস্থায়ী। চাকুরি স্থায়ী করার জন্য বহু চেষ্টা করে বিফল হই। অবশেষে রাউজান ফকিরহাটের আবদুল নূরের সঙ্গে স্বামীসহ শাহানশাহ্ বাবাজানের নিকট গিয়ে আবেদন জানাই। তিনি আমাকে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেবের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে চিনবেন না বলে উল্লেখ করলে বললেন, 'চট্টগ্রামের লোক

বলে পরিচয় দিবেন। তবু না চিনলে আমি পাঠিয়েছি বলবেন। কাজ হয়ে যাবে’। অতঃপর তাঁর নির্দেশ মতো ঢাকা গেলাম। শিক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে গিয়ে স্লিপ দিলে অধ্যাপক সাহেব ডেকে পাঠান। সেখানে সাবেক মন্ত্রী বিনীতা রায়ও ছিলেন। ফাইলপত্র দেখে উপদেষ্টা সাহেব চাকুরি স্থায়ী হওয়ার বিহিত ব্যবস্থা করেন।

বহুদিন থেকে মনে একটা সুপ্ত আশা পিএইচডি করবো। অনেক চেষ্টা তদবীর করলাম, কোন সুযোগ হয় না। অবশেষে বাবাজানের দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, ‘একটু অপেক্ষা করুন। একটা বৃত্তি পেয়ে যাবেন’। তবু মন বোধ মানে না, একদিন যেন এক বর্ষ; আশার দ্বীপ কবে জ্বলবে। অনেক দিন পর একটি ভারতীয় স্কলারশীপ পেলাম বোটানীর উপর তিন বছরের কোর্স। একদিন শুভ মুহূর্তে যাত্রা করলম। কোর্স শেষে ডক্টরেট নিয়ে দেশে ফিরি। তাঁর অপূর্ব কৃপা না হলে আমার মতো কোন যোগসূত্রহীন অবলা নারীর পক্ষে জীবনেও এই ডিগ্রী পাওয়া সম্ভব হতো না। তিনি যে দয়ার অবতার।

বর্ণক: অধ্যাপিকা আলো রাণী পালিত, স্বামী- মৃণাল কান্তি পালিত, গ্রাম- ঢেউয়া পাড়া, সুলতানপুর, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

মরণ সঙ্কটে মুক্তিদাতা

আমার প্রথম সন্তান প্রসবের সময় হলে ভালো পরিচর্যার জন্য বাপের বাড়ি চলে যাই। সেখানে প্রসব বেদনা শুরু হলে ধাত্রী ডাকা হয়। দু’দিন ধরে কষ্ট পাওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয়। ঔষধপত্রে কোন কাজ হলো না। এমনি সময়ে ফুফাজান শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী একটা গাড়িতে করে ফুফু ও দাদীজানকে শহর হতে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। পরদিন তিনি নিজেও আসেন। আমার সে কী কষ্টকর সময়। বর্ণনায় বুঝাতে পারবো না। তৃতীয় দিনে আমার অবস্থা চরমে পৌঁছলে ফুফাজানকে সবাই দোয়া করতে বলেন। তিনি কিছু না বলে বাড়ির উঠানে শুধু পায়চারী করতে থাকেন। অবশেষে অপারেশন করার জন্য ডাক্তার আনা হয়। গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই। তাদের হাতে অপারেশনে জীবন-আশঙ্কাজনক। তবু উপায় নেই। এমন সময় তিনি আমার ঘরের দরোজায় উপস্থিত হয়ে ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে ঘরে আসলে

আমি দয়ার আশায় তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'মা কেঁদোনা, তোমার কষ্ট এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে'। তিনি ঘর হতে উঠোনে গিয়ে আমার বাবাকে বলেন, 'দাদা নাতিন এসেছে'। অথচ তখনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নি। একটু পরে একটা মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ন্যান্সী আমার প্রথম মেয়ে। ফুফাজান আমার মরণ সংকটে মুক্তিদাতা।

বর্ণক: মিসেস সাহেদা আখতার বেগম, স্বামী- কাজী শামসুল আলম, গ্রাম- পূর্ব সৈয়দপুর, থানা- সীতাকুণ্ড, জেলা- চট্টগ্রাম।

এ টাকা ভালো না

তিনি সম্পর্কে আমার দুলাভাই। উনার সাথে আমার বাল্যকাল হতেই ঘনিষ্ঠতা। উনি ঢাকায় আসলে প্রায় আমার বাসায় উঠতেন। এইরূপ একদিন আমার বাসায় আসেন এবং কয়েকদিন কাটানোর পর আমি উনার কাছে একটা গাড়ির চাকা কেনার জন্য টাকা চাইলাম। কারণ আমি ভাবলাম, উনি তো অনেক টাকা এমনিই লোকদের দিয়ে দেন। তিনি আমার কথার উত্তরে বললেন, 'টাকা দেওয়া যাবেনা। এই টাকা ভালো না। অসুখ হয়ে যায়। এমন অনেক টাকা আমার নিকট আসে, যা আমি নিজেও রাখতে পারি না। কাউকে দিতেও পারিনা। এইগুলি পুড়ে ফেলি'। যা হোক, মনে মনে কিছুটা রাগ করলাম। এরপর হঠাৎ একদিন উনি আমার বেডরুমের নিকট এসে আমাকে ১০০ টাকার সাতখানা নোট দিলেন এবং আদেশ দিলেন যেন একটি টায়ার কিনে নিই। আমি উনার হাতে অনেক টাকা দেখে বললাম সাতশত টাকায় গাড়ির চাকা পাওয়া যাবে না। একটি টায়ারের দাম ৮৫০ বা ১০০০ টাকা। বললেন বাদবাকী টাকা আমার থেকে অথবা ভাবী অর্থাৎ আমার স্ত্রী থেকে নিয়ে যেন কিনি। তাই করলাম। চাকা এনে তাঁকে দেখিয়ে গাড়িতে লাগালাম, দুই একদিন উনাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে কয়েক জায়গায় গেলাম। গাড়ি নিয়ে চট্টগ্রামে চলে আসলাম। পথিমধ্যে চৌধুরী হাটের নিকট আসার পর গাড়ির চাকা ফেটে যায়। নেমে দেখি যে ঐ নতুন চাকাখানি! আমি অসহায় হয়ে পড়লাম। কারণ নিজের কোন অতিরিক্ত চাকা নেই। তাই আরেকটি চাকা লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক পথিক ভদ্রলোক আমাকে একটা চাকা লাগিয়ে দেন। এই ঘটনায় আমার

মনে খুবই দুঃখ পেলাম। পরে সাক্ষাতে ঐ কথা বলাতে তিনি বললেন, 'বলেছিলাম না সে টাকা ভালো না'। **(ক)**

নির্দেশ না মেনে

২৯ জানুয়ারি ১৯৮২ইং আমি মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে চলে আসার সময় ভাবলাম, উনার সাথে দেখা করে যাই। তাঁকে ঘরের সামনে না পেয়ে ভিতরে গিয়ে ডাকলাম। দরজা খুলে দিলে আমি ঢাকা চলে আসার কথা বলতে উনিও আমার সাথে ঢাকা আসতে চাইলেন। তিনি একজনকে ১৫০ টাকা দিয়ে একটা ভাড়ার ট্যাক্সি আনার জন্য আদেশ দিলেন। আমি উনাকে বললাম, আমার নিকট গাড়ি আছে। ঐ গাড়িতে করে যাওয়া যাবে। ভাড়ার গাড়ির প্রয়োজন নাই। কিছুক্ষণ পর উনি বললেন, 'আমি যাব না। আর আপনিও কয়েকদিন বাড়িতে বেড়িয়ে যান'। আমি ভাবলাম, এটা কি সম্ভব? আমার জরুরী কাজ। তাই আমি উনার কথার অবাধ্যতা করে ঢাকা চলে আসার জন্য রওয়ানা দিলাম। ফেনীর নিকট আসলে আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তবে তাঁর অশেষ দয়া থাকায় পিছন থেকে তাঁর মামা স্কোয়াড্রন লিডার সৈয়দ আবুল ফয়েজ সাহেব আমাকে সাহায্য করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। **(খ)**

বর্ণক: (ক ও খ) সাহেদুল আযম, সাবেক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এস.এম. শফিউল আযম সাহেবের ছোট ভাই, ১০/১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

খোয়াজ খিজিরের জিকির

একদা গভীর রাতে শাহানশাহ্ মামা আমার জামালখানস্থ বাসায় এসে হাজির। আমাকে বললেন, 'চলুন মামা, ফৌজদার হাট সমুদ্র সৈকতে ঘুরে আসি'। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। এজন্য আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। আনুমানিক রাত ৩টায় বাসা থেকে আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। অনেকটা বিব্রত অবস্থায় পুনঃ পুনঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এতো রাতে সেখানে কী করবেন? রাস্তা-ঘাট কোথাও যে মানুষ জন গাড়ি ঘোড়া কিছুই নেই। তিনি বললেন, 'সমুদ্রের ঢেউ এ পানির কল্‌কল্ ঝুপঝাপ ধ্বনিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ জিকির উঠে। আমরা খোয়াজ খিজিরের সে জিকির শুনব'। বুঝলাম অসামান্য কোন ব্যাপার। আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।

ড্রাইভারসহ আমাকে গাড়িতে বসতে বলে তিনি একাকী বেলাভূমি পেরিয়ে দ্রুত গভীর সমুদ্রের দিকে আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। বৃষ্টি ও বাতাসের সাথে সমুদ্রের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হিম্‌ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। নিকষ কালো গভীর সমুদ্রের অস্তিত্ব, উঁচু ঢেউ উঠানামার শব্দ মনে সঞ্চার করে অজানা ভয়। ভয়াল প্রকৃতির দু'বাহু বেষ্টনে যেন আড়ষ্ট করে ফেলেছে। মূর্তির মতো বসে রইলাম। ঘন্টাধিককাল পরে তিনি ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'মামা আপনার কোন অসুবিধা হয়েছে কি'? দেখলাম তাঁর পরনের কাপড় ভিজা নয় সম্পূর্ণ শুকনো। অতঃপর আমরা চট্টগ্রাম শহর অভিমুখে ফিরে আসি। পূর্বের আকাশে তখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে। মসজিদের মিম্বর হতে আবহমানকালের সে আহ্বান ধ্বনি ভেসে আসছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'।

বর্ণক: সৈয়দ মোহাম্মদ জাকারিয়া, সদস্য – মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ও সদস্য – চট্টগ্রাম আইন শৃঙ্খলা কমিটি। পিতা- মৃত আলী আহমদ মাস্টার, গ্রাম- নানুপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান- জামালখান সড়ক, চট্টগ্রাম।

যক্ষ্মায়ও রক্ষা হয়

কথায় বলে যার হয় যক্ষ্মা– তার নেই রক্ষা। রাজরোগ যক্ষ্মা শুধু বক্ষ নয়, সমগ্র শরীরে এ রোগের অবাধ বিচরণ। খুশখুশে কাশি, শরীরে জ্বর জ্বর ভাব, কখনো কাশির সাথে রক্ত, এগুলো যক্ষ্মা বা টি.বি'র লক্ষণ। ছিয়াত্তর সালে আমার স্ত্রীর এ রোগই হয়েছিল। টি.বি. বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুছ এবং পরে প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর গোলাম মোস্তফা চৌধুরী দীর্ঘ দু'বছর ধরে চিকিৎসা করেন। কিন্তু রোগের প্রতিকার হয় না। বরং কণ্ঠনালীর পাশ দিয়ে ছিদ্র হয়ে ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত কালো পুঁজ বের হতে থাকে। প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করি। অবশেষে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। একদিন মাইজভাণ্ডার শরিফ বাবাজানের নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি দু'ফাইল ভাইব্রোমাইসিন লিকুইড ব্যবস্থা দিয়ে বলেন, 'চিন্তা করবেন না, ভাল হয়ে যাবে'। এতো বড় বড় এম.আর.সি.পি, এফ.আর.সি.এস ডাক্তার যে রোগের চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে তাঁর দেওয়া এই সামান্য ঔষধে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ ভালো হয়।

বর্ণক: মোহাম্মদ নুরুচ্ছাপা, পিতা- মোখলেছুর রহমান, গ্রাম- ছোট ছিলোনিয়া, সুন্দরপুর ইউনিয়ন, থানা- ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আবার সুখের সংসার

ছিয়াত্তর সালের ঘটনা। আমার স্বামী তাহের সওদাগর তখন বাড়ি-ঘরে তেমন আসতেন না। বাইরে সঙ্গীদের সঙ্গে থাকতেন। অতিষ্ঠ হয়ে একদা এক বান্ধবীকে বলি– তিনি যেমন, বোধহয় তাঁর পীরও তেমন। আমি আনোয়ারা থানার এক হাফেজ সাহেবের নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলাম। একদা স্বপ্নে দেখি– আমি চকবাজার লীগ স্টোরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। পীর হাফেজ সাহেব আমার পিছনে ছিলেন। তখন পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে জ্যোতির্ময় সুন্দর এক পুরুষকে আসতে দেখে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। আমার পীর সাহেব পিছনের দিকে চলে গেলেন। সালাম করতেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বলেন, 'আমরা তো গুন্ডা-পান্ডা' 'কেন সালাম করছো'। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? জানালেন, 'তাহেরের পীর সাহেব'। আমি করজোড়ে ক্ষমা চাইলাম, জ্বালায় অস্থির হয়ে না জেনে বলেছি। পিছনে কে চলে গেলেন জিজ্ঞাসা করলেন এবং পীর সাহেব কি সবক দিয়েছেন তাও জানতে চান। আমি সব জানালাম। তিনিও আমাকে কিছু তসবীহ্ পাঠের কাজ দেন। স্বামীর অসুখের কথা জানালে মাইজভাণ্ডার শরিফ হযরত কেবলা (ক.) ও বাবাজান কেবলার (ক.) দরবারে একটা করে গরু দিতে নির্দেশ দেন। আমি স্বামীর আর্থিক অবস্থা খারাপ বলে জানালে ছাগল দিতে বলেন। ইতিপূর্বে তাহের সাহেবের বুকে ভীষণ ব্যথা হয়েছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, হৃদরোগ। স্বপ্ন নির্দেশ অনুসারে দু'টা ছাগল নিয়ে জবেহ করে সকলকে খাওয়ালে ব্যথা চলে যায়। পরে আবার ডাক্তার দেখালে বলেন, কোন রোগ নেই। স্বামী পরে ঘরমুখো হয়। বাবাজানের দয়ায় পরে আমাদের সুখের সংসার।

আশি সালে একদা সন্ধ্যায় হেঁটে নিকটস্থ বাপের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। রাস্তার উপর কী একটা জন্তু আমার গলা টিপে ধরলে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে স্মরণ করি। আমার হুঁশ লোপ পাচ্ছিলো। হঠাৎ দেখি তিনি একটা পিতল মোড়ানো লাঠি হাতে জন্তুটাকে দু'টা আঘাত করতেই সেটা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি ডাকতেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সে স্থানে পূর্বে বহু লোক ভয় পেয়েছে। সেদিন হতে সেখানে কেউ আর ভয় পায় না।

বর্ণিকা: ছনোয়ারা বেগম, স্বামী- তাহের উদ্দিন, গ্রাম- বাকলিয়া, থানা- চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

হারানো দলিলের হদিস

এক শুক্রবার রাত প্রায় আটটার সময় আমি এডভোকেট কবির চৌধুরীর বাসভবন থেকে বের হয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অর্থাৎ কোতোয়ালী থানার দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তার ধারে দেখলাম শাহানশাহ্ হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সালাম জানালে বললেন, 'একটি রিক্শা ডেকে দাও'। আমি রিক্শা ডেকে দিলাম। তিনি পুনঃ বললেন, 'রিক্শায় তুমিও উঠো'। আমিও রিক্সায় উঠলাম। তিনি নাকি পাথরঘাটা বান্ডেল রোডে যাবেন। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল। সুতরাং সেই হিসাবে বললাম, হুজুর, বেশ কিছুদিন হয়েছে আমার কিছু প্রয়োজনীয় দলিল হারিয়ে গেছে। আপনি একটু দয়া করুন। হুজুর মৃদু হেসে বললেন, 'পাবেন না'। আমার চেহারা মলিন হলে হুজুর বলে উঠলেন, 'খুবই দরকার নাকি'? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ, খুব দরকার। তিনি বললেন, 'যার নিকট কাগজপত্র বিক্রি করেছেন তার নিকট আপনার দলিলগুলো আছে, তাড়াতাড়ি খোঁজ নিন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে বাজারে অনেক প্রচার ও ঢোল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। পরদিন হুজুরের কথামতো বাড়িতে এসে দোকানদারের সাথে দেখা করলাম। কাগজের বান্ডিলের ভিতর আমার সম্পূর্ণ দলিলটি পাওয়া গেল। অসহায়ের সহায় হে মহান অলি আপনাকে হাজার সালাম।

বর্ণক: সৈয়দ মোহাম্মদ নূর উদ্দিন, খাদেম, হযরত মোহছেন আউলিয়ার (রা.) দরগাহ্ শরিফ, থানা- আনোয়ারা, জেলা- চট্টগ্রাম।

এক আল্লাহ্র সৃষ্টি

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন শনিবার কাজী ফরিদ সাহেবসহ দরবার শরিফ যাই। ফরিদ সাহেবের অনুরোধে রাত্রে দরবার শরিফে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। খাওয়া-দাওয়ার পর বসে আছি, এমন সময় বাবাজান হুজরা থেকে চতুরায় এসে আমাকে চলে যাবার আদেশ দিলেন। আমি তখন বাবাজানকে প্রণাম করে মনে মনে ভাবলাম আমি হিন্দু বলে যেতে বলছেন না তো? বাবাজান বলে উঠলেন, 'দরবারে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ নাই। সব এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। আপনি তাড়াতাড়ি চলে

যান'। কী এক অজানা ভয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল, কেন বাবাজান আমাকে বিদায় দিলেন। শহরে পৌঁছুতেই মনে পড়ল – সেদিন সন্ধ্যায় শহরের সব দরগাহ্ ঘুরে আসব বলে নিয়ত করেছিলাম। **(ক)**

মহাশক্তির সবই সম্ভব

১৯৮১ সালের শেষ দিকে আর্থিক দিক দিয়ে এত দুর্বল হয়ে গেলাম যে আর সহ্য করতে না পেরে একদিন সৈয়দ বদিউজ্জামানকে নিয়ে সরাসরি বাবাজানের নিকট গিয়ে সব খুলে বললাম; বাবাজান আমি যে আর পারছি না। কী করব বলে দিন। বাবাজান বলেন, 'বাসায় চলে যান, বিশ্রাম করুন'। অধৈর্য হয়ে বললাম, বাবাজান, আমি কি বিদেশে চলে যাব? বাবাজান বললেন; 'আপনি অসুস্থ, ওখানে গেলে অসুবিধা হবে। আপনি বাসায় যান, বিশ্রাম করুন'। আমি বললাম, বাবাজান আমার যে আর চলে না। আমার একটা বিহিত করে দিন। বাবাজান তখন বললেন– 'রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আপনি কি করবেন। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। রিজিক কি আপনি খুঁজে পাবেন? আপনি বাসায় বিশ্রাম করুন। দেখবেন একদিন রিজিক আপনাকে খুঁজে বাসায় হাজির হবে'। অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরলাম। **১৯৮২** ইংরেজি জানুয়ারির শেষ দিকে কাতারে কিছু লোক নেবার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। আমি অনেক আশায় বুক বেঁধে দরখাস্ত নিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু বলে আমাকে বাদ দিয়ে দেয়। ঢাকা থেকে ফিরে এসে ফরিদ সাহেবকে নিয়ে বাবাজানের নিকট গোটা ব্যাপারটা বর্ণনা করে আর্জি পেশ করলাম। বাবাজান বলে উঠেন, 'কাতার ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, হুম্'। তারপর আমাদের কেক, মিষ্টি চা এবং অবশেষে বিরিয়ানীসহ রাত্রে ভুরিভোজন করিয়ে বিদায় দিলেন। কাতার থেকে মোটামুটি একটা মনোনীত তালিকাও চলে এল ঢাকায়। আমি আশা ছেড়ে দিয়েই বসে থাকি। এর মধ্যে একদিন সৈয়দ বদিউজ্জামানকে নিয়ে আবার বাবাজানের সাথে দেখা করলাম। আমার পকেটে একটা কলম ছিল। বাবাজান সেটা নিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করেন আপনি'? আমি বললাম; বাবাজান, আমার এখন কোন কাজ নেই। বাবাজান বললেন, 'আমার লাইটটা একটু ঠিক করে দেন'। বাতি জ্বলে উঠলে উচ্চস্বরে বাবাজান বলে উঠেন, 'আল্লাহু আকবর'। সে দিন ছিল সোমবার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ঐ

ঘটনার এক সপ্তাহ পর ঠিক পরের সোমবার আমার কাতার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চাকরিটা হয়ে গেল। ঘটনা হল– বাবাজান আমাকে দিয়ে বাতি ঠিক করার দু'দিন পর আমার এক বন্ধু, যে আগে কাতারে সেই চাকুরিতে দরখাস্ত দিয়ে নির্বাচিত হয়ে যাবার প্রতীক্ষা করছিলেন– তিনি হঠাৎ ঢাকা থেকে আমাকে টেলিফোনে বলেন; দাদা আগের সিলেক্শান অনুযায়ী এখন লোক নিচ্ছে না। নতুন টীম এসে আবার নতুন করে নির্বাচনী পরীক্ষা নিয়ে নতুনভাবে সিলেক্শান হচ্ছে। সুতরাং আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন। সাথে সাথে বাবাজানের কাছে গিয়ে অনুমতি নিয়ে ঢাকায় গিয়ে ইন্টারভিউ দিলাম। এক দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসানে শেষ পর্যন্ত দেখলাম আমিও নির্বাচিত হয়েছি। যথারীতি মেডিক্যাল চেকআপ এর বেড়াজালও পার হয়ে গেলাম। তখন আনন্দে চোখে জল এসে গেল। পরম শ্রদ্ধায় বাবাজানকে স্মরণ করে প্রণাম জানিয়ে ভাবলাম, তিনি যে মহাশক্তি, সবই পারেন। **(খ)**

বর্ণক: (ক,খ) রাখাল চন্দ্র নাথ, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), পিতা- মৃত মনমোহন নাথ, গ্রাম- ছোট কুমিরা, উপজেলা- সীতাকুণ্ড, জেলা- চট্টগ্রাম।

হলুদ চুমকির ঝিলিমিলি

মেজ ছেলে রফিক মারা গেলে তিনি নিজে গিয়ে মেজবুবুকে (তাঁর মেজ আপা) দরবার শরিফে নিয়ে আসেন। আমার ছেলে দুলাল তাঁর সাক্ষাতে গেলে আমাকেও নিয়ে যেতে বলেন। ঘরে অসুস্থ স্বামী। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হচ্ছিল। একদিকে স্বামীর সেবা নারীর নির্ধারিত দায়িত্ব, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র অলির আহ্বান, কোনটা করি। স্বামীকে বলে মাইজভাণ্ডার শরিফ গেলাম। বিকেলে চলে আসতে অনুমতি চাইলে বলেন, 'যেতে পারবেন না, তিন মাস থাকতে হবে। বড় বিপদ এসেছে; সদ্‌কা দিতে হবে'। বললাম, স্বামীর যে অসুখ! তাঁকে দেখবার মত ঘরে তো আর কেউ নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভাই সাহেব কি রাগ করবেন'? কিন্তু বিদায় দিলেন না। বাধ্য হয়ে থাকতে হলো। গভীর রাত পর্যন্ত উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি আল্লাহ্‌র জিকিরে রত থাকেন। তখন তাঁর সারা শরীরে হলুদ চুমকির ঝিলিমিলি। অপরূপ হৃদয়হরা কান্তি। ঠিক নানাজান কেবলাকে [হযরত মাওলানা শাহ্ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী] যেরূপে দেখেছি। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে

নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলেন। পৌষের কন্কনে শীতের রাতে ড্রাম থেকে পানি ঢেলে গোসল করলেন। রাত ৪টার দিকে জেবুর মাকে (তাঁর স্ত্রী) ডেকে রাতের খানা কবুল করলেন। অতঃপর ভাবীকে বলেন, 'আপনি একটা খাসী জবেহ করে বুবুদের জন্য খানা তৈয়ার করুন। আমি ঢাকা থেকে ঘুরে আসি'। ভোর ৬টায় একটা গয়াল জবেহ করালেন এবং মাংসগুলো পার্শ্ববর্তী কুলালপাড়া ও ফরহাদাবাদের দরবারী ভক্তদের দিয়ে দিতে বলে জীপ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলেন, 'চালাও'। ড্রাইভার তেল নেই বলে জানালে বলেন, 'ভাণ্ডারীর গাড়ি তেল লাগে না, বাতাসে চলে, স্টার্ট করো'। গাড়িতে করে তিনি চলে গেলেন। দুপুর ১টার দিকে দু'জন মেয়ে ও দু'খানা দধি নিয়ে দরবারে ফিরে আসেন। আমরা মনে করলাম চট্টগ্রাম শহর হতে ঘুরে এসেছেন। অনেকক্ষণ পর মেয়েগুলোকে শরবত দিতে বললেন। তাদের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করি তারা কোথা থেকে এসেছেন। ঢাকা পৌর কর্পোরেশন অফিসে চাকুরি করেন বলে জানান। তারা নাকি দাদার সাথে আরো এসেছেন। এতো কম সময়ে ঢাকা গিয়ে কেমনে ফিরলেন একথা ভাবতেই তিনি আমার হাত ধরে মেয়েগুলোকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার খালাত বোন, সবার ছোট। সাবধান! বেয়াদবী করোনা'। পরিচয় জেনে আমার পা ছুঁয়ে ওরা সালাম করলেন। স্বামীর অসুখ বলে মেজ বুবু আবার বিদায়ের অনুমতি চাইলে বলেন, 'আপনাকে কিছু বলতে হবেনা'। লোকটাকে অসুস্থ রেখে এসেছি, না জানি কেমন আছেন– এমন ভাবতে ভাবতে নিকটে গেলে বিদায়ের অনুমতি দিলেন। তাঁর দেওয়া কিছু শুকনো মাংস নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে দেখি উনি (স্বামী) সম্পূর্ণ সুস্থ।

ছেলে বিদেশ যাওয়ার সময় তাঁর নিকট দোয়া চাইতে গেলে আমাকে জোর করে কিছু টাকা দেন। গুণে দেখি দেড় হাজার, বরকতের জন্য পাঁচশ টাকা রেখে পাঁচশ টাকা গরীব দুঃখীদের দান করলাম এবং বাকি পাঁচশ টাকায় ভাণ্ডারীর ফাতেহা দিলাম।

বর্ণক: সৈয়দা আমাতুল ফেরদৌস, স্বামী- দবির আহমদ, গ্রাম- নানুপুর, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

জায়গা ছাড়তে পারে না

'কেমনে ছাড়বে। জায়গা ছাড়তে পারে না। এ জায়গা আপনার দরকার আছে। ছাড়লে কাজ কোথায় করবেন'? আমার আবেদনের উত্তরে বাবাজানের উক্তি। আমার দোকানের উত্তর পার্শ্বে জলসা নামে একটা ক্লাব আছে। সে ক্লাবের সভাপতি সদস্যদের নিয়ে বারবার ক্লাবের সোজাসুজি পেছনে আমার কারখানার স্থান ক্লাবের জন্য ছেড়ে দিতে হুমকি দিলে বলি আমার পীরের দয়ায় এখানে আছি। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি এই জায়গা ছাড়তে পারবো না। সভাপতি জাহাঙ্গীর দৃঢ়তার সাথে বলেন, আসমান হতে ফেরেশ্‌তা এসে বললেও রেহাই নেই। জায়গাটা তোমাকে ছাড়তেই হবে। পেশীশক্তির ভয়ে নিরুপায় হয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ বাবাজানের নিকট আর্জি করি। কিছুদিন পর সভাপতি আমার হাত ধরে বলেন, আপনি আউলিয়া ভক্ত লোক। তাই দাবী ছেড়ে দিলাম। এই ঘটনা সাতাত্তর সালের।

বাহাত্তর সালে লালখান বাজার সিডিএ এভিনিউতে সরকারি জমিতে ঘর তৈরি করে বাগদাদ ফার্নিচার নামে একখানা দোকান খুলি। ছিয়াত্তর সালে সরকারের অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি বিভাগ হতে কয়েকবার নোটিশ জারি করে এটা তাদের সম্পত্তি বলে দাবী করে। হাজির হয়ে আমি বন্দোবস্তির কাগজপত্র দেখালাম। কর্মকর্তারা এসব কাগজ মানেনা। আশেপাশের কিছু সুযোগ সন্ধানী লোক অফিসে যোগাযোগ করে, আমার দোকান-ঘর জবর দখল করার ষড়যন্ত্র করে। একদিন আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ঐ অফিসের ইঞ্জিনিয়ার কর্মচারী ও ষড়যন্ত্রকারীসহ দু'তিন শত লোক লাঠিসোটা নিয়ে দোকানে হামলা করে; দোকানের পেছনের কারখানা গৃহ তারা দখল করে নেয়। আমার কর্মচারীদের একটা ঘরে আটকে রাখে। একজন কর্মচারী পালিয়ে কোর্টে গিয়ে আমাকে সংবাদ দেয়। আমি এসে বাবাজানকে স্মরণ করে একাই সকলকে লাঠিপেটা করে পুনঃদখল করি।

পিটুনী খেয়ে কর্মচারীরা বিভাগীয় কমিশনার সাহেবকে দিয়ে একদা দোকানঘর সীল করে দেয়। দোকান ও কারখানায় তখন প্রায় চার লাখ টাকার মালামাল ছিল। বাবাজানকে আর্জি করলে তিনি চুপ করে থাকেন। পরিত্যক্ত সম্পত্তি অফিস চুপিসারে অন্যজনকে ইজারা দেওয়ার চক্রান্ত করে। আমি কোর্টে মামলা করলাম। দু'বছর পর মামলার রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও ইঞ্জিনিয়ারের শাস্তি হয়। কিন্তু

দোকানঘর সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ফলে জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করলাম। সেখান থেকে মামলা অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নিকট হস্তান্তর হয়। একরাতে স্বপ্নে দেখি আমার উকিল বি.জি. মাহমুদ জালাল সাহেবের নিকট বাবাজান মামলার বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করছেন, মামলা চলতে থাকে। পরিচিত যার সাথেই আলোচনা করি সবাই বলে বিভাগীয় কমিশনার বিরোধী বলে আপনার মামলা জিতবার কোন আশা ভরসা নেই। মামলার খরচ যোগাতে হবে বলে শ্বশুর গোষ্ঠিও দূরে সরে যায়। একদা ঘরে এসে দেখি স্ত্রী সন্তানাদিসহ বাপের বাড়ি চলে গেছে। কোন রুজি রোজগার না থাকায় কপর্দকশূন্য হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। পথ হতে সিগারেটের পরিত্যক্ত টুকরো কুড়িয়ে ধূমপানের নেশা করি। মনে হলে হাসি পায় আমি তো কোন কালে ৫৫৫ সিগারেট পান করতাম। মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে মাঝে মধ্যে উপোষও থাকতে হয়। ধন-সম্পদ বন্ধু-বান্ধব এমনকি প্রিয়তমা স্ত্রীও তো ছেড়ে গেল, আমার আর রইলো কী? সব দয়া মেহেরবানী যখন উঠেই গেছে, বাবাজানের কাছেই বা কেন যাওয়া? আমার অসহ্য দুঃখ কি তাঁর অজানা? একা একা বসে ভাবি, অতীত সুখের দিন কি আবার ফিরে আসবে? এ দুঃসময়ে ক'জন পীর ভাইয়ের সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ না পেলে মনে হয় পাগল হয়ে যেতাম।

এক রাতে ঘুম হল না। ভোর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে গেলাম। বাবাজানের সাক্ষাতে যাবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। গোসল করে মা'র পা ছুঁয়ে সালাম করে যখন দামপাড়া ব্যাটারী গলিতে পৌঁছি তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। ঘরের খোলা দরজায় তিনি যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁধভাঙ্গা আবেগে তাঁর পবিত্র কদমে লুটিয়ে পড়লাম। বহুক্ষণ কেঁদে শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোর্টে যাবেন'? উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আজকে মোকদ্দমার তারিখ। তিনদিনের মধ্যে জায়গার ডিক্রী পেলাম। শূন্য হাতে কিভাবে দোকান চালাবো আবেদনের জবাবে বলেন, 'দোকানে বসে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো, সব ঠিক হয়ে যাবে'। আল্লাহ্‌র এই অলির অসীম দয়ায় জীবনে আবার এসেছে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি।

বর্ণক: আবদুল শুকুর, পিতা- মৃত মোহাম্মদ ইসমাইল, গ্রাম- বাকলিয়া, থানা- চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

একটি শব্দে কত শক্তি !

স্বর্গীয় পিতা উকিল নলিনী রক্ষিত দেশের খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। ছোটবেলা থেকে দেখতাম বাবার অফিস ঘর সর্বদা লোকে পরিপূর্ণ। মামলা মোকদ্দমার নানা জটিল বিষয়ের পরামর্শ অথবা কোন মামলার আর্জি তৈরি করার জন্য লোকেরা আসতেন। মক্কেল ছাড়াও আসতেন আইনজীবীরা। উকিলদের সাথে আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। এ আসর সন্ধ্যায় শুরু হয়ে রাত দুপুর পর্যন্ত চলতো। রাতের রান্নাবান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাবার পুনঃ পুনঃ ফরমায়েশী চায়ের দাবী মেটাতে মা হিমশিম খেতেন। অনুচ্চ টিলার উপরে আমাদের বাসভবনের এসব বৈঠকের শোর শব্দ বাতাসের ইথারে ইথারে ছড়িয়ে দিত বাবার ওকালতির প্রজ্ঞা, যশ খ্যাতি ও সম্মান। আদালতে যে হাকিমের এজলাসে বাবা কোন বাদী অথবা বিবাদীর পক্ষে দাঁড়াতেন সেখানে দর্শনার্থীর ভিড় জমে উঠতো। অপর পক্ষের উকিল ও হাকিম গভীর মনোযোগে শুনতেন বাবার ক্ষুরধার যুক্তি ও আইনের নিত্যনতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এই প্রবীণ আইনজ্ঞের নিকট জুনিয়র উকিলেরা পেয়েছেন আইনের বহু জটিল সমস্যার সমাধান। শুধু চট্টগ্রাম আদালত নয় তাঁর লিখিত আর্জি মূলে ঢাকা ও কলিকাতা হাইকোর্টে বহু মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে। ফলে তিনি পরিগণিত হন আইনের ইন্‌স্টিটিউশান বা প্রতিষ্ঠানে।

ছাত্রজীবনে বাবার আইন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনে শুনে ভাবতাম কেউ এগুলো নিয়ে বই ছাপিয়ে পাঠক সমাজ তথা আইনজীবীদের হাতে তুলে দিলে মানুষের কতইনা উপকার হতো! মামলা মোকদ্দমার পরামর্শে সকাল থেকে রাত অবধি এতবেশী লোকজন আসতেন যে, লেখার জন্য সময় করে নেওয়া বাবার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। আইন বিষয়ে পড়বার সময় এবং পাস করে আইন ব্যবসায় যোগ দেবার পরে আইনের বহু জটিল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মত বিনিময় করতাম। তাঁর প্রজ্ঞাময় মন্তব্য মতামত ও বিশ্লেষণগুলো স্মৃতি হয়ে মনে জমতে থাকে। অন্য কেউ উদ্যোগ না নেওয়ায় একসময় মনে ইচ্ছা জাগে আহরিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যদি আইনের বই লিখতে পারতাম! তাহলেই বোধ হয় তাঁর সন্তান হিসেবে দায়িত্ব সম্পন্ন হতো। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের মতো মনে ভাব আসলেই গড় গড় করে কালি কাগজে লেখা হয়ে যাবে এটাতো তেমন সহজ বিষয় নয়। সমাজের তুখোড় আইনজীবীরা আইন সংক্রান্ত লেখা

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রেফারেন্স ইত্যাদি আইন কাঠামোর মধ্যে যথাযথ না হলে কোন আইনজীবী হয়তো আদালতে মামলা ঠুকে লেখকের শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা করেই ছাড়বেন। কাজেই এ বিষয়ে ইচ্ছাটা যত সহজ কাজটা ঠিক ততটাই কঠিন। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, বাবার জ্ঞান বুদ্ধি বিচক্ষণতা কোনটাই আমার নেই। উকিল হিসেবেও তেমন যশ-খ্যাতিসম্পন্ন কেউ নই যে বই প্রকাশ হলেই পাঠক তা লুফে নেবে। পত্র পত্রিকাতে লেখালেখিতেও অভ্যস্ত ছিলাম না। সুতরাং ব্যাপারটা ছিল পঙ্গুর গিরি লংঘনের মত দুঃসাধ্য। মনে তবু আশার প্রদীপ নিভু নিভু জ্বলে। লোকমুখে জিয়া বাবার দয়াদানের বহু ঘটনা শুনেছি। তাই তাঁর কাছে দয়া প্রার্থনা করার মনোবাসনা জাগে। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রাম নিবাসী ইউসুফ আলী ফকির নামে এক মস্তান মাইজভাণ্ডার শরিফ উরসের জন্য মাঝে মধ্যে বাসায় এসে চাঁদা নিয়ে যেতো। একদা সেই ফকিরের সঙ্গে বাবাজীর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। মুখে কিছুই বললাম না। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন 'কাজটা তো বড়ই কঠিন' একথা শুনে বিনয় সহকারে জানালাম, আপনার দয়া হলে কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। অধমকে একটুখানি দয়া করুন। আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা'।

বাবাজীর অনুমতি পেয়ে তিন বছর ধরে আইনের বহু বই পাঠ করলাম। অতঃপর আটাত্তর সালে তাঁকে স্মরণ করে লিখতে আরম্ভ করি। রসকসহীন আইনের কঠিন বিষয়গুলো তাঁর অনুগ্রহে এমন সহজ হয়ে গেল যে, আমি নিরবধি লিখেই চলি। এভাবে আটখানা বই রচনা শেষ হয়। আরও ২/৩টা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে ছয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের আইনজীবীদের পেশাগত প্রয়োজনে বইগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। আমার অন্তরের অন্তহীন বিস্ময় তাঁর 'আচ্ছা' শব্দে না জানি কী শক্তি ছিল!

এক. দি টেনেন্সী ল' অব বাংলাদেশ, ভল্যুম-১
দুই. দি টেনেন্সী ল' অব বাংলাদেশ, ভল্যুম-২
তিন. দি ল' অব ভেস্টেড প্রপার্টিজ
চার. দি প্রিন্সিপ্যাল অব হিন্দু ল'
পাঁচ. দি ল্যান্ড ল'জ অব ইস্ট পাকিস্তান

ছয়. দি কেস নোটেড এন্ড কনসুলেটেড দি ইস্টবেঙ্গল স্টেট এক্যুজিশান এন্ড টেনেন্সী এ্যাক্ট্

সাত. দি ল' অব প্রিয়েমশান ইন বাংলাদেশ

আট. এ গাইড টু সিভিল কোর্ট প্রেসটিস এন্ড প্রসিডিউর।

বর্ণক: এডভোকেট মৃদুল কান্তি রক্ষিত, পিতা- স্বর্গীয় এডভোকেট নলিনী বিনোদ রক্ষিত, হাজারী লেন, চট্টগ্রাম।

পানি দিয়ে চলে গাড়ি

দুনিয়াব্যাপী তেলের বিকল্প চিন্তা-ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। সূর্যকিরণকে বন্দী করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। কোন কোন দেশ তেলের সাথে মদ জাতীয় পানি মিশ্রণ করে গাড়ি চালাচ্ছে। তবু কুল পাচ্ছে না। তিয়াত্তর সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর পরাজিত আরব দেশগুলো ওপেক গঠন করে তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় শতকরা চারশ' ভাগ। ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামে। লন্ডভন্ড হয়ে যায় বহু দেশের আর্থিক ভিত; বিশ্বব্যাপী নেমে আসে অর্থনৈতিক মন্দা। তাই তেলের বিকল্প নিয়ে জোর প্রচেষ্টা।

শুনতে আশ্চর্য লাগবে তেল ছাড়া গাড়ি চলে। আমি প্রায় সাড়ে তিন বছর 'হক ভাণ্ডারীর' গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। বিভিন্ন সময় তাঁর নির্দেশে তেল ছাড়া শত শত মাইল গাড়ি চালনা করেছি। ১৯৭৮ সালে একবার পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি থানার ময়ূরখিল কৃষি খামারে যাচ্ছিলাম। মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে ৭ মাইল দূরে বিবিরহাট পেরিয়ে গেলে গাড়ির তেল ফুরিয়ে যায়। তেলের কথা জানালে তিনি বললেন, 'এমনি চলবে, তুমি চালিয়ে যাও'। ইতস্তত: করলে আমাকে মারতে লাগলেন। তেলশূন্য জীপটা চালিয়ে সেখান থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে ধুরুং নদী পার হতে বললেন– 'এখান থেকে পেট্রোল ট্যাংকে পানি ভরে নাও'। আমি নির্দেশ পালন করলাম। সে পানিতেই গাড়ি প্রায় ৩০ মাইল চালালাম। কোন অসুবিধা হয় নাই। তবে কি পানিতে গাড়ি চলার কোন উপাদান আছে? আরেকবার কক্সবাজার যেতে জানালাম ট্যাংকে মাত্র এক গ্যালন তেল আছে, তেল নিতে হবে। তিনি বললেন, 'চালাও'। তখন তিনি জজ্‌বা হালে ছিলেন। ভয়ে ভয়ে স্টার্ট করে চালাতে

লাগলাম। পথিমধ্যে কোন তেল না নিয়ে আসা-যাওয়া ১৪০ মাইল গাড়ি নির্বিঘ্নে চলেছে।

বর্ণক: নাছির আহমদ, পিতা- মৃত কাসেম আলী, সাং- আজিম নগর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম লালদিঘীর গাড়ির স্ট্যান্ড। বহু কারের সমাবেশ। আমার গাড়ি নং প-১৪৯৮। ঊনআশি সালে স্ট্যান্ডে এসে তিনি আমার গাড়িখানা ভাড়া করেন। শহরে কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে মেহেদীবাগে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আনাড়ী সহকারীকে রাঙ্গামাটির দিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেন। সে ভয়ে ভয়ে গাড়ি চালাতে থাকে। অতো দূরে যাওয়ার জন্য গাড়িটা ছিল অনুপযুক্ত। তবু তাঁর নির্দেশের উপর নির্ভর করে সহকারী কোন অসুবিধা ছাড়াই গাড়িটা নিয়ে রাঙ্গামাটি পৌঁছে। যাবার পথে বিভিন্ন পাম্প স্টেশন থেকে মোট চৌদ্দ গ্যালন তেল কিনেন। তিনদিন ধরে প্রায় ৪০০ মাইল গাড়ি চললো। তারপর আরো দুদিন গাড়ি নিয়ে তিনি কক্সবাজার ও বাঁশখালী যান। বাঁশখালীর উকিল আজিজ মিয়ার বাড়িতে তিনি নামলে রেডিয়েটারের পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় পানি দিতে হয়। এরপর গাড়ি আর স্টার্ট হয় না। লোকজন দিয়ে ঠেলে চেষ্টা করা হয়। তবুও চলেনা। ধারনা করা হলো মিস্ত্রি দিয়ে গাড়ি ঠিক করতে হবে। রাত তিন ঘটিকায় তিনি গাড়িতে এসে উঠলেন এবং স্টার্ট দিতে বললেন। তিনবার সেল্‌ফ স্টার্টে চাপ দিয়ে চেষ্টা করতেই গাড়ি চালু হয়ে গেল। সেখান থেকে চট্টগ্রাম শহরে ব্যাটারী গলি তাঁর অস্থায়ী খানকায় ফিরে আসেন। এ পাঁচদিন সর্বমোট সাড়ে পাঁচশো মাইল শুধুমাত্র চৌদ্দ গ্যালন পেট্রোল দিয়ে গাড়ি চলেছে। সেদিন তিনি কোন ভাড়া না দিয়েই বিদায় দেন। পরে গিয়ে দিয়ে আসবেন বলে জানান। তিনদিন পর আমাকে ভাড়া বাবদ চৌদ্দশ টাকা দিয়ে যান। চট্টগ্রামের অনেক ড্রাইভার এ ধরনের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

বর্ণক: কবির আহমদ ড্রাইভার, গাড়ি নং- ১৪৯৮, লালদিঘী কার স্ট্যান্ড, চট্টগ্রাম।

একাশি সালের এক সকালে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী আমাদের বাসায় আসেন। বেড়াবার জন্য তিনি আমাদের প্রাইভেট কারটা চেয়ে নেন। শহরে বিভিন্ন স্থান ঘুরে ড্রাইভারকে কক্সবাজার যেতে বলেন। কালুরঘাটের পুলের কাছাকাছি গেলে ড্রাইভার তেল নিতে অনুরোধ করে। গাড়িতে তখন মাত্র এক গ্যালনের মত

পেট্রোল ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন ‘চালাও’। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে থাকে। কক্সবাজারের কাছাকাছি পৌঁছলে একস্থানে গাড়ি থামাতে বলেন। তিনি নেমে একটা মাযার জিয়ারত করে পুনঃ চট্টগ্রাম শহরের দিকে চালাতে নির্দেশ দেন। শহরে এসে ফৌজদারহাট সমুদ্র সৈকতে যান। সেখান থেকে রেয়াজউদ্দিন বাজার চৈতন্য গলিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় উঠেন। অতঃপর ড্রাইভার খোরশেদকে গাড়িসহ বিদায় দিয়ে আমাদের বাসায় চলে আসতে বলেন। এদিকে ছোট ভাই মর্তুজা এক জরুরী কাজে যেতে গাড়ির জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। বিনা তেলে এত দীর্ঘপথ চলে গাড়িটা বাসার সামনে পৌঁছলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। দেখা গেল ট্যাংকে এক ফোটা তেলও নেই। কোন সে মহাশক্তি গাড়িটাকে এত দীর্ঘপথ চালিয়ে নিলো?

বর্ণক: এস.এম. ফারুক, সভাপতি – চট্টগ্রাম জেলা কৃষক লীগ, গ্রাম- আজিম নগর, থানা- ফটিকছড়ি, বাসা- ইফ্কো কমপ্লেক্স, সিডিএ এভিনিউ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

বিনা পেট্রোলে মামু সাহেবের গাড়ি চালানোর ঘটনায় আমি অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। শুধু একদিনের ঘটনা বলি। **১৯৮১** সালের সেপ্টেম্বর কী অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে বিকেল চারটা সাড়ে চারটার দিকে আমার পিতা ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে মামু সাহেব বেরুলেন। একটু খারাপ ধরনের এই গাড়িটা (ক–৬২৯১১) নিয়েই আমরা বেরিয়েছি। তিনি প্রথমে পশ্চিম দিকে যেতে বলেন। দেওয়ান হাটের কাছে মামু-ভাগিনার মাযারের কাছে এসে ডানদিকে ফিরতে নির্দেশ দেন। ড্রাইভার আবু তাহের ডানদিকে ফিরে সেখানকার পেট্রোল পাম্পে ফিরাতে চাইল। মামু সাহেব সেদিকে ফেরার কারণ জানতে চেয়ে ড্রাইভারের মুখে পেট্রোলের প্রয়োজনের কথা শুনতে পেয়ে ড্রাইভারের সিটের পিছনে সজোরে লাথি মেরে বললেন– ‘গাড়ি কি তেল দিয়ে চলে’? আদেশ দিলেন, ‘চালাও’। অগত্যা ড্রাইভার গাড়ি চালাতে থাকে। পেট্রোলহীন অবস্থায় আমরা সেদিন ফেনী পর্যন্ত ঘুরে বহু রাতে আবার চট্টগ্রাম শহরে ফিরে এসেছিলাম। সম্পূর্ণ পেট্রোলহীন অবস্থায় একই গাড়ি চালিয়ে তিনি আমার আব্বাজানসহ আরেকবার ঢাকা ঘুরে এসেছিলেন। সেবারও গাড়ির ড্রাইভার ছিল আবু তাহের।

বর্ণক: শেখ মতিউর রহমান, পিতা- শেখ বজলুর রহমান, গ্রাম- ধলই, থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমানে- রাজাপুকুর লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আট বছর ধরে আমি মামুজানকে নিয়ে গাড়ি চালাবার সুযোগ পেয়েছি। ঘটনার সংখ্যা আমি হিসাব করে বলতে পারবোনা। শুধু ড্রাইভার হিসেবে এই কথাই জানি ও বলতে পারি, তেল ছাড়াও মামুজানের গাড়ি চলে। তেল থাকলেও ক্ষতি নেই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বহুসময় ট্যাংকে যে তেল নিয়ে বেরিয়েছি; কক্সবাজারের মতো সুদূর দূরত্বে চক্কর দিয়ে এসেও দেখি তেল ততটুকুই রয়ে গেছে। দেখতে দেখতে আমি এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, মোটেই আশ্চর্য মনে হয় না। এসব তাঁর শান্। আমি আরো দেখেছি টাকা। বান্ডিল বান্ডিল টাকা। অনেক টাকা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে থাকে। কিন্তু তেমনি দেখেছি সে টাকার প্রতি তাঁর চরম অনীহা। দেখেছি সেসব টাকা মানুষকে বিলিয়ে দিতে। দেখেছি তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, দিনের পর দিন খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নাই তিনি আছেন তাঁর কাজে।

বর্ণক: ড্রাইভার শামসুল আলম মিয়াজী, পিতা- নুরুচ্ছাপা মিয়াজী, গ্রাম ও পোষ্ট- কোয়েপাড়া, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

তাঁর (শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী) খালাতো বোন নানুপুর নিবাসী সৈয়দা আমাতুল ফেরদৌস বলেন, একবার শহরে যেতে ড্রাইভার তেল লাগবে জানালে দাদা বলেন, 'ভাণ্ডারীর গাড়ি বাতাসে চলে'। সেদিন তেল ছাড়াই গাড়িটি চট্টগ্রাম শহরে যাতায়াত করে। তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর উপরোক্ত ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়ার পর এই সত্য পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রমাণিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে কর্মরত গবেষক বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে, খুবই সহজ ধরনের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে প্লাটিনাম ও টোনিয়াম এই দুই অনুঘটন যোগ করে সূর্যরশ্মির বিকিরণে তাঁরা হাইড্রোজেন উৎপাদন বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। বিশ্বের গবেষকদের প্রাপ্ত সর্বাধিক হারের চেয়ে এটা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশী।

কানাকড়িও দাম নেই

আমরা দু'জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলাম। শ্রেণিকক্ষে, করিডোরে, ক্যাফেটেরিয়া ও চড়াই-উৎরাই জনপথে নিয়মিত দেখা হতো। পাঠ্য বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসে কখন যে পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেছি টেরও করতে পারি নি। এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষায় বন্ধু যে সেকেন্ড ক্লাস পাবে তেমন বিশ্বাস ছিল না। আমারও না। পাসের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় নিয়ে আলাপের এক পর্যায়ে হঠাৎ মনে পড়লে বললাম, চলো, পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাসে বাবাজানের সাহায্য চাই। তিনি দয়া করলে আমাদের মনোবাসনা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। বন্ধু কট্টর বস্তুবাদী কম্যুনিষ্ট, তবু রাজি হলো। একদিন মাইজভাণ্ডার শরিফ এসে বাবাজানের কাছে আবেদন জানাই। মনে হলো তিনি সাড়া দিলেন। বস্তুবাদী বন্ধু খুব বেশী আশ্বস্ত নয়। পরীক্ষা ভালোই দিলাম। প্রখ্যাত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমাদের ভাইভা-মৌখিক পরীক্ষা নিলেন। আমার তেমন অসুবিধা হয় নি। বন্ধু কাব্যচর্চা করে জানাতে বোধহয় একটু বেশী জিজ্ঞাসা করেছেন। পরীক্ষা শেষে হতাশায় বন্ধু কেঁদে ফেলে। কারণ পাসের কোন ভরসা নেই। ফল বের হলে দেখি আমি সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাস, বন্ধু স্টুড ফার্স্ট–একেবারে প্রথম। ফলে আমাদের সে কী আনন্দ!

বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিনের দায়িত্বে ছিল। তাই লেখাপত্রের প্রতি অনুরাগী, পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করতো। লেখার হাতও ছিল ভাল। একদা প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এই অবরুদ্ধ মানচিত্রে'। প্রকাশক আসিফ দিলওয়ার। প্রগতিশীল সাহিত্য সাময়িকী এপিটাফের যুগ্ম সম্পাদক। বইটি সারাদেশে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অধিক বিক্রি কিংবা তুঙ্গ জনপ্রিয়তার জন্য নয়, গণপ্রতিবাদের জন্য। এ বইয়ের একটি লাইন, 'মোল্লা মৌলানার সর্বাঙ্গে পেচ্ছাব করে, আমি স্বর্গে যাব, স্বর্গে যাব'। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মসজিদ মাদ্‌রাসা থেকে মিছিল বের হয়, 'কবি মিনার মনসুরের ফাঁসি চাই' – 'এই অবরুদ্ধ মানচিত্র নিষিদ্ধ কর' ইত্যাদি স্লোগান। বইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আলেম মাওলানা ও বুদ্ধিজীবীরা পত্র পত্রিকায় চিঠিপত্র, বিবৃতি ও আবেদন প্রকাশ করতে থাকে। ফলে সরকার এ বই প্রকাশ প্রচার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে প্রকাশিত

সকল বই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। পুলিশ হন্যে হয়ে কবিকে খুঁজে বেড়ায়। অসহায় কবির সাথে আমার দেখা হলে পূবালী ব্যাংক পাথরঘাটা শাখার তৎকালীন ম্যানেজার কাজী ফরিদ সাহেবের কাছে নিয়ে যাই। তিনি তরুণ কবিকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, আল্লাহ্‌র অলির আশ্রয় নিলে কোন অসুবিধা থাকবে না। চলুন, বাবাজানের স্মরণ নেই। একদা চট্টগ্রাম শহরে দামপাড়া ব্যাটারী গলিতে আসিফ দিলওয়ারসহ কবিকে নিয়ে চাচা ফরিদ সাহেব তাঁর শরণাপন্ন হন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এম.এ. মান্নান সাহেবের শ্যালক মোহাম্মদ মুছা। নিষিদ্ধ ঘোষিত বইয়ের একটি কপি বাবাজানকে উপহার দিতে চাইলে জিজ্ঞাসা করেন, ওটা কি সামাজিক বই? কবিতার বই বলে জানালে বলেন, আমরা কবিতার বই পড়ি না। তবু তাঁর দয়ায় তরুণ কবি পুলিশী হয়রানি কিংবা ধর্মান্ধতার প্রাণঘাতি বিপদ থেকে বেঁচে যায়। সাধকদের কথাই তো কাব্যময়, যেহেতু অপরকে বিশ্রীভাবে আঘাত করে নিজের যশ খ্যাতির জন্য লেখা বইটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যত সুন্দর কবিতাই হোক সামাজিক চহিদা না মিটলে সত্য ও সুন্দরের প্রতীক আল্লাহ্‌র অলির কাছে তার কানাকড়িও দাম নেই।

যশোহরের কলেজ ছাত্র হাফেজুর রহমান জ্ঞান অর্জনে দোয়াপ্রার্থী হলে বলেন, 'জ্ঞানের যে সাধনা মনে উদারতা ও চরিত্রে দৃঢ়তা আনে, সেটাই সঠিক জ্ঞান'।

বর্ণক: অধ্যাপক কাজী ফরিদ উদ্দিন আখতার, পিতা- ডা. কাজী মাহবুব উল আলম, কাজী বাড়ি, গ্রাম- পূর্ব মাইজভাণ্ডার, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

ফলাফল ফার্স্ট ক্লাস

আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র। বাবাজান আমাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হতে নির্দেশ দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বিষয়ে ভর্তি হলাম। পরিবর্তিত বিষয়ে পাঠে মন বসে না। বছর গড়িয়ে যায়। সামনে অনার্স পরীক্ষা, ফার্স্ট ক্লাস অর্জনের আশা ছিল। ঊনিশ্‌শ' একাশি সালের মার্চ-এপ্রিল দুমাস খেটেও তেমন সুবিধাজনক প্রস্তুতি হল না। মনে ভরসা ছিল বাবাজনের কাছে আবেদন করে দোয়া চাইবো; কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য শুনে একেবারে দমে গেলাম। বাস্তবেও তাই হলো ফলাফল সেকেন্ড ক্লাস।

এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষার বহু পূর্বে তিনি ঢাকা আসেন। প্রাক্তন মন্ত্রী শফিউল আযম সাহেবের ছোট ভাই শাহেদুল আজমের মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডের বাসায় উঠেন। সাক্ষাতে জানতে চাইলেন আমরা কোথায় থাকি। জানালাম, আমাদের বাসা ইন্দিরা রোড। বাসার নম্বর ৪৭৮ কিনা জিজ্ঞাসা করলে বললাম, জ্বী না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে আসে না। কারণ বাসার নম্বর সেটা নয়। তাঁকে স্মরণ করে মনে মনে দোয়া চেয়ে প্রস্তুতি আরম্ভ করি। এবারও পরীক্ষা প্রস্তুতি ভাল হল না। ছোটবেলা থেকে ডানপিটে বলে মা-বাবা ও বড় ভাই সবসময় সতর্ক করেন; ভাল পাস করতে হবে। নতুবা জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই। শেষ পরীক্ষায় ভাল পাস করতে না পারলে ব্যর্থতার লজ্জা জীবনভর বইতে হবে। সব মিলে দারুণ হতাশায় ভুগছিলাম। পরীক্ষার প্রবেশপত্র হাতে পেয়ে দেখি রোল নম্বর ৪৭৮। আনন্দে মনটা নেচে উঠলো; এটাই তো বাসার নম্বর কিনা বাবাজান জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হতাশা কেটে গেল। পূর্ণ আস্থা নিয়ে পরীক্ষা দিলাম। ফলাফল ফার্স্ট ক্লাস। এন্ত্রোপলজির উপর একটা বৃত্তি পেয়ে নরওয়েতে ৪ বছর কাজ করে গবেষণার কাজ সাফল্যজনকভাবে শেষ করেছি। বর্তমানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত।

বর্ণক: মনজুরুল মন্নান, পিতা- আবদুল মন্নান, ৪০৭ নং ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। অধ্যাপক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সারা বিশ্বে একমাত্র

দৈনিক আজাদী অফিসের পূর্বদিকে চেরাগী পাহাড়ের দক্ষিণে এশিয়া ওভারসীজ নামে ট্রাভেল এজেন্সীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অংশীদারী কারবার। মূলধন আত্মসাৎ করে একে একে তিন পার্টনারই চলে যায়। এজেন্সীর বিরুদ্ধে সিভিল কোর্টে দুখানা, মার্শাল ল' কোর্টে দু'খানা মামলা। তন্মধ্যে দু'খানা বানোয়াট মিথ্যা মামলা। ফটিকছড়ি থানার হাইদচকিয়া নিবাসী জাহেদুল আলম নামে জনৈক যুবক এনওসি'র জন্য অগ্রিম দেওয়া এক লাখ টাকা নিয়ে সৌদি আরবে উধাও। দেনার দায়ে ব্যবসা গুটিয়ে আসবাবপত্র বাসায় এনে রাখি। এক পাওনাদার টাকার পরিবর্তে চেয়ার, টেবিল, সোফা ইত্যাদি নিয়ে যায়। শুধু মূলধন নয়, মান সম্মান খুইয়ে পথে নেমে গেলাম। বন্ধু বান্ধব সকলে দূরে দূরে। ব্যাটারী গলিতে বার বার গিয়ে বাবাজানের সাথে দেখা করি। বিশেষ করে মার্শাল ল'

কোর্টে মামলার জন্য দয়া প্রার্থনা করি। তিনি ভরসা দিয়ে বলেন, কী হবে! কিছুই হবে না। তবু মনের ভয় কাটে না। চিন্তায় কত রাতে ঘুম আসে না। কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজে। এক শুক্রবার ভাণ্ডারী ভক্ত ছৈয়দ মছিউদ্দৌলার আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইনস্থ দোকানে অনেকক্ষণ বসে থাকি। পরে দৌলা ভাইকে আমার সব কথা বলে পরামর্শ চাইলাম। তিনি বাবাজানকে সব সমস্যা জানিয়ে একটা সমাধান চাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সঙ্গী হতে অনুরোধের জবাবে বলেন, তুমি নিজে গিয়ে নিজের কান্না কাঁদো। সেখান থেকে ব্যাটারী গলিতে ছুটে গিয়ে তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ কাঁদলাম। বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইলেন আমি কি করার মনস্থ করেছি। বিনীতভাবে বললাম, আগেও বিদেশে ছিলাম, অনুমতি দিলে আবার যেতে চাই। অতঃপর অনুমতি পেয়ে চার দিনে নতুন পাসপোর্ট হয়ে যায়। মায়ের মালিকানার তিন কানি জমি নব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় এবং কিছু স্বর্ণ বন্ধক দিয়ে লাখ টাকার মত সংগ্রহ করি। তিরাশি সালের ২০ মার্চ চুয়াত্তর হাজার টাকা টিকেটসহ এনওসির জন্য প্রদান করি। বাকি টাকা বকেয়া বাসা ভাড়া ও অতি জরুরী কিছু কর্জ শোধ করি। এক মাসের মধ্যে ভিসা লাগে, মে মাসের এগার তারিখে ফ্লাইট নির্ধারিত। যাওয়ার পূর্বদিন বাবাজানকে শহরে খুঁজে না পেয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ গেলাম। তিনি সেখানেও নেই। সন্ধ্যার পর পাঠানটুলী আকমল খান সাহেবের বাড়িতে খোঁজ পেলাম। অনেক ডাকাডাকিতেও কেউ দরজা খোলে না। ভেতর থেকে কে একজন বাবাজানের অসুখ বলে জবাব দিলেন। মন ভীষণ উদ্বিগ্ন। বহু চেষ্টা করে ভেতরে ঢুকলাম। তিনি গা টিপে দিতে আদেশ করেন। সুযোগ পেয়ে দোহা যাবার কথা বলে তাঁর মেহেরবাণী প্রার্থনা করলাম। তিনি অনেক কিছু বললেও উচ্চ ভলিয়্যুমে টিভি চালু থাকায় কিছুই বুঝতে পারি নি। বিদায় পেয়ে যখন বেরিয়ে আসলাম মন আমার শান্ত ও আশ্বস্ত। ছোট ভাই শফিউল বশরকে বললাম, মাকে বলবি, আমার কাজ হয়েছে; বাবাজান দয়া করেছেন। মাকেও দোয়া করতে বলবি। নিজ পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ আমার বিদেশ গমনের খবর জানতো না; কোন পাওনাদার যাওয়ার ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটায় এই ভয়ে। আর জানেন দরবারের এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি জনাব সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ এবং সম্পাদক জনাব জামাল আহমদ সিকদার। বিদায় লগ্নে খানবাড়ির গেটের সামনে পেয়ে এ দুজনকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে

কেঁদেছি। রাতের অন্ধকারে চোরের মত দেশ ছেড়ে রাত্রে নিরাপদে দোহা পৌঁছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানলাম শতকরা ৮০% জন বহিরাগত বেকার, কাজ নেই। পাগলের মত হন্যে হয়ে কাজ খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না। মাস চলে যায়। জুনের দশ তারিখ বাসা থেকে বের হয়ে এক বাঙালির ইলেকট্রনিক্সের দোকানে গিয়ে বসলাম। সেখানে হাসান সাদী নামে এক আরবি বৃদ্ধের সাথে পরিচয় হয়। তিনি কোথায় চাকরি করি, কার ভিসা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন। জানালাম চাকুরি নেই বেকার। তাঁর ফার্মে চাকুরি করবো কিনা জানতে চাইলে সম্মতি জানাই। নাম জিজ্ঞাসা করলে খায়রুল বশর উচ্চারণ করতেই বৃদ্ধ ভীষণ রেগে আরবি ভাষায় শয়তান, বদমাইশ ইত্যাদি অনেক কিছু বকলেন। অবশেষে বলেন, সারা বিশ্বে একটি মাত্র খায়রুল বশর, হযরত মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শান্ত হয়ে পরিবর্তন করে আমার নাম দিলেন মোহাম্মদ বশর। পরদিন কাজে যোগ দিলাম। কেরানীর চাকুরি, বেতন কম। কর্জ যে পরিমাণ এই বেতনে তা শোধ করতে বিশ বছরেও কুলাবে না। তাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এক আত্মীয়কে টেলিফোনে বিষয়টা জানালে তিনি চাকুরি করে যেতে বলেন। বাবাজানকে স্মরণ করে চাকুরিতে লেগে থাকি। 'আলহাদী ট্রেডিং এস্টাব্লিশমেন্ট' দোহার নাম করা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৫০০ রকম ভবন নির্মাণ সামগ্রীর চারটি বিরাট স্টোর এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানা। কোম্পানীর ফাইলের পরিমাণ কয়েক আলমিরা। চৌদ্দ জুলাই বোম্বে শহরে ছেলের জন্মদিনের উৎসব। ভারতীয় খৃষ্টান ম্যানেজার তাই ১২ তারিখে ছুটিতে যাচ্ছেন। ৯ জুলাই মালিক ও ম্যানেজার মিলে আমাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। পরিবারের কেউ কখনো চাকুরি করে নি। তাই ভয়ে ভয়ে কাজ বুঝে নিলাম। সে কোম্পানীতে দেড় বছর চাকুরি করে সব কর্জ শোধ করে, মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে বিয়ে শাদী করেছি। আমার বাড়ি গাড়ি সব হয়েছে। বর্তমানে আমি সুখী-সচ্ছল।

বর্ণক: মোহাম্মদ খায়রুল বশর, পিতা- মরহুম হাজী নুর আহমদ সওদাগর, গ্রাম- ঢালকাটা, নানুপুর, থানা- ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

বিলের চেক বাসায় হাজির

ঊনিশ্‌শ' পঁচাত্তর সালের ঘটনা। ৫০,০০০ টাকার বিল পড়েছিল সিএন্ডবি'র আবদুস ছত্তার রোডস্থ অফিসে। সাপ্লাই করেছিলাম এক লাখ ঘনফুট বালি। এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আজিজ এর সাথে টেস্টিং রিপোর্ট নিয়ে কথাকাটাকাটি হওয়ায় বিল দেয় না। একদা চৈত্র মাসের কাঠফাটা রোদে শহর থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফ অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। সঙ্গে কোন টাকা পয়সা ছিলনা, আল্লাহ্ ভরসা করে ছুটলাম। ব্যক্তি জীবনে তখন ভীষণ আর্থিক সংকট। বাসে আমার নিকট ভাড়া চাইল না। নাজিরহাটে নেমে হেঁটেই দরবার শরিফ পৌঁছলাম। আমাকে দেখেই বাবাজান বার বার বলতে লাগলেন, আপনি ঠাণ্ডা খাবেন, না গরম খাবেন? আমি বললাম আপনার মর্জি। তিনি বললেন গরম খান। চা এনে দিলেন। দশ মিনিট বসে চলে যেতে বলেন, অথচ যে জন্য আসলাম তার কিছুই বলতে পারলাম না। রাস্তার মাথায় গিয়ে দেখি আমার পাশের এক ব্যবসায়ী রিক্সাতে বসে আছেন। আমাকে ডাকলেন। আমি ইতস্ততবোধ করি। লোকটা বলেন, ভাড়া আমি হলেও দেবো অথবা আপনি হলেও দেবেন। তার সাথে বিনাখরচে বাসায় পৌঁছি। পরদিন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মনসুর আহমদ বাসায় টেলিফোন করে জানালেন আজিজ সাহেব খুলনা বদলী হয়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি এসে তাকে ধরে টাকা পয়সা কিছু দিয়ে বিলটা নিয়ে যান। জানালাম, আমার তো টাকা পয়সা নেই। তিনি ৫,০০০/- টাকা হাওলাত দিলেন। টাকাগুলো নিয়ে আজিজ সাহেবের সাথে দেখা করলে তিনি রেগে বললেন দশ হাজার টাকা দিলেও বিল দেবো না। পরদিন স্টীমারে তিনি সপরিবারে চলে যাচ্ছেন। ছেলে মেয়েসহ স্ত্রী স্টীমার ঘাটে চলে যান। তিনি বিদায় সম্বর্ধনা শেষে একটা পিক আপ গাড়ি করে স্টীমার ঘাটে যেতে সদরঘাট লায়ন সিনেমার একটু দক্ষিণে গাড়িটা এক্সিডেন্ট হয়। সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তথায় তিনি মারা যান। ক'দিন পর মনসুর আহমদ সস্ত্রীক আমার বাসায় এসে হাজির। তিনি বললেন, তোমাকে অনেক খুঁজে না পেয়ে নিজেই চলে আসলাম। আজিজ সাহেবের মৃত্যুতে উভয় কাজের দায়িত্ব হাতে আসায় বিলের চেক নিয়ে এলাম, আমি হতভম্ব। পাঠ্যাবস্থায় তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। প্রথম এসেছেন এজন্য ৩০০০ টাকা তাঁর স্ত্রীকে দিলাম। মনসুর সাহেব সেগুলো আমার ছেলেদের ফেরত দিলেন। **(ক)**

আয়ের ছবি তোলে ক্যামেরা

১৯৮১ সাল। ঘরে বিয়ের যোগ্য দু'মেয়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে। কোন্‌খানে সম্বন্ধ করলে ভাল হবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তাই সঠিক সিদ্ধান্তের আশায় চট্টগ্রাম শহরে দামপাড়া ব্যাটারী গলিস্থ অস্থায়ী আস্তানায় বাবাজানের সাথে দেখা করি। তিনি নিউমার্কেট হতে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দামের একটা কোডাক ক্যামেরা এবং হংকং এর তৈরি ১২ ব্যাটারীর একটা এভারেডি টর্চলাইট কিনে দিতে তিন বার আদেশ করেন। বহু দোকানে খোঁজ করেও সে দামের কোন ক্যামেরা পেলাম না। দোকানে ১২ ব্যাটারীর টর্চের কথা জিজ্ঞাসা করলে আমাকে পাগল বলে ঠাট্টা করে। ৮ ব্যাটারীর উপরে নাকি কোন টর্চলাইট হয়না। দুইটার কোনটাই না পেয়ে হতাশ মনে পুনঃ তাঁর নিকট ফিরি। রাত তখন প্রায় ১১টা। আমাকে দেখেই বলে উঠেন, আসুন! আসুন! বাসায় সবাই ভালো আছে কি? আদর করে চা-নাস্তা খাইয়ে বিদায় দিলেন। মেয়ের বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগ পেলাম না। তাই ক্ষুণ্ন মনে ফিরছিলাম। গেটের কাছে লাল পাগড়ী মাথায় এক ফকিরের সাথে দেখা। কী জন্য এসেছি ফকির জানতে চাইলেন। বিরক্তির সাথে বললাম আপনাকে বলে কী হবে? তবু লোকটা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। কোন উত্তর না দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। লোকটা আমার পিছু নেয়। আলমাস সিনেমা হলের উত্তরে আনন্দ ফার্নিচার এর নিকটে পৌঁছলে নাছোড়বান্দা লোকটাকে ঘটনা বলতেই হলো। তিনি বললেন, কী করতে হবে আপনাকে তো বলে দিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম সে কেমন? মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব কোনখান থেকে এসেছে ফকির জানতে চাইলে উত্তর দিলাম নিউ মার্কেটের ডায়মন্ড রেস্টুরেন্টের মালিক নাসির আহমদ এর জন্য বড় মেয়ে মমতাজ হাসিনার প্রস্তাব দিয়েছে। মেজ মেয়ে হাসিনা আখতারের প্রস্তাব পাঠিয়েছে নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া চৌধুরী বাড়ির আমান চৌধুরীর জন্য। ছেলেটা বাংলাদেশ সরকারের ম্যানপাওয়ার (জনশক্তি) মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকুরি করে। ফকির সাহেব বাবাজানের বাক্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ক্যামেরা যেমন একস্থান থেকে নানারকম ছবি তোলে তদ্রুপ এক জায়গায় বসে রোজগার করা অর্থাৎ রেস্টুরেন্টের ব্যবসা। টর্চলাইট অন্ধকারে আলো জ্বেলে পথ দেখায় অনুরূপ ম্যানপাওয়ার বিভাগও বেকারত্বের অন্ধকার হতে মানুষকে জীবিকার সন্ধান দেয়। সমাধান পেয়ে খুশি মনে বাসায় ফিরলাম।

পরদিন প্রথম পক্ষকে খবর দিলাম। বাবাজানের অনুমতি পাওয়া গেছে, আত্মীয়তা হতে পারবে। সেদিন সন্ধ্যায় হযরত আমানত শাহের (রহ.) মাযারে আক্‌দ সম্পন্ন হয়। তারপর দিন ঢাকা থেকে ছেলেকে নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষও এসে হাজির। ফিরিঙ্গি বাজার আমার বাসায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে বাবাজানের দয়ায় কোন প্রকার যৌতুক দেওয়া কিংবা আপ্যায়নের বিপুল খরচের দায় থেকে বেঁচে গেলাম। **(খ)**

বর্ণক: (ক ও খ) কাজী করিমুল হুদা, পিতা- আলহাজ্ব কাজী মোবারক হোসেন, কাজী বাড়ি, গ্রাম- মোমিনপুর, জেলা- নোয়খালী, বর্তমান ঠিকানা- ৬৭৭ নং অভয়মিত্র ঘাট রোড, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম।

আমেরিকা মহাশক্তি নয়

আমাদের প্রিয় এই পৃথিবী হাজার কোটি বছরের সাজানো সুন্দর সমাজ সভ্যতা-সংস্কৃতি। সকল ভূমি সন্তান, প্রায় প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা এই ভূমণ্ডলের শান্তি সৌহার্দ সমৃদ্ধি। এই অর্জনের সংগ্রামে বিশ্ব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। এক ভাগে অবাধ পুঁজিবাদী বহুদলীয় গণতন্ত্র অন্য ভাগে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির একদলীয় গণতন্ত্র বা কম্যুনিজম। প্রথম ভাগের নেতৃত্বে বৃহত্তম পরাশক্তি আমেরিকা, অপর পক্ষের নেতৃত্বে অপর পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া। প্রতিটি পরাশক্তি চায় গোটা বিশ্বসমাজ যেন তাদের নীতি গ্রহণ করে একরৈখিক হয়ে যায়। এজন্য প্রত্যেকে প্রচার প্রপাগান্ডা কুটনীতি 'সমরনীতি' বাণিজ্যনীতি অর্থনীতি সহ সকল নীতিকে কাজে লাগায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাই যুদ্ধ সংঘর্ষের আশঙ্কা সর্বদা বিদ্যমান। গোটা মানব সম্প্রদায় শঙ্কিত কখন যুদ্ধ বাঁধে বিপন্ন হয় এই শান্তি। এটাই স্নায়ু যুদ্ধ। যুদ্ধ না থাকলেও অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছেই, এজন্য মানুষের স্নায়ুর উপর ভয়ের চাপ। ফলে একদিকে অপব্যবহার হচ্ছে মানুষের প্রতিভা, অন্যদিকে বাড়ছে স্নায়ুযুদ্ধের পরিধি, বিপর্যস্ত হয়ে চলেছে মানুষের বিপুল সৃজনী শক্তি। এই নিঃশব্দ ধ্বংস হতে বিশ্ব মানব সম্প্রদায়কে বাঁচাতে তো হবেই। সম্ভাব্য কম্যুনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধে আমেরিকা তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এমনিভাবে সাজিয়েছে যার সাথে দুনিয়ার অন্য কোন দেশের তুলনাই চলে না। সর্বাধুনিক মডেলের যুদ্ধ জাহাজ, ডুবো জাহাজ, বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক, বিমান বিধ্বংসী কামান, রকেট ক্ষেপণাস্ত্র এবং পরমাণু বোমা

ইত্যাদি অসংখ্য রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, রাষ্ট্রপতি ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা। তদুপরি তাদের রয়েছে সর্বাধুনিক উদ্‌জান বোমা। যে বোমা গাছপালা দালানকোঠা কোন কিছুই ধ্বংস করবে না, শ্বাস গ্রহণে মানুষ বায়ু হতে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে এই বোমা শুধু তা-ই নষ্ট করবে। তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি অসংখ্য মানুষ। হায়রে মানুষ! তোমার চেয়ে ইট রড সিমেন্টও কত মূল্যবান। অথচ তুমি নাকি খোদ্ খোদার প্রতিনিধি। আমেরিকার হাতে এতো আণবিক বোমা মজুদ রয়েছে যে, গোটা দুনিয়াটা ধ্বংস করতে ক'টি মাত্র ব্যবহারই যথেষ্ট। বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা এতে এক নিমিষেই নারকীয় বীভৎস রূপ ধারণ করবে। মিত্রশক্তির পক্ষে আমেরিকাই গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নাগাসাকি হিরোশিমায় প্রথমবার আণবিক বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ লোক মেরেছে। অবিরত চলছে সে প্রচেষ্টা। মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ অতঃপর আকাশে তারকা যুদ্ধের জন্য মারণাস্ত্র তৈরির গবেষণাও করছে। এ বিপুল শক্তির হর্তাকর্তা বিধাতা সে দেশের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান।

২৩ মার্চ ১৯৮১ খৃঃ। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সেদিন চট্টগ্রাম শহরে আমার শ্বশুরের চৈতন্য গলিস্থ বাসায় ছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আমার দিকে চেয়ে জজ্‌বা হালে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট রিগানের পেট আমি ফেটে ফেলবো। সে কি আমাকে চেনে'?

সপ্তাহের মধ্যে ঘটে গেল এক তোলপাড় কাণ্ড। ৩০ মার্চ জন হিংকলে নামক ৩০ বছরের এক যুবক প্রেসিডেন্ট রিগানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। পর পর নিক্ষিপ্ত রিভলবারের বারটি গুলিতে তিনি পেটে আঘাত পান। সেই সাথে আরো ২ জন আহত হন। অভিনেত্রী জুডি ফস্টারের কৃপালাভের জন্য হিংকলে এ কাণ্ড করে বলে প্রকাশ। হাসপাতালে পেট অপারেশন করে গুলিগুলো বের করা হলে কয়েকদিনে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন।

বিশ্ব জুড়ে সি.আই.এ.-এর যত গুপ্ত চৌকি, দেশের অসংখ্য সেনারক্ষী এবং প্রেসিডেন্টের বিশেষ রক্ষাব্যূহ মিলে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা পরাশক্তির নিয়ন্ত্রক রিগানকে নিক্ষিপ্ত গুলি থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু তিনি মরেন নি। শাহানশাহ্‌র বাক্য মত শুধু পেট ফেটেছে (অপারেশন)। '৮৫ সালের ১৩ জুলাই আর একবার রিগানের পেট ফাটতে (অপারেশন) হয়। না, এবার কোন গুলিগোলার

ব্যাপার নয়। রোগের জন্যই বেথলদা মেডিকেল সেন্টারে ডাক্তারেরা টিউমারসহ তাঁর বৃহৎ অন্ত্রের অনেকখানি অংশ কেটে ফেলেন। টিউমারের অভ্যন্তরে টিস্যুর বায়োপসি রিপোর্টে ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। ইরান সরকার কর্তৃক মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের জিম্মি করে রাখা আমেরিকার জন্য দারুন লজ্জাজনক ঘটনা ছিল। যদিও জিম্মি হিসেবে আটকিয়ে রাখা কূটনৈতিক রীতি ও আইন বিরুদ্ধ। তবে খোমেনী সরকারের সাফ জবাব, বিতাড়িত রেজাশাহ্ ও তৎ গোষ্ঠী কর্তৃক ইরান হতে আমেরিকার ব্যাংকসমূহে পাচারকৃত হাজার হাজার কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি ইরানের বৈধ সরকারকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। এ দাবী না মেনে রাতের অন্ধকারে উদ্ধারকারী মার্কিন বিমান বহর জিম্মিদের তুলে নিতে এসে নিজেরাও জিম্মি হয়ে মরু বালিতে আটকে যায়। এই চোরাবৃত্তির জন্য সারা বিশ্বে প্রথমে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও পরবর্তীতে রিগান প্রশাসন চরমভাবে ধিকৃত হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে গোপনে আপস করতে হয়। ইরানীদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রের বিনিময়ে জিম্মিরা ছাড়া পায়। অস্ত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থে নিকারাগুয়ার সরকার বিরোধী কন্ট্রা বিদ্রোহীদের গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও সাহায্য পাঠানো হয়। সংবাদপত্রে এ খবর ফাঁস হয়ে পড়লে রিগান প্রশাসনের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে কঠোর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে রিগানকে ভুল স্বীকার করে বলতে হয়, ‘ইরানে গোপনে অস্ত্র চুক্তি করে আমি ভুল করেছি’ তবু শেষ রক্ষা হয় না। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বই আকারে প্রকাশিত হয়। এটাই সে দেশে বছরের সর্বাধিক বিক্রীত বই। এটাকে কয়েক বছর আগের ওয়াটারগেট কেলেংকারীর সাথে তুলনা করা হয়। ওয়াটারগেট কেলেংকারীতে নির্বাচনে প্রতিপক্ষের স্ট্যাটেজি (কৌশল) আড়ি পেতে গোপনে জেনে নিজের নির্বাচনী বিজয়ের সকল দায় দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। অস্ত্র বিক্রির এ ঘটনায়ও প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানকে পড়তে হয় চরম রাজনৈতিক সংকটে। তাঁর গদি বাঁচলেও পদত্যাগ করতে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান অলিভার নর্থকে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রিগানের ক্ষমতার দর্পচূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ ক্ষমতার দাম্ভিক পেট ফেটেছে।

দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী ইরান-ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা ও তৎ মিত্রশক্তি ছিল ইরাকের পক্ষে। ইরাক হতে ক্রয় করা বিভিন্ন দেশের তৈলবাহী জাহাজগুলো ইরানের সামরিক টার্গেট বলে ঘোষিত হলে আমেরিকা তার বিরাট নৌবহর নিয়ে ইরাকের পক্ষে এগিয়ে যায়। আমেরিকান নৌবহরের ছত্রছায়ায় কুয়েতী পতাকাবাহী জাহাজে ইরাক তার তেল সরবরাহের চেষ্টা করলে ইরানী বোমারু বিমানগুলো বোমা ফেলে জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেয়। এই আক্রমণকে রিগান প্রশাসন আমেরিকার বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করে। অতঃপর আমেরিকার বিমান বহর সমুদ্র বুকে ইরানের দুটি তৈল ক্ষেত্র উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় সারা বিশ্বে যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শেয়ার বাজার ও ডলারের মূল্যে ধস নামে।
বিশ্বের সেরা শেয়ার মার্কেট নিউ ইয়র্কের ওয়ালস্ট্রীটের শেয়ার বাজার। দুনিয়ার পুঁজির লেনদেনের মূল সংযোগ এখানেই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বড় বড় ধনীক বণিকের স্বার্থ এখানে জড়িত। বহুজাতিক বড় বড় কোম্পানীর তেজী শেয়ার এখানে নিত্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। ৪ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে এই শেয়ার বাজারে হুড়োহুড়ি করে অধিকাংশ শেয়ার মালিক নিজ নিজ শেয়ার বিক্রি করতে চাইলে শেয়ারের দামে ধস নামে। অকল্পনীয়ভাবে বিশ্ব বাজারে আমেরিকান ডলারের দামও দ্রুত হ্রাস পায়। অপরদিকে ইয়েনের বাজার তেজী হয়ে উঠে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের মহামন্দার পর এরকম অবস্থা আর কখনও হয় নি। অর্থনীতির সকল নিয়মনীতি পরাভূত। কোন আক্রমণ ছাড়াই নিজ সৃষ্ট অবস্থার শিকার হয়ে আমেরিকার তেজী অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। এশিয়া ইউরোপের দেশে দেশে আতঙ্কময় এই প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে যায়। সবখানে ডলার চরম মার খেতে থাকে। নিরুপায় রিগান প্রশাসন তার আগ্রাসী হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এটাকেই বলা হয় 'আল্লার মাইর'।
পর পর দুবার আগ্রাসী নীতি মার খেলে প্রেসিডেন্ট রিগান সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভের অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি প্রস্তাবে রাজী হন। যার ফলশ্রুতিতে ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭ উভয় প্রেসিডেন্ট স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূলে সম্মত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ জাতিসংঘ চত্বরে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভ বিশ্ববাসীকে এক ঐতিহাসিক ঘোষণায় নতুন আশাপ্রদ সংবাদ জানিয়ে বলেন, আগামী দু'বছরের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দশ শতাংশ হ্রাস করবেন। অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ

সোভিয়েত সেনা কমে যাবে। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে "একটা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠারও আহ্বান জানান।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘে ক্রুশ্চেভের জুতো পেটানো ঘটনার পর আর কোন সোভিয়েত নেতা নিউইয়র্ক যান নি এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাও করেন নি। মিখাইল গরবাচেভের বক্তৃতা শ্রোতা-দর্শকদের যেমন বিস্মিত করে তেমনি উৎসাহিত বোধ করে জোর করতালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের ঘোষণাটা নজিরবিহীন। এছাড়া মিখাইল গরবাচেভের পূর্বে আর কোন সোভিয়েত নেতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সহযোগিতার জন্য এভাবে এগিয়ে আসেন নি।

জাতিসংঘে ভাষণদানের পর মধ্যাহ্ন ভোজনের অবসরে সোভিয়েত নেতার সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিগানের সাক্ষাৎ হয়। তিনি গর্বাচেভের ঘোষণাকে 'সৌহার্দ পরিবেশে' অনুমোদন করেন। ইউরোপ মহাদেশ সম্পর্কে মি. গর্বাচেভ যে কল্পনার কথা বলেছেন তার প্রতি ইউরোপিয়ান নেতারা ইতিবাচক সাড়া দিলেন। তাঁদের আশা এই মহাদেশটা আগামী দিনে আর দুটো সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে থাকবেনা। গর্বাচেভের পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবস্থিত সোভিয়েত ঘাঁটিতে অবস্থানরত পাঁচ ডিভিশন সোভিয়েত সেনাসহ পাঁচ হাজার ট্যাংক প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক ঘাঁটিগুলো থেকেও আরো পাঁচ হাজার ট্যাংক প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। আটশ' কমব্যাট এয়ারক্রাফ্‌ট এবং সাড়ে আট হাজার সাঁজোয়া ব্যবস্থাও কমিয়ে ফেলা হবে। সর্বমোট ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া শক্তির এক-চতুর্থাংশ হ্রাস করা হবে।
অ্যাসল্ট এবং ল্যান্ডিং ফোর্সের সংখ্যাও কমানো হবে। এদের মাঝে নদী-সাগর পারাপারের কাজে নিয়োজিত বিশেষ ইউনিটগুলোও থাকছে। গর্বাচেভের এই ঘোষণার মাধ্যমে সোভিয়েত সমর পরিকল্পনায় মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। এতোদিন পর্যন্ত তা আক্রমণাত্মকভাবে প্রণীত হত। আর তার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ন্যাটো জোটের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ সোভিয়েত সমাজে গণতন্ত্রের পথে 'পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত' নামে যে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন তার তীব্র স্রোতে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে। চুয়াত্তর বছর পূর্বে রশিয়ায় যে সাম্যবাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সার্বিক পতন

হয়। সাম্যবাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল আর ব্যর্থ এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর চিরবিদায় গ্রহণ করে। রাশিয়ার জনগণকে দীর্ঘদিন যাবৎ অলস ও অনুগত জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তারাই এবার জেগে উঠে সাম্যবাদকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির একদল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তিনদিন স্থায়ী একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে আনুগত্য ফিরিয়ে আনা। তাঁদের ধারণা সোভিয়েত সমাজ ক্রমবর্ধমান হারে গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এতে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তাঁদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার পর সেই সমাজ সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত ও রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব আর থাকলো না।

দেশটার এই পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যায়। ব্যর্থ কম্যুনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচেভ পদত্যাগ করে দলটাকে বিলুপ্ত করে দেয়ার আহ্বান জানান। কেজিবি তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে বোরিস ইয়েলেৎসিনের নাটকীয় উত্থান সোভিয়েত ইউনিয়নের মৃত্যু ঘোষণা করে। বোরিস ইয়েলেৎসিনের বিরোচিত বিরোধিতা জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে, যা শেষপর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র ইয়েলেৎসিনের জয় জয়কার ঘোষণা করা হয়। একই পথ ধরে পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে কম্যুনিস্ট শাসনের দ্রুত পতন ঘটে। সরে যায় জগদ্দল পাথররূপী একদলীয় অপশাসন। অবসান হয় স্নায়ুযুদ্ধের। শঙ্কামুক্ত হয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর একটিমাত্র বাক্য বদলে দেয় বিশ্ব ইতিহাসের গতিধারা। 'আমার একটা প্রশাসন আছে যেখান থেকে এ বিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত'। 'আমার দরবার আন্তর্জাতিক সামরিক আইন প্রশাসক অফিস, আমি ভেঙ্গেচুরে সব ঠিক করি'। এই বাণীগুলো সত্য প্রভায় উদ্ভাসিত ও প্রমাণিত।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকাই একমাত্র পরাশক্তি বা মহাশক্তি বলে গণ্য হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সৈন্য ও আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে সাজানো নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমেরিকা তার শ্রেষ্ঠ সন্তান যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং ও কৃষ্ণাঙ্গ নেতা বিশপ রেভারেন্ড ট্রোডুকে ঘাতকের বুলেট থেকে

রক্ষা করতে পারে নি। ২০০০ সালের ২০ মার্চ একদিনের সফরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশে এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও সৌদি সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনের ভয়ে তিনি সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধ ও জয়পুরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প পরিদর্শন কর্মসূচী বাতিল করেন। তাহলে কোন্ যুক্তিতে আমেরিকাকে মহাশক্তি বলা চলে?

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগণের ভোট বেশী পায় সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আলগোর; অপরদিকে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি ভোট বেশী পায় অপর প্রার্থী জর্জ ডব্লিউ বুশ। ফলে নির্বাচনী ফলাফল আদালতে উঠে। রাজ্য হাই কোর্টে জর্জ ডব্লিউ বুশকে নির্বাচিত ঘোষণা করে চূড়ান্ত রায় দিলে বিবাদ মিটলেও জনগণের ভোটের অধিকার ক্ষুণ্ন এবং বিশ্ববাসীর চোখে আমেরিকার নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। একুশ শতকের জানুয়ারিতে জর্জ ডব্লিউ বুশ ক্ষমতা গ্রহণ করেই বিগত প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সূচিত মানবাধিকার বাস্তবায়ন নীতি ত্যাগ করে যুদ্ধ রাজনীতি গ্রহণ করেছেন। রিগান আমলে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে সম্পাদিত ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল চুক্তিটি বাতিল করে স্থগিত তারকা যুদ্ধের প্রস্তুতি পুনঃ চালু করা হয়েছে। কিয়েতা প্রটোকল হতে সরে এসে গ্রীন হাউস গ্যাস তথা বিশ্ব বিপর্যয়ে ভূমিকা রাখা, মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনকে কোণঠাসা করে ইসরাইলকে সন্ত্রাসী ভূমিকায় দাঁড় করানো, অতীতের পুরানো ইউরোপিয়ান বন্ধু দেশগুলোকে অবজ্ঞা, তাইওয়ানকে মিসাইল বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য পাল্টে দিচ্ছে। আমেরিকার গোয়েন্দা বিমানের সাথে ধাক্কা লেগে চীনের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বিমান ধ্বংস হলে আমেরিকান বিমান জব্দ করে চীন যেন তার উঠতি শৌর্যবীর্য জানান দিল। জব্দ করা বিমানটি কেটে খণ্ড খণ্ড করে নিজ দেশে ফেরত নেওয়া যেন আমেরিকা পরাশক্তির ধ্বংসের প্রতীকী সূচনা শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর পেট ফাঁড়া কার্যক্রম।

বর্ণক: আবদুর রহমান, পিতা- আজিজ মোহাম্মদ, ধর্মপুর, কুমিল্লা শহর। বর্তমানে চৈতন্যগলি, রেয়াজউদ্দিন বাজার, চট্টগ্রাম।

না চেয়ে আশাতীত পাওয়া

১. দীর্ঘ ছুটিতে আছি। অবসর নেয়ার পূর্বে চাকুরিজীবিরা যে ছুটি পেয়ে থাকে। বয়স ৫৭ বছর হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকুরির মেয়াদ শেষ। এমনি সময় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী আমার পোর্ট কলোনীস্থ বাসভবনে আগমন করেন। তাঁকে বললাম, 'চাকুরির মেয়াদ শেষ। তাই এক মাসের মধ্যে এ বাসা ছাড়তে হবে। পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে যাবো'। তিনি উত্তরে বলেন, চাকুরি আবার হবে। আমি বললাম, 'অনেক চেষ্টা করেছি, বন্দর কর্তৃপক্ষ আমার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন'। তিনি জালালী হালে বলেন, 'কোথাকার বোর্ড পোর্ট? চাকুরি করতেই হবে'। কথা বলতে উদ্যত দেখে স্ত্রী আমাকে বারণ করেন। আমার সহধর্মিণী শাহ্জাদা সৈয়দ আবুল বশর মাইজভাণ্ডারীর কন্যা। পরদিন বন্দর অফিসে যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম ডক লেবার শ্রমিক ইউনিয়নের ভাইস চেয়ারম্যান মেজবাহ উদ্দীন খানের সাথে দেখা। তিনি বলেন, 'আমরা ডক লেবার হাসপাতাল করছি। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন। আপনি যোগদান করুন;'। আমি চার হাজার টাকা মাসিক বেতন দাবী করলাম। কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজী। অতটা আশা করি নি। শাহানশাহ্ মেহেরবাণীতে অসম্ভব যেন সম্ভব হয়। আমি ডক লেবার হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার মনোনীত হলাম।

বর্ণক: ডা. নুর খায়ের, এমবিবিএস, চীফ মেডিকেল অফিসার, ডক লেবার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

২। চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক প্রশাসন জনাব মো. গোলাম রসূল বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও ছাড় দেওয়া বর্ধিত বেতন বন্দর চেয়ারম্যান আটকে দিলে প্রধান অর্থ ও হিসাব কর্মকর্তা এ.এম.এম. শাহাদত হোসেন প্রতিকারের আশায় আমাকে নিয়ে শাহানশাহ্ বাবাজানের সাথে দেখা করেন। আবেদন শুনে প্রার্থিত বিষয়ে কিছু না বলে শাহাদত সাহেবকে মেম্বার ফাইন্যান্স বলে মন্তব্য করেন। যে ব্যক্তি চেয়ারম্যানের বিরোধিতার জন্য বেতন ভাতাই পাচ্ছেন না তার কাছে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব বা হেঁয়ালি বলে মনে হল। ফলে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে যান। এ'টি আশির দশকের মধ্যখানের ঘটনা। পরে দেখা গেল তিনি বর্ধিত বেতন তো পেয়েছেনই এবং প্রমোশন পেয়ে 'মেম্বার

ফাইন্যান্স' পদ লাভ করেন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি বন্দরের সর্বোচ্চ পদ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সূত্র: চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত খোশরোজ শরিফের আলোচনা সভা ২০-১২-২০০৩।

শোকজ দাতাই ট্রান্সফার

একবার বাসা থেকে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেন। গাড়িতে আরো তিনজন লোক ছিল। কয়েক জায়গা ঘুরে ড্রাইভারকে কক্সবাজার যেতে নির্দেশ করেন। কক্সবাজার ও টেকনাফে ৮ দিন কাটিয়ে সাতকানিয়া পোঁছলে ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন, বাঁশখালী চালাও। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসায় ফিরতে ইচ্ছুক হলেও ভয়ে চুপ থাকি। সেখানে ৫ দিন থাকেন। এককালের জমিদার চৌধুরী ওয়াজেদ আলী সাহেবের বাড়ি, সে বাড়ির অনতিদূরে একটা কবরস্থান। সেখানে কোন বুজুর্গের মাযার আছে। গভীর রাতে তিনি তথায় গিয়ে অনেক্ষণ পর ফিরে আসেন। আমরা কেউ বাসায় ফিরবার কথা আবেদন করলে উত্তর দেন, এখানে এমনি আসি নি; কাজে এসেছি। মোট ১৩ দিন পর বাসায় ফিরে আসি। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান বিনা অনুমতিতে স্থান ত্যাগ করায় আমার বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ দিয়েছেন। একদিন পর খুব ভোরে পুনঃ বাসার গেটে গাড়িতে একটানা হরণ বাজালে বুঝতে পারলাম তিনি এসেছেন। সাদর অভ্যর্থনায় ঘরে নিয়ে আসি। চা-নাস্তা খাওয়ার পর আমাকে বলেন, চলুন মামা, আপনাকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে যাব। আমি জানালাম, আপনি তো সারা জগতের শাহানশাহ্, আপনার সাথে তের দিন ডিউটি করলাম, অথচ পোর্ট ট্রাস্ট চেয়ারম্যান আমাকে শোকজ নোটিশ ইস্যু করেছেন। তিনি চেয়ারম্যানের নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি নাম বলে বাড়ির ঠিকানা দিলে বলেন, অত দরকার নেই নাম হলেই চলবে। একটু জজ্‌বা হালে তিনি পুনরায় বলেন, চেয়ারম্যানকে ট্রান্সফার (বদলী) করলাম'।

এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান মঈদুল ইসলাম সাহেব মংলা বন্দরে বদলী হয়ে যান।

বর্ণক: ইঞ্জিনিয়ার আলী নবি চৌধুরী, মোটর যান বিভাগ, চট্টগাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

নেশা ছাড় সুস্থ হও

চট্টগ্রাম বন্দরের ক'জন অফিসার ও নিরাপত্তা বিভাগের আবদুল মান্নানসহ একবার আমরা মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহানশাহ্ বাবাজানের সাক্ষাতে যাই। এক অফিসার বিয়ার পান করে আমাদের সঙ্গী হতে চাইলে নিষেধ করি। অফিসারটির মন্তব্য বিয়ার তো মদ নয় হালকা পানীয়; তাছাড়া হুজুর কি এতদূর হতে দেখছেন? বাধা না মেনে সঙ্গে গেলে ১০০ গজ দূর হতে বাবাজান ঐ লোককে মদখোর বলে তাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এটা দরবার, এখানে মদখোরের প্রবেশ নিষেধ'। অতঃপর লোকটি মদপান ছেড়ে দেয়।

বর্ণক: মো. গোলাম রসুল, পরিচালক প্রশাসন, চট্টগ্রাম বন্দর।

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগ সভাপতি ও সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এম.এ. মান্নান এক বক্তব্যে বলেন, একবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুসহ ব্যাটারী গলির আস্তানায় বাবাজানের সাথে দেখা করি। বন্ধুর মদপানের কুঅভ্যাস ছিল, বন্ধুকে লক্ষ্য করে বাবাজান বলে উঠেন, 'আবার মদ খেলে আমি জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলব'। সম্ভবত: আগে কখনও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। সেদিন হতে নিত্য নেশাখোর বন্ধুটি মদপান ছেড়ে দেন।

সূত্র: চট্টগ্রাম মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত খোশরোজ শরিফের আলোচনা সভা, ২০-১২-২০০৩।

চট্টগ্রাম বন্দরের এক কর্মকর্তা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার এক শাখা দরবারের মুরিদ ছিলেন। লোকটির মদপানের কুঅভ্যাস ছিল। বন্দরে যাওয়া আসা অবস্থানের সুযোগে ঘনিষ্ঠ হলে বাবাজান তাকে মদপান ছেড়ে দিতে নির্দেশ করেন। ফলে সে লোক মদপান ছেড়ে দেয়। কিন্তু একদা বন্ধুদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে চট্টগ্রাম ক্লাবে মদপান করে দক্ষিণে রাস্তায় ট্যাক্সির জন্য দাঁড়ালে শাহানশাহ্ বাবাজানের গাড়ি এসে সেখানে উপস্থিত। বাবাজান ডাকলেন, মামু সাহেব গাড়িতে উঠেন। লোকটি ইতঃস্তত করলে বলেন, কী হবে, ছেলে না হয় একটু পান করেছে আর কী? অনুনয় বিনয় করে বিদায় চাইলেও নাছোড়বান্দা। অবশেষে গাড়িতে উঠতেই হল। গাড়ি সোজা দরবার শরিফ। অত:পর বাবাজান লোকটিকে গ্লাসের পর গ্লাস পানি খাওয়াতে লাগলেন। শেষে পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা। লোকটি বলে, আর যে পারি না বাবা, দয়া করে ক্ষমা করুন। ওয়াদা

নিলেন আর কখনো মদপান করবেন না। আরেকবার বন্ধুরা জোর করে মদের বোতল সামনে নিয়ে এলে দেখেন বোতলে বাবাজানের ছবি। সাপ দেখার মতো পিছিয়ে আসেন। সেই থেকে চিরতরে মদ ছাড়েন। **(ক)**

সরকারের এক পদস্থ কর্মকর্তার হেরোইন সেবনের বদঅভ্যাস ছিল। লোকটি রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বহুল পরিচিত এই ব্যক্তি একসময় মাইজভাণ্ডার শরিফের ভক্ত হয়ে যান। কিন্তু হেরোইনের নেশা ছাড়তে পারেন না। নিজে নিজে তওবা করে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠিক থাকতে পারেন না। এক রাতে স্বপ্নে শাহানশাহ্ বাবাজান বলেন, নেশা ছেড়ে সুস্থ হয়ে যান। অতঃপর আপনা আপনি নেশাটি ছেড়ে যায়। এভাবে কত নেশাখোরকে নেশা ছাড়িয়েছেন তা কেবল তিনিই ভাল জানেন। মানহানির কারণে নাম উল্লেখ করা হল না। বাংলার প্রখ্যাত কবি নবিনচন্দ্র সেন এমনি পুণ্যাত্মা সম্পর্কে তাঁর কাব্যে বলেন,

যেইজন পুণ্যবান কেবা তারে ভালোবাসে
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর
পাপীরে যে ভালোবাসে আমি ভালোবাসি তারে
সেইজন প্রেম অবতার। **(খ)**

বর্ণক: (ক ও খ) জীবনী লেখক।

পিতা-মাতা চালক নয়

বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়। সকল প্রকার চিকিৎসা একপ্রকার ব্যর্থ। নিরুপায় হয়ে দয়ার অবতার শাহানশাহ্ বাবাজানের দরবারে মাইজভাণ্ডার শরিফ গমন করি। হুজরায় তাঁর পা ধরে কান্নাকাটি করে বললাম, বাবা পরিবারের চালক, তিনি মারা গেলে আমরা চালকহারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়বো। বাবার রোগ মুক্তির জন্য আপনি একটু দয়া করুন। তিনি সান্তনা দিয়ে বললেন, 'পিতা-মাতা চালক নয় – সাথী; চালক আল্লাহ্, আমরা আছি না'? পবিত্র কোরআন থেকে আয়াত পড়ে বাংলায় বুঝিয়ে দেন। অতঃপর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। আমি পবিত্র রওজা হতে তাবার্রুকের পানি আনতে চাইলে বখ্তেয়ার মামা আমাকে বলেন– আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে জীবন্ত দেখেন কিনা চেষ্টা করুন। দোয়া

না করে কেন এরূপ বলেছেন জনৈক ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে মামা বলেন, বাবাজানের শোয়ার অবস্থা দেখে বুঝেছি চৌধুরী বাবু এতক্ষণ নেই। আমি অক্সিজেন পর্যন্ত পৌঁছলে দেখি শহরের দিক হতে একখানা ট্যাক্সিতে আমার দূর সম্পর্কীয় এক ভাই বাবার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আমাকে আনতে দরবার শরিফ যাচ্ছে। মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পর একরাতে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার শ্মশানে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসেন।

বর্ণক: মৃদুল কান্তি চৌধুরী, মেসার্স দরবার ইলেকট্রিক স্টোর্স, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

জিলানীর সুখ শান্তি

এককালে আমরা ভারতের বিহার রাজ্যের অধিবাসী ছিলাম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান গঠিত হলে আমরা হিজরত করে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে চলে আসি। অনেক দুঃখ কষ্টের পর চট্টগ্রামের জেমস ফিনলে কোম্পানীতে চাকুরিতে যোগদান করি। ক'বছর ধরে দামপাড়া ব্যাটারী গলিতে মরহুম আবদুল গণি সওদাগরের বাসায় ভাড়া থাকতাম। পরিবারে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। তাই নিম্নমানের খানা খেয়ে দিন গুজরান করতাম। বাবাজান তখন গণি সওদাগরের বাড়িতে থাকতেন। হাঁটা চলায় তাঁকে দেখতাম, শুনতাম, কিন্তু ভয়ে কাছে যেতাম না। হঠাৎ এক রাতে আমার বাসা হতে খাবার চেয়ে পাঠালেন। ভাল তরকারী কিছুই ছিলনা। তাই মনক্ষুণ্ন হলাম। তবু শাক ও আলু ভর্তা দিয়ে ভাত দিলাম। তিনি যেন তৃপ্তি ভরে খেলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, মাঝে মধ্যে খানা চাইলে দেবেন তো? বললাম, গরীবের খানা কবুল করলে ধন্য হবো। তিনি বলেন, “ধনী-গরীব কোন কথা নয়, সবাই মানুষ। মানুষে মানুষে প্রীতিভাব থাকা প্রয়োজন”। তিনি মাঝে মধ্যে আমার বাসায় ভাত তরকারী চেয়ে পাঠাতেন। ওই বাসায় থাকাকালে ফতেয়াবাদে কিছু জায়গা খরিদ করি। সেখানে বাসা তৈয়ার করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছি। তাঁর দোয়ায় মাথা গুঁজার ঠাঁই হয়েছে। **(ক)**

রোগের ঔষধ লোটার পানি

একাশির ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখ বাবাজান আমার ফতেয়াবাদের বাসায় আসেন। আমি ছিলাম না। বাহ্য ক্রিয়ার জন্য তিনি আমার ছেলের নিকট একটা লোটা চেয়ে নেন। লোটা নিয়ে পুকুর ঘাটে বসেন। লোটায় পানি ভরে আবার পুকুরে ঢেলে ফেলে দেন। কিছুক্ষণ এভাবে পানি নিয়ে খেলা করার পর লোটাটা পুকুরের মাঝে ছুঁড়ে মারেন। অনেক খুঁজেও সেটা আর পাওয়া গেল না। তিন মাস পর আমার মেজ ছেলে গোলাম দস্তগীর (বাবর) পুকুর ঘাটে গোসল করার সময় তার মাকে বলে– মা পায়ে একটা ইট ঠেক্ছে। তুলে দেখা গেল ইট নয় সেই লোটা। ঘষে মেজে লোটাটিতে কিছু পানি ভরে কেউ না ধরে মতো রেখে দিলাম। আমার বড় ছেলে পরদিন তাবার্রুক স্বরূপ সেখান থেকে পানি খেয়ে দেখে খুশ্বু। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন খুশ্বু দিয়েছি কিনা? বললাম, পুকুরের পানিই তো ভরে রেখেছি। দ্বিতীয় ছেলে বাবরের একবার জ্বর হয়ে কিছুক্ষণ পর পর বেহুঁশ হয়ে পড়তো এবং ওষ্ঠদ্বয় কাল হয়ে যেতো। কোন চিকিৎসায় সারে না। বাবাজানকে খেয়াল করে সে লোটা থেকে পানি খাইয়ে দিলে ছেলের রোগ সেরে যায়। সে রোগ আর কখনো হয় নাই। এ লোটার পানি তাবার্রুক হিসেবে পান করে এলাকার বহু লোকের অসুখ সেরেছে। **(খ)**

বর্ণক: (ক ও খ) গোলাম জিলানী খান, পিতা- মরহুম ধনু খান, পার্ক সার্কাস লেন, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। বর্তমান- ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

চুরাশি বছর দীর্ঘ রাত

চুরাশি সালের শবেবরাতে তিনি আমার নাসিরাবাদস্থ বাসভবনে ছিলেন। শাহানশাহ্ বাবাজানের আগমনের সংবাদ পেয়ে বহু আশেক ভক্ত সমবেত হয়। সকলে এ পবিত্র রাতে তাঁর মেহেরবানী প্রার্থী। মধ্যরাতে তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের সুরা ক্বদর থেকে পাঠ করেন, লায়লাতুল ক্বদ্‌রে খায়রুম মিন্ আলফি শাহ্‌র। আবার বাংলা অর্থ করে বলেন, 'হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত (শবেক্বদর)। তাই এই রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের সমান'। বন্ধু আবুল মনসুরকে জিজ্ঞাসা করেন, এক হাজার মাসে কত বছর হয়? মনসুর সাহেব হিসাব করে জানায়, ৮৪ বছর। তিনি স্বগতভাবে বলেন, এ রাত বড়

ফজিলতের (কল্যাণের) রাত। আবেগ ভরে প্রশ্ন করলাম, আমরা তো আপনার সঙ্গে আছি; আমরা কি শবেবরাত পাবো? তা না হলে আমরা কি জন্য আছি, তিনি উত্তর দেন।

সাতাশির শবেক্বদরে তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফ আন্দর বাড়ি পারিবারিক ভবনের নীচ তলায় পূর্বের কক্ষে বসা ছিলেন। সেখানে বসেই তিনি দরবারে আগত অসংখ্য মানুষকে দর্শন দেন। এটা ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। কেননা তিনি কখনো আন্দর বাড়িতে বেগানা পুরুষ প্রবেশ পছন্দ করতেন না। ভিড়ের চাপে শৃঙ্খলা রক্ষা কর্মীদের হিমশিম অবস্থা। একবার ভিড়ের চাপে দর্শনার্থীরা তাঁর গায়ের উপর গিয়ে পড়ে। তবু তিনি শান্ত। মাঝে মাঝে হৃদয়হরা 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' শব্দে জিকির করেন। ভক্তরা তাঁর জন্য সেদিন যত ভাত মাংস মিষ্টি কেক ইত্যাদি এনেছেন সবগুলো দর্শনার্থীদের বণ্টন করে দিতে আদেশ দেন। বণ্টনের সময় সে কি হুলুস্থুল কাণ্ড! সৌভাগ্য রজনীতে (শবে ক্বদর) আল্লাহ্র মহান বন্ধুর আশীষধন্য একটুখানি তাবার্রুক সবাই পেতে চায়। একসঙ্গে সকলে পেতে চাওয়ায় জটলা সৃষ্টি হলে কেউ বেশী কেউ কম কেউ না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে গেছেন। সে রাতে মাইজভাণ্ডার শরিফে আগত প্রায় সকল আশেক ভক্তরা তাঁর নিকট ভিড় জমায়। রাত এগারোটায় দরবারের সর্বত্র ঘুরে ফিরে দেখেছি হক মন্‌জিল ছাড়া সব জায়গা ছিল এক প্রকার শূন্য-ফাঁকা।

বর্ণক: সৈয়দ মোহাম্মদ মর্তুজা হোসেন, পিতা- মাওলানা সৈয়দ সিরাজুল হক, গ্রাম- আজিম নগর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা- ইফ্‌কো কমপ্লেক্স, সিডিএ এভিনিউ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

বাঁধি তার ঘর

আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর
আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়াই,
যে মোরে করেছে পর।

একদা কবি জসিম উদ্দীনের কবিতার এ চার লাইন তিনি দরদভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। আবৃত্তির স্বর ও সুরে অন্তর বিমোহিত। নিকটে বসে এই আবৃত্তি শুনতে

শুনতে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'এটাই আমাদের নীতি, কেউ খারাপ করলেও তাদের ভাল করা'। তিনি আরো আবৃত্তি করেন–

মহাজ্ঞানী মহাজন
যে পথে করে গমন,
হয়েছেন চির স্মরণীয়।
সে পথ লক্ষ্য করে,
সে কৃতি ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।

পাঠ শেষে মন্তব্য করেন, অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য বা পথ সেটাই হওয়া উচিত। ইংরেজিতে আরো বলেন– A man can not live in society without co-operation অর্থঃ পরস্পর সহযোগিতা ছাড়া কোন মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারেনা।

বর্ণকঃ সৈয়দ ওসমান কাদের, প্রকাশ পিন্টু মিয়া, পিতা- মরহুম সৈয়দ আজিজুল হক, গাউসিয়া আমিন মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

আরামে ঘুমিয়ে নির্বাচিত

সাতাত্তর সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেম্বার পদপ্রার্থী ছিলাম। আমাদের ভোট কেন্দ্র পূর্ব মাইজভাণ্ডার আমতলী স্কুল। নির্বাচনের দিন সকালে ভোট কেন্দ্রে যেতে দয়ার আশায় বাবাজীর দরবারে হাজির হলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, ঘরে গিয়ে লেপ মুড়িয়ে ঘুমান। ঘরে ফিরে তাঁর নির্দেশ মত লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমালাম। সারাদিন ভোট কেন্দ্রে যাওয়া তো দূরে থাক কোন প্রকার খবরও নেই নি। শুধু তাঁর পবিত্র বাক্যের উপর নির্ভর করি। বিজয়ী ঘোষণার পর লোকজন ঘরে এসে ডাকলে আমি লেপ ছেড়ে বেরিয়ে আসি। সমর্থকরা মালা পরাতে চাইলে বারণ করলাম। সে মালা তো আমার নয়। মালা নিয়ে তাঁকে বিজয় সংবাদ জানাতে গেলে তিনি মৃদু মৃদু হাসেন। আরেকদিন দেখা করার জন্য তাঁর হুজরার কাছাকাছি গেলে মনে পড়ে সঙ্গে তো হাতঘড়ি আছে। ঘড়িটা তাঁকে দিতে বলবেন এই ভয়ে দেখা না করে ফিরে আসি। বহু লোকের হাতঘড়ি তিনি চেয়ে নিয়েছেন বলে শুনেছি। তখন আসর নামাযের

আযান হয়েছে। মসজিদ পুকুরের ঘাটে অজু করালাম। টুপি মাথায় দিয়ে ঘড়িটা হাতে লাগাবার জন্য পকেটে হাত দিয়ে বোকা বনে গেলাম। ঘড়ি নেই, পকেটে তো ঘড়িটা ঠিক ঠিক রেখেছি। অজু করার আগেও দেখেছি। আমার আশে পাশে কোন লোকজনও ছিলনা। তাই কেউ চুরি করার সন্দেহ সম্ভাবনাও নাই। জীবনভর নিজেকে ধিক্কার দিই, কেন যে আল্লাহ্‌র অলিকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলাম।

বর্ণক: আবু মিয়া মেম্বার, পিতা- মৃত আমানত আলী, সাং- মাইজভাণ্ডার শরিফ, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গ

যে রাতে শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হয় সে রাতের প্রথমার্ধে ৮টার সময় স্থানীয় টিপটপ টেইলার্স এর মালিক এজাহার খলিফার দ্বারা ৮ হাত দৈর্ঘ্য ৬ হাত প্রস্থ একখানা কালো পতাকা সেলাই করে শাহানশাহ্‌ হকভাণ্ডারী (ক.) ভোর রাতে তাঁর হুজরার উপরে একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে উত্তোলন করেন। তাঁর সাক্ষাতে আগত হাজার হাজার লোক তা দেখেছেন। সে পতাকা ৪০ দিন পর্যন্ত উত্তোলিত ছিল। ইসলাম ধর্মের বিধান মতে শোকের সর্বোচ্চ সময়সীমা এটাই। ভয়ে কেউ শোক পালন করার কথা চিন্তাও করে নি, তখন আল্লাহ্‌র এই মহান অলি সমগ্র জাতির পক্ষ হতে সে দায়িত্ব পালন করেন। মুজিবের প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে এবং সমগ্র বিশ্বে তাঁর স্মরণে সেদিন সম্ভবতঃ এটাই ছিল একমাত্র শোক চিহ্ন।

৭ জুলাই ১৯৮৪ সাল শনিবার সকালে শহরে আসবার জন্য বিদায় নিতে গেলে শাহানশাহ্‌ বাবাজান অন্যদের বিদায় দিয়ে আমাকে হুজরা শরিফের ভিতরে ঢুকে বসতে আদেশ দেন। নিজেই কথা আরম্ভ করে বলেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী আবদুর রাজ্জাক সাহেব দরবার শরিফ খুঁজে শহরে গিয়ে আমার সাথে দেখা করেন'। আমি অনুচ্চস্বরে বললাম, রাজ্জাক সাহেবতো নতুন দল বাকশাল গঠন করেছেন। উত্তর দিলেন, 'বাকশাল টাকশাল কীসের কথা। কাজের লোক কি কাজ ছাড়া থাকতে পারে'? আমার দিকে চেয়ে বলেন, জাপানেও বহু মুসলমান আছে। বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর বলেন, 'মাওলানা

ভাসানী বড় নেতা ছিলেন’ আমি মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালাম। পরিশেষে জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ‘জাতির জনক টনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’।

১৯৮৪ সালে ৬ অক্টোবর মাইজভাণ্ডার শরিফ গিয়ে দেখি শাহানশাহ্ বাবাজানের বিছানায় একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ে আছে। চার ভাঁজ করা পত্রিকায় যে অংশটুকু পড়া যাচ্ছিল তাতে দেখা যায় ‘বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের’ অদৃশ্য অংশে সম্ভবত: বিচারের কথা লিখা থাকবে। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের বামদিকে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ খোলা হাসি বিধৃত একখানা ছবিও ছাপা ছিল। দীর্ঘদিন ধরে পত্রিকাখানা সেখানেই ছিল।

শাহানশাহ্ বাবাজানের একজন খাদেমের নাম তৌহিদ ফকির। সে বঙ্গবন্ধুর নামে পাগল। স্বভাবে সে অতি সরল সোজা। পঁচাশি সালের শুরুতে এই খাদেম বঙ্গবন্ধুর ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেন্ডার কিনে দরবারের বেড়ার অফিস ঘরে টাঙ্গিয়ে দেয়; উক্ত সালের রমজান মাসে একটা কাগজের মালা হুজরা থেকে এনে বাবাজান সে ছবির গলায় পরিয়ে দেন। ফলে ফকিরের আনন্দ ধরে না। হাত ধরে টেনে নিয়ে আমাকে মালাপরা ছবিখানা দেখায়।

এসব রহস্যপূর্ণ ঘটনায় জাতির জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বীকৃতি ছিল অবধারিত। ‘টনক’ শব্দের উল্লেখে বুঝা যায় বাঙালি জাতির দুর্যোগ দুর্দিনে ‘বঙ্গবন্ধু’ চেতনার উৎস হিসেবে পরিগণিত হবেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধুর হাতে মালা পরাতে তাঁর প্রতি জাতির শ্রদ্ধা ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়ে স্থায়ী হবে। ১৯৮৭ সালে এই জীবনী গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত উপরোক্ত মন্তব্য ১৯৯৭ সালে বাস্তবে রূপলাভ করেছে। জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার সরকারই (১৯৯৬–২০০১) জতির জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখের জঘন্য হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় ঘোষিত হয়েছে। ১৯ জন আসামীর ১৫ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে মৃত্যুদন্ড এবং ৪ জনকে নির্দোষ হিসেবে খালাস দেওয়া হয়েছে। মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আসামী সরকার উভয়পক্ষ হাইকোর্টে আপিল করেছে। হত্যাকারী ও হত্যাকাণ্ডের সুবিধাভোগীদের সকল ষড়যন্ত্র পরাজিত ও পর্যুদস্ত; সত্যের জয় রোখা যায় না, এটা প্রমাণিত হল।

বর্ণক: জীবনী লেখক।

নীতি আদর্শ শিখবে

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব এম.এ. আওয়াল একবার হাটহাজারী থানার গুমানমর্দন নিবাসী আহমদ হোসেন কোরেশীকে সঙ্গে নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ যেয়ারতে আগমন করেন। মাযার শরিফ জিয়ারত শেষে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে সাজ্জাদানশীন পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি হল ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বের হুজরায় একখানা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত ছিলেন। কমিশনার সাহেব একখানা চেয়ারে বসে এক পায়ের উপর অপর পা (উরুর উপর উরু) তুলে এমনভাবে পা দোলাচ্ছেন অল্পের জন্য হুজুরের কেদারায় ঠেকছে না। তাঁরা কী ব্যাপারে আলাপে রত। এমন সময় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সেখানে পৌঁছে রাগান্বিত কণ্ঠে বলেন, 'বেয়াদব! পা নামিয়ে রাখুন, আপনি কি জানেন কার সামনে বসেছেন? আমি আপনাকে ট্রান্সফার করলাম'। সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় কমিশনার সাহেব মনোক্ষুণ্ন হয়ে সহসা বিদায় নিয়ে চলে যান। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ঢাকায় বদলী হন। চট্টগ্রাম হতে বিদায় হবার পূর্বে একদিন দামপাড়া ব্যাটারী গলিতে শাহানশাহ্‌র নিকট বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা চাইতে যান। শাহানশাহ্ আদর করে নিকটে বসিয়ে চা-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে উপদেশ দেন, "আপনারা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। মানুষ আপনাদের কাছেই আদব-আখলাক নীতি আদর্শ শিখবে। তাই আচার আচরণে শালীনতা বজায় রাখবেন। দুর্নীতি করবেন না। মানুষের সেবা করবেন, মানুষের সেবা করাও আল্লাহ্‌র ইবাদত"।

বর্ণক: খায়রুল বশর মাস্টার, পিতা- নোয়া মিয়া, গ্রাম- ছাদেক নগর, সুন্দরপুর ইউনিয়ন, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম, সাবেক কর্মচারী, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল।

এদেশ গরীব নয়

একবার ফজরের নামাযের পর হুজরা শরিফে তাঁকে সালাম জানাতে যাই। তিনি খাটে বসা। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছেন? বুবু (আমার স্ত্রী) কেমন আছেন? উত্তর দিয়ে কাছাকাছি ঘরের মেঝেতে বসলাম। নিজের আর্থিক অবস্থা খারাপ চলছিল বলে ভবিষ্যতে কেমন হবে। দেশের ভবিষ্যতই বা কী এ

বিষয়ে মনে মনে ভাবছিলাম। অমনি তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠেন ‘মিয়া! পুলসিরাত দৌলতসে নেহী – ঈমানসে পার হো সেক্‌তি’ অর্থঃ বিপুল সম্পদে নয়, ঈমানেই পুলসিরাত পার।

একসময় আমার লাভজনক আমদানী ও সাবান ফ্যাক্টরীর ব্যবসা ছিল। উপর্যুপরি ব্যবসায়িক অসফলতার দরুণ পুঁজি হারিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা কর্জগ্রস্থ্‌ হলে দিশেহারা অবস্থায় বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীকে কয়েকবার আর্জি পেশ করে কোন সাড়া না পেয়ে আমি আরও হতাশ হই। অবশেষে তাঁর একমাত্র কিশোর শাহ্‌জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মা.জি.আ.) সাহেবের মাধ্যমে সুপারিশ করালাম। আদর করে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার জেঠাজী কোথায় যেতে চান? আমি উত্তর দিলাম, আমাদের দেশতো গরীব। তাই আরবের কোন ধনী দেশে গিয়ে চাকুরি ব্যবসা কিছু একটা করে ভাগ্য ফিরে কিনা চেষ্টা করে দেখতে চাই, আপনি একটু দয়া করুন। উত্তরে বললেন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর এদেশ গরীব নয় ধনী। আপনার জেঠাজীর টাকা রোজগারে কোথাও যেতে হবেনা। সময় হলে কখনো বেড়াতে যাবেন। এ ঘটনা আশির দশকের প্রথম দিকের, তাঁর অবারিত দয়ায় ছেলেরা বড় হয়ে বিদেশ গিয়ে রোজগার করায় আমার পারিবারিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়। অবশেষে **১৯৯৭** সালে হজ্ব করে গিয়েছি।

বর্ণক: আমিনুর রহমান কোম্পানী, পিতা- মৃত আসকর আলী জমাদার, গ্রাম- পশ্চিম গুজরা, ডাকঘর- নোয়াপাড়া, থানা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

ধনধান্য পুষ্পে ভরা

একবার আমিসহ আরও ৫ জন ভক্ত নিয়ে জীপ গাড়িতে করে বাবাজান ফেনী পর্যন্ত গিয়ে যাত্রাবিরতি করেন। একটা আবাসিক হোটেলে তিনটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে একটা নিজের জন্য রেখে অন্য দু-কক্ষে আমাদের থাকতে দেন। রাতের খাওয়ার পর সবাই যার যার কক্ষে ঘুমোতে যাই। গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে কৌতুহল বশতঃ কক্ষের বাইরে আসলাম। দেখি বাবাজানের কক্ষের দরোজা খোলা, তিনি নেই। খুঁজতে খুঁজতে ছাদের উপর পেলাম। তিনি আপন মনে পায়চারী করে কবি নবিন চন্দ্র সেনের কবিতার দু’চরন সুর দিয়ে গেয়ে যাচ্ছেন–

‘ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা .... সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি’।

বর্ণক: সামসুল আলম চৌধুরী, পিতা- জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নাজির বাড়ি, চট্টগ্রাম। বর্তমান- কাঁচা রাস্তার মাথা, রামপুরা- ঈদগাঁ, চট্টগ্রাম।

বাবাজানের সাথে একবার কক্সবাজার সফর করি। সেখানে তিনি হোটেল সায়মনে উঠেন। খুব ভোরে সূর্য উঠার আগে তিনি সমুদ্র সৈকতে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গান ধরেন, ‘প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ’। অতঃপর পেছনে ফিরে আমাকে দেখে বলেন, ‘এই যে সাগর দেখছেন, এখানে অনেক মূল্যবান সম্পদ রয়েছে’।
উপরের মন্তব্য ১৯৮৭ সালে এই জীবনী গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত। অতঃপর ক’বছরে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডার, কয়লা, তেল, ১৯৯৯ সালে মিঠাপুকুরে কয়লা খনিতে স্বর্ণ ও হীরক পাওয়া গেছে। বিপুল সম্পদ এখনো অনাবিস্কৃত। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী যে, মহান অলি উল্লাহ্‌র পবিত্র উক্তি ভবিষ্যতে বাস্তব সত্যে রূপলাভ করবে।

বর্ণক: শেখ মুজিবর রহমান বাবুল, পিতা- শেখ বজলুর রহমান, ১৩ রাজাপুকুর লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শান্তি ও মুক্তির ঠিকানা

১৯৮৭ সালে ফটিকছড়ি থানার দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী মরহুম খান বাহাদুর হাফেজুর রহমান চৌধুরী বাড়ির আলী আহমদ সস্ত্রীক হজ্বে যাবার নিয়ত করেন। ফয়েজ বরকতের আশায় বড় ছেলে মাহবুব পিতামাতাকে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর দরবারে যেতে অনুরোধ করেন। মাহবুব তাঁর ভক্ত। একদা সস্ত্রীক আলী আহমদ মাইজভাণ্ডার শরিফ আগমন করেন। হুজুর তাঁদের আদর আপ্যায়ন করেন এবং হজ্বে যাবার অনুমতি ও দোয়া চাইলে তাও মঞ্জুর করেন। তাঁর জন্য মক্কা শরিফ হতে কি জিনিস আনবেন জিজ্ঞাসা করলে বলেন, দুটি কলম আনবেন। পাসপোর্ট ভিসাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে একদা বাংলাদেশ বিমানের হজ্ব ফ্লাইটে জেদ্দা পৌঁছেন। মক্কা মোয়াজ্জমায় গিয়ে তাঁরা

প্রথমেই একখানা বাসা ভাড়া করেন। অতি নিকটে বলে গভীর রাতেও পবিত্র হেরম শরিফে নামায কালাম এবং খানায়ে কাবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা সুবিধা হয়। মনভরে আলী আহমদ প্রিয় রাসূলের জন্মভূমি ও সাধনার স্থানগুলো জবলে নূর (আলোর পাহাড়), হেরা পর্বতের গুহা ইত্যাদি দেখেন। হেরা পর্বতের গুহায় সহধর্মীনি হযরত খাদিজা (রা.) রাসূলের জন্য একাকী রাতের খাবার বয়ে নিতেন শুনে আলী আহমদ ও তাঁর স্ত্রী ভয়ে শিহরিত হন। তখনকার বিপদ সঙ্কুল রাতে পতিপরায়ণ মহিয়ষী নারীর দুঃখ-কষ্ট স্মরণ করে উভয়ে অঝোরে কাঁদেন। এখানেই ২৭ রমজান নাজিল হয়েছিল আল্লাহ্র পবিত্র মহাবাণী আল-কোরআনের প্রথম আয়াত।

১০ জিলহজ্ব আরাফাত মাঠে হজ্বের প্রধান অনুষ্ঠান। দুনিয়ার দূর-দূরান্ত হতে লক্ষ লক্ষ লোক হজ্ব করার জন্য সমবেত হয়েছেন। হাজার হাজার তাঁবুতে ময়দান ছেয়ে গেছে। সঙ্গীরাসহ আলী আহমদ এক তাঁবুতে আশ্রয় নেন। তাঁবু থেকে বের হলে ঘুরতে ঘুরতে ভিড়ের চাপে তিনি সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একবার হারিয়ে গেলে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে পুনঃ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এদিক ওদিক অনেক ঘুরেও হদিস খুঁজে না পেলে আলী আহমদ কাঁদতে লাগলেন। এমনি সময়ে ভিড়ের মধ্যে কে যেন তাঁর ডান হাত শক্ত করে ধরলেন। ভাল করে চেয়ে দেখলেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। নির্দিষ্ট তাঁবুতে পৌঁছে দিয়েই তিনি দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে চলে গেলেন। স্ত্রীসহ সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে পেয়ে আনন্দে আল্লাহ্র শুকরিয়া করলেন। মদিনা শরিফ রাসূলুল্লাহ্র (দ.) রওজা মোবারক জিয়ারত শেষে স্বামী-স্ত্রী নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসেন।

অতঃপর শাহানশাহ্র নির্দেশমত কেনা কলমগুলো নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তাঁর সাথে দেখা করলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরব দেশে কোন প্রকার অসুবিধা হয় নি তো'? তাঁর দয়ায় অসুবিধা হয় নাই বলে ঘটনা উল্লেখ করতে চাওয়া মাত্র বিদায় করে দেন।

২০ রবিউল আউয়াল ১৩ অক্টোবর ১৯৮৭ শুক্রবার মাইজভাণ্ডার শরিফ হযরত সাহেব কেবলার (ক.) রওজা শরিফ মাঠে আনজুমান-এ-মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিরাট মিলাদুন্নবী (দ.) মাহ্ফিল প্রখ্যাত

ওয়ায়েজীন মাওলানা সামশুল আলম হেলালী (বসতবাড়ি- ঢালকাটা নানুপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্‌র অলিরা যে চাওয়া মাত্র বিপদ আপদে সাহায্য করেন এটা তার বাস্তব প্রমাণ। উক্ত হাজী সাহেবের নিকট ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনেছি। সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে উদাত্ত আহ্বানে মাওলানা বলেন, দূর-দূরান্ত হতে আগত হে উপস্থিত জনতা, আপনারা যার যার এলাকায় গিয়ে বলুন আল্লাহ্‌র অলিরা খোদায়ী শক্তিতে শক্তিমান। তাঁরা জিল্লুল্লাহ্, জিল্লে রাসূল অর্থাৎ খোদা রাসূলের প্রতিনিধি প্রতিচ্ছবি। উভয় জগতের শান্তি ও মুক্তির জন্য তাঁদের শামিয়ানা তলে সমবেত হোন।

বর্ণক: মাওলানা মোহাম্মদ লোকমান হোসাইনী, পিতা- হাজী ইউনুস মিয়া, গ্রাম- শিয়ালী পাড়া, থানা- নাঙ্গলকোট, জেলা- কুমিল্লা, সাবেক খাদেম- হক ভাণ্ডারীর রওজা শরিফ, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ।

সরকারের শান্তি ও স্থিতি

আলোর দিকে কীট পতঙ্গের যেরূপ গতি ও আকর্ষণ তদ্রূপ আল্লাহ্‌র অলির দরবারের প্রতি সর্বশ্রেণির মানুষের। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়, পাপী-তাপী কোন ভেদাভেদ নেই। নিজ নিজ প্রয়োজনে সকলে এঁদের দরবারে ভীড় করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী ৭ অক্টোবর ১৯৮৭ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর কৃপালাভের আশায় দরবারে আগমন করেন। দীর্ঘ এক ঘন্টা পনের মিনিটকাল মন্ত্রী মহোদয় হুজরায় তাঁর অতি নিকটে থাকার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। মন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন জাতীয় পার্টির চট্টগ্রাম উত্তর জেলা নেতা এডভোকেট মোহাম্মদ ফয়েজ এবং মহানগর নেতা মোহাম্মদ আশরাফ খান, ফটিকছড়ির সংসদ সদস্য মোজহারুল হক শাহ্ চৌধুরী প্রমুখ। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবদুল মান্নান, টি এন্ড টি বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার, ফটিকছড়ি থানা নির্বাহী অফিসার তফাজ্জল হোসেন, উপজেলা পুলিশ প্রধানসহ বহু সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয় দেশের দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দোয়া প্রার্থনা করলে হুজুর বলেন, "সন্তান কষ্ট পেলে বাবা মারও কষ্ট হয়। দেশের মানুষ কষ্ট পেলে সরকারেরও কষ্ট হয়। জনগণ তো আপনাদের সন্তানের মত। তাদের যাতে কষ্ট

না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। মনে রাখবেন, জনগণের সুখ শান্তিতেই সরকারের শান্তি ও স্থিতি”।

প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবার কিছুদিন পর ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসের ২৩ তারিখে তিনি আরও একবার মাইজভাণ্ডার শরিফ এসেছিলেন। তখন চা-নাস্তা খানাপিনা দ্বারা মন্ত্রীকে আপ্যায়ন করেন। দোয়া করতে অনুরোধে বলেন, ‘ভালমতে কাজ করবেন। কাজ আমি করে দেবো, ভয় করবেন না’। একটু জজ্‌বা হালে আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমি সব জানি, সব বুঝি’। অতঃপর পবিত্র কোরআনের বাণীর উদ্বৃতি দেন, ‘লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক্‌তাসাবাত’ অর্থ– ‘যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়’। (সূরা বাক্বারা : ২৮৬)

বর্ণক: এ.কে.এম. আবু বকর চৌধুরী, পিতা- আলহাজ্ব বজলুর রহমান চৌধুরী, চৌধুরী কলোনী, ঘাট ফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।

হাজার ভোল্টের পাওয়ার

চিকিৎসার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আলী নবি চৌধুরীর বাসা থেকে ডাক আসে। সেখানে মাইজভাণ্ডার শরিফের শাহানশাহ্ এসেছেন। আমি আধ্যাত্মিকতা তেমন মানতাম না। যতদূর সম্ভব পীর-ফকিরদের এড়িয়ে চলতাম। চিকিৎসা আমার পেশা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হলো। চৌধুরী সাহেবের বাসায় পৌঁছে দেখি তিনি একখানা খাটে শুয়ে আছেন। ডাক্তার এসেছেন বলে জানালে বাম হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘অসুখ লাগছে, একটু দেখুন তো’। আমি ডান হাতে শিরা পরীক্ষা করার জন্য হাত দিতেই আমার মনে হয়েছিল যেন হাজার পাওয়ারের কোন ইলেকট্রিক তারে শক্ খেলাম। সে ঝাঁকুনীতে বহুক্ষণ শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। আমি হতবিহ্বল হয়ে বসে থাকি। আমার দীর্ঘ চিকিৎসা জীবনে অনুরূপ ঘটনা কখনো ঘটে নি। ফলে আমি তাঁর অনুগত ভক্ত হয়ে যাই।

বর্ণক: ডাক্তার আবদুল মান্নান, চীফ মেডিকেল অফিসার, চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।

দাও ভাল বিছানা

১০ অক্টোবর ১৯৮৬ শুক্রবার। আমার চাচা আবদুন নঈম সিকদার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মাগরিবের কিছু আগে হঠাৎ তিনি বলতে লাগলেন, পেতে দাও ভাল বিছানা। কার জন্য বিছানা বলছেন আত্মীয় স্বজনেরা জানতে চাইলে বলেন, 'মাইজভাণ্ডার শরিফের শাহানশাহ্ জিয়াউল হক হুজুর এসেছেন'। একথা শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা পেতে দেওয়া হয়। চাচা আবারও বলতে লাগলেন, 'কত বড় বিল্ডিং। সভাপতি হযরত সাহেব কেবলা, সেক্রেটারী বাবাজান কেবলা। এতো বড় বিল্ডিং তদারক করা আমার দ্বারা কি সম্ভব হবে? আপনি কী বলেন'। কথাগুলো যেন শাহানশাহ্ বাবাজানকে লক্ষ্য করে বলা হলো। তারপর আর কোন কথা নেই। এভাবে চুপ থেকে রাত ১টা ২৫ মিনিটে তিনি ইন্তিকাল করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অতি সরল সোজা। ভারত বিভাগকালে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কখন যে লেখাপড়া ছেড়ে রাজনৈতিক কর্মী হয়েছেন বুঝতেই পারেননি। স্বার্থের অঙ্ক কষতে অনভ্যস্ত এই রাজনৈতিক কর্মী রুজি রোজগারের সার্বিক কোন পথ খুঁজে না পেয়ে অতি দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। পেলা গাজী মসজিদের উত্তর পূর্বের চৌরাস্তা থেকে একদা শাহানশাহ্ বাবাজান নিজের গাড়িতে চাচাকে অন্য ক'জন লোকের সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ নিয়ে যান। তারপর থেকে মাঝে মধ্যে যেতেন। তবে তিনি কারো মুরিদ ছিলেন না। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।

বর্ণক: মোহাম্মদ আবু তাহের সিকদার (মেম্বার), ফতেহ্ মোহাম্মদ সিকদার বাড়ি, ছিলোনীয়া- হরিনা দিঘী, সুন্দরপুর ইউনিয়ন, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

দশ কোটি মানুষের মুখপত্র

৭ মার্চ ১৯৮৩। দামপাড়া ব্যাটারী গলির আস্তানায় তিনি দু'বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে বসেছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আওয়ামী লীগ করেন? আমি উত্তর দিবার সময় চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, এ, মন্নান (পরবর্তীকালে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী) সেখানে পৌঁছেন। বাবাজান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শেখ সাহেবের বড় মেয়েটার কি নাম? মান্নান সাহেব

জবাব দেবার আগে তিনি নিজেই বলেন, শেখ হাসিনা না? 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি দিলে মান্নান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি মেয়েটাকে একটু দেখাতে পারবেন? আগামীতে চট্টগ্রাম সফরে আসলে আপনার কাছে আনবো বলে নেতা প্রতিশ্রুতি দেন।

বর্ণক: আবদুল হালিম সওদাগর, আজীজ শরীফ হোটেল, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

২১ আগস্ট ১৯৮৩ খৃ: ব্যাটারী গলির আস্তানায় ফটিকছড়ি হতে নির্বাচিত সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য নুরুল আলম চৌধুরী শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর সাথে দেখা করেন। সেদিন নোয়াখালীর জনসভায় যাবেন কিনা অনুমতি চাইলে যেতে বলেন। আবদুল মালেক উকিলসহ বহিস্কৃতদের পুনরায় দলে নিবেন কিনা পরামর্শ চাইলে বলেন, 'নিয়ে নিন। দলে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে তাতে অল্পবয়সী কম যোগ্যতাসম্পন্ন অবলা নারী শেখ হাসিনা দলের নেতৃত্ব দিতে পারবে কিনা প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা আপনারা মিলে দোয়া করলে নিশ্চয় পারবে। মান্নান সাহেবের চেষ্টার ফলে তিরাশির আটাশ আগস্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাইজভাণ্ডার শরিফ আগমন করেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকারের আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেন, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব কোরবান আলী, আমির হোসেন আমু, কেন্দ্রিয় মহিলা আওয়ামী লীগ সম্পাদিকা এডভোকেট সাহারা খাতুন এবং জেলা পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব এম এ ওহাব, এম এ মান্নান, নুরুল আলম চৌধুরী প্রমুখ। নেতারা পৌঁছবার পূর্বে বাবাজান হুজুরার দরজা-জানালা বন্ধ করে লেপ মুড়িয়ে মধ্যের কক্ষে শুয়ে পড়েন। প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব চৌধুরী এন.জি মাহমুদ কামাল ও শাহ্ সুফি ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক সাহেব বন্ধ জানালায় গিয়ে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। কামাল সাহেব শেখ সাহেবের মেয়ে শেখ হাসিনা এসেছেন বলে জানালে বসতে নির্দেশ দেন। উপস্থিত নেতা কর্মীরা না বসে জিয়ারত সেরে পুনরায় আবেদন করলে কাছাড়িতে বসাতে বলেন। এবার একটুখানি বসে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে দুপুরের খাবার খেতে যান। শেষবারে নেত্রী ও ডক্টর কামাল সাহেব আসেন। অবস্থা বেগতিক দেখে এম এ মান্নান ও নুরুল আলম চৌধুরীর অনুরোধে জামাল সিকদার নেত্রীকে বাবাজানের কাছে নিয়ে যেতে বখ্‌তেয়ার মামাকে অনুরোধ করেন। হুজরা ঘরের সবগুলো

দরজা জানালা বন্ধ, শুধু পূর্বদিকে একটি মাত্র জানালা খোলা। সেদিকে গিয়ে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। এই সুযোগে বখ্‌তেয়ার সাহেব তাড়াতাড়ি বক্তব্য পেশ করতে বললে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাবা আমি হাসিনা এসেছি'। বাবাজান লেপের ভিতর থেকে সম্মতি সূচক জী জী শব্দ করেন। নেত্রী পুনঃ বলেন, "আল্লাহ্‌ ছাড়া দুনিয়াতে আমার যে আর কেউ নাই। আপনি কি আমাকে একটু দোয়া করবেন?' বাবাজান সাড়া দেন, 'জী'। অতঃপর নেত্রী বলেন, চট্টগ্রাম শহরে আজকে আমাদের কর্মী সভা, আমি যাবো কি বাবা।' বাবাজান উত্তর দেন, যেতে পারেন; আমি দোয়া করছি, কোন ভয় নাই।'

আল্লাহ্‌র অলিদের কাছে আনুগত্য পছন্দনীয়। নেত্রীর নরম মনোভাবের জন্য শেষের আবেদন সম্ভব হয়েছে। পত্রিকার বর্ণনায় দেখা গেছে সেবারের চট্টগ্রাম সফরকালে পথে পথে নেত্রী বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছেন। সামরিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অনুমতি ছাড়া সভায় মাইক ব্যবহার করে আইন ভঙ্গ করা হয়। এ জন্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা সর্বজনাব এম এ ওহাব, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, এম এ মান্নান, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও এ কে এম আবু বকর চৌধুরীর নামে স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে সামরিক আইন ভঙ্গের দায়ে কারণ দর্শাও নোটিশ দিলেও কোন মামলা হয় নাই। সেদিন শুধু মুসলিম হল নয় সামনের মাঠ, দক্ষিণ পশ্চিমের রাস্তা ও পূর্বে সিনেমা প্যালেস রাস্তাসহ সমগ্র এলাকা যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামের এটা নেত্রীর প্রথম সভা ছিল না। সেদিনের সভায় নেত্রীর ভাষণের কথা ও প্রকাশ ভঙ্গী ছিল অনন্য।

বর্ণক: আবদুল হালিম সওদাগর মালিক- আজিজ শরীফ হোটেল, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী মাঝে মধ্যে আমার বাড়িতে পদার্পণ করতেন। কোন দিন এসেই চলে যেতেন, কখনো পাঁচ সাত দিন (কম বেশীও হতে পারে) থাকতেন। চুরাশি সালের মার্চ মাসে তিনি নিজে নিজে বলেন, শেখ মুজিব ছাড়া কি দেশ চলবে?' একথা দু'বার উল্লেখে আমি বিনীতভাবে জানালাম, তিনি তো মারা গেছেন। জবাব দিলেন, তার লোকজন আছে না?

বর্ণক: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আকমল খান, পিতা- মরহুম উকিল আমানত খান, খান বাড়ি, পাঠানটুলী, চট্টগ্রাম।

২২ নভেম্বর ১৯৮৬ ইংরেজী, শনিবার সকাল ৮ ঘটিকায়, হুজরা শরিফ থেকে বেরিয়ে তিনি পুকুরের দক্ষিণ পাড়, পূর্ব পাড় হয়ে গুদামের সামনে আসেন। একজন কর্মচারীকে আদেশ দিয়ে একখানা চেয়ার এনে দক্ষিণমুখী হয়ে বসেন। গুদাম ঘরে ছিলেন দরবারের ম্যানেজার আবু আহামদ, নিকটস্থ কুলালপাড়ার চুনু মিয়ার ছেলে বৃদ্ধ ওমদা মিয়া এবং এন্তেজামিয়া কমিটির সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদার। আমি নিকটে গিয়ে দাঁড়ালে মেহমান খানা বিল্ডিং এর তিন তলা হতে একখানা আরাম কেদারা আনতে নির্দেশ দিলে ২/৩ জনে মিলে এনে দিই। চা-নাস্তা ও খাবার খাদেম তৌহিদ ফকিরকে বলে সেখানেই আনিয়ে নেন। উপস্থিত লোকদের খেতে দিয়ে তিনিও দুতিন গ্রাস খেলেন। হুজুরা শরিফ থেকে খাদেম তৌহিদ ফকিরকে দিয়ে তাঁর কুরআন শরিফটি আনিয়ে সিকদার সাহেবের হাতে দিয়ে পাঠ করার নির্দেশ দিলে তিনি অংশ বিশেষ পাঠ করেন। অতঃপর স্বগতঃভাবে বলে উঠেন আওয়ামীলীগ বৃহত্তম দল, দশ কোটি মানুষের মুখপত্র। তাঁর সে দিনের ভবিষ্যদ্বাণী পরে বাস্তব সত্যে রূপ পায়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে জিতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন।

বর্ণক: মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, পিতা- মৌলানা রফিক আহমদ, সাং-মরিয়ম নগর, থানা- রাংগুনিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। প্রধান। শিক্ষক, মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, চারালিয়া হাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

হাত মুখই সম্পদ মাত্র

চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী সম্পাদক ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ উনিশ্‌শ’ সাতাশির মধ্যভাগে অর্ধাঙ্গ বা প্যারালাইসিস্‌ রোগে আক্রান্ত হন। এতে তাঁর একহাত অবশ হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেন। মুখ এক দিকে বাঁকা হয়ে কথাবার্তা অস্পষ্ট হয় পড়ে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় তিনি সস্ত্রীক মাইজভাণ্ডার শরিফ আগমন করেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, হযরত বাবা ভাণ্ডারী ও বাগে হোসাইনীতে জিয়ারত শেষে তিনি গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসেন। অফিস ঘরে হাটহাজারী থানার ধলই গ্রাম নিবাসী কাজী ইউসুফ ফকির, সুয়াবিলের মোহাম্মদ লোকমান ফকির, চট্টগ্রাম শহরের পাঠানটুলীর নুর মোহাম্মদ বাবুল, জামাল আহমদ

সিকদার এবং বর্ণনাকারীও বসা ছিলাম। অধ্যাপক সাহেব নিজের অসুবিধার কথা আমাকে ও সিকদার সাহেবকে বুঝিয়ে বলেন। যাতে আমরা বাবাজানের নিকট তাঁর আবেদন পেশ করতে পারি। অতি কষ্টে তিনি বলেন 'গ্রামের জমি ছাড়া শহরে আমার কোন জমি কিংবা বিল্ডিং নেই, কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই, ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য কোন ইন্স্যুরেন্স পলিসিও নেই। অথচ তিনিও একজন সংসদ সদস্য ছিলেন। সম্পদ বলতে আছে, একখানা মুখ ও দুখানা হাত। হাতে লিখে, মুখে বলে আমি জীবিকা অর্জন করি; মানুষের সেবাও করি। এ দুটার দ্বারা আমার যত ইজ্জত-সম্মান। এগুলো বিকল হয়ে গেলে বেঁচে থেকেই বা আর কী লাভ! তার চেয়ে মরণ ভাল। হুজুর আল্লাহ্‌র অলি, তাঁর দোয়া নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে। আপনারা তাঁকে বলুন 'হয়তো আমার হাত আর মুখ ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করুন, নতুবা বিকলাঙ্গ বেইজ্জতীর চেয়ে মৃত্যুই যেন হয়'। এই আবেগ আপ্লুত বক্তব্যে তাঁর চোখে জল এসে যায়। উপস্থিত অন্যরাও অশ্রুসজল হয়ে পড়েন। বাবাজানের নিকট আবেদন পেশ করলে তিনি মুখে কিছু না বলে 'একটা গ্যাস লাইটার উজ্জ্বল শিখায় দীর্ঘক্ষণ জ্বালিয়ে রাখেন'। অধ্যাপক সাহেবকে ভরসা দিয়ে বলি, অতি সহসা আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং আপনার জনপ্রিয়তাও অত্যধিক বেড়ে যাবে। বাবাজানের দয়ায় প্রখ্যাত নিউরোসার্জন অধ্যাপক ডাক্তার এল.এ. কাদেরীর চিকিৎসায় তাঁর হাত ও মুখ আবার সচল হয়েছে। সেরে উঠার পর দিন দিন তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। অতঃপর চট্টগ্রামে তিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি হিসেবে পরিগণিত হন।

বর্ণক: সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল বখ্‌তেয়ার, সভাপতি, এন্তেজামিয়া কমিটি, গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।

ক্ষুধামুক্তির বিশ্ব প্রতীক

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ ভালবাসার শাশ্বত স্বরূপটি এভাবেই বাংলা ভাষার সূচনা পর্বের কবি ঈশ্বর পাট্‌নী নিজের জীবনদুঃখ ভুলে সন্তানের জন্য দুধভাতের একটা সুখময় জীবন ব্যবস্থার দাবী করেছিলেন। জগত জুড়ে হাজারো কোটি কণ্ঠে হাজার বছর ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে এ দাবী। শিক্ষা সভ্যতা, বিজ্ঞানের বিপুল আবিষ্কার উন্নয়ন সত্ত্বেও পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ আদম সন্তান মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য। সংখ্যা

বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের খাদ্য, পুষ্টি, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অভাব অনটন। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধ বিগ্রহ মানবিক সংকটকে করে তোলে আরও ভয়াবহ। ফলে তীব্রতর হয়েছে দীর্ঘ দুধভাতের দাবীটিও। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে দাবীটি ব্যাপকতায় গৃহীত হয়েছে, যার প্রমাণ যুগের বিশ্বঅলির কর্ম আচরণে পরিদর্শিত ও বিশ্ব ঘটনা প্রবাহে প্রতিফলিত। যেহেতু নবি অলিরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর কার্যাবলী দেখার আয়না স্বরূপ।

"খাওয়ার জন্য শিশুরা এখন একটু দুধ পাচ্ছে না। আমার হাসান মিঞা না বাঁচলে দুনিয়াতে কোন শিশু বাঁচবে না"। ১৯৭৩–৭৪ সালে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীকে বেশ ক'বার জজ্‌বা হালে এই কালাম (বাক্য) বলতে শোনা গেছে। গুঁড়ো দুধের বাজারে তখন দারুণ আকাল। দাম হু-হু করে বেড়ে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অবশেষে দাম দিলেও বাজারে দুধ ছিল দুষ্প্রাপ্য। দুধ পাওয়া প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। মায়ের দুধের বিকল্প গুঁড়ো দুধ। খাদ্য আমদানী, বাজারজাতকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব ছেড়ে বাতুল কাজে ব্যস্ত থাকায় সরকারকে এজন্য তিনি দায়ী করেন। তখন ৫ বছর বয়স্ক তাঁর একমাত্র ছেলেকে কেন যে সারা বিশ্বের কোটি কোটি শিশুর প্রাণপ্রতীক করেছিলেন সে রহস্য তিনিই ভাল জানেন।

ইথিওপিয়ার ত্রাণ শিবিরে খালি থালা হাতে খাদ্যের জন্য কান্নারত হাড়জিরজিরে একই বয়সের এক শিশুর ছবি বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে তোলপাড় তোলে অর্থাৎ দেশে দেশে রেডিও টেলিভিশন ও পত্র পত্রিকায় প্রচারিত হলে বিশ্ব গণমানসে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের খবরেও শিশুদের দুর্দশাই বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচার লাভ করে। দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের প্রতি সৃষ্ট মর্মবেদনাই বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করে।

ইন্টারনেট বিশ্বায়নঃ গরীবের ক্ষমতায়ন

অধ্যাত্ম ব্যক্তিবর্গ বাস্তবতা বিবর্জিত কোন কল্পলোকের বাসিন্দা নন। মানুষের সুখ-দুঃখ, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা ও সমাধানে তাঁরা অত্যন্ত সজাগ ও সংবেদনশীল। শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী তেমনি এক মহান ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৩ সালে পিতা কর্তৃক হাসানবাগ-এ (বর্তমান গাউসিয়া হক মন্জিল) আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলে শুরু হয় শাহানশাহ্'র স্বাধীন সাধনা ও প্রভাবমুক্ত কর্মতৎপরতা। ইতিপূর্বে দরজা-জানালা বন্ধ কক্ষে তিনি কী করতেন সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিপনী বিতানের ৪ তলার রেডিওনিক্স হতে তিনি ১২ ইঞ্চি সাদাকালো একটি টেলিভিশন কিনে দরবারে নিয়ে আসেন। '৭৭ সালে একই শ্রেণির দ্বিতীয় টেলিভিশনটি নিয়ে আসেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী সৈয়দ রফিউজ্জামানের বেতবুনিয়ার বাসা হতে। অতঃপর ৭৯-৮০ সালের মধ্যে ভক্তদের কাছ থেকে তিনি সাদাকালো ও রঙিন ৮টি টিভিসেট সংগ্রহ করেন। ২৪ ইঞ্চি মাপের সর্বশেষ টিভি সেটটি ঢাকার বিশিষ্ট ভক্ত মীর আহম্মদের দেওয়া। এই ১০টি টিভি সেট, ক'টি ট্রানজিস্টার, ২টি ফোনোগ্রাম ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কক্ষ অর্থাৎ পাকা একতলা বাসগৃহের গোটা চত্বর জুড়ে বসানো হয়। কোন কোন সময় সবগুলো একসঙ্গে চালু করে দিলে হুজরা শরিফ বিচিত্র শব্দে ভরে যেতো। সামনের কক্ষের পূর্ব-উত্তর কোণে রাখা বড় টিভিটি একটানা বছরের পর বছর ধরে চালু ছিল। গভীর রাতে অথবা ভোরে যখন বাংলাদেশ টেলিভিশন বন্ধ থাকতো তখনও সেটিতে অনুষ্ঠান দেখা যেতো। আবার দেশের টিভি কেন্দ্র চালু অবস্থায় সেটির অনুষ্ঠানশূন্য পর্দায় দেখা যেতো শুধু ইলেকট্রন-প্রোটনের ঝিলিমিলি। দু'পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে চোখের পলকে ঘন্টার পর ঘন্টা কী কী করতেন এবং মুখে বিড়বিড় করে কিছু বলতেন। '৮৮ সালের শেষ দিক পর্যন্ত তাঁর এ সব কার্যক্রম চালু থাকে।

শুরুতে বর্ণিত চোখ ইশারায় লেখা বইটি ছিল বাওবি'র 'অন্তিম স্বাধীনতা', অপর দিকে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর চোখের পলকের অপার স্বাধীনতা হলো, পরম করুণাময় স্রষ্টার মহাশক্তির অনন্তর গতিশীলতা। তিনি দাবী করেন, "আমার দরবার আন্তর্জাতিক সামরিক আইন প্রশাসক অফিস, দুনিয়ার সবকিছু আমি ভেঙে চুরে ঠিক করি"।

১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি। রাত বারোটা বেজে গেছে। প্রচণ্ড শীত। পরদিন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌র (ক.) পবিত্র উরস শরিফ। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তখন অবস্থান করছেন চট্টগ্রাম মহানগরীর ষোলশহর এক নম্বর গেইটের পূর্ব পার্শ্বে টাওয়ার হাউসে বিশিষ্ট শিল্পপতি মির্জা আবু আহমদ সাহেবের বাসায়। চারদিক নীরব-নিথর। বিরোধী দলগুলো পরদিন হরতাল ডেকেছে। ফলে আরো বেশী করে ঝিমিয়ে পড়েছে শহর। রাত্রি যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন।

গোটা প্রকৃতি, আকাশ-নক্ষত্র যেন কার আরাধনায় নিমগ্ন। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড যেন এক সৃজনশীল মৌনতায় রত। এই সুগভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে শোনা গেল বন্ধ দরোজা খোলার একটি শব্দ। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর সৌম্য-প্রশান্ত অবয়ব নিয়ে দন্ডায়মান হলেন দরোজায়। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাঁর গায়ে শুধু একটি গেঞ্জি। অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করেন যেন বহু দূরাগত বাণী: 'আমার এগুলো বুঝেন? আমার এগুলো সৃষ্টি ত্বরিকা'। সাবেক এমপিএ মীর্জা মনসুর, আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইন নিবাসী শেখ মুজিবুর রহমান বাবুলের সাথে সেখানে আরও ছিলেন এস.এম. মর্তুজা হোসাইন, অধ্যাপক কাজী ফরিদ উদ্দীন আকতার ও নোয়াখালীর আবদুল মালেক প্রমুখ।

কী এই সৃষ্টি-ত্বরিকা? মহাবিশ্বের প্রতি পলে পলে চলছে অন্তহীন এক সৃজন প্রক্রিয়া। আল্লাহ্‌র এই মখলুকাতে কোন কিছুরই ধ্বংস, কোন কিছুর বিনাশ নেই। যা আছে, তা হচ্ছে নিত্য নতুন পরিবর্তনের মাধ্যমে এক অনন্ত সৃজনশীল প্রক্রিয়া। কোন কিছু ধ্বংস হয় না, নতুন করে সৃজিত হয় মাত্র। এ কারণেই বুঝি আল্লাহ্ তায়ালার প্রধান গুণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে 'রব' শব্দটি, যার অর্থ সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকর্তা। যেখানে শুধু সৃজন পালন আর বিবর্তনের মাধ্যমে নব রূপায়ন। এই অন্তহীন সুন্দর প্রক্রিয়ার সাথে যারা নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারে, তারাই ধর্ম-জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সব মানুষকেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টিকূলকে ভালোবাসতে পারেন গভীর আবেগে ও শ্রদ্ধায়। আল্লাহ্‌র এই রব গুণে গুণান্বিত শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। এই চেতনা-প্রত্যয় আস্থা ও পালনবাদী দর্শন বা আদর্শ। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী কি 'সৃষ্টি ত্বরিকা' শব্দটি উচ্চারণ করে মহাবিশ্বের নিত্য

সক্রিয় অন্তহীন সৃজনশীলতা এবং সে সৃষ্টি ও সৃজনশীলতার প্রতিপালনের শাশ্বত নীতির কথাই বলে গেলেন?

আশির দশকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ বিভাগীয় টি এন্ড টি অফিসের প্রকৌশলী খবির উদ্দিন সাহেব দরবারে তাঁর সাথে দেখা করলে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমার এখানে একটি টেলিফোন দিতে পারবেন? সংযোগ দেওয়ার মত কাছাকাছি যে কোন এক্সচেঞ্জ নাই; প্রকৌশলীর বিনয়ী উত্তর। বাবাজানের পুনঃ প্রশ্ন, সংযোগ ছাড়া দিলে হয় না? সংযোগ ছাড়া টেলিফোন সম্ভব নয় জানালে বাবাজান 'হু' বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন।

বিশিষ্ট ভক্ত নুরুল আমিন কালু শাহ্ বলেন, এক গভীর রাতে হুজরা শরিফে তিনি কি করছেন দেখতে গেলে ডেকে বলেন, মামু সাহেব, আসুন খেলা দেখি। টিভির পর্দায় তখন ফ্রান্স-ব্রাজিল ফুটবল খেলা প্রদর্শিত হচ্ছিল। বাংলাদেশ টিভি কেন্দ্র রাত ১২টায় বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যাবল টিভি, ডিস এন্টেনার তখন জন্মই হয়নি। কোন সংযোগ ছাড়া কিভাবে এত দূরের দৃশ্য টিভিতে দেখা যাচ্ছে জানতে চাইলে বলেন, "আল্লাহ্র ইচ্ছায় সবই সম্ভব"।

আশির দশকের শুরুতে মাইক্রো কম্পিউটারের উদ্ভব ঘটে প্রতিনিয়ত সংস্করণের মাধ্যমে উন্নত অবদান রেখে চলেছে। ইন্টারনেটের জনক বলে খ্যাত ভিনটন সার্ফ ও সহকারী রবার্ট ক্যান দু'জনে মিলে যখন টিসিপি/আইপি উদ্ভাবন করেন তখন দু'জনার কারোরই ধারণা ছিল না এই প্রযুক্তি পরবর্তীকালে কি বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে। আমেরিকা অনলাইন ইনকর্পোরেটেডসহ ক'টি প্রতিষ্ঠান টিভি+ইন্টারনেট এক করার উদ্যোগ নিয়েছে। 'ক্যাবল ইন্টারনেট' প্রযুক্তি টেলিফোন লাইন ছাড়াই ঘরের টেলিভিশনে বিশ্ব টিভি চ্যানেলের সুবিধার একই সাথে কম্পিউটার ইন্টারনেট সুবিধাও দেবে[১]।

নব্বই দশকের শেষ দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় বাংলাদেশের এক কলেজ ছাত্র মাউস আর কি একটা যন্ত্র সংযুক্ত করে টেলিভিশনকেই কম্পিউটার টিভি দু'ভাবে ব্যবহারের প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছিল। যার সচিত্র সংবাদ দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। আমাদের দূর্ভাগ্য যে সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন মহলই কার্যকরী উদ্যোগ না নেওয়াতে বিপুল সম্ভাবনাময় হাজার হাজার ডলার আয়ের সুযোগটি ভেস্তে যায়। নব্বই এর দশকে সরাসরি কোন সংযোগ

ছাড়া মোবাইল টেলিফোন পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ বিপ্লব এনে দিয়েছে। যত দূরেই থাকুক প্রিয়জন, অফিস, কারখানা কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ রাখা আর কোন সমস্যা নয়।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে অধ্যাত্ম সাধকের কিসের সম্পর্ক? বিজ্ঞানীদের কষ্টার্জিত সফলতাকে কৌশলিক ব্যবহারে প্রিয় ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত করার জালিয়াতি নয় কি? আসলে ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার মত নয়। বিশ্বের তাবত সৃষ্টিজগত এক অটুট যোগসূত্রে বাঁধা। আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া একটি ধূলিকণাও নড়ে না। এই বিশ্বাস তারই প্রতিফলন। পবিত্র কোরআনের সূরা লোকমানের ২০ আয়াত, সূরা ফাতিহার ৬ আয়াত, রাসূল (দ.)'র কয়েকটি হাদিসে ('দয়াল দাতা বিশ্বঅলি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে গণমুখী সংস্কার' নিবন্ধে বিস্তারিত বর্ণিত) বিশ্ব সংস্কারক আল্লাহ্‌র মোজাদ্দেদ অলিদের কর্মক্ষমতা ও দাওরায়ে কামালিয়াত বা সময় বৃত্তের বর্ণনা রয়েছে। এই সময়বৃত্ত কোন হাদিসে একশ বছর, কোন হাদিসে পাঁচশ বছর এবং সর্বোচ্চ এক হাজার বছর বলে জানা যায়। সমকালের কামেল অলি হযরত মাওলানা আবদুল কুদ্দুস ভাণ্ডারীর (মা.জি.আ.) বর্ণনা মতে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর দাওরায়ে কামালিয়াত ১০০০ বৎসরব্যাপী। মৃত্যু জয়ী[২] এ মহান অলি উল্লাহ্‌র সৃষ্টি কল্যাণকর সংস্কার কার্যধারা নির্দিষ্ট সময়বৃত্ত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

১। তথ্য সূত্রঃ ক্যাবল টিভি থেকে ইন্টারনেট ঃ শত কোটি ডলারের হাতছানি, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯/১/২০০০ ঐ ইন্টারনেট + টিভি? ঐ।

২। সূত্রঃ কু:২:১৫৪ সূরা বাক্বারা, কু:৩:১৬৯ সূরা আল্ ইমরান।

শ্রম ও শিক্ষার বিশ্ব দুয়ার খোলে

১॥ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গোটা বিশ্ব ছিল ক'টি সাম্রাজ্যে বিভক্ত। তন্মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল সর্ববৃহৎ। ফলে একেকটি সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশ অথবা শহর বন্দরে যাতায়াত ও কর্মসুবিধা ছিল অবারিত বাধাহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়াব্যাপী অঞ্চলভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে এই সুবিধা সংকুচিত। স্বাধীনতার পর নিজেদের লোকের কর্মসৃষ্টির জন্য বহু বছর ধরে কর্মরত বিদেশীদের জোর করে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়। ভারত বিভক্তির পর বার্মা ও ভারত থেকে বিপুলসংখ্যক বাঙালি দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হয়।

তবে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কল-কারখানায় ব্যবসা বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালীর জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাংলাদেশীদের পাকিস্তান ছেড়ে স্বদেশে ফিরতে হয়। এভাবে বাংলাদেশের মত বহু স্বাধীন দেশে শ্রমজীবি মানুষেরা স্বদেশে গুটিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রসমূহ পরাজিত হলে তেল উৎপাদক রাষ্ট্র সমূহের সমিতি ওপেক তেলকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করে তেলের মূল্য পাঁচশত গুণ বৃদ্ধি ঘোষণা করে। ফলে তেল বিক্রির বিপুল অর্থভাণ্ডার স্ব স্ব দেশের উন্নয়নে প্রয়োগ করলে বাড়তি কর্মসৃষ্টি হয়। তখনো আরব দেশসমূহ স্বীকৃতি না দেওয়াতে ওসব দেশে আমাদের যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ১৯৭৪ সালে ভাগিনা মাহবুবুর রহমান (পিতা-মৃত বদিয়ার রহমান, সাং-সাপলংগা, উপজেলা-রাউজান। বর্তমান-১১৩ ফ্লোরা পাশ রোড, ঝাউতলা, চট্টগ্রাম) সৌদি আরবে ওমরা করার জন্য ভারতীয় নাগরিক দেখিয়ে একটি ভিসা সংগ্রহ করে।
ফলে ভারতের ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এর বিমানে যেতে হয়। মাহবুব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বলে সেখানে একটি চাকুরি পেয়ে যায়। চাকুরির ভিসা নিয়ে সে দেশে ফিরে। প্রথম যাত্রা এবং দ্বিতীয় যাত্রায় নিরাপদ সফরের জন্য শাহানশাহ্ বাবাজানের দোয়া চায়। আমিও সঙ্গে ছিলাম। বাবাজানের জন্য কি উপহার দ্রব্য আনবে জানতে চাইলে বলেন; 'আট আনা ওজনের দুটি সোনার আংটি আনবে'। তখন সৌদি আরবের দূতাবাস ছিল দিল্লীতে। দূতাবাসে ভিসা এন্ড্রোস এর জন্য দিলে জাল বলে বাতিল ঘোষণা করে। ফলে হোটেলে ফিরে ভাগিনা কেঁদে কেঁদে বাবাজানের উদ্দেশ্যে বলে আমি তো আপনাকে আরজি করে বিদেশের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে এসেছি; এখন কি আশা ভরসা ধুলিসাৎ হয়ে দেশে ফিরতে হবে? হোটেলে তার পাশের কক্ষে ছিল এক টেকনাফী সৌদি নাগরিক। তার পেরেশানি দেখে তার সাথে আলাপ করে বিষয়টা জেনে নেয়। অতঃপর সে ব্যক্তি দূতাবাসে জামিন হলে মাহবুবের বিপদ কেটে যায়। দু'জন একই ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এ সৌদি আরব পৌঁছে। দু'বছর পর দেশে ফিরে দরবারে গেলে বাবাজান দক্ষিণের গেইটে দাঁড়িয়ে ভাগিনা মাহবুবকে দেখে বলেন, 'আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি,

আমার আংটি দু'টি দিন'। ভাগিনা আশাতীত উপার্জন করে চট্টগ্রাম শহরে বাড়ি গাড়ির মালিক হয়েছে।

বর্ণক: সৈয়দ নুরুল গণি, পিতা- মৃত সৈয়দ শফিউল্লাহ্, সৈয়দ পাড়া, বক্তপুর, ফটিকছড়ি।

২॥ নোয়াখালীর সোনাগাজী উপজেলার দৌলতপুর নিবাসী নজির আহমদ জাহাজে চাকুরি করতো, নয় বছর চাকুরি করে টাকা জমিয়ে চট্টগ্রাম শহরে হযরত গরীব উল্লাহ্ শাহ্'র (র.) রওজার পশ্চিমে ডেবার পাড় নামক স্থানে ৪ গন্ডা জমি খরিদ করে। জমি খরিদের যোগাযোগটা গড়ে উঠে নোয়াখালীর এক লোকের মাধ্যমে লালখান বাজার বাগদাদ ফার্নিচারের মালিক আবদুল শুক্কুর এবং আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইনের সৈয়দ জিয়াউল হক প্রকাশ হক সাহেবের সাথে। তারা উভয়ের সাথে মিলামিশায় নজিরও শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর ভক্ত হয়ে যায়। নিজের ইচ্ছা এবার এমন লাইনের জাহাজে উঠবে যাতে আমেরিকার কোন বন্দরে নেমে যেতে পারে। তখন এইভাবে ছাড়া সেদেশে যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। বাবাজানের দরবারে সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্'র মাধ্যমে বার বার আর্জি পেশ করে। বখ্তেয়ার শাহ্ আশ্বস্ত করেন ধৈর্য ধর তোমার কাজ হবে।
জাহাজের অফিস হতে বার বার তাগাদা আসে। আমেরিকান লাইনের জাহাজ না পাওয়ায় নজিরও বার বার নানা অজুহাতে তাগাদা এড়ায়। বছরের পর বছর অপেক্ষা করাতে শ্বশুড় পক্ষসহ আত্মীয়রা ভুল বুঝে। ইতিমধ্যে দরবারের একনিষ্ঠ ভক্তি দেখে লোক সমাজে 'নজির ভাণ্ডারী' নাম প্রচারিত হয়। ফলে আত্মীয়দের ধারণা নজির সংসার বিরাগী হয়ে গেছে। অবশেষে ১৯৮৬ সালে একদিন বিকালে মাইজভাণ্ডার শরিফ গিয়ে শাহানশাহ্ বাবাজানকে একলা পেয়ে যায়। বাবাজান দোকান থেকে চা-নাস্তা আনতে নির্দেশ দিলে একটা ট্রেতে করে এনে দেয়। চা-নাস্তা খেলে ট্রেখানা বাবাজান নিকটস্থ পুকুরে ভাসিয়ে দেন। অতঃপর শহরের বাসায় পৌঁছে নজির ভাই আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ভাই! বাবাজান দয়া করেছেন এবার আমার বিদেশ যাওয়ার লাইন হবে। পরদিন আগ্রাবাদ অফিসে গিয়ে দেখে শেষবারের মত তাগাদা পত্রে আমেরিকান লাইনের জাহাজে চাকুরি হয়েছে। সে জাহাজে উঠে, জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরে ভিড়লে তথায় নেমে যায়। পরবর্তীকালে গ্রীণকার্ড পেয়ে শহরের জমি বিক্রয় করে স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাইকে আমেরিকা নিয়ে যায়।

বর্ণক: সামশুল আলম (একই বাসার সঙ্গী), গ্রাম- পাটিয়ালছড়ি, উপজেলা- ফটিকছড়ি।

৩॥ আমাদের বড় ছেলে বাহাদুর তখন ৮ম শ্রেণির ছাত্র। ছেলে স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে দেখে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী খুশিতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, 'আমার বাহাদুর মামা আমেরিকায় পড়বে, সেখানে কাজও করবে'। তখন আমার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, আমেরিকায় লেখাপড়ার খরচ যোগানো সম্ভব। অপর দিকে তখন আমেরিকা যাওয়ার কোন সুযোগও ছিল না। এটা **১৯৮৮** সালের ঘটনা। ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর তাঁর দয়ায় আমার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে ছেলের আমেরিকা যাওয়ার সুযোগও হয়ে যায়। সে নিজে গিয়ে দূতাবাসে লাইনে দাঁড়ালে শিক্ষা ভিসা পেয়ে যায়। ইতিমধ্যে স্বামীসহ এক মেয়ে আমেরিকা প্রবাসে থাকায় আমার কোন চিন্তাই করতে হয় নাই। ছেলে এম.বি.এ ডিগ্রী নিয়ে সেখানেই চাকুরিতে নিয়োজিত হয়েছে।

বর্ণক: আলহাজ্ব আকমল খান, পিতা- এডভোকেট আমানত খান, খান বাড়ি, পাঠানটুলি, চট্টগ্রাম।

প্রথম ঘটনা বিশ্লেষণে শাহানশাহ্ বাবাজানের কুতুবে ইরশাদ সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্ বলেন, অতীত যুগে রাজা বাদশা রাজদূতেরা সরকারি দলিলপত্র আংটি দিয়ে মোহর করতেন। দুই আংটি নিয়ে তিনি একাধিক দেশে যাতায়াতের অনুমোদন দিলেন। **১৯৭৪** সালে লাহোরে ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে কয়েকটি মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দিলে সেসব দেশে কর্মের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে সৌদি আরবও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। **১৯৭৪** সালের পর আরব দেশসমূহে যে বিপুল কর্মসৃষ্টি হয় তাতে সারা বিশ্বের কয়েক লক্ষ লোকের জীবিকার সুব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা জাহাজ থেকে নেমে পালিয়ে থাকা ছাড়া আমেরিকা যাওয়ার অন্য কোন সুযোগই তখন ছিল না। এভাবে বহু দেশের জাহাজীরা আমেরিকায় নেমে গিয়ে তথাকার নাগরিকত্বও পেয়ে যায়।

তৃতীয় ঘটনার পর নব্বই দশকের প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট সোভিয়েত রাশিয়ার পতনে স্নায়ুযুদ্ধের ঝুঁকি কমে গেলে নিজেদের দেশে শ্রমিক শূন্যতা পূরণে ডিভি কর্মসূচীর মাধ্যমে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আমেরিকা গমনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে লক্ষাধিক বাঙালিও রয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতার পর হতে এ পর্যন্ত প্রায় বিশ লক্ষাধিক বাঙালি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সাথে রয়েছে

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষা ও গবেষণায়। পরবর্তীকালে বাণিজ্যের বিশ্বায়নে পুঁজির অবাধ বিচরণের একই বরাবরে শ্রমের অবাধ বিচরণে ভিসামুক্ত বিশ্বের দাবি উঠেছে। সে দাবি ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে।

মরিয়া জাগিল প্রাণ

চট্টগ্রাম শহরে জি ই সি মোড়ে সৈয়দ মর্তুজা হোসেনের ইফ্‌কো কমপ্লেক্স হাউসে তিনি দু'চার দিন কখনো বা তারও বেশী দিন এসে থাকতেন। আমিও সেখানে ভাড়ায় থাকতাম। চুরাশির সতের এপ্রিল সকালে কাজে বের হতে তাঁর সাথে দেখা করি। হাতের আন্দাজে কত বড় হবে তা দেখিয়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় আমাকে বলেন, "মামু সাহেব টুয়েনটি টু টুয়েনটি ফাইভ (বিশ হতে পঁচিশ) সের ওজনের একটা বড় মাছ কিনে আনতে পারবেন কি"? সম্মতি জানিয়ে বললাম, চেষ্টা করবো। চকবাজার, বক্সিরহাট ঘুরে রেয়াজউদ্দিন বাজারে এসে এগার সের ওজনের একটা কাতাল মাছ পেয়ে সেটাই কিনে নিলাম। কাপ্তাই লেকের হিমায়িত বরফ দেয়া মাছ। সম্ভবতঃ ২/১ দিন আগেই ধরা হয়েছে। তাঁর নিকট উপস্থিত হলে জিজ্ঞাসা করেন, "মাছটা কি জীবিত"? হিমায়িত মরা মাছ বলে জানালাম। থলে থেকে বের করতে নির্দেশ দিলে মাছটা আমার দু'হাতের উপর পাঁজাকোলা করে নিলাম। লক্ষ্য করি যে, মাছটি মুখ কান নাড়ছে – আস্ত একটা জীবন্ত মাছ। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। হিমায়িত মরা মাছ – আমি তো দেখে শুনেই কিনেছি। এটা আবার জীবন্ত হলো কিভাবে! তবে কি এ মহান অলির বাক্যে কোন মৃত সঞ্জীবনী শক্তি আছে? নিশ্চয় তাই। এ দৃশ্য দেখে বাড়ির মালিক ও আমি স্থির (ফ্রিজ) চিত্রের মত অনেকক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর ডাকে হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জাগলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'মাছটা দরবার শরিফ দিয়ে আসুন'। নিজে গিয়ে পৌঁছে দিলাম। পাক করা মাছ তাঁর জন্য শহরে পাঠালে আমাদের বাসায়ও কিছু দেওয়া হয়। খেয়ে দেখি পুকুরের তরতাজা মাছের স্বাদ। তিনিও বলেন, 'মাছটা ভাল স্বাদ হয়েছে। পাওয়া গেলে বড় দেখে আরেকটা কিনে আনবেন'। আমি 'আচ্ছা' বলে সম্মতি জানাই।

বর্ণক: আলহাজ্ব এম.এ. মনসুর, পিতা- কবির আহমদ সওদাগর, পশ্চিম ফরহাদাবাদ, থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান- মনসুর ভবন, ১ নং গলি, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম।

ধপ্ করে কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ শোনা গেল। তখনো সকাল হয় নি। সবাই ঘুমে। কিছুক্ষণ পূর্বে জেগে হুজরার দিকে গেলে বাবাজান কাছে ডেকে আলাপ জুড়ে দেন। পতনের শব্দে বড় কাচারিতে যারা ঘুমিয়েছিলেন সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্, মফিজুল ইসলাম, আমিনুর রহমান সওদাগর, মাহবুব আলী তালুকদার, সৈয়দ জিয়াউল হক (হক সাহেব), সৈয়দ রফিকুল হোসাইন, আয়ুব আলী সওদাগর, মাওলানা সৈয়দ জহুরুল কাদের আজাদ, তাহের উদ্দিন, মোহাম্মদ নুরুচ্ছাপা, সৈয়দ মসিউদ্দৌলাহ্, মাওলানা মোহাম্মদ হাসান, জামাল আহমদ সিকদারসহ সবাই জেগে উঠেন। তেরশ' পঁচিশ বঙ্গাব্দের দশ পৌষ খোশরোজ শরিফের তিন দিন পরের ঘটনা। বাবাজান কী হয়েছে জানতে চাইলে বললাম, বড় গয়ালটা বোধ হয় পড়ে গেল। গত দু'দিন সেটার অসুখ। এজন্য ছোট কাচারির উত্তর পাশে অস্থায়ী ঘরে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এ গয়াল পবিত্র খোশরোজে আয়ুব আলী সওদাগরের প্রদত্ত হাদিয়া। মফিজ সাহেব (এন্তেজামিয়া কমিটির তখনকার সম্পাদক) রাতে পশু ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিয়ে ইন্জেকশান দেওয়ান। একটু জজ্বাহালে বাবাজান বলেন, 'কার হুকুমে ইন্জেকশান করা হলো? আমার গয়ালের অসুখ কেন আমাকে জানানো হলো না'। দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে বলেন, 'হক সাহেব কোথায়? একটা বড় ছুরি আনো'। ছুরিখানা হক সাহেবকে দিয়ে বলেন, 'জবেহ করে দাও'। আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল গয়ালটা মারা গেছে। তাই উপস্থিত সকলের মনের প্রশ্ন, 'মরা পশু জবেহ করে কী হবে!' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'গয়াল কি মারা গেছে'? কেউ জবাব দেয়ার পূর্বে নিজেই উত্তর দেন, 'না মরে নাই'। গয়ালের গলায় ছুরি চালাতে উচ্চস্বরে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠতে সকলে প্রতিধ্বনি করেন। রক্ত নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত ছুরি চলে না। তিনি নির্দেশ দেন, 'ছুরি চাপ দাও আরও, আরো একটু', অতঃপর বলেন, 'এখন বন্ধ করো'। কল্কলিয়ে বেরিয়ে আসে তাজা রক্ত। পা ছুড়ে, মাথা নেড়ে গয়াল নিজেই জানায় যে, সে মরা নয়।

বর্ণক: সৈয়দ ওবায়দুল আকবর, পিতা- মরহুম সৈয়দ মুসলিম হোসেন, সৈয়দ পাড়া, গ্রাম- বক্তপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

১৯৮৮ সালের ঘটনা। বাবাজান আমাদের বাড়িতে তশরিফ আনলে আমি আজাদী বাজার হতে কিছু সওদা করে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে শুনলাম আমাদের এক আত্মীয় হাবিলাশ তালুকদার বাড়ির ইসহাক মাস্টার বিষ খেয়েছে। বাড়ি ফিরে বাবাজানকে বললাম, ইসহাক মাস্টার আপনার ভক্ত। এভাবে মারা গেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এতিম হয়ে ভীষণ কষ্ট পাবে। বাবাজান আমার আব্বা আবদুল মাবুদ সাহেবকে বললেন, 'আপনি গিয়ে লোকটাকে একটু দেখে আসুন'। তিনি উত্তর দিলেন, আমি গেলে কি লাভ হবে? আপনি গেলেই তো ভাল হয়। বাবাজান পুনঃ বলেন, 'আপনি গিয়ে ফু দিলে ভাল হয়ে যাবে'। অতঃপর বাবা গিয়ে ফু দিলে ইসহাক মাস্টার সেরে উঠে।
সেদিনও বাবাজান আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। রাত ২টার সময় তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি ঘুম থাকাতে আব্বা রুম থেকে বের হয়ে দেখা করলেন। বাবাজান কিছু ছাই সংগ্রহ করে দিতে বলেন। আমার আব্বা ছাই নিয়ে দিলে ৮/৯ বছরের মফিজ নামের আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাইগুলো আমার রুমের আনুমানিক ২ হাত দূরে ছিটিয়ে দিতে হুকুম করেন। ছেলেটা হুকুম তামিল করে। এমন সময় বাবাজান অট্টহাসিতে বলেন, 'বিষ পানি করছি'। সকাল পর্যন্ত আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি। মানিক নামের এক ছেলে এসে ঘটনা বর্ণনা করে।

আমাদের বাড়িতে তশরিফ আনলে লস্কর বাড়ির আবদুল কুদ্দুস বাবাজানের আদেশকৃত ২টি পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্ট নিয়ে প্রায় হাজির হতেন। এক পারিবারিক ঘটনায় রাগের চোটে এই ব্যক্তি এক রাতে ৪০টি ঘুমের বড়ি কিনে ৩৯টি খেয়ে আত্মহত্যা করে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় ১টি ট্যাবলেট খেতে পারে নি। সবাই মনে করেছে মারা গেছে। ঘটনাটি বাবাজানকে জানালে তিনি আমাকে তাঁর পা টিপে দিতে হুকুম করেন। আমি খেদমতে রত হলে বলেন, 'কুদ্দুস বেঁচে যাবে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই'। ভোর ৪টার পর কুদ্দুছের দেহে প্রাণের সাড়া মেলে। আত্মীয় স্বজনেরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। সেখান থেকে পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে।

বর্ণক: এস.এম. হেলাল উদ্দিন, শিক্ষক, পশ্চিম নিচিন্তাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিতা- এস.এম. আবদুল মাবুদ, গ্রাম- দক্ষিণ ধর্মপুর, উপজেলা- ফটিকছড়ি।

আমার তৃতীয় ছেলে নাজিম উদ্দিন তখন ফটিকছড়ি জামেউল উলুম মাদ্‌রাসায় আলিম সমাপনী বর্ষের ছাত্র। ১৩৯৪ বাংলা সনের ২০ ফাল্‌গুন বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ১০ মিনিটে হাসপাতাল নেওয়ার পথে রক্ত বমি হয়ে সে মারা যায়। বার্মা প্রবাসী এক মামার পরিত্যক্ত জমি নিয়ে ছোট ভাইয়ের সাথে আমার মামলা মোকদ্দমা দ্বন্দ্ব সংঘাত ছিল। কোনভাবে পেরে না উঠে সে যাদুর মৃত্যুবাণ মেরে এই তরতাজা ছেলেটিকে মেরে ফেলে। অতঃপর চতুর্থ ছেলে ফটিকছড়ি করোনেশান হাই স্কুলের ৮ম শ্রেণির ছাত্র ফরিদ উদ্দিনকে একই মৃত্যুবাণ হানে। দুজন এমবিবিএস ডাক্তার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় কোন রোগ নির্ণয়ে সক্ষম না হয়ে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় কাজ হবে না ভেবে ঝাড় ফুঁক বৈদ্য এনে তাবিজ দেয়ার ব্যবস্থা করি। ফলে তিন দিন একটু সুস্থ থাকে। তারপর দিন শত চেষ্টা করেও তিন বৈদ্য রোগীকে হুঁশ করতে পারল না। অবেশেষে তারা বলল, শক্ত মৃত্যুবাণ মারা হয়েছে আমাদের ক্ষমতার বাইরে। দু'ঘন্টার মধ্যে রোগী মারা যাবে।

বাড়িতে তখন দারুণ শঙ্কা ও শোকাকুল অস্থিরতা। সবাই ধৈর্যহারা, ছেলের মা বোনের আহাজারিতে আল্লাহ্‌র আরশও বুঝি কাঁপছিল। এক তরতাজা ছেলের মৃত্যু শোক না ভুলতে আরেক ছেলে মরণগামী, মনকে কী করে প্রবোধ দিই। কান্নার শোরশব্দে উঠানে বহুলোক জমা হয়। ভিড়ের মধ্যে নাজিরহাটের সবজি ব্যবসায়ী আবু তাহের বলেন, মাইজভাণ্ডারী হক বাবাজান নিতে বলেছেন। তাড়াতাড়ি বিবিরহাট হতে দু'খানা ট্যাক্সি এনে ছেলের নানাবাড়ি বড় ছিলনীয়া হতে ভাণ্ডার শরিফ রওয়ানা হই। উল্লেখ্য যে, চিকিৎসার গোপনীয়তার জন্য ছেলেকে আমার শ্বশুর বাড়িতে রেখেছিলাম। এক ট্যাক্সিতে ছেলের দুই সহপাঠি ছাত্র ইকবাল ইউসুফ ও লোকমান হোসাইন ফরিদকে লম্বা করে কোলে নেয়। অপর ট্যাক্সিতে আমার পরিবার ও আমি। সঙ্গী লোকজন বারবার নিঃশ্বাস পরীক্ষা করছিল। নাজিরহাট পর্যন্ত পৌঁছতে রোগীর মুখে ফেনা এসে নিঃশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ। আমার সারা শরীর কাঁপতে আরম্ভ করে। তবু এক আকুল বিশ্বাসে কাঁদতে কাঁদতে দরবার শরিফ পৌঁছলাম। ট্যাক্সি গাউসিয়া হক মন্‌জিলে থামতেই সঙ্গীরা মাইজভাণ্ডার শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নুরুল ইসলাম ফোরকানী সাহেবকে ডেকে নিয়ে হুজরা শরিফের পূর্বের জানালায় দাঁড়ালাম। সঙ্গীরা রোগীকে পাঁজাকোলা করে হাতের উপর জানালা বরাবর তুলে ধরে।

ফোরকানী সাহেব আরজি করেন, 'আপনি আল্লাহ্‌র শাহানশাহ্ অলি, মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে দিয়েছেন, বাবাজান আমরা এই ছেলের জীবন ভিক্ষা চাই' বলে সবাই কাঁদতে থাকি। আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি বিছানা হতে উঠে জানালার কাছে এসে রোগীর মাথায় একটুখানি স্পর্শ করে বলেন, 'বাইরে থেকে একটু বাতাস খেয়ে এসো'। এই একটি মাত্র বাক্যে লাশের শরীরে প্রাণের সঞ্চার হয়। মাটিতে দাঁড় করালে আস্তে আস্তে সে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। দু'পাশ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে মসজিদের সামনে আনলে সে ডাব ও কলা চেয়ে খায়। উপস্থিত লোকের বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা, 'মরিয়া জাগিল প্রাণ, এ কেমন কথা'। সুস্থ শরীরে লেখাপড়া শেষ করে ফরিদ সৌদি আরবে ব্যবসা বাণিজ্য করে পরবর্তীকালে সুখী সংসারী হয়।

বর্ণক: আলহাজ্ব আবুল বশর সওদাগর, জুতার দোকান, দরগাহ রোড, বিবিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুল হক চৌধুরীর বড় ছেলে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়া অবস্থায় এক জটিল রোগে মৃত্যুবরণ করেন। চিকিৎসকমণ্ডলী রোগ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন। একই পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান শাহেদ আলী চৌধুরীও সম্ভবত: একটি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসা শেষ করে ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল) ভর্তি হন। সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ডাক্তারেরা বললেন, আমাদের সব চেষ্টা শেষ। এ রোগের কোন ঔষধ এখনো আবিষ্কার হয় নি; তাই ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যা চায় খেতে দেবেন; রোগী আর বেশি দিন বাঁচবে না। ঢাকা থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলে মা-চাচা-চাচী ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের বুকভাসানো কান্নার রোল উঠে। উপযুক্ত এক ছেলে কিছুদিন আগে চলে গেল এখন আরেকজন মৃত্যুপথ যাত্রী। তরল খাদ্য ছাড়া রোগী কিছুই খেতে পারে না; শরীর শুকিয়ে হাড্ডিসার, খুবই দূর্বল। অকালে মৃত্যুর নিশ্চিত পরওয়ানা পাওয়া ব্যক্তির মনের কী অবস্থা হতে পারে তা অন্যের বুঝার ব্যাপার নয়। মা জীবনের প্রত্যাশায় ছেলেকে নিয়ে একদা হাজির হলেন হক মন্‌জিলে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর দরবারে। মা ভাই ও রোগী নিজে অঝোর কান্নায় বুক ভাসিয়ে আর্জি করলেন, হে বিশ্ব অলি, জগতের শাহানশাহ্

রাজাধিরাজ। লওহ মাহ্ফুজে (বরাদ্দ লিপি) না থাকলেও আপনি চাইলে মৃতকে জীবন নিয়ে দিতে পারেন; আল্লাহ্ তায়ালা তো আপনাকে কুন্ ফায়াকুনের (হওও বলা মাত্র হয়ে যাওয়া) ক্ষমতা দিয়েছেন; আপনার অবারিত দয়ায় জীবন ভিক্ষা চাই। বাবাজান কিছু না বললেও দরবারে রোগীকে রেখে মা বুকভরা আশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। শাহেদ আলী চৌধুরী দরবারে আগত ঘনিষ্ঠ আশেক ভক্তদেরও নিজের জন্য বাবাজানের নিকট আর্জি আবেদন জানাতে অনুরোধ করতে থাকেন। এভাবে ছয়মাস পর একদা ফজর নামাযের পূর্বে হুজরা শরিফের নিকট গেলে দেখি বাবাজান দু'কদমের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর বসে নাস্তা করছেন, বাইরে শাহেদ চৌধুরী দাঁড়ানো। বাবাজান জিজ্ঞাসা করলেন, শাহেদ আলী মামু, আপনি কামাল মামুকে চিনেন? চৌধুরী চিনে বলে উত্তর দিলে বললেন, কামাল মামুর জন্য চা-নাস্তা নিয়ে আসুন। তখন মসজিদ পুকুরের উত্তর পাড়ে চায়ের দোকান ছিল। শাহেদ চৌধুরী ট্রেতে করে দোকান থেকে চা-নাস্তা এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম বাবাজান না বলা পর্যন্ত কিছুই খাবো না। তৎক্ষণাৎ বাবাজান নির্দেশ দিলেন, চা নাস্তা নিন। সুযোগ পেয়ে আর্জি করলাম, বাবাজান, মামা শাহেদ আলী অনেকদিন ধরে অসুখে কষ্ট পাচ্ছে। ঢাকার পিজি হাসপাতাল ফেরত দিয়েছে; কোন আশা নেই, আশ্রয় নেই। আপনার আশ্রয়ে এসেছে আপনি তার সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিন। তিনি কালাম করলেন, 'জী, ভাল হয়ে যাবে'। ক'দিন পর দরবারের ময়ূরখিল খামারে গিয়ে কিছুদিন থাকার জন্য বাবাজান আদেশ দিলে চৌধুরী সেখানে চলে যান। নির্দিষ্ট সময়ের পরে একদা লোক পাঠিয়ে আবার দরবারে আনিয়ে নেন। অতঃপর বাড়ি গিয়ে আরাম করতে আদেশ দিলে বাড়িতে অল্পদিনের মধ্যে শাহেদ চৌধুরী পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মৃত্যু পরওয়ানা মিথ্যা প্রমাণ করে সে রোগী আজবধি শুধু সুস্থ নয়, ইতিমধ্যে বিবাহিত জীবনে দু'সন্তানের জনকও। পরবর্তীকালে একনিষ্ঠ কর্ম ও সেবায় শাহেদ আলী চৌধুরী মন্‌জিলের কেন্দ্রিয় পর্ষদের সদস্যপদ লাভ করেন। **বর্ণক: 'ক'**।

দয়ার দান তিন সন্তান

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে আমার বিয়ে হয়। সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর আমাদের কোন সন্তান হয় নি। বাবাজানের কাছে অনেকবার সামনা-সামনি আর্জি করেছি। সবসময় বলতেন, 'হবে, দেব'। কিন্তু পুরুষ লোকেরা যেমন ধৈর্যশীল মেয়ে লোকেরা তেমন ধৈর্য ধরতে পারে না। তাই স্ত্রীও বার বার বাবাজান ও মা'জানকে বিরক্ত করে। মা'জানও খুবই চিন্তায় ছিলেন এবং নিজেও বাবাজানের কছে খাস্ আর্জি করেন। আমাকে অনেক লোক পরামর্শ দিয়েছে আরেকটা বিয়ে করে যেন সন্তানের বাবা হই। কিন্তু আমার ভিতর সে চিন্তাধারা উদয় হয় না। আমি বাবাজানের কালামের উপর বিশ্বাসে নির্ভর করে থাকি। যারা আমাকে আর এক বিবাহ করার জন্য পরামর্শ দিত তাদেরকে বলতাম যদি ঐটাতেও না হয়, তারপর কী হবে। হলে এটাতে হবে, না হওয়ার থাকলে না হবে, তাতে কী আছে? আমি যখন পৈত্রিক ভিটায় পাকা দালান নির্মাণ করি লোকে আমাকে বলে তোমার কোন ছেলেপুলে নেই অত টাকা খরচ করে পাকা ঘর কেন করছো?

আমি উত্তরে বলতাম আমার ছেলেমেয়ে এখন না থাকলেও আল্লাহ্র হুকুমে বাবাজান মেহেরবাণী করলে হতেও পারে। অগত্যা যদি নাও হয় ঘর বানালে আমাদের পরিবারের সবাই থাকবে। কত নতুন জন্মিবে, কত লোকের শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ হবে এই ঘরে, এটাই হবে আমার সন্তুষ্টি। আমার বয়স ৪৭ বৎসর এবং আমার মা-এর বয়স ৭৫ বৎসর এর উর্ধ্বে। এখনও আমরা চাচা, চাচী, চাচাত ভাই, চাচাত বোন, চাচাত ভাইয়ের বউ সবাইকে নিয়ে একত্রে বসবাস করে এক পাকে খাওয়া দাওয়া করি। বর্তমানে এরকম থাকাটা রীতিমত বিরল। এজন্যই বলতাম, আমার যদি পরবর্তী কালে কেউ নাও থাকে ওরাই থাকবে ঐ ঘরে। পাকা ঘরটি তৈরি করার আগে বাবাজান আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'মামু আপনাদের ঘর কি দালান'? আমি বলতাম বাবাজান আমাদের ঘর তো গুদাম ঘর টিনের ছাউনি। আপনি যদি মেহেরবানী করেন তাহলে দালান ঘর বানাতে পারবো। ঘর তৈরি হওয়ার পর ঢোকার জন্য মেজবানের আয়োজন করে আর্জি করলাম– বাবাজান আগামী শুক্রবার আমাদের বাড়িতে মেজবান। আপনি মেহেরবানী করে তশরিফ নিলে খুবই খুশী হবো। বাবাজান কালাম করলেন, "আচ্ছাজি"।

মেজবানের দিন সকালে বাড়িতে মেহমানেরা আসছে দেখে সকাল সকাল আমি বাবাজানের কাছে যাই। বাবাজান তখন রুমের মধ্যে পায়চারি করছেন। ঘরের পূর্ব পার্শ্বের জানালায় গিয়ে আরজ করলাম– বাবাজান আজকে তো আমাদের বাড়িতে মেজবান, আপনাকে নিতে এসেছি। বাবাজান কালাম করলেন, "আজকে তো শুক্রবার অনেক লোক আসবে। তাদের সাথে একটু আলাপ-সালাপ করতে হয়। তারা যদি আমাকে না পায় মনে কষ্ট আনবে। আমিতো আপনাদের বাড়িতে সবসময় যাই। আজকে যাব না। আজকে আপনার ফুফু এবং কানিজদেরকে নিয়ে যান"। আন্দর বাড়িতে মা জানকে সবকিছু খুলে বললাম। মা জান বললেন, ঠিক আছে চল আমরা যাই। এই প্রথমবার মা জান আমাদের বাড়িতে তশরিফ নিলেন। বাবাজানের মেহেরবাণীতে সমস্ত মেহমানের সন্তুষ্টি মত খানা খাওয়ানোর পর এক বড় ডেকচি মাংস এবং দুই বৈঠা ভাত বেঁচে যায়। তা বাড়ির লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিই। বার বার আবেদনে একদিন ব্যাটারী গলিতে ব্যাটারী কোম্পানীর ঘরে বাবাজান রাগচ্ছলে কালাম করলেন, "আরও ধৈর্য ধরতে হবে, আরও কষ্ট করতে হবে"। এর ভিতর কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত তাবিজ শেষ করেছি তার কোন ইয়ত্তা নেই। কোন কিছুরই কোন ফল হয় না। সরওয়ার চৌধুরী নামের আমার এক পরম বন্ধু খবর দিল তার হাতে একটি তিন মাসের মেয়ে আছে। ভাল মানুষ পেলে পালক দিবে, আমারও লোভ লাগল, আমি তাকে পালবো। ঘরে ফিরার সময় বড় ছোট টাওয়াল, বাচ্চার কাপড় সব কিনে নিয়ে গেলাম। বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে বললাম তিন মাসের একটা মেয়ে পেয়েছি, তাকে পালন করার জন্য বাজার করেছি। সে আমাকে বলল, 'আমি পরের কোন ছেলেমেয়ে পালবো না। নিজের হলে হবে, না হলে হবে না'। তার কথার উপর আর আমি কোন কথা বললাম না।

১৪ বৎসর ৭ মাস পর ১৯৮৮ ইং সেপ্টেম্বর মাসে বাবাজানের অশেষ মেহেরবাণীতে আমাদের প্রথম মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাবাজানের ওফাতের সপ্তাহ পূর্বে জিজ্ঞেস করলাম– আপনি যে মেয়েটি দিয়েছেন তার একটা নাম দিলে ভাল হয়। বাবাজান কালাম করলেন, 'নীহার রাখেন, নীহার' – মেয়ের নাম রাখলাম নীহার আখতার। তাঁর মেহেরবাণীতে আমাদের ২ মেয়ে ১ ছেলে হয়েছে।

বর্ণক: (ক ও খ), কামাল উদ্দিন আহম্মদ, পিতা- মরহুম মুহম্মদ ইউনুছ মিয়া, চাঁদগাজী সিকদার বাড়ি, গ্রাম- ইমাম নগর, দৌলতপুর, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

বিজ্ঞান যেখানে পরাভব মানে

"ভাণ্ডারী যেদিকে তাকায়, যাদের দিকে তাকায়, তাদের কি কোন অসুবিধা হতে পারে"?

বাবাজান শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এ মহান অভয়বাণী তাঁর অবারিত করুণাধারার এক অনিশেষ বাঙময় রূপ। যা তাঁর আশেক-ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিপদে শত বিপদ দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করে। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ের যে কোন একদিন আমাদের গ্রামের বাড়ি বাঁশখালীর কালীপুরে তশরিফ রত অবস্থায় বাবাজান আমি এই অধমকে দিয়েছিলেন এ অভয়বাণী।

সে অভয়বাণী বাবাজানের লক্ষ লক্ষ ভক্তের জীবনে একেক সময় একেকভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আমি তাঁর দয়ার্দ্র প্রত্যক্ষ প্রকাশ যেভাবে পেয়েছি তাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট যে, আল্লাহ্‌র কামেল অলি যা দেখেন তা আল্লাহ্ নিজেই দেখেন এবং কামেল অলির জবান থেকে নিঃসৃত বাণী আল্লাহ্‌র বাণী হয়ে যায়– আর তখনই আল্লাহ্‌র সেই অলি হাজার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারে হাত দিতে পারেন, নজর হিসাবে আনা বিরাটাকার মরা মাছ পুকুরে ছাড়ার হুকুম প্রদানের সাথে সাথে পানিতে পড়েই প্রাণ ফিরে পেয়ে গভীর পানিতে চলে যায়। তখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা স্থবির – চলে না, সবকিছু মিথ্যা হয়ে যায়। সত্য শুধু জাজ্বল্যমান হয় আল্লাহ্‌র রাহে আল্লাহ্‌র অলির কৃপা দৃষ্টিতে।

১৯৮৫ সাল। বাবাজান আমাদের বাড়িতে তশরিফ রাখার পর দশ বছর গত হয়ে গেছে। আমি তখন ইস্পাহানী পাহাড়তলী টেক্সটাইলের ইনচার্জ ম্যানেজার এডমিনিস্ট্রেশন। একদিন হঠাৎ করে সংবাদ পেলাম মেজো ভাই–প্রিন্সিপাল জহির উদ্দিন অসুস্থ, তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে এসে ছোট ভাই প্রফেসর নাজিমের কাছে যা শুনলাম, তাতে বুক কেঁপে উঠল। শুনলাম তিনি দীর্ঘদিন ধরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাচ্ছিলেন; কলেজ ও বাড়ি ফেলে শহরে আসতে চান না। অবস্থা খারাপ ঠেকাতে তাঁকে জোর করে শহরে নিয়ে এসেছে। ডা. মান্নান সিকদারের প্যাথলজী থেকে ৩/৪ দিন পর বায়োপ্সি রিপোর্ট নিলাম। রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের সাথে আলাপের পর জানতে পারলাম ক্যান্সার। মাথার উপর সমস্ত পৃথিবী দোলে উঠল। সেই আমার ছেলে বেলা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। কতো কথা কতো স্মৃতি। একের পর এক ভাসতে লাগলো। ছোট ভাই নাজিমের চোখে না পড়ার মতো, চোখের পানি

অনেক কষ্টে চাপতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, প্রবল স্রোত বাঁধ মানে না। কোন কথা নয়, একে অপরের দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মেজো ভাইয়ের কাছে চলে আসলাম। তাঁকে কিছুই বুঝতে দিলাম না। বললাম, রিপোর্ট ডাক্তারের কাছে।
মেজো ভাই কখনো ধার্মিকতায় বেশী অনুরক্ত ছিলেন না। নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁর চাইতে অধিক অনুরক্ত ছিলাম বলতে পারবো না। তিনি বামপন্থী রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আমিও তাই। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিক অথবা ৭৩ সালের শেষ দিকে মামার বাড়িতে আমার বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে বাবাজানের কাছে শুভাশুভ জানতে চাওয়া থেকে কিছুটা ভাবিত হয়েছি, তাই'ই ৭৫ এর শুরুতে বিয়ের পর জাগরুক হয়। মেজো ভাইয়ের মধ্যে ধার্মিকতা না থাকলেও বাবাজান যখনই আমাদের বাড়ি তশরিফ রাখতেন পরিবারের আর সবার সাথে তিনিও তাঁর খেদমতে অসম্ভব আন্তরিকতার সাথে নিয়োজিত থাকতেন।
৬ সেপ্টেম্বর তারিখে মেডিকেলে ভর্তি করার ৩/৪ দিনের মাথায় রিপোর্ট পেলে আমি সম্ভবত: তার ২/১ দিন পরই মেজো ভাইয়ের নিজের টাকা খুঁজে, একশো টাকা নিলাম। তিনি বুঝলেন আমি এ টাকা কেন নিলাম। হাসলেন, কিছু বললেন না– যেন যাচ্ছ যাও ধরণের মনোভাব। যতটুকু মনে পড়ে বিকেলের দিকে পৌঁছে বাবাজানের ঘরের পশ্চিমের জানালা দিয়ে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম এতো গরমে বাবাজান নিচের বিছানায় আপাদমস্তক ডাবল কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। খাদেম রফিক বা ইব্রাহীম ২/৩ বার আমার কাছে এসে বাবাজানকে ডাকতে চাইলো। কিন্তু আমি রাজী না হওয়ায় তারা ফিরে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর তিনি কম্বল মাথা থেকে সরিয়ে সরাসরি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “মামু সাহেব না, কখন এসেছেন, ভালো আছেন তো”? আমি তাড়াতাড়ি তসলিম জানিয়ে মেজো ভাইয়ের কাছ থেকে নেয়া একশ টাকার নোট হাতে নিয়ে তাঁকে দিতে চাইলাম। উত্তরে তিনি তা নেবার অনাগ্রহ প্রকাশ করলেন। “টাকা লাগবে না। আমার অনেক টাকা আছে”। আমি আর আমার আবেগ ধরে রাখতে পারলাম না। ডুঁকরে কেঁদে উঠলাম। বাবাজান এ নজর আপনি নেবেন না? আমার মেজো ভাইয়ের অসুখ, ক্যান্সার। এবার বাবাজান দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে? জহির মামা’? বলতে বলতে জানালায় চলে আসলেন এবং অনুগ্রহ করে আমার দেয়া ভাইয়ের নজরের সামান্য টাকাটা

গ্রহণ করে আমাকে চলে আসতে বললেন। আমি অত্যন্ত নিশ্চিত মনে দরবার শরিফ থেকে ফিরে এসে ভাইকে বললাম, আপনি সুস্থ হবেন। উনি হাসলেন।
তারপর এক দেড় মাস গত হয়ে গেলো। কিন্তু উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেলনা। তিনি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে লাগলেন। একদিন চিন্তা করলাম মেজোভাইকে বাবাজানের কদমে হাজির করবো। নির্ধারিত সময়ে গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম। হাসপাতালে তার সিটে অন্য এক লোক দেখে বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কিন্তু না। তিনি বাইরে বারান্দায় ছিলেন। আমি কাছে যেতেই সিটে ফিরে এসে বললেন, 'আমার কলেজের কেরানী হিমাংশু। তুমি তো চিনো– তার নাকি ব্লাড ক্যান্সার, প্রফেসার নুরুল ইসলাম বলেছেন। তাকে একটু দরবার শরিফে নেবে'? মেজো ভাইয়ের মধ্যে পরিবর্তন দেখে ভালো লাগলো। বললাম, কেন নয়? গাড়িতে জায়গা হবে। মাইজভাণ্ডার শরিফে সব জাতি সব ধর্মের লোকেরই তো সমান মর্যাদা। মানবতাবোধ-মানবধর্ম সেখানে মুখ্য। বর্ণ-গোত্র বা সামাজিক অবস্থানের কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান। সবাই এক স্রষ্টার সৃষ্টি।
পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মেজোভাই এবং হিমাংশুদাকে সাথে নিয়ে বাবাজানের হুজরা শরিফের মূল গেটের বাইরে ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। ডেকে তাঁর ধ্যান ভাঙবো না, যতক্ষণ না দরজা খুলে তাঁর দয়া দৃষ্টি পাই! হুজরা শরিফের সামনে বাম দিকে তখন একটি বড় শিউলি ফুলের গাছ ছিলো। বাবাজান ভিতরে সিংহাসনের মতো উঁচু চেয়ারটায় যে আসীন ছিলেন, বুঝিনি। আমি তাঁদের দু'জনকে পেছনে নিয়ে শিউলি ফুলের গাছ পার হতেই-বিকট বাজপড়া শব্দের মতো বাবাজানের আওয়াজ শুনে মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং তাজিমি সেজদা আরজ করলাম। এতো বেশী হতবিহ্বল হয়েছিলাম যে আর কিছুই খেয়াল নেই। শুধু মনে আছে পশ্চিমের কাচারি ঘরে তিন কাপ চা এসেছিলো। প্লেটে যা পড়েছিল তাও কাপে ঢেলে তাদের সাথে নিজেও খেয়েছিলাম। দরবার শরিফ থেকে ফিরে আসার পরও তাঁর শরীরের বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। তখন ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। আমি মেজো ভাইয়ের খাটের পাশে টুলে বসা। সর্ব দক্ষিণের সীট তাঁর। ডাক্তার প্রফেসার-নার্স-স্টাফরা পর্যন্ত মেজো ভাইকে বেশ সমীহ করতেন প্রিন্সিপাল হিসেবে। তাই তাঁর সীট সবচাইতে ভালো জায়গায়।

সিটে শুয়ে শুয়ে মেজো ভাই জিজ্ঞেস করলেন কোন মাস। বললাম, ফেব্রুয়ারি। অনেক গভীর থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনের ভেতর কী চলছে বুঝতে পারলাম। আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়লাম। বারান্দার আলো আঁধারীতে কাঁদলাম, বাবাজানের উদ্দেশ্যে না জানি কত কী বললাম। অল্প ক'দিন পরই তাঁকে পিজিতে পাঠানো হলো। প্রথমে সেখানেও শরীর খারাপ গেলো। তাঁর ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি ছোটভাই নাজিমের বিয়েও হলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র অলির পাক কালাম কখনো বিফলে যেতে পারেনা। ৫/৬ মাসের মধ্যে ছোট একটা অপারেশনের পর আল্লাহ্‌র অপার মেহেরবাণীতে মেজো ভাই সবাইকে আশ্চর্যান্বিত করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। আর হিমাংশুদা! ১৮ বছরতো গত হলো। দু'জনে এখানো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। বিজ্ঞানকে হতবাক করে শুধু এক কাপ চা পান করে।

বর্ণক: অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ জাফর চৌধুরী, পিতা- মরহুম এডভোকেট আজিজ আহমদ চৌধুরী, গ্রাম- কালীপুর, থানা- বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

যে প্লেটে ১ ছটাক পানি ধরবে না তাতে ২ লিটার পানি ধরে

চট্টগ্রাম বিপণী বিতান সজনী জুয়েলার্স এর মালিক এস.এম. শফি সাহেবের ছোট বোনের সাথে আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয় ২৭ জুন ১৯৮৬ সাল। দাওয়াতের কার্ড নিয়ে শাহানশাহ্ বাবাজানকে বিয়ের দাওয়াত দিতে দুই দিন আগে মাইজভাণ্ডার শরিফ গেলাম। বাইরের হুজরা শরিফে একটা বড় সাদাকালো টেলিভিশন চালু অবস্থায় ঝিলমিল করছে। ঘড়ি দেখলাম ৩টা বাজে। স্টেশন তো চালু হবে সন্ধ্যা ৫টায়। মনে মনে ভাবি এখনতো কোন অনুষ্ঠান নেই হুজুর টিভিতে কী দেখছেন? অমনি টিভি বন্ধ (অফ) করে আবার বোতাম ঘুরিয়ে অন অর্থাৎ চালু করতেই অনুষ্ঠান এসে যায়। আমি হাত ঘড়িতে আবার সময় দেখলাম ৩টা ২মিনিট। আবার অফ করে অন করলে আগের মত ঝিলিমিলি। অতঃপর বাইরে অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের প্রতি নজর পড়লে জ্বলজ্বালা হয়ে সকলকে তাড়িয়ে দিলেন।

সেদিন আমি চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন নিঝুম ভবন শফি সাহেবের বাসায় ছিলাম। ভোর ৬টার সময় কলিং বেল বাজালে দরজা খুলে দেখি আজিম নগরের মৌলভী কুদ্দুস সাহেব। তিনি বললেন বাবাজান এসেছেন। ড্রয়িং রুম খুলে দিলে

বাবাজান ঘরে ঢুকেই শফি সাহেবের সাথে কুশল বিনিময় করে বললেন, মামু সাহেব! টফি খাব। এত সকালে টফি কোথায় পাওয়া যাবে ভাবতেই মনে পড়ে গেল ক'দিন আগে দুবাই থেকে আনা কয়েক রকমের টফির কথা। টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হল। ৮/৯টার মধ্যে নামী-দামী আশেক-ভক্তদের ভিড়ে কক্ষ ভর্তি হয়ে গেল। আগতদের তিনি টফি, চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করান। ১১টার দিকে সবার জন্য দুপুরের খাবার তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। ফ্রিজে রূপচাঁদা মাছ ছাড়া আর কিছু নেই। কাজের লোক হাসেমকে বাজারে পাঠিয়ে মুরগী, গরুর মাংস ও সব্জি আনানো হয়। তাড়াহুড়া করে পাক করে খাবার পরিবেশন করা হয়। ডিনার সেটের চেতানো অগভীর প্লেটে খাওয়ার পর হাত ধোয়ার জন্য বাবাজান জগ হতে আমাকে পানি ঢালতে আদেশ করেন। আমি ভয়ের সাথে অল্প অল্প পানি ঢালতে থাকি যাতে প্লেটের পানি গড়িয়ে ডাইনিং টেবিল, হুজুরের পরনের কাপড় এবং ঘরের মেঝের কার্পেট ভিজে না যায়। তিনি পুনঃ পুনঃ ঢালতে বলাতে আমি ঢালতে ঢালতে বড় কাঁচের এক জগ পানি শেষ করি। আশ্চর্য হয়ে দেখি, যে প্লেটে ১ ছটাক পানি ধরার ক্ষমতা নেই সে প্লেটে প্রায় ২ লিটার পানি ধরেছে।

বর্ণক: কাজী মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ সওদাগর, পিতা- কাজী জহুরুল আলম সওদাগর, কাজী বাড়ি, সুলতানপুর, রাউজান।

হাত দিয়ে মধু ঝরে

আমরা ফিরছিলাম খিরাম পাহাড়ের পূর্বে গলাচিপা হতে। চাকমা বৈদ্যের কাছে ছোট ভাই দেলোয়ার হোসেনের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। উত্তর সর্ত্তা কড়ইওয়ালা বটতলে পৌঁছলে দেখি একখানা জীপ গাড়ি দাঁড়ানো। ড্রাইভার গাড়িটা ঠেলে চালু করে দিতে অনুরোধ করলেন। বললাম, বহুদূর হতে হেঁটে আসছি, আমরা বড় ক্লান্ত; গাড়ি ঠেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওটা শাহানশাহ্ জিয়াউল হক বাবাজানের গাড়ি। দুর্বল হলেও আল্লাহ্র অলির গাড়ি ঠেলে স্টার্ট হলে গাড়িতে চরে হেলাল মাস্টারের বাড়িতে গেলাম, যেখানে বাবাজান আছেন। তখন রাত ১১টা। সঙ্গী ৪ জনের মালামাল গাড়ির উপর রেখে আমরা বাবাজানের নিকট গেলাম। আমরা দু'ভাই রাতে সেখানে থেকে যাই। অপর ২ জন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে গাড়ির কাছে

এসে দেখে তাদের কাঁঠাল, আনারস চুরি হয়ে গেছে। আমরা দুভাইয়ের মালামাল হেফাজতে রয়েছে। পটিয়ার জাফর সাহেবের সাথে ২ রাত ২ দিন জিকির মাহ্ফিলে আমরাও অংশ নিলাম। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই হয়। শেষের দিন সন্ধ্যায় হেলাল মাস্টারকে বাবাজান জিজ্ঞাসা করলেন ঘরের আনারস দু'টা খাওয়া যাবে কিনা? খাওয়া যাবে বলে জানানো হলে তিনি মধু পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন। হেলাল মাস্টার সন্ধ্যায় 'মধু কোথায় পাব' বলে জবাব দিলেন। আমরা তখন বসত ঘরের উত্তর কামরায় জিকির করছিলাম। বাবাজানের আদেশে জাফর সাহেব ফাতেহা দিলেন। অতঃপর বাবাজান হেলাল মাস্টারকে হাত পাততে বলে তার হাতের উপর নিজের ডান হাতখানা ধরলে হাত বেয়ে মধু ঝরতে দেখা গেল। ওই মধু আনারসের টুকরায় মেখে আমাদের পরিবেশন করা হলে বাবাজানসহ তৃপ্তি ভরে খাই। এমন সুস্বাদু যে মনে হলো বেহেশ্তি নেয়ামত।

পরদিন সকাল ৯টার দিকে বিদায় চাইলে বললেন, আমার জন্য ১টি পাঞ্জাবী, ১টি গেঞ্জি, ১টি টর্চলাইট, ১টি ফ্লাক্স ও ১টি টিউব লাইট আনবেন। বাড়িতে পৌঁছে টাকা জোগাড় করে আজাদী বাজার হতে জিনিসগুলো কিনে তাঁর হাতে পৌঁছে দিলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। পাঞ্জাবী ও গেঞ্জি তখনি পরিধান করলেন।

বর্ণক: আমীর হোসেন, পিতা- মৃত নাদরজজমা, গ্রাম ও ডাক- সাদেক নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসে পাকের রওজা শরিফের দক্ষিণে আমার নানাবাড়ি। সৈয়দ মাহবুবে সোবহানী আমার নানা। সেখানে থেকেই লেখাপড়া করেছি। তাই ছোট বেলা হতেই শাহানশাহ্ বাবাজানকে দেখেছি। কখনো ছেলে সন্তান কোলে নিয়ে আশেপাশে হাঁটতেন, দক্ষিণে রাস্তার মোড় পর্যন্ত কখনো পায়চারি করতেন। আমি ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম, তিনিও চোখ বড় বড় করে তাকাতেন। ১৯৭৪ সালে কৌতুহলবশত: হক মন্জিলে দেখতে গেলে ডাকলেন, বাবা ও মার কথা জিজ্ঞাসা করে সালাম বলতে বললেন। তাঁর ছাত্র অবস্থায় বাবা গৃহ শিক্ষক ছিলেন। সুযোগ মত মা বাড়িতে নিয়ে আসতে বলেন। ১৯৭৫ সালের রমযান মাসে তিনি আমাদের বাড়িতে আসতে রাজি হয়ে দুটো রিক্শা ডাকতে হুকুম করেন। সামনের রিক্শায় তিনি, পিছনেরটাতে আমি বসে রওয়ানা হলাম। নাজিরহাট-হাটহাজারী-গহিরা-মোহাম্মদ তকির হাট হয়ে

আমাদের বাড়ির রাস্তার মাথায় এসে বেশী রাত হয়েছে বলে ফিরে যেতে চাইলেন। এক প্রকার জোর করেই বাড়িতে নিয়ে যাই। তখন রাত ১২টা। সবাই গভীর ঘুমে। মাকে ডেকে দুজনে রাতের খাবার খেলাম। আমার খাটে বিছানা দিলাম। খেদমতের জন্য আমি খাটের নিচে শয়ন করি। তিনি খাট ছেড়ে দীর্ঘ ৪ ঘন্টা আমাকে বুকে নিয়েছিলেন। আমার অবস্থা তখন মরার মত। এ দৃশ্য দেখে মা দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করে আমার দাদা মাওলানা ফোরক সাহেবকে ডেকে আনেন। তিনি অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেন। সেই থেকে ওফাতের আগ পর্যন্ত বহুবার তিনি আমাদের বাড়িতে তশরিফ আনেন। এখানে তাঁর বহু কেরামত ও ঘটনা প্রকাশিত।

একদা জজ্‌বা অবস্থায় একটা টেবিল ফ্যানকে পর পর আছাড় মারলে সেটি বিকল-বিকৃত হয়ে যায়। আমাকে বললেন, 'ফ্যানটা ঠিক কর এবং ঘুরতে বল'। আমি চেষ্টা করে বিফল হলে বাবাজান টেনে ধরে সোজা করে ঘুরতে বললে ফ্যানটি ঠিকমত ঘুরতে শুরু করে। বাইরে উপস্থিত শতাধিক লোক অবাক চোখে ঘটনাটি দেখে।

বর্ণক: এস এম হেলাল উদ্দিন – প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম নিচিন্তাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রাম- দক্ষিণ ধর্মপুর, ফটিকছড়ি, পিতা- এস এম আবদুল মাবুদ, সহকারী প্রধান পোস্ট মাস্টার জেনারেল, চট্টগ্রাম প্রধান ডাকঘর, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সড়ক, চট্টগ্রাম।

ভালবাসার মূর্ত প্রতীক

"মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। ক্রীতদাসের প্রতিও সদ্ব্যবহার করবে। নিজেরা যা খাও তাদের অনুরূপ খেতে দেবে"। রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) অমরবাণী। সর্ব সাধারণের জন্য এ উপদেশ দেওয়া হলেও আল্লাহ্‌র অলিরা ছাড়া খুব কম লোকই তা মানে। রিয়া বা অহংকারের ঊর্ধ্বে উঠা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী উপরোক্ত বাণীর অনুসরণে মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান করতেন। খাদেম, চাকর-চাকরানী এমনকি ছোট শিশুকে পর্যন্ত 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সকলকে সম্মানসূচক– যথা, পুরুষদের 'মিয়া-সাহেব' এবং মেয়েদের 'খালা-মাধু' বলে ডাকতেন, বয়সে ছোট হলেও। চাকর-চাকরানী, খাদেম-খাদেমা ও ছোট শিশুদের মারধর করতেন না। তাদেরকে গভীর স্নেহ-ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন। দরবারে আগত আশেক-ভক্তদের ছোট শিশুদের

কোলে নিয়ে আদর করতেন। এটা-ওটা খেতে দিতেন। ষাট বছর বয়স্ক খাদেমা বেলুর মা বলেন, "সেবা কতটুকু করতে পেরেছি জানিনা। কিন্তু তাঁর স্নেহ-প্রীতিময় ব্যবহারে পরিবার-পরিজন ছেড়ে আঠার বছর যাবত এখানে পড়ে আছি[১]"। একবার তাঁর নিকট আত্মীয় আকমল খাঁন সাহেবকে আমাকে দেখিয়ে বলেন, "এই মেয়ে প্রথম আট বছর ধরে সেবাকালে এ বাড়িতে তখন আলো পানি ছিল না। আমাকে বাতাস করেছে; আমি আরামে ঘুমিয়েছি। ভাত পানি সিগারেট সব কিছু ইশারায় চাইতাম, বুঝে নিতো। কখনও কোন অসুবিধা হয় নি, বড় ভালো মেয়ে"। চৌদ্দ বছর বয়সী সেবিকা শামিমাকে তিনি খালা বলে ডাকতেন। প্রথমদিন তাঁর নিকট আসলে খেয়ে আসতে বলেন এবং বাড়ির গেট পর্যন্ত সঙ্গে যান। তারা দু'ভাই দু'বোন পর্যায়ক্রমে তাঁর খেদমতে ছিল। একদা শামিমার চোখে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হলে তিনি নিজ হাতে ঔষধ লাগিয়ে দেন এবং একবার দেওয়াতেই সেরে যায়। কোন কোন সময় নিজ হাতে না খেয়ে সেবিকাদের বলতেন, "খালা, তোমার হাতে খাইয়ে দাও"। ভাত-চা-পানির জন্য বেশীরভাগ তাকে ডাকতেন। শামিমা বলে, বাবার কী যে স্নেহ বলতে পারবোনা। খাওয়া-দাওয়া, সুখ-অসুখ সবকিছু জিজ্ঞাসা করতেন। জজ্‌বা হালে কী বলেন বুঝতে কষ্ট হতো। শান্ত অবস্থায় যেন দয়ার সাগর[২]।

চাষের কর্মচারী জহুর[৩] চার বছর দায়িত্বে ছিল। তার ভাষ্য, একবার খুব সকাল বেলায় গরুর গাড়িতে মা জানের আদেশে ভিতর বাড়িতে কিছু মাটি আনছিলাম। গাড়ি হুজরার পাশে আসলে বাবাজান হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে আসেন। আমি গাড়ি থামিয়ে সালাম করলাম। আমাকে বলেন, "কষ্ট করবেন না। কার আদেশে কেন মাটি এনেছেন"। বললাম, মেয়ে মেহমানদের থাকার জন্য একখানা ঘর তৈরি করতে হবে; বখ্‌তেয়ার মামা বলেছেন। তিনি বলেন, "এখানে কেউ মেহমান নয়; রিফুজী চিনেন? আমরা সবাই রিফুজী মাত্র। মিথ্যা বলো কেন? ভয়ে মা জানের কথা বলি নি। "এখানে আমার হুকুম ছাড়া কিছু করবে না। গরুকে মারধর করো"? উত্তর দিলাম, 'জী–, না'।

গাউসিয়া হক মন্‌জিলে হিজরতের পর ছোট বড় ৮/১০টা কুকুর মন্‌জিল এলাকায় বিচরণ করতো। এই কুকুরদের তিনি কেক মিষ্টি এমনকি পিরিচে করে চা ও ভাত মাংস গভীর স্নেহে খাওয়াতেন। একটা বড় কাল, একটা বড় সাদা এবং একটা বড় লাল কুকুর তাঁর খাটের নিচে প্রায় সময় শুয়ে থাকতো। কখনো

কখনো চেয়ারেও উঠে বসতো। একটা বড়ো বাদামী ও আরেকটা মাঝারী কুকুর দরবারে আগত ভক্তদের পা জড়িয়ে ধরে রুটি দেওয়ার জন্য অনুনয় করতো। অনেকের কাছে শুনেছি তাদের খাবার দিলে উদ্দেশ্য পূরণ হতো। তাঁর ওফাতের পর কুকুরগুলোকে আর দেখা যায় না।

শৈশবের স্মৃতি বর্ণনায় তাঁর একমাত্র ছেলে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) বলেন, "বাবার সাথে একবার ফৌজদারহাট সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাই। আমি ও বদু চাচা খেলতে খেলতে সাগরের দিকে অনেক দূর পানিতে চলে যাই। কখন সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ এসেছে আমরা খেয়াল করি নি। আমাদের নিশ্চিত ভাসিয়ে নিতো। বাবা খুব জোরে ডাক দিলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি"। "আরেকবার বাবার সঙ্গে ভাড়া করা টয়োটা গাড়িতে করে ছোটবোন কুমকুম, মুনমুন, কানিজ, খালাত ভাই করিম দা, জসিম ভাই ও মামাত ভাই মানিকসহ কক্সবাজার যাচ্ছিলাম। চিরিঙ্গা পার হলে হঠাৎ আমাদের গাড়ির স্টিয়ারিং বিকল হলো; গাড়ি আর চলেনা। ঠিক সে সময় বিপরীত দিক থেকে একটা বাস তীব্র বেগে আমাদের গাড়ির দিকে আসছিলো। মনে হলো ভীষণ জোরে ধাক্কা খাবে। ভয়ে আমাদের হুঁশ নেই। বাসটা নিকটে পৌঁছতে বাবা কী একটা শব্দ করলেন। অমনি গাড়িটা জঙ্গলে ঢুকে গেল। বাবা জজ্বা হালে বলতে লাগলেন, "জীন আমি রাখবোনা, মেরে ফেলবো"। ড্রাইভারকে বললেন, 'গাড়ি স্টার্ট দাও'। ড্রাইভার বললো, 'গাড়ি চলবেনা'। বাবা পুনঃ বলেন, 'গাড়ি চলবে'। স্টার্ট দিতেই সে অচল গাড়ি চলতে লাগলো; আমরা সে গাড়িতেই কক্সবাজার পৌঁছি"।

তৃতীয় মেয়ে সৈয়দা কুমকুম হাবিবা কক্সবাজারে ফেলে আসার স্মৃতি বর্ণনা করেন, "আমি ছোট বোন কানিজ ও মামাত ভাই মানিকসহ বাবার সঙ্গে কক্সবাজার যাই। বাবা আমাদেরকে হোটেল সায়মানে রেখে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন। ড্রাইভার বাবাকে অনেক খুঁজেছে, পায় নি। ভয়ে ভয়ে রাত কাটালাম। সবাইতো ছোট! পরদিন ড্রাইভার চট্টগ্রাম শহরে রিয়াজউদ্দিন বাজার সংলগ্ন খালাম্মার বাসায় পৌঁছে দেন"।

সবার ছোট দু'সহোদরা মুনমুন ও কানিজ বলেন, আব্বা না আমাদের খুব ভালবাসতেন। সুন্দর-সুন্দর জামা, মিষ্টি, খেলনা কতকিছু কিনে দিতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আরবি পড়তে যেতে বলতেন। বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খেতে

বলতেন : এতে নাকি বিষ পানি হয়। কাছে গেলে চা-নাস্তা ভাত খেয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করতেন এবং আরাম করতে বলতেন"।

বড় দু'বোন জেবু-হোমায়রা বলেন, বাবার অত্যধিক জজ্‌বাহাল ছিলো বলে শৈশবে কাছে যেতে খুবই ভয় করতাম। ছোট বেলায় বাড়িতে একটা মাত্র ফ্যান থাকাতে একদিন বাবার খাটের নীচে শয়ন করলে তিনি উপরে উঠিয়ে শুইয়ে দেন। পরদিন শহর হতে আমাদের জন্য আরেকটা ফ্যান কিনে আনেন। পারিবারিক আদবের প্রতি তিনি অত্যধিক খেয়াল রাখতেন। ভিতর বাড়িতে কোন বয়স্ক পুরুষ যাওয়া-আসা তাঁর একেবারে অপছন্দ ছিল"।

খাদেমা মহিলাদের ছোট ছেলে-মেয়েকে দুধ ও হরলিক্স বানিয়ে মায়ের মতো খাওয়াতেন। এদের সাথে শিশুসুলভ কথা বলতেন এবং জামা-খেলনা কিনে দিতেন। তিনি বলেন, "শিশুরা মাসুম; আল্লার অলি"। "শিশু কিশোরদের দরবারে আনা নেওয়া ভাল। এতে তারা আদব-আখ্‌লাক বুঝ-জ্ঞান দয়া রহমত পাবে"। এককথায় তিনি ছিলেন স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার মূর্ত প্রতীক।

সূত্রঃ ১। সৈয়দা আমিনা খাতুন, আং-আবদুল আজিজ, মুসলিম পাড়া, ডাক-জঙ্গলবাড়ি, থানা-করিমগঞ্জ, জেলা-ময়মনসিংহ। **২।** সৈয়দা শামিমা আখতার, পিতা-ডা. মোহাম্মদ ইউসুফ, গ্রাম-নানুপুর, থানা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম। **৩।** জহুর আহমদ, পিতা-ছিদ্দিক আহমদ, গ্রাম-পূর্ব ভূজপুর, থানা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম।

ঘাম ঝরে বাত সারে

সত্তর দশকের মাঝামাঝি বাত রোগে আমার ডান পায়ের গিরাগুলো ফুলে যায়। চলাফেরা উঠা বসা করতে ব্যাথায় খুবই কষ্ট হত। বিজ্ঞ ডাক্তার আহাদ চৌধুরীসহ অনেকের চিকিৎসায়ও কোন ফল না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ি। আমি তখন চকবাজার প্যারেড মাঠের পশ্চিমে ভাণ্ডার মন্‌জিলের মালিক মফিজুল ইসলামের দেওয়ানহাট ভাণ্ডার মোটরস এ ম্যানেজারের পদে চাকুরি করতাম। শাহানশাহ্ বাবাজান মাঝে মধ্যে ভাণ্ডার মন্‌জিলে আসতেন। তাঁকে আরজি জানালে হাসপাতালে ভর্তি হতে পরামর্শ দেন। ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসায় আমার আস্থা হয় না। তাই বার বার আরজি করে, বিনা চিকিৎসায় কত জটিল কঠিন রোগী আপনার দয়ায় ভাল হয়েছে আমিও তেমন দয়া চাই। দু'বছর রোগ ভোগের পর ১৯৭৮ সালে একদা চৈতন্য

গলিতে তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের বাসায় দেখা করি। সেখানে পূর্ব মাইজভাণ্ডার কাজী বাড়ির খাদেম সুলেমানও উপস্থিত ছিলেন। বাবাজান বিছানায় শুয়ে আছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটু পা টিপে দিতে আদেশ করেন। টিপতে আরম্ভ করলে আমার শরীর হতে অত্যধিক ঘাম ঝরতে থাকে। এত ঘাম জীবনে কখনো ঝরেছে বলে মনে হয় না। তাঁর গায়ে ঘাম পরে বলে নানাভাবে মুছতে থাকি। শরীরের জামা কাপড় ভিজে ঘামে ঘরের মেঝেও ভিজে যায়। বহুক্ষণ সেবা গ্রহণের পর বিদায় দেন। দুপুরের ভাত খেতে নিষেধ করেন। ৫/৬ মাস দুপুরে ভাত খাওয়া হতে বিরত থাকি। অতঃপর বাবাজানের খলিফা হযরত সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌'র অনুমতিক্রমে আবার দুপুরে ভাত খাওয়া আরম্ভ করি। তখন থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আনোয়ারা উপজেলা নিবাসী প্রখ্যাত আইনজীবি বদরুল হক খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুহুল আমিন খানের একই রোগ হয়েছিল। একই রোগভোগী বলে উভয়ে দেওয়ানহাট দোকানে বসে রোগের নানা অসুবিধা নিয়ে আলাপ করতাম। তিনি বড়লোক, ব্যয়বহুল বহু চিকিৎসা করেও কম বয়সে মারা গেলেন। বাবাজানের মেহেরবানীতে আমি সুস্থ হয়ে দীর্ঘজীবী।

বর্ণক: সৈয়দ ওবায়দুল আকবর, পিতা- মরহুম সৈয়দ মুসলিম হোসেন, সৈয়দপাড়া, গ্রাম- বক্তপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

লাফ দিয়ে উঠে লাশ

ছাত্র জীবনে আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। ধর্ম বিশ্বাস করতাম না বললেই চলে। একদিন লক্ষ্মীছড়ি বাজারে তনু মাঝির চা দোকানে দেখলাম জনৈক উলঙ্গ দরবেশকে পায়ে ধরে লোকজন সালাম করছে, টাকা সিগারেট পান ও চা খাওয়াচ্ছে। মনে এই ব্যাপারে জানার কৌতুহল জাগে। দূর থেকে লক্ষ্য করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর ঐ দরবেশ আমাকে ডাকলেন এবং লোকজনকে লক্ষ্য করে বলেন এই লোকটা খুবই গরম, দেখবেন ও খেয়াল রাখবেন। তারপর আমাকে চা খাওয়ান। দরবেশ সাহেব বেনসন সিগারেট সেবন করতেন। হঠাৎ করে দরবেশ সাহেব বললেন, চল আজকে তোমার বাড়িতে যাবো। উনার নির্দেশ অনুযায়ী আমার গ্রাম চাল্যাতলীর দিকে রওয়ানা হই। উনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে থাকলে আমার দৌড়াতে হয়। আমার বাড়িতে পৌঁছার সাথে সাথে মোরগ জবেহ

করে দিই। মোরগ জবাই করার সময় আমার খেয়াল ছিল মোরগ এর কলিজা দিয়ে ভাত খাওয়াবো। যেহেতু আমাদের চাকমা সমাজে অতি আদরের মেহমানকে মোরগ-মুরগীর কলিজা দিয়ে ভাত খাওয়ানোকে উষ্ণ আপ্যায়ন বলে ধরে নেয়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস ভাত খাওয়ানোর সময় ডেকচিতে মুরগীর কলিজা পাই নি। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিই। উনি ভাত খেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অনেক কাকুতি মিনতির পরে তিনি সামান্য ভাত খেয়ে থালার বাকী ভাত আমাকে খাওয়ান।

রাত্রে ঘুমানোর সময় আমার বাবাকে বললেন আজকে রাত্রে আমার সাথে ঘুমাতে হবে। বাবা ক্ষমা চেয়ে বললেন, আপনি ফকির মানুষ। আপনার সাথে ঘুমানো বেয়াদবী হবে। ঘুমে হয়ত আপনার গায়ে (শরীরে) পা লাগতে পারে। তবু দরবেশ সাহেব বাবাকে উনার সাথে ঘুমাতে নির্দেশ দেন। বাবা উনার নির্দেশ মোতাবেক উনার সাথে ঘুমান। রাত ৩টার সময় হঠাৎ করে দরবেশ সাহেবের গায়ে বাবার হাত লাগলে বাবা উপলব্ধি করলেন যে, লোকটা মারা গেছে। যেহেতু লোকটার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা নাকে হাত দিয়ে দেখেন শ্বাস-নিঃশ্বাস বন্ধ। বাবা আমাকে বললেন– দয়া, তুমি কোন্ ধরণের লোক এনেছে? লোকটা যে মারা গেছে। বাবা বললেন, তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করি। কারণ বাড়ির পার্শ্বে পুলিশ ক্যাম্প, অপরদিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে অভ্যন্তরীণ গোলমাল। তাই রাতের মধ্যেই দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বাড়ির চাকরদেরকে দাফনের ব্যবস্থা করতে বলি। দাফন করার সব তৈরি। মৃত দরবেশকে দাফন করতে নেওয়ার জন্য যখন উদ্যত হই তখন দরবেশ সাহেব হঠাৎ করে 'আল্লাহু-আকবর' শব্দ করে লাফ দিয়ে উঠে বলেন, আমি মক্কা শরিফ গিয়েছিলাম। তারপর তিনি মাইজভাণ্ডারী গান ও জিকির করতে থাকেন এবং আমি চৌকিতে মাইজভাণ্ডারী সুরে তাল বাজাতে থাকি। অতঃপর তিনি আমাকে পরিচয় দিলেন আমার নাম নুরুল হক, আমার পীরের নাম জিয়াউল হক। তুমি সেখানে যাবে। তোমার সাথে সেখানে দেখা হবে। উনার নির্দেশ মোতাবেক আমি অদ্যাবধি দরবার শরিফে আসি। তবে আমি মনে করি আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার মতন পাপী দরবার শরিফে আসার সুযোগ পেয়েছি।

দরবার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলে শাহানশাহ্ জিয়া বাবার কদমে গিয়ে মনে মনে সেই দরবেশ নুরুল হক সাহেবকে খোঁজ করি। কিন্তু কোথাও দেখিনা। এ

ব্যাপারে বখ্‌তেয়ার মামা নির্দেশ দিলেন বাবাজানের হুজরা শরিফের সামনে পাহারা দিতে। আমি উনার নির্দেশ অনুযায়ী বাবাজানের হুজরা শরিফের সামনে একটি লাঠি নিয়ে পাহারা দিতে থাকি ও মনে মনে সেই দরবেশ নুরুল হক সাহেবকে খোঁজ করি। হঠাৎ একদিন দেখি নুরুল হক সাহেব আমার সম্মুখে। আমাকে নির্দেশ করলেন, তুমি এখানে ডিউটি কর এবং দরবারে আসবে। মনস্থ করলাম তাঁকে পায়ে ধরে সালাম করবো। ঐ খেয়ালটা আসার সাথে সাথে নুরুল হক সাহেব গায়েব (উধাও)।

বর্ণক: দয়া ভূষণ চাকমা, পিতা- পূর্ণ কুমার চাকমা, গ্রাম- পূর্ব চাল্যাতলী, পোস্ট+থানা- লক্ষিছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি। বর্তমান ঠিকানা: জনতা ব্যাংক, স্টিল মিল শাখা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

কুমন্ত্রণাদাতা–মানুষরূপী শয়তান

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে আশা-নিরাশা, আতঙ্ক-নির্যাতন, ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট মানুষের ধর্মানুভূতি বাড়িয়ে তোলে। ফলে মসজিদ, মন্দির, মাযার, মাহফিল-মিলাদ, ধর্মীয়সভা এবং পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসীর আস্তানা আখড়া খানকায় দিন দিন মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে। স্বাধীনতার আগের কিছু পীর আলেম ছাড়া এখনকার জমজমাট অনেক পীর মাওলানার খানকা আস্তানা ছিল একপ্রকার জনশূন্য অথবা অস্তিত্বহীন। অনেকের কোন পরিচিতিও ছিল না। এমন কী নিকট ভবিষ্যতের সমাগত সত্য বুঝতে না পেরে অধিকাংশ আলেম স্বাধীনতা সংগ্রামের আতঙ্কময় সময়ে নির্যাতিত মানবতার বিরুদ্ধে অত্যাচারী পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করেছেন। কেউ কেউ আল্‌-বদর, আশ্‌-শামস ও রাজাকার দলে যোগ দিয়ে কাফের হত্যার নামে দেশকে প্রায় জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবি শূন্য করেছেন। বুদ্ধিজীবিদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা দেশকে ভালবেসেছিলেন। যেহেতু ওসব আলেমদের কাশ্‌ফ বা সত্যদর্শন শক্তি ছিল না। তাদের মধ্যে নূরী ঈমান এবং সাধারণ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানেরও অভাব ছিল। নতুবা তারা বুঝতো অত্যাচারী মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী অথবা নির্যাতিত বৃহত্তর জনগণ, কোন্‌ পক্ষে যাওয়া ধর্মসম্মত। ইসলাম মানবতার ধর্ম।

অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে। শাসক গোষ্ঠীর ইসলামের দোহাই মুখোশ পরা ভণ্ড নবি মুসাইলিমা অথবা

রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) নয়নমণি রক্তের উত্তরসূরী হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) হত্যাকারী এজিদের ‘ইসলাম’ কিনা, তারা তা ভেবে দেখলো না। স্রষ্টার ইচ্ছা শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সত্য দেশের স্বাধীনতা এদের অনেকে বহুকাল পরেও মেনে নিতে পারে নি। এজন্য পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে, “এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার (বিশ্বাসী) নয়। তারা আল্লাহ্‌ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করছে মাত্র। কিন্তু মূলতঃ তারা নিজেদের ঠকাচ্ছে; আর সে সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নাই” - (সূরা বাক্বারা : ৮/৯)। সত্যদর্শী এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন আলেম মৌলভীরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন না করলেও বিরোধিতা করেন নি। অল্পসংখ্যক আলেম স্বাধীনতার সমর্থন ও পক্ষে কাজ করেছেন।

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা প্রবাহে দিশেহারা মানুষের অবস্থা বুঝে চতুর স্বার্থ বুদ্ধিবাজ কিছু আলেম নিজেদের দল ভারী করার জন্য মাঠে নামেন। কোরআন ও ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা মুসলমানদের বিপথগামী করছে। তাদের মধ্যে একজন সুকণ্ঠধারী ভাল বক্তা যাকে স্বার্থান্ধ ভক্তরা বর্তমানে ‘আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ’ বলে খেতাবে ভূষিত করেছে। বিগত সত্তরের দশকে এই মাওলানা চট্টগ্রাম শহরে প্রথম তাফসির মাহ্‌ফিল করলে তার বক্তব্য নিয়ে আলেম সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। জীবিত অলি উল্লাহ্‌র নিকট সঠিক সিদ্ধান্তের আশায় চট্টগ্রাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম বলে খ্যাত মাওলানা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী এবং প্রসিদ্ধ বক্তা মাওলানা ওবায়দুল হক নঈমী শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নিকট মাইজভাণ্ডার শরিফ আগমন করেন। নঈমী সাহেব বিতর্কিত সেই মাওলানা প্রসঙ্গে বলার ইচ্ছা মনে আনতেই তিনি বলে উঠেন, ‘বেয়াদব, খান্নাসুল্লাজি, জিহ্বার গোড়ায় কেটে ফেলা দরকার’। সমাধান পেয়ে উভয় মাওলানা সাহেব খুশি হয়ে চলে যান। শাহানশাহ্‌র এ পবিত্র বাক্যশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে অতঃপর সে তফসিরকারের বিরুদ্ধে দুই মাওলানা ও অন্যরা মাঠে নামেন।

মাওলানা(?) সাঈদী মে’রাজ শরিফের ঘটনা বর্ণনায় পবিত্র কোরআনের ‘আবহিদী বা আবদূহ্‌’ শব্দের তফসির করেন ‘দাস’। আল্লামা ইকবাল তাঁর জাবিদনামা গ্রন্থে বলেন, “আব্‌দ’ এক জিনিষ, ‘আবদূহ্‌’ অন্য কিছু। যে আব্‌দ

সে অপরের মুখাপেক্ষী ও অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু 'আবদূহূ'র অপেক্ষায় এই ত্রিভূবন, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর মুখাপেক্ষী"। তিনি আরও বলেন, "সময়কাল বা জমানাই 'আবদূহূ' বা নূরে মোহাম্মদী (দ.)। আমরা রঙ; তিনি রঙ বা গন্ধের উর্ধ্বে, যা আমাদের জ্ঞানেরও বাইরে। 'আবদুহূ'র আদি নেই, অন্ত নেই, অর্থাৎ তিনি এই বিশ্বের নন, 'আবদূহূ' 'ইল্লাল্লাহ্'র রহস্য। লা-ইলাহা তরবারি 'আবদূহূ' তার প্রাণ। আরও খোলা বলতে গেলে তিনিই (আল্লাহ্) 'আবদূহূ'। 'ওয়ামা রামাইতা ইজ্ রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লা রামা" – (বদর যুদ্ধে) 'নুড়ি পাথর আপনি নিক্ষেপ করেন নি বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন' (সূরা আন্‌ফল আয়াত ১৭)। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই অবস্থান হতে তাঁকে (রাসূল) দেখ। সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ বলেন, 'আদিকালে যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত মানুষেরা বিজয়ী রাজশক্তির হাতে জন্তু জানোয়ারের ও পণ্যের মত বেচাকেনা হতো। এরাই দাস-সে কালের যাতনাক্লিষ্ট অসহায় প্রাণী বিশেষ। এহেন দাসের দ্বারা কি তখনকার রাজার প্রতিনিধিত্ব কল্পনাও করা যায়? মহান স্রষ্টা প্রভুর পবিত্র বাণীর ধারক, বাহক, প্রচারক ও বাস্তবায়নকারী রাসূল কি দাস বা নগন্য চাকরের সাথে তুলনীয়? চাকরের দ্বারা কি মালিকের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব সম্ভব? মোটেই নয়। তাই রাসূল (দ.) দাস নয়, প্রভুর সম্মানিত বন্ধু ও প্রেরিত পয়গম্বর। রাসূলের অনন্ত মহান মর্যাদাকে যারা খাটো করতে চায় তারা নিশ্চয় সৃষ্টিসেরা বেয়াদব'।

তথাকথিত সে আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদের ইসলামী ব্যাখ্যা! রাসূল (দ.) অতিমানব নন, মহামানব। এ কথার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) প্রতিদিন সকালে এক স্ত্রীর (হযরত জয়নব রা.) ঘরে মধুর সরবত পান করতেন। এতে অন্য দুই স্ত্রী (হযরত আয়েশা রা. ও হযরত হাফ্‌সা রা.) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাঁদের ঘরে গেলে রাসূলকে বলেন, আপনার মুখে (তৎকালীন আরবে প্রচলিত মদ বিশেষ) গন্ধ লাগছে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, আগামীকাল থেকে সরবত পান ত্যাগ করবেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআনের ওহী আসে, "হে নবি, আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিচ্ছেন ঐ বস্তুকে, যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করেছেন? আপনি বিবিগণের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু" (সূরা তাহ্‌রিম : ১)।

দ্বিতীয় ঘটনা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আরবের ক'জন ধনীর সাথে আলাপ করার সময় সেখানে জনৈক অন্ধ মুসলমান উপস্থিত হয়ে কিছু বলতে চাইলে বিরক্তি বশত: তাঁর কপাল কুঁচকে যায়। তখনি কোরআনের সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয় "তিনি (রাসূল) ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর নিকট অন্ধ লোকটি আসে" (সূরা আবাসা : ১–২) তফসিরকার মাওলানার দাবী সর্বজ্ঞ অতিমানব হলে রাসূল (দ.) এসব ভুল করতেন না। আল্লাহ্ তাঁর নবিদের দ্বারা এমন কিছু ছোট খাটো ভুল করান যাতে তাঁরা অতিমানব হয়ে না যান।

বাহ্বা! এ কেমন জগতসেরা তফসিরকার! যিনি খোদ্ খোদার উপর খোদ্কারী করে বেড়ান। আল্লাহ্ ভুল করান, এমন জঘন্য অপবাদ অভিশপ্ত শয়তানের কণ্ঠ থেকেও প্রকাশ পেয়েছে বলে প্রমাণ নেই। শয়তানের বাড়া এ কোন্ মহা শয়তান! যিনি স্রষ্টার পূত পবিত্র মহোত্তম সত্ত্বায় অপরাধের কালিমা আরোপ করেন? মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করা তো বিতাড়িত শয়তানের কাজ। শয়তানী কাজের কলংক মহামহিম স্রষ্টার প্রতি নিক্ষেপ করে তফসিরকার কি কুফ্রী করেন নি?" "এরপরও যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তারাই সীমালংঘনকারী জালেম" (সূরা আল-ইমরান : ৯৪)। "সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহ্র আনুগত্য করার) দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। আল্লাহ্ এ রকম জালিমদের হিদায়াতের শিক্ষা দেন না" (সূরা সাফ্ফা : ৭)। অথচ সূরা ইন্শিরাহ্-এ আল্লাহ্ বলেন, "আমি আপনার (রাসূল) বক্ষ হতে অন্ধকারের পর্দা উঠিয়ে নিয়েছি। আপনার অন্তরে অসীম প্রশান্তি দান করেছি। জড়দেহে জড়া যা আপনাকে ক্লান্ত করতে পারে তাও দূর করে দিয়েছি এবং (আপনার) গুপ্ত ব্যক্ত পরিপূর্ণতা সম্পর্কে ত্রিভূবনে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছি (১–৪)"। তিনি আরো বলেন, "অস্তগামী তারকার শপথ, তোমাদের বন্ধু (মোহাম্মদ) ভুল করেন না, অথবা বিপথগামীও নন এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না" (সূরা নজম : ১–৩)। কোরআনের এসব ঘোষণা কি মিথ্যা? গুপ্ত ব্যক্ত সকল জ্ঞান যাঁকে দান করা হয়েছে বিষয়গুলো কি তাঁর অজানা থাকতে পারে? আল্লাহ্ ও কোরআনে অবিশ্বাসী রাসূল বিদ্বেষী পাপিষ্ঠরাই শুধু বলতে পারে 'রাসূল গায়েব জানেন না'। তিনি যে গায়েব জানতেন কোরআনে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। খোদ্ কোরআনই

তো গোপন জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। সূরা ফিলে তাঁর জন্মপূর্বের ঘটনা বর্ণনায় বলা হয়েছে "আলাম-তারা" হে রাসূল! আপনি কি দেখেন নি? অর্থাৎ আপনি তো ধরাপৃষ্ঠে মানুষরূপে আগমনের আগে ঘটনাটি দেখেছেন; এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের শাশ্বত সত্ত্বার সাক্ষ্য দান করেন। মধুর ঘটনা সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শ, পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির সুপথ দিশারী আল্লাহ্‌র বাণী। মহানবির জীবনে সংঘটিত মধুর ঘটনা মানুষকে নারী চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য কালজয়ী গ্রন্থ কোরআনের ওহীরূপে অবতীর্ণ। মহানবির সঙ্গপ্রাপ্ত পবিত্র নারীরাও যে ঈর্ষাপরায়ন হতে পারেন এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাধারণ নারীদের মধ্যে তাই হিংসা বিদ্বেষ থাকা অতি স্বাভাবিক। মানব জাতিকে ঈর্ষার আগুন হতে বাঁচাবার জন্য কোরআনের এই সতর্কবাণী। দ্বিতীয় ঘটনাও কোন মানুষকে যাতে অবহেলা করা না হয় তজ্জন্য কোরআন শরিফের আয়াত দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমেই মানুষকে শিক্ষা দেন। সূরা 'দোহায়' "আপনি (রাসূল) এতিমদের প্রতি কখনো কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীদের ধমক দেবেন না" (৯–১০)। এসব কথা রাসূলকে কেন বলা হলো, তিনি কি কখনো তেমন করেছেন? নিশ্চয় না। 'উস্ওয়াতুন হাসনা' অতুলনীয় সুন্দর চরিত্রের অধিকারী রাসূলকে উদ্দেশ্য করে এসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ এতিম ও গরীবদের প্রতি সদয় হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

উক্ত তফসিরকার আরেক বর্ণনায় বলেন, একদা ফজরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ (দ.) অনুপস্থিত। হযরত ওমর (রা.) বলেন, চলুন আগে রাসূলের খবর নিই, তারপর নামায পড়বো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, আগে নামায, তারপর রাসূলকে খুঁজবো। অতঃপর নামায আদায় করে তাঁরা রাসূলের খোঁজে গেলেন। মদিনার কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। মদিনা থেকে বহু দূরে এক পাহাড়ের নিকট একটি উটচালক রাখাল বালকের দেখা পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে উটের রাখাল, তুমি কি মানুষের রাখালকে দেখেছো'? একটা পশুর রাখালের সাথে তুলনা করে নবিদের সর্দার আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলকে বর্ণনাকারী কি সীমাহীন অপমান করেন নি? মহানবির অপমানকারী এবং তার বিশ্বাসী শ্রোতাদের ঈমান থাকতে পারে কী? মানুষের মধ্যে পশু স্তরের লোকও আছে, আবার নবি রাসূল আউলিয়াও মানুষ।

সকল মানুষকে পাইকারীভাবে পশু বানানোর বিদ্যা তিনি কোথায় শিখেছেন? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মানুষকে বলেছেন, 'আশরাফুল মাখ্লুকাত' – সৃষ্টিসেরা এবং নূরনবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)-কে এ জগতে পাঠিয়েছেন "রহমতুল্লিল আলামীন" জগত সমূহের রহমত–করুণাধার করে। হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "কুন্তু কান্জান মখ্ফিয়ান ফাআহবারতু আন্ উরেফ, – খালাক্তুল খল্কা – আমি ছিলাম গুপ্তধন ভাণ্ডার, তৎপর নিজেকে প্রকাশের নিমিত্ত এই জগৎসমুহ সৃষ্টি করলাম"। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, "আনা মিন্ নূরীল্লা, ওয়াকুল্লু সাঁইয়ীন মিন্ নূরী" – আমি আল্লাহ্র নূর (জ্যোতি) হতে এবং সমগ্র সৃষ্টি আমার নূরে সৃষ্ট। স্রষ্টা প্রভুর ঘোষণা "লাওলাকা লামী খালাকুতুল্ আফ্লাক্ – আপনার (রাসূল) জন্য না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না"। তফসিরকারের তো ছায়া আছে, যেহেতু তিনি কায়ার সৃষ্টি। রাসূলও মানবরূপে ধরাধামে এসেছেন, তাঁর ছায়া কোথায়? আল্-কোরআনে রাসূলুল্লাহ্র (দ.) পরিচয় ঘোষিত, "আমিও তোমাদের মত মানুষ; তবে আমার নিকট ওহী আসে"। এই 'ওহী আসে' বর্ণনায় কি তাঁর অতি উঁচু মর্যাদা নির্ণীত নয়? তফসিরকারও তো মানুষ দৈববাণী (ওহী) তার নিকট আসে না কেন? আকাশের চাঁদকে পুকুর, নদী, সাগর জলে প্রকৃত চাঁদের মতই তো দেখা যায়; সেটা কি আসল চাঁদ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্লমার্কস, মাওসেতুং, মহাত্মা গান্ধী, নিজ নিজ অবদানের জন্য মানব সমাজে মহামানব রূপে স্বীকৃত। সৃষ্টির করুণাধার রহমতুল্লিল আ'লামীন কি তাদের সাথে তুলনীয়? এমনি তুলনা ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা নয় কি?

বাহ্যিক আকৃতি ও শরীর গঠনের দিক থেকে নবি, রাসূল, অলি-আউলিয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। অন্য মানুষের যেমন নাক, কান, চোখ ইত্যাদি থাকে তদ্রুপ নবি অলিদেরও থাকে। অন্য মানুষের মত তাঁরাও হাটা চলা করেন, কথাবার্তা বলেন এবং ক্ষুধা পেলে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেন। অতএব সাধারণ মানুষ ও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই পার্থক্য বুঝতে না পেরে ইসলামের আবির্ভাবকালে মূর্খ লোকেরা বলতো, মা লিহার্যা রসূলি ইয়া'কুলুততা আমা ওয়া ইয়ামশী ফিল আসওয়াক্ – (সূরা : ফোরকান–৭) এটা আবার কি ধরনের রাসূল? ইনি খাদ্যও খান, বাজারেও যান (আমাদের মত)? অর্থাৎ ওই লোকেরা নবি ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝতে পারে

নাই। বর্তমান যুগেও বহু জ্ঞানপাপী নবিদের সে দৃষ্টিতেই দেখে থাকে। আল্লামা রুমী (র.) তাদের প্রতি কটাক্ষ করে তাঁর অমর গ্রন্থ মসনবি শরিফে বলেন–

আশ্‌কিয়ারা দাদায়ে বীনা নাবুদ্‌
নেক্‌ওবদ্‌ দারদীদা শাঁ একছাঁনমুদ।

অর্থঃ হতভাগাদের দেখার চক্ষুই নেই। তারা পূণ্যবান ও পাপীদের এক বরাবর দেখে। পবিত্র কোরআনের সুরা ইয়াসিনে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তায়ালা কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট দু'জন নবি পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা যখন লোকদের বললেন, "আমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবি। তোমাদের শিক্ষা ও মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ আমরা দু'জনকে প্রেরণ করেছেন। তোমরা খোদার নির্দেশ মেনে চলো"। দুষ্ট লোকেরা তাঁদের কথা মানলো না এবং বললো, "মা আন্‌তুম ইল্লা বাঁশারুম মিসলুনা, ওয়ামা আনজালার রাহ্‌মানূ মিন্‌ শাঁইয়িন্‌, ইন্‌ আন্‌তুম ইল্লা তাক্‌জিবূন", অর্থাৎ তোমরা তো আমাদের মত মানুষ। আল্লাহ্‌ কোন কিছুই নাযিল করেন না। তোমরা মিথ্যা বলছো।

আল্লামা রুমীর ভাষায়–

ই নাদানাসিস্তান্দ ইশাঁ আজ আমা
হাস্ত ফরকে দরমিঞা বেএন্তেহা।

অর্থঃ অন্ধত্বের কারণেই তারা বুঝতে পারে নি এ দু'টার মধ্যে কত বিরাট ব্যবধান। তিনি আরো বলেন, বোলতা ও মৌমাছি একই ফুল হতে রস সংগ্রহ করে। কিন্তু বোলতার সংগৃহীত রসে হয় বিষ, অথচ মৌমাছির সংগৃহীত রসে হয় সুস্বাদু মধু। জঙ্গলে দুই প্রকার হরিণ বিচরণ করে। আকৃতি-প্রকৃতি, খাদ্য-পানীয় উভয়ের এক হলেও এদের একটির নাভীতে হয় মহামূল্য কস্তুরী; অন্যটির তেমন কিছুই হয় না। নলখাগড়া ও ইক্ষু দেখতে একইরকম একই ভূমি হতে রস শোষণ করে বাঁচে। কিন্তু নলখাগড়ার ভিতরে শূন্য। জ্বালানী ব্যতিত এটা অন্য কোন কাজেই আসে না। অথচ ইক্ষুতে থাকে প্রচুর মিষ্টি রস; যে রস পান করে মানুষ তৃপ্তি লাভ করে। ইক্ষুর রস হতে তৈরি হয় চিনি, গুড় আরও কত কি! লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি দেখতে একই রকম। মিষ্টি পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। অন্যটি অপেয়। তদ্রুপ বাহ্যিক আকৃতি অভিন্ন হলেও নবি, অলি ও সাধারণ মানুষ গুণগতভাবে এক হতে পারে না। নবির যাতায়াত সর্বোচ্চ

আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত। অথচ সাধারণ মানুষ কোন বাহন ব্যতিত সামান্য উঁচুতেও উঠতে পারে না। ঠিক তেমনি ব্যবধান উভয়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়। এসব পার্থক্য যারা বুঝতে চান না তারা আসলে মনোবিকারগ্রস্ত এক প্রকার রোগী। যাদের অন্তর চক্ষু বা প্রজ্ঞার লেশমাত্র নেই। তাই এরা হযরত মুসা নবির (আ.) মোজেজাযুক্ত লাঠি আর যাদুকরের লাঠি ভিন্ন দেখে না। এ শ্রেণির লোকের আন্দাজী জ্ঞানের বক্তৃতা বয়ান ও পুস্তক কিতাবে বর্ণিত ধারণা যুগে যুগে অসত্য অসার ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তাই কালজয়ী সাধক আল্লামা রুমী বলেন–

লা'নাতল্লাহ্ ই আমলরা দার ক্বেফা
রহমাতুল্লাহ্ আঁ আমলরা দার ওফা।

অর্থ– এমনি আন্দাজী ধারণার অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্‌র চির অভিশাপ। অন্য দিকে কৃতজ্ঞ অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্‌র অবারিত করুণাশীষ (রহমত)। পবিত্র কোরআন তফসিরের নামে যে বক্তা বিষতুল্য আন্দাজী জ্ঞানে ধর্মের মনগড়া অপব্যাখ্যা ও মহান নবির প্রতি চরম অমর্যাদা বয়ান করেন সে তফসিরকার নিশ্চয় "খান্নাসুল্লাজি – মনুষ্য জাতি হতে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণাদাতা মানুষরূপী শয়তান" (সূরা নাস : ৪–৬)। সূরা লাহাবে আল্লাহ্‌র রায় ঘোষণা, "আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক, অতঃপর সে নিজেও ধ্বংস হবে (সূরা লাহাব : ১)"। যে বাহুবলে আবু লাহাব রাসূলের উপর অত্যাচার করেছিল আল্লাহ্‌র গজবে সে হাত দু'টি প্রথমে পঙ্গু হয়েছিল। অনেক কষ্ট ভোগে অবশেষে সে নিজেও ধ্বংস হয়। রাসূলের আপন চাচা হওয়া সত্ত্বেও আবু লাহাব খোদায়ী শাস্তি হতে রেহাই পায় নি। সুললিত কণ্ঠের ভাষণ শুনিয়ে তথাকথিত যে তফসিরকার অসংখ্য মুসলমানকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে সে মূলশক্তি জিহ্বার গোড়ায় কাটতে বলে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী আল্লাহ্‌র কোরআনী রায়ই পুনঃ ঘোষণা করেন। আল্লাহ্‌র দরবারে এ যুগের এসব আবু লাহাবদেরও ক্ষমা নেই।

ওহাবী-শিবির কিছুই পারবে না

১০ মাঘ উরস শরিফ ১৯৮৭ সাল। সকাল হতে প্রত্যেক বছরের মত আশেক-ভক্তরা দলে দলে হাদিয়া– মহিষ, গরু, ছাগল, বাদ্যবাজনা তক্‌বির ও জিকিরের সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে সমবেত হচ্ছিল। আনুমানিক বিকাল ৩টার দিকে কিছু দরবারী ভক্ত লোক দৌড়ে এসে জানালো কাঞ্চনপুর ও মানিকপুরের ভক্তরা হাদিয়া ব্যান্ডসহ ভাণ্ডার শরিফে আসার পথে শাহ্‌নগর দিঘীর পাড়ে পৌঁছলে ইসলামী ছাত্র শিবির নেতা মোহসিনের নেতৃত্বে ক'জন শিবির কর্মী ঢোলবাদ্য বাজিয়ে যেতে বাধা দিলে মারামারি লেগে যায়। শাহ্‌জাদা সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারীর এক মুরিদের লাঠির আঘাতে অপর পক্ষের একজনের মাথা ফেটে যায়। স্থানীয় মেম্বারের শালিসী মীমাংসায় দরবার ভক্তদের ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। প্রখ্যাত জমিদার আদালত খানদের বাড়ির দক্ষিণে হাদিয়া মিছিলটি আবার ওহাবীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা দেয় 'মাইজভাণ্ডারীরা মসজিদের নামাযের ব্যাঘাত করেছে। তোমাদের দা-ছুরি, লাঠি যার যা আছে তা নিয়ে কাফের মুশরিকদের বাধা দাও। তাদের মহিষ-গরু আটক কর'।

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে" – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হক ভাণ্ডারী বাবাজান সামনের হুজরায় বড় চেয়ারটাতে বসা ছিলেন। মির্জাপুরের মৌং সৈয়দ মসিউল করিম, দৌলতপুরের চেয়ারম্যান দবিরুল আলম চৌধুরী, হারুয়ালছড়ির সামশুল আলম, নাজিরহাটের বটন বাবু ও খবর নিয়ে আগত ভক্তবৃন্দ সহকারে আরজি করলে বাবাজান চেয়ার ছেড়ে আমাদের নিকটে এসে জানত চান, কিসের হাদিয়া, কোথায় আটক হয়েছে? শাহ্‌নগরে উরসের হাদিয়া ওহাবীরা আটক করেছে বলে জানালে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'ধরে নিয়ে এসো'। এই নির্দেশের কথা জানায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধে এন্তেজামিয়া কমিটির সম্পাদক জামাল সিকদার সাহেব ভাণ্ডার শরিফ আহমদিয়া প্রাইমারী স্কুল মাঠে উরস শরিফ প্যান্ডেলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে বাবাজানের নির্দেশ বাস্তবায়নে এক জ্বালাময়ী ভাষণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কয়েক হাজার ভক্তসহ শাহ্‌নগর অভিমুখে রওয়ানা দেন। অল্পসংখ্যক ভক্তের হাতে ছিল

জ্বালানী কাঠ, অন্যরা ছিল শূন্য হাত। সমবেত জনতা জেহাদী জোশে 'নারায়ে তকবীর–আল্লাহু আকবর, নারায়ে রিসালাত–ইয়া রাসূলুল্লাহ্, নারায়ে গাউসিয়া–ইয়া গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, ধর্মের নামে ভন্ডামী-চলবে না, চলবে না, হাদিয়া ব্যান্ড ছেড়ে দাও – নইলে এবার রক্ষা নাই, বাতেলের আস্তানা – জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও' প্রভৃতি স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত এই বিশাল বাহিনী যখন অর্ধবৃত্তাকারে ফসলশূন্য উত্তর বিল অতিক্রম করছিল আমাদের চোখে তখন ঐতিহাসিক ক্রুসেড বিরোধী যুদ্ধযাত্রা চীনের লং মার্চের বিশাল অভিযানের বাস্তবতা এবং অন্তরে বদর ওহুদ মক্কা বিজয়ের সংগ্রামী উদ্দীপনা। পাঠানপাড়া পেরিয়ে জানলাম আমাদের তকবীর ধ্বনির হায়দরী হুংকারে বাতেলেরা নিজের এলাকা ছেড়েই পালিয়েছে। হাদিয়া-ব্যান্ড নিয়ে এগিয়ে আসে আক্রান্ত উরস কাফেলা। বিনাযুদ্ধে কেল্লা ফতে হলে এই কাফেলাকে সামনে রেখে বিজয়ী বাহিনী ভাণ্ডারীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে দরবারে ফিরে আসে। রাত ৮টার দিকে খবর আসে রাউজান সুলতানপুরের ইসমাইল শাহ্নগরে বিরোধীদের হাতে নিহত। সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্ উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যবস্থা নিতে আদেশ দিলেন। জামাল সিকদার সাহেব রাতে ভক্তদের সেখানে পাঠালে বড় সংঘর্ষ হতে পারে মনে করে প্রশাসনের সহায়তা চান। অনেক খুঁজে মাইজভাণ্ডার-নাজিরহাট সড়কে যানজট নিরসনে ব্যস্ত মেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলে তিনি অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী হেতু অপারগতা প্রকাশ করেন। ফটিকছড়ি থানায় যোগাযোগ করে জানা গেল সেখানে মাত্র ৪জন পুলিশ থানা পাহারা দিচ্ছে। অতঃপর চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপারকে টেলিফোনে অনুরোধ করে সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠানো হয়। রাত ১১টা নাগাদ মির্জাপুরের ভক্ত আবদুল হাকিম একটা রিক্শায় করে মাথা ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা ইসমাইলকে নিয়ে মন্জিলে ফিরে আসে। দেখা গেল এ ব্যক্তি সুলতানপুরের নয়, এ ইসমাইল কাগতিয়ার। মূল দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে স্থানীয় কিছু লোক এক বাড়িতে হাদিয়ার মহিষ বেঁধে রেখেছে বললে মিথ্যা তথ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ইসমাইল সেখানে গেলে পিটিয়ে আহত করে। ঘটনার পরদিন একটা জীপে করে ক'জন ভক্তসহ বাবাজান শাহ্নগর-বিবিরহাট হয়ে চট্টগ্রাম শহরে যান। তিনি শাহ্নগরে রাস্তার মাটিয়ালদের ষাট হাজার টাকা দান করেন এবং কালাম

করেন, “মাইজভাণ্ডার শরিফকে তোমরা শত বছরেও চিনলে না, আমি চিনিয়ে ছাড়বো”।

১৫ মাঘ ছিল গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অন্যতম কামেল খলিফা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ রিজওয়ান উদ্দিন শাহ্নগরীর (র.) বার্ষিক উরসের তারিখ। এলাকার জামাত-শিবির ও ওহাবীরা জোটবদ্ধ হয়ে উরস বন্ধের জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। অতীতের নিরিখে হাদিয়া নজরানার টাকা তারা পরিশোধ করবে অঙ্গীকারে উরস বন্ধ রাখার দাবীতে জনমত গঠন করে উরস কমিটিকে প্রচণ্ড চাপ দেয়। এমনকি তারা রওজা শরিফ তালা মেরে বন্ধ করে দেয়। সুন্নী মুসলমান ও দরবারী ভক্তদের মধ্যে এ ঘটনা দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গোপালঘাটা হতে কিছু লোক মন্জিলে এসে বাবাজানের নিকট আরজি করলে বাবাজান জ্বালালী হালতে বলেন, “সূর্য কবে উঠে গেছে, ওহাবী শিবির কিছুই করতে পারবে না”। হুজরা শরিফে বিচরণরত কাল পিঁপড়াগুলো আমাদেরকে মারতে বলে নিজেও মারতে লাগলেন। পটিয়ার জাফর, চাক্তাইর বদি সওদাগর, পাঠানটুলির নূর মোহাম্মদ বাবুল ও যশোহরের কলেজ ছাত্র আবদুল হাফিজ এই কাজে অংশ নেয়। অতঃপর বলেন, একটা জীপ নিয়ে আসবেন, আমরা উরসে যাব। শাহানশাহ্ বাবাজান উরসে যাবেন এই খবরে দরবারী আশেক ভক্ত ও সুন্নীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এবারে উরসে হক মন্জিলের স্থানীয় ভক্তরা একটা গরু হাদিয়া দেয়। জীপ এনে বাবাজানকে যেতে অনুরোধ করলে বলেন, “আমাদের যেতে হবে না, উরস চলছে, চলবে”। পরদিন মোহাম্মদ ইউছুপ প্রকাশ টুনু কাওয়ালসহ বহু ভক্তের মুখে শুনলাম সামা মাহফিল প্রায় দশ হাজার মানুষের হালকা জিকির ও অজদের হালতে রাত ভোর হয়ে যায়। উরসে এবারই বিপুল লোক সমাগম ও বেশী হাদিয়া আসে।

২৬ আশ্বিন ১৯৯৫ খৃঃ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর বার্ষিক সপ্তম উরস শরিফ। রাউজান উত্তর সর্ত্তা, কড়ইওয়ালা বটতল, দক্ষিণ ধর্মপুর, আবদুল্লাহ্পুর, জাফতনগর হতে বিকাল বেলা হাদিয়া-মহিষ গরু ও মাইকে মাইজভাণ্ডারী গানের ক্যাসেট বাজিয়ে মিছিল করে আশেক ভক্তরা মাইজভাণ্ডার শরিফে আসছিল। আজাদী বাজারে ওহাবী মাদ্রাসার শিক্ষকদের উস্কানীতে ছাত্ররা মাদ্রাসা ভবনের ছাদ হতে ইট-পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করলে দরবারী মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। উত্তেজিত ভক্তরা মন্জিলে এসে খবর দেয় যে,

ওহাবীরা উরসের হাদিয়া কেড়ে নিয়েছে, ভক্তদের মেরে আহত করেছে এবং মাইক নিয়ে গেছে। এক্ষুনি ভক্তদল পাঠিয়ে প্রতিকার করা হোক। একের পর এক গরম খবর দিয়ে কমিটিকে ত্বরিৎ প্রতিকারে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষ হতে স্কুটারে দুজন লোক পাঠিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও স্থানীয় ছাত্র নেতাদের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। উত্তেজনাকর অবস্থায় ভক্তদের পাঠানো হলে বড় কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বিরত রাখা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ ও ছাত্র নেতা-কর্মীদের প্রচেষ্টায় উত্তেজনা কমলে হাদিয়াসহ ভক্তরা দরবারে পৌঁছে, ২/৪ জন সামান্য আহত এবং মাইকের স্পীকার, ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি হরণ হয়েছে বলে জানা যায়।

ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও আজাদী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক মাস পর বাজারে সালিশী বৈঠক বসে। মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, ভাণ্ডারী ভক্তরা মাইকে গান বাজিয়ে নামাযের ব্যাঘাত করে। বন্ধ করতে বললে অনাহূত ইট মেরে ঘটনার সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা জবাব দেয়া হয়। ভাণ্ডারীদের পক্ষে উত্তর সর্ত্তার আবুল খায়ের বলেন, জোহরের নামায দেড়টায় শেষ হয়েছে। তবু আমরা বাজারে ঢোকার আগে মাইক বন্ধ করি, তখন বিকেল আড়াইটা। হুজুররা মিথ্যা বলছেন। আমরা নই, তারাই অনর্থক আমাদের মিছিলে মাদ্‌রাসা ভবনের উপর হতে বৃষ্টির মত ভাঙ্গা ইট মেরে ভক্তদের আহত করে। মাইকের স্পীকার ও ক্যাসেট প্লেয়ার জোর করে কেড়ে নেয়। ছাত্রনেতা আলী আবদুল্লাহ্ ও বাজারের ব্যবসায়ীদের সাক্ষী প্রমাণে মাদ্‌রাসা পক্ষের বর্ণনা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মাদ্‌রাসার পক্ষ হতে ধর্মপুর ইউনয়িন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলামুর রহমানকে, ভাণ্ডারীদের পক্ষ হতে হক মন্‌জিলের সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদারকে এবং সভার পক্ষ হতে রাউজান হল্‌দিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রখ্যাত ভাণ্ডারী ভক্ত আবদুল ওহাব মিঞাকে সালিশান মনোনীত করা হয়। সালিশানগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর আবদুল ওহাব সাহেবকে রায় ঘোষণার ভার দেয়া হয়। সারগর্ভ রায়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আবদুল ওহাব সাহেব বলেন, মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ঘটনার দায় স্বীকার না করলেও একটা ঘটনা যে ঘটেছে সেটা তো সর্বস্বীকৃত। আমরা এখানে কোন পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে জরিমানা অথবা মুচলেকা দলিল সৃষ্টি করতে আসি নি। কেউ স্বীকার করুক বা

না করুক, ঘটনা যেখানে ঘটে সেখানকার মানুষেরা সামাজিক নৈতিক দিক হতে সবাই দায়ী। মানুষ গড়ার শরিয়তি প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ দোষী হওয়ার লজ্জায় সত্য প্রকাশে সাহসী না হওয়ায় তাদের নিজের জন্য, প্রতিষ্ঠানের জন্য ও ধর্মের জন্য ভাল করলেন না। নামায যেমন ইবাদত, উরস মিছিলও ইবাদত; যারা যেটা মানে। মাইজভাণ্ডারী উরস মিছিল শত বছরের; মাদ্‌রাসা তার অর্ধেক কালেরও নয়। সার্বজনীন যে রাস্তা দিয়ে উরস মিছিল প্রতি বছর কয়েকবার যাতায়াত করে সে রাস্তার পাশে যারা ভিন্নধর্মী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন নিশ্চয় তারা সার্বিক অবস্থা মেনেই তা করেছেন। তা অগ্রাহ্য করা শান্তি ও ধর্ম দুটোর জন্যই ক্ষতিকর হবে। এখন কি আমরা নিরাপদ মিছিলের জন্য রাস্তাটিকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবো? নাকি নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশের জন্য মাদ্‌রাসাটি অন্যত্র তুলে নিয়ে যেতে বলতে পারি? কোনটাই সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রয়াত মুরুব্বীরা যেমন সহাবস্থান করেছেন আমাদেরও তা-ই করতে হবে। কোন বিকল্প নেই। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে উভয় পক্ষসহ বাজারের ব্যবসায়ী ও এলাকার সমাজকেও দায়িত্ব নিতে হবে। উপস্থিত সকলে শান্তির অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হন।

বর্ণক: আবুল খায়ের, গ্রাম- উত্তর সর্ত্তা, উপজেলা- রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

'সূর্য কবে উঠে গেছে, ওহাবী শিবির কিছুই করতে পারবেনা' বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর কুতুবে ইরশাদ-ব্যাখাকার মুখপাত্র হযরত সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ বলেন, এই সূর্য প্রতীকী অর্থে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়াত। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) হতে আরম্ভ হয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শাহানশাহ্ বাবাজানের মধ্যেও সে শক্তি বিকশিত।

অধিকাংশ মুসলমান ওহাবীদের সঠিক ইতিহাস জানে না। তাই দাড়ি, টুপি, জোব্বা, মেসওয়াক, ঢিলা-কুলুপ, নামায-রোযা হজ্ব পালনকারী হিসেবে মুমিন মোত্তাকী মনে করে অধিক শ্রদ্ধা সম্মান করে থাকে। এসব তাদের বাইরের ধর্মীয় লেবাস মাত্র। তাদের অন্তরে নূরী ঈমান নেই। যেহেতু তারা পবিত্র কোরআন ঘোষিত 'রহমতুল্লিল আ'লামীন' নূরী রাসূলকে মাটির মানুষ, অন্যের মত দোষে গুণে মানুষ মনে করে। ওহাবী ফিত্‌নার (বিভেদ) স্রষ্টা মোহাম্মদ বিন্ আবদুল ওহাব নজ্‌দী 'কিতাবুত্ তাওহীদ ও কাসফুস্ সাবাহাত' নামক দুইটি কিতাব

লিখেন। এই কিতাবে বর্ণিত ঈমান ধ্বংসকারী আকিদাগুলো (১) কালেমা তৈয়বার 'মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' বাক্যাংশ বিশ্বাসী না হলেও চলবে। (২) রাসূলুল্লাহ্'র রওজা পাক যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মদিনা শরিফ গমন করা 'শিরিক'। (৩) নবি ও অলিদের ঘৃণা না করলে কাফের হয়ে যাবে। (৪) নবি-অলিদের প্রতি বিশ্বাসীদের হত্যা করা ওয়াজিব। (৫) অলিদের আকিদা অনুসারীদের বিবাহিত স্ত্রী অপহরণ জায়েয। (৬) কোন মযহাবের ইমামের অনুসরণ করা 'শিরিক'। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী কওমী রাজাকার নামে এক যুব বাহিনী গঠন করে ১৮০৩ সালে শিরিক বেদাতের ধূয়া তুলে জান্নাতুল বাকিতে ঢুকে মা ফাতিমার (রা.) রওজাসহ বহু সাহাবীর মাযার ধ্বংস করে। তারা হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান নরনারী ও শিশু হত্যা করে।

সিফ্ফিনের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্'র (দ.) মূল খেলাফতের উত্তরাধিকারী, জামাতা ও 'আল্লাহ্র সিংহ' উপাধি প্রাপ্ত হযরত আলীর (ক.) পক্ষ ত্যাগ করে ওহাবীরা প্রকৃতপক্ষে নূরী ঈমানী সংযোগধারা হতে চিরতরে খারেজ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে 'খারেজী' বলে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। রাসূল দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইনকে (রা.) তারা ইসলামের ফিত্না (বিভেদ) সৃষ্টিকারী এবং কারবালা যুদ্ধে নিহতদের শহিদ নয়, বাগী অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘৃণা করে। কুখ্যাত এজিদ তাদের বিশ্বাসে পাক্কা মুমিন মুসলমান। এজন্য মানবতা ও ইসলামী ইতিহাসের জঘন্যতম মর্মান্তিক শোকাবহ কারবালা ঘটনার স্মরণে মহর্‌রম মাসে তারা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে না। প্রবাদ আছে– শিয়াদের মধ্যে হাফেজ এবং ওহাবীদের মধ্যে বুজুর্গ হয় না। ওহাবীরা তাদের কিছু আলেমকে বুজুর্গ বলে প্রচার করলেও আসলে তারা 'তাবিজের বুজুর্গ– কামেল অলি নয়।

'ইন্নি জায়েলূন ফিল্ আরদ্বে খলিফা' এই কোরআনী ঘোষণা মতে মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী খোদায়ী যুগ প্রতিনিধির অনুমোদন অভাবে যুগে যুগে ওহাবীদের বহু ঐতিহাসিক সংগ্রামের ফলাফল শূন্যই দেখা গেছে। এই উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের আমদানীকারক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী আল্লামা আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভীর মুরিদ হলেও নিজে আলেম ছিলেন না। ১৮২১ খৃ: ভবঘুরে হয়ে সৌদি আরব সফরে গিয়ে সেখানে দেড় বছর অবস্থান করে তিনি ওহাবী মতবাদে দীক্ষিত হন। ১৯২৪ সালে তিনি ৪০০ সমর্থক সংগ্রহ করে হজ্বে গিয়ে ওহাবী মতবাদে দীক্ষা দিয়ে দল গঠন করেন। লেখাপড়া কম

জানতেন বলে 'তাক্বিয়াতুল ঈমান' কিতাবটি লিখেছেন প্রধান শিষ্য মৌলভী ইসমাইল দেহলভী। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ যে রকম গোপন চুক্তির মাধ্যমে তুর্কীদের তাড়িয়ে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর জামাতা ইবনে সাউদকে সৌদি আরবের সিংহাসনে বসায় তেমনি এক গোপন সমঝোতায় ওহাবী সৈয়দ আহমদ ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় ইংরেজ শত্রু শিখদের বিরুদ্ধে নামে। জয়ী হতে পারলে নিশ্চয় সৌদিদের মত গোলামী তক্মা শাসন ক্ষমতার এঁটো উচ্ছিষ্ট কিছু জুটতো। ওহাবীরা শিখ বিরোধী অভিযানকে জিহাদ [ধর্ম যুদ্ধ] বলে ঘোষণা করে। উত্তর প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের কিছু অংশ জুড়ে ওহাবীরা তৎপরতা চালিয়েছিল। ১৮২৬ সালের ২০ ডিসেম্বর রাতের নিশিথে অতর্কিত হামলা করে ৯০০ মোজাহিদ কয়েকশত শিখ সৈন্য হত্যা করে। সংঘর্ষে মাত্র ৩৬ জন মুসলমান নিহত হয়। (সূত্রঃ বালাকোট এক রক্তসিক্ত ইতিহাস, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, ধর্মচিন্তা বিভাগ, দৈনিক ইত্তেফাক, ০৮-০৫-২০০৩)। উল্লেখ্য যে, চোরের মত রাত নিশিথে অতর্কিত হামলা ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুদ্ধনীতিতে এমন কখনো ঘটে নি। তাই এই ঘটনা ছিল কাপুরুষোচিত বিলকুল হারাম। দুনিয়ার কোন সরকার বিনা স্বার্থে স্বদেশে ভিন্ন সরকার পোষে না। পেশোয়ারে ৪ বছর স্থায়ী সৈয়দ আহ্মদের সরকারের নির্বিঘ্ন অবস্থান প্রমাণ করে যে, তারা ব্রিটিশ শিখণ্ডী ছিল। বিপ্লবী সূর্যসেনের চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সরকারকে ব্রিটিশ ৪ দিনও সহ্য করে নি। ১৮৩১ সাল বালাকোটের যুদ্ধে পাঞ্জাবের প্রজাহিতৈষী শিখ রাজা রনজিত সিংহের ৫০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রায় ৮০,০০০ ওহাবী মুসলমান অংশগ্রহণ করে। প্রধান নেতা সৈয়দ আহমদ ও তৎশিষ্য মৌং ইসমাইল নিরুদ্দেশ নিখোঁজ অথবা শিখদের হাতে নিহত হলে ওহাবীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়। এ বিষয়ে গোলাম রসুলের লেখা 'সিরাতে সাঁইয়েদ আহমদ শহীদ (র.)' নামক উর্দ্দু ভাষার বইটির বাংলা অনুবাদ (দুই খণ্ড) এবং হাফেজ মাওলানা নুরুল আবছারের লেখা 'আমিরুল মুমেনিন সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.)' বই দুটি পাঠ করেছি। সংঘর্ষের ঘটনাগুলো বাদ দিলে প্রথম বইটিকে চট্টগ্রামী ভাষায় বলা যায়, দুয়াইয্যা পীরের (মুরিদের দুয়ারে দুয়ারে কিছু পাওয়ার আশায় যে পীর ঘুরে বেড়ায়) সফরনামা। অসুস্থ-অথর্ব মুরব্বীর ময়লা সাফ করার সাবান বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বইটিকে। ক্ষমতা ও বিত্তলোভী সৈয়দ আহমদকে শহীদ

বানানোর পরাজিত ওহাবীদের মুখরক্ষার কৌশল ও ভবিষ্যতে সুবিধা ভাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করে রাখা। শেষ মুগল সম্রাট শাহ্ আলম জাফরকে নেতৃত্বে বসিয়ে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নেপথ্য নেতৃত্বেও ছিল ওহাবী আলেমেরা। পশ্চিম বঙ্গের নারকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধ যুদ্ধের সেনাপতি নিসার আলী তিতুমীর ও ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ও ছিলেন ওহাবী মতবাদের অনুসারী। ভারতকে দারুল হার্‌ব (দূর্গত অঞ্চল) ঘোষণা করে ওহাবীরা ব্রিটিশ আমলে জুমার নামায পড়া বন্ধ করে দিলে সুন্নীদের সাথে বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা আবার ব্রিটিশ আমলে জুমার নামায পড়েছিল। এমন পরাজয় মুসলমানের ইতিহাসে বিরল। খোদায়ী মহাশক্তির যুগ প্রতিনিধি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনকালেই উপরোক্ত ঘটনাগুলো ঘটেছিল। আমরা নিশ্চিত যে, এসব ঘটনায় ওহাবীদের পক্ষে খোদায়ী কোন অনুমোদন ছিল না। তাই এদের কেউ সফলতার মুখ দেখেন নি।

লর্ড ক্লাইভের নৌবহরে হযরত খিজির (আ.)

কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধের সময় একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুজুর্গ হুগলী নদীতে অযু করছিলেন। সেই সময় লর্ড ক্লাইভ ঐ নদী পথে যুদ্ধ সাজে বিশাল বাহিনী নিয়ে পলাশীর দিকে যাচ্ছিলেন। বুজুর্গ ব্যক্তিটি অন্তর্চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, হযরত খিজির (আ.) লর্ড ক্লাইভের নৌবহরে অগ্রগামী হয়ে সাথে সাথে যাচ্ছেন। তিনি ভেবে অবাক হলেন, আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট অলি হযরত খিজির (আ.) ক্লাইভের নৌবহরে অগ্রগামী দলে কেন? পরে চিন্তা করলেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ইংরেজ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু হঠাৎ করে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলে নবাবের সমর্থিত সেনাবাহিনীর অরক্ষিত গোলাবারুদ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। পলাশী বিপর্যয়ে এটাকেও অনেকে একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। যাই হোক না কেন, এ ঘটনা থেকে আরেকবার প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোন ঘটনা ঘটতে পারেনা। হযরত খিজির (আ.) ক্লাইভের অগ্রগামী দলে ভিড়ে আল্লাহ্‌র এই ইচ্ছাকে সমর্থন দিয়েছেন মাত্র ক্লাইভকে নয়। তদ্রুপ দেখা যায়– পৃথিবীতে প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটি আধ্যাত্মিক কারণ নিহিত থাকে, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

সিপাহী বিদ্রোহে পরাজিত পর্যুদস্ত ওহাবী নেতারা নিজেদের মতবাদের বহুল প্রচার ভারতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দেওবন্দ মাদ্‌রাসা। এই মাদ্‌রাসার উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌলবী রশিদ আহমদ গাংগুহী, মৌলবী আবুল কাসেম নানুতুবী, মৌলবী খলিল আহমদ আম্বুটবী প্রমুখ। বাহ্যিকভাবে ধর্ম শিক্ষার আড়ালে সময় সুযোগে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই তাদের মূল লক্ষ্য। এজন্য খারেজী মাদ্‌রাসা ভবনগুলো রাস্তাকে পিছনে রেখে একটি মাত্র শাহী দরজাসহ সুরক্ষিত দুর্গের আদলে তৈরি। মাদ্‌রাসা সিলেবাসে তাসাওউফ অর্থাৎ সুফিবাদী শিক্ষা থাকলেও ওরা সুফি মতবাদে বিশ্বাসী নয়; তাই কেউ অনুসরণও করে না। এসব মাদ্‌রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ সভা সমাবেশে উপস্থিত হয়ে সর্বকালে তাদের ক্ষমতালিপ্সু আলেমদের রাজনৈতিক দাবাড় গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ আন্দোলনে ওহাবীদের সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নিখিল ভারত কংগ্রেসের সমর্থনে অখণ্ড ভারতের দাবীদার ছিল। অপরপক্ষে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সমর্থনে সুন্নী মুসলমানদের সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামী'র দাবী ছিল ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা। সুন্নী মুসলমানদের দাবী আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে। পক্ষান্তরে কয়েক কোটি ওহাবীর দাবী বাতিল হয়ে যায়। আবার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত বাঙালির পক্ষ সমর্থন না করে ওহাবী আলেম ও মাদ্‌রাসা ছাত্ররা এবং জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘ তথা ছাত্র শিবির হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সমর্থনে রাজাকার, আল্‌-বদর, আশ্‌-শামস্‌ বাহিনীতে যোগ দিয়ে পরাজিত পর্যুদস্ত হয়ে ধৃত, বেইজ্জতি ও পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়।

তাবলীগ ওহাবীদের একটি প্রচারমুখী উদ্যোগ। মৌলবী মোহাম্মদ ইলিয়াস দিল্লর মেওয়াতি গ্রামের মসজিদে ১৯৩১ খৃঃ এই তাবলীগের কাজ শুরু করেন। সেই হতে মসজিদে মসজিদে অদ্যাবধি তাবলীগের দাওয়াতি প্রচার চলে আসছে। এই তাবলীগকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে তাবলীগ জামাত সংগঠিত হয়। মৌং ইলিয়াস লিখিত 'মলফুজাতে ইলিয়াস' নামক উর্দু ভাষায় লিখিত কিতাবে বর্ণিত ইলম আল্লাহ্‌ সাহেব পয়গম্বরকে বলেছেন, লোকদেরকে এটা বলে দাও যে, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ জানে না; ফেরেশ্‌তা, মানুষ, না জ্বীন, না

অন্য কেউ। মৌং ইসমাইল দেহলভী লিখিত 'তকবিয়াতুল ঈমান' (পৃষ্ঠা ২৫) 'নবি-অলিরা গায়েবী কোন কিছু দিতে পারেন না?, তারা মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। তাদের মাযার যিয়ারত করা শিরিক বিদায়ত; তাদের উসিলা গ্রহণও হারাম'। এসব ওহাবী আলেমদের লেখা বহু কিতাবে প্রচারিত। অথচ সওয়ানেহে কাসেমী, তযকেরাতুর রশিদ, ফতেহ বেরেলী কাদিলকাশ নাযারা ইত্যাদি বহু ওহাবী আলেমদের লিখিত কিতাবে মৌলবী আবুল কাসেম নানুতুবী, মৌলবী রশিদ আহমদ গাংগুহী, মৌলবী আশরাফ আলী থানবিসহ বিশিষ্ট ওহাবী নেতাদের বহু অদৃশ্য ঘটনার কেরামত বর্ণিত। এভাবে তাদের গোটা ধর্মীয় ঈমান আমল স্ববিরোধিতায় ভরপুর [দেখুন যালযালা (উর্দু), আল্লামা আরশাদুল কাদেরী অনুবাদ – অধ্যাপক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, প্রকাশক–মোহাম্মদী কুতুবখানা, ৪১ শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লাহ্, চট্টগ্রাম]।

এই ইজতেমার গুরুত্ব প্রচারে তাবলীগীরা বলে থাকে, মক্কা শরিফ গিয়ে হজ্ব করলে এক হজ্বের সওয়াব, টঙ্গী ইজতেমায় গেলে ৭০ হাজার সওয়াব। .... ইজতেমায় ৩০/৪০ লক্ষ লোক সমাবেশ হয়; হজ্বে অত হয় না। বেশী লোকের এক সঙ্গে মোনাজাত কি আল্লাহ্‌র দরবারে বেশী কবুল হবে না? এমনি লোভনীয় লাভের কুট কৌশলে সাধারণ মানুষ তো বটেই জ্ঞানী গুণী বিদ্বানেরাও ঝুঁকে পড়তে বাধ্য।

মুসলমানদের প্রতি ৪০ জনে একজন আবেদ থাকেন; যার উসিলায় আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া কবুল হয় বলে নবির হাদিসে বর্ণিত। ৩০/৪০ লক্ষ মুসল্লি মুসলমানের মহাসমাবেশে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নেক বান্দার উপস্থিতির কারণে বিশ্ব ইজতেমার আখেরী মোনাজাত তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ার কথা। কিন্তু কবুলের কোন প্রমাণ তো মিলে না। কোরআনের ঘোষণা মতে পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত হজ্বই একমাত্র বিশ্ব ইজতেমা; অন্য কোনটি নয়। তাই আল্লাহ্‌র কোন খাস বান্দার টঙ্গী ইজতেমায় উপস্থিতি অসম্ভব। এজন্য তাদের 'আখেরী মোনাজাত' আখের অর্থাৎ শেষ গন্তব্য আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে না। যে কোন মানুষ দান, খয়রাত, হেবা, ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি করে থাকে নিজের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ বা ভালাই পাওয়ার আশায়।

আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক দেখা যাবে, যারা কথাবার্তা পোষাক পরিচ্ছদে অতি বেশী ধার্মিক (অর্থাৎ

ধার্মিকতার ভান করবে) অথচ ভুল বিশ্বাস ও আচরণের ফলে তারা ঈমানদারই নয়, তারা হবে দজ্জাল হতে ভয়ঙ্কর (আল্ হাদিস – বোখারী)।

যুগ যুগের ব্যর্থতার মূল কারণ তাদের নূরী ঈমান নেই। তাই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। অনাগত সত্য জানার জন্য এল্কা এল্হাম (খোদায়ী বাণী/অন্তর সংকেত) স্বপ্ন কিংবা এস্তেখারা কিছুই তাদের সঠিক হয় না। দুইশত বছর ধরে তারা বেঈমানীর অন্ধকারে ঘুরে মরছে।

রাউজান উত্তর গুজরা নিবাসী মরহুম আবদুল কাদের চৌধুরীর পুত্র এহছানুল হক চৌধুরীকে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী বলেন, "ওহাবী আলেমদের পিছনে নামায পড়বেন না, তাদের ঈমান নেই"। বখ্তেয়ার শাহ্ উপসংহার টেনে বলেন, ওহাবী শিবির অতীতে যেমন মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কোন কিছু দিতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

এই শতাব্দীর শুরু হতে জঙ্গী-সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য ইউরোপ-আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্ব যাদেরকে মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করেছে তারা আসলে ওহাবী ফেরকার (মতবাদ) অনুসারী। তারা নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান বা ইসলামের প্রকৃত লোক বলে জাহির করে।

তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম মানে জবরদস্তি কর্তৃত্ব; ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম ও ধর্ম সম্প্রদায় বাতিল। ভিন্ন ধর্মীদের সম্পদ ও নারীরা ধর্মযুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গণিমত। ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সুযোগে তারা নিজেদের জঘন্য মতবাদ প্রচার প্রসার করে চলেছে। এই অপশক্তিটি এশিয়া-আফ্রিকায় প্রায় সবগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে গ্রাস করছে, চেষ্টা করছে তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সৌদি আরব ও পাকিস্তান। তাতারস্থানের প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ড. রাফায়েল এস থাকিমভ বলেন, ওহাবীরা অন্য ধর্ম ও বিরুদ্ধ মতের প্রতি বল প্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী। ওহাবীরা মনে করে, কোরআন উপলব্ধি করার বিষয় নয়, অন্ধ বিশ্বাসের বিষয়। তারা গৌণ জেহাদকে মুখ্য করেছে এবং মুখ্য জেহাদ – যা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি, তা পরিত্যাগ করেছে। কাজানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুর হযরত জাকির বলেন, 'আমরা মনে করি–ওহাবী মতবাদ ইসলামের মূলনীতি ও চেতনা বিকৃত করছে। আমাদের কাছে ওহাবীদের স্থান নেই। (সূত্রঃ রুখে না দাঁড়ালে মুক্তি নেই, আবুল হোসেন খোকন, দৈনিক ভোরের কাগজ ১২-৭-২০০৪)।

রাউজান উপজেলার ডাবুয়া হাছনের খিল নিবাসী মৌলানা মোহাম্মদ হাসান বলেন, ১৯৮৪ সালে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী রাউজান ছেড়ে একদিন একটা জীপ গাড়ি নিয়ে পূর্বদিকে রওনা হলেন। সাথে আমি ও রাউজান ফকির হাটের মন্টু বিশ্বাস। কোথায় যাচ্ছেন কোন হদিস আমরা জানিনা বা জানার কথাও নয়। তবে এতটুকু জানি আল্লাহ্‌র অলিরা অপ্রয়োজনে কিছু করেন না। যা করেন তাতে আল্লাহ্‌র গুপ্ত রহস্য নিহিত থাকে। গাড়ি চলতে চলতে এক সময় রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজারে গিয়ে থামল। গাড়ি থেকে নেমেই শাহানশাহ্ বাবাজান ইন্দ্রপুরী সিনেমা হল দেখে বলেন, চলুন! আমরা সিনেমা দেখব। একথা শুনে আমি ও মন্টু একে অপরের দিকে চাইলাম। হল কর্তৃপক্ষকে বাবাজান বললেন, আধঘন্টা আগে ছবি শুরু করতে পারবেন? জবাবে 'না' আসলে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ১০ মিনিট আগে শুরু করতে পারবেন? কর্তৃপক্ষ এবার হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। ১৬টি টিকেট কাটা হল। ইতিমধ্যে বাবাজান আস্তে আস্তে হেঁটে রিজার্ভ বাজার লঞ্চ ঘাটের দিকে চললেন। আমরা পিছনে পিছনে চললাম। বাবাজান হাঁটছিলেন আর আমরা দৌড়াচ্ছিলাম। হেঁটেই লঞ্চ ঘাটের পাশ দিয়ে নদীতে নামলেন। কোমর পর্যন্ত পানিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও নিজের অজান্তে কখন যে ঘাটে নামলাম বুঝতেই পারি নি। বাবাজান পিছন দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন, "পানির ঢেউয়ের সাথে হযরত খোয়াজ খিজির (আ.) হাঁটছেন, খুব সুন্দর লাগছে"। একথা শুনার সাথে সাথে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। মনে মনে আরজ করলাম, হযরত খোয়াজ খিজিরকে দেখার মত আমার তো সেই চোখ নেই। আপনি তো আল্লাহ্‌র মাহবুব সবই দেখতে পান। এবার আমি ও বাবাজান উপরে উঠে আসলাম। আশ্চর্য ওনার শরীর ও কাপড়ে বিন্দুমাত্র পানি লাগে নি। সবই শুকনো। এরপর সিনেমা দেখার জন্য আমরা হলের ভিতর প্রবেশ করলাম। হলে প্রবেশের ঠিক ৫ মিনিট পর বাবাজান জজ্‌বা হালে তাঁর কদম মোবারক থেকে পাদুকা নিয়ে দর্শকদের পেটাতে লাগলেন। হল ভর্তি মানুষ যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। আমি হল থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। অপর দিকে হল কর্তৃপক্ষ তৎকালীন ডিসি আলী হায়দার সাহেবকে ফোন করলেন এবং পার্শ্ববর্তী আর্মি ক্যাম্পে ফোনে ঘটনার বিস্তারিত জানালেন। সংবাদ পেয়ে ডিসি আলী হায়দার সাহেব ঘটনাস্থলে এসে শাহানশাহ্ বাবাজানকে দেখে যেন একেবারে চুপসে

গেলেন। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, মনে হয় বাবাজানকে তিনি চিনেন। ডিসি সাহেব স্বস্থানে খুবই বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবাজান চেয়ার টেবিল নিয়ে সিনেমা হলের দরজায় বসে রইলেন। আর্মি ক্যাম্প হতে একজন আর্মি অফিসার বেত হাতে দ্রুত বেগে হলের দিকে আসতে লাগলেন। আর্মি অফিসারটা একশত গজ নৈকট্যে পৌঁছলে শাহানশাহ্ বাবাজান ডান হাত মোবারক তুলে টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করে বলেন, 'বেয়াদব? এদিকে কী'? শব্দের তোড়ে হাতের বেত পড়ে গেলে আর্মি অফিসার সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি। এই একটি মাত্র বাক্যে কত শক্তি ছিল শুধু আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই ঘটনাকাল হতে পার্বত্য বিষয়টি সামরিক সমস্যা হতে রাজনৈতিক সমস্যায় রূপান্তর ঘটতে শুরু করে এবং সামরিক প্রশাসনিক আগ্রাসনও কমতে থাকে।

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মিছড়ি থানার ময়ূরখিল মৌজায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের কৃষি খামার। শাহানশাহ্ বাবাজান বছরে কয়েকবার এখানে আসা যাওয়া করতেন, কখনো এসেই আবার চলে যেতেন কখনো কয়েকদিন অবস্থান করতেন। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে তিনি ক'দিন এখানে ছিলেন। খবর শুনে পাহাড়ী বহুলোক তাঁর সাথে দেখা করে নানা আর্জি-আবেদন জানান। একদা সন্ধ্যার পর ১৮ জনের একদল সশস্ত্র শান্তিবাহিনী সদস্য তাঁর সাথে দেখা করার জন্য খামারের তত্ত্বাবধায়ক ওমর আলী ফকিরের সাহায্য চায়। ফকির বাবাজানের অনুমতি চাইলে অস্ত্রগুলো একটি ঘরে রেখে পুকুর হতে হাত মুখ ধুয়ে আসতে নির্দেশ দেন। হাত মুখ ধুয়ে হুজরা শরিফের নিকট গেলে বাবাজান বেরিয়ে আসেন। পদপ্রান্তে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তারা আবেদন করেন 'বাবা! সরকারি অত্যাচার অবিচারে বাধ্য হয়ে আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছি। আপনি অন্তর্যামী সব জানেন, পাহাড়ীদের মান সম্মান নিয়ে বাঁচতে দয়া করুন'। আবেদনে সাড়া দিয়ে বাবাজান বলেন, "ন্যায়ের সংগ্রাম বিফলে যায় না। অনর্থক রক্তপাত করবেন না"। অতঃপর দক্ষ সেনাপতির মত সামরিক কায়দায় লাইন ধরে তাদের দাঁড় করালেন ও বসালেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে বিদায়কালে দোকান থেকে চা বিস্কুট এনে আপ্যায়নের নির্দেশ দিলে ওমর আলী ফকির সে ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পর থেকেই শান্তিবাহিনীর মধ্যে আদর্শগত ও যুদ্ধকৌশলগত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তাদের মধ্যে ভাঙ্গন

ধরে লাম্বা গ্রুপ ও বাঁড়ি গ্রুপ মেরুকরণের মাধ্যমে। লাম্বা (লম্বা) গ্রুপ নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা কমিউনিস্ট অনুসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অবলম্বনের পক্ষপাতী। দৈহিক আকারেও এরা লম্বাটে। বাঁড়ি (বেঁটে) গ্রুপের তরুণ নেতা প্রীতিকুমার চাকমা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের অনুসারী। আদর্শগত দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ লাভ করে। ফলে উপজাতীয়দের এই আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আন্দোলনের অনিশ্চয়তা দলে দলে সরকারি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ শুরু করে, যার শুভ উদ্বোধন করেন শাহানশাহ্ জিয়া ময়ূরখিল খামারে। এটা তাৎপর্যময় যে, চূড়ান্ত আত্মসমর্পণও এই জেলার কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তি চুক্তির পর কৃতজ্ঞতা জানাতে শান্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতারা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ পদার্পণ করেন। অবশেষে ১২ মে '৯৯ তারিখে সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বর্ণক: নূর মোহাম্মদ, পিতা-টুনু মিয়া, সাং-কাঞ্চননগর, উপজেলা-চন্দনাইশ। ম্যানেজার-ময়ূরখিল মাইজভাণ্ডারী খামার, উপজেলা- লক্ষ্মীছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি।

দু'ঘণ্টাধিক সময় গায়েব

শাহানশাহ্ বাবাজানের পূণ্যস্মৃতি কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করার যোগ্যতা ও সামর্থ কোনটাই আমার নেই। বাবাজান ছিলেন দয়ার ভাণ্ডার করুণার মহাসাগর এবং বেলায়তের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর করুণাধারা থেকে আমাকে যা কিছু দান করেছেন তাতে প্রতীয়মান যে, সৃষ্টিকুলের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য তিনি অকাতরে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা নির্বোধ নিতে জানি নি এবং কী পেয়েছি তাও ঠিক বুঝিনা। বাবাজান আমাকে অপূর্ব স্নেহ আদরে একান্ত সান্নিধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি না বুঝে অথবা ভয়ে সে সুযোগ লাভ করতে জানি নি বলে আমার মনে হয়। বাবাজান প্রায় সময় একান্ত ভক্ত ও আশেকান মানুষের বাড়ি, বাসায় গিয়ে অবস্থান করতেন; এটা সর্বজনবিদিত। তাঁর দয়া পাওয়ার আশায় আমি চট্টগ্রাম শহরের ব্যাটারী গলিতে আবদুল গণি সওদাগরের বাসায় অনেকবার যাওয়া-আসা করেছি।

১৯৮২/৮৩ সনের কোন এক সময়ের ঘটনা। আমার বড় ছেলে জন্মের পর থেকে ঘন ঘন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। আরোগ্যের উদ্দেশ্যে দয়াপ্রাপ্তির

আশায় একদিন সন্ধ্যার সময় ব্যাটারী গলিতে গিয়ে সৌভাগ্যবশত: বাবাজানের সামনে উপস্থিত হই। বাবাজান ঐ বাড়ির পূর্ব দিকের ঘরটিতে খাটে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক শান্ত মেজাজে ছিলেন। এমন দীপ্তমান, ভদ্র, বিনয়, হাসিমুখে কথা বলতে আমি আর কাউকে দেখি নি। কিছুক্ষণের মধ্যে মাগরিবের আযান শুনা গেল। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদরের সুরে বললেন, 'বদ্দা (দাদা) আযান দিচ্ছে তো, মাগরিবের নামাযটা পড়ে আসুন'। তখন আমি বুঝতে পারলাম নিয়মিত নামায কায়েম করা আমার অবশ্য কর্তব্য। অতঃপর মসজিদ থেকে নামায পড়ে আসলে বাবাজান আমার জন্য চা-নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'বদ্দা সিনেমা দেখবেন? অনেকে পছন্দ করেন না, সেজন্য বলছি'। আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে সম্মতি জানালাম। তিনি একটি গাড়ির (প্রাইভেট কার) ব্যবস্থা করলেন। ড্রাইভারসহ আমরা তিনজন গাড়িতে উঠলাম। বাবাজান বললেন, 'প্রফেসার সা'ব চলুন আমরা সমুদ্র দেখতে যাই'। গাড়ি ছুটল কুমিরা সৈকতের দিকে। সাগর পাড়ে গাড়ি থামলো। স্থানীয় খাবারের দোকানগুলো থেকে লোকেরা বিভিন্ন খাবার নিয়ে উপস্থিত হলেন। বাবাজান সামান্য কিছু কবুল করেছেন কিনা মনে পড়ছে না। সমস্ত খাবার আমাকে খেতে বললেন। অতঃপর তিনি আমাকে গাড়িতে রেখে সাগরের দিকে হেঁটে গেলেন। সেখানে অন্ধকারে তিনি কতদূর গিয়েছিলেন কী করছিলেন তা দেখা বা জানার সাধ্য আমার ছিল না। গাড়িতে করে সারা পথ যাওয়া-আসার সময় তিনি সারাক্ষণ কোন সময় জজ্‌বাহালে আবার কোন সময় স্বাভাবিকভাবে রহস্যপূর্ণ কথা বলতেন এবং মাঝে মধ্যে আমার দিকে তাকাতেন। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে জড়সড় থাকতাম। সমুদ্র দেখে তিনি ড্রাইভারকে নিউমার্কেটের সামনে জলসা সিনেমায় যেতে বললেন, সেখানে পৌঁছে আমাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠলেন। ম্যানেজার আবসার উদ্দিন চৌধুরী (যিনি সম্পর্কে আমার চাচা হন), বিনীতভাবে আমাদের তাঁর অফিসে বসিয়ে কোকাকোলা দিয়ে আপ্যায়ন করালেন। বাবাজান তাঁকে বললেন, আমাদের জন্য দু'টা টিকেট দেন, আমরা সিনেমা দেখব'। তখন সিনেমা সমাপ্ত হওয়ায় লোকজন হল থেকে বেরিয়ে আসছিল এবং নতুন করে আবার আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই বাবাজান বললেন, 'প্রফেসর সা'ব চলুন আমরা ব্যারিস্টার মিল্কী সাহেবের বাসায় যাব'। ব্যারিস্টার সাহেবের কোতোয়ালী মোড়ের বাসায়

অনেক মক্কেলকে বসে থাকতে দেখা গেল। বাবাজান আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। তড়িৎগতিতে অন্দরমহলে বাবাজানের আগমণের খবর পৌঁছলে মিল্কী সাহেবের স্ত্রী, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী মরহুম খান বাহাদুর সুলতান আহমদ চৌধুরীর কন্যা, বাবাজানকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। বাবাজান তাঁকে ভিতরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে ব্যারিস্টার সাহেবের স্ত্রী এবং মরহুম সুলতান মিঞার পরিবারের সদস্যগণ বাবাজানের একান্ত ভক্ত বলে মনে হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যারিস্টার মিল্কী সাহেব এসে তাঁর চেয়ারে বসলেন। বাবাজান উঠে বললেন, আমরা মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে এসেছি। মিল্কী সাহেব বললেন, আমিও মাইজভাণ্ডার শরিফ যাই। অতঃপর বাবাজান উঠে পড়লেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রফেসর সা'ব চলুন আমরা যাই। ব্যারিস্টার সাহেব চা নাস্তা খেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বাবাজান দেরী না করে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে হালিশহরে মরহুম সুলতান মিঞার বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী সাহেবের বাড়ির উঠানে গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মহিলা ভক্তবৃন্দ অভ্যর্থনা জানিয়ে বিনীতভাবে ভিতরে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ জানালেন, কিন্তু বাবাজান গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মহিলাগণকে ভিতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসলেন। তাঁর নির্দেশে নিউ মার্কেটের দিকে গাড়ি ছুটলো। সেখানে পৌঁছে না থামিয়ে মার্কেটের দক্ষিণ রোড দিয়ে গাড়ি চালাতে বললেন। আমরা লালদিঘী মাঠের পশ্চিম দিকে পৌঁছলাম। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, সিনেমা বুঝি আর দেখা হলো না। তৎক্ষণাৎ বাবাজান ড্রাইভারকে জলসা সিনেমা হলে গাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই দেখলাম চাচা আবসার সাহেব সিনেমার টিকেট নিয়ে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছেন সেই তখন থেকে। উনি অত্যধিক আনন্দে বিনীতভাবে আমাদের হলের সবচেয়ে ভাল দুটো সিটে বসিয়ে দিলেন। দেখলাম সিনেমা সবেমাত্র আরম্ভ হলো। এই মধ্যখানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তথা মিল্কী সাহেবের বাসায় যাওয়া, সেখান থেকে হালিশহর হয়ে ফিরে এসে লালদিঘীর পাড় ঘুরে আবার জলসা সিনেমা হলে ফিরে আসা হিসেব করলে অনেক সময়। বাবাজানের এ কেমন কেরামতি শক্তি! সময়ের ব্যবধান তো কিছুই হলো না। হাত ঘড়িতে দেখলাম সবে ৬টা বেজেছে। অথচ আমরা দু'ঘন্টার অধিক ঘুরাঘুরি করেছি। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর মেরাজের রাত যা ছিল ২৭ বছর

দীর্ঘ অথচ জগতবাসী তা অনুভবই করতে পারে নি। আল্লাহ্‌র বহু মর্যাদাবান অলিদের জীবনে অনুরূপ বহু ঘটনা ঘটেছিল বলে শুনেছি। দেখলাম এই প্রথম। এটা 'তা'য়ী যামান' বা সময় সংকোচন। বাবাজান আমাকে এবং চাচা আবসার উদ্দিন চৌধুরী সাহেবকে ব্যাটারী গলির বাসায় নিয়ে গেলেন। আমাদের রাত্রের খাবার দিতে বললেন। চিংড়ী মাছ এবং আরো অন্যান্য সুস্বাদু তরকারী দিয়ে আমরা পরম তৃপ্তির সাথে অনেক ভাত খেলাম। এরকম সুস্বাদু খাবার আর কখনো খেয়েছি বলে মনে হয়না। বিশেষ করে চিংড়ী এত উপাদেয় হয়েছিল যে, ঐ রাতের খাবার স্মৃতি আমার মনে চির অম্লান হয়ে রয়েছে। ভাত খাওয়ার সময় হঠাৎ করে বললেন, 'সিনেমা কেমন লেগেছে? Most Appealing না'? আমি বিস্ময়ে হতবাক। যিনি সিনেমা হলে সারাক্ষণ 'আল্লাহ্' আল্লাহ্' জিকির করেছেন, তিনি যে ছায়াছবিটা অন্যান্য দর্শকদের চেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছিলেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হলাম। বাবাজানের সতর্ক তীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং জ্ঞানের পরিধি যে কত ব্যাপক এটা বুঝা কঠিন, কী করে বুঝাব! খাওয়ার কিছুক্ষণ পর তিনি আবছার চাচাকে বললেন, 'বদ্দা, আপনার কাজ আছে, আপনি যেতে পারেন'। আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'প্রফেসর সাহেবের তো এখন কাজ নেই, উনি থাকবেন'। আবসার সাহেব চলে যাওয়ার পর বাবাজান আমাকে বললেন, 'চলুন আগামীকাল মোহ্‌সেন আউলিয়ার দরগায় যাব। ভাল হবে না গেলে'? আমি একটু চিন্তিত হলাম এই কারণে যে, কানুনগোপাড়ার বাসায় বলে এসেছিলাম রাত্রে ফিরব, এখন রাত্রে ব্যাটারী গলিতে থাকব এবং পরদিন মোহ্‌সেন আউলিয়া (র.) দরগাহ যাওয়া, তারপর কি হবে! সব যেন অনিশ্চিত হয়ে গেল। আমার গায়ে শার্ট ও প্যান্ট ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। বাবাজান তাঁর নিজের পরিচ্ছন্ন সুন্দর একখানা লুঙ্গি আমাকে পরতে দিলেন। ব্যাটারী গলির বাড়ির সামনের পূর্ব-পশ্চিম লম্বা ঘরটির পশ্চিম পাশের খাটে বিছানা মোবারকে আমাকে শুতে বললেন। আমি নির্দেশ পালন করলাম। সে যা হোক বাবাজানের স্নেহ মেহেরবাণীতে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসেনা, তিনিও ঘুমান নি। তিনি পূর্বদিকের কক্ষটিতে তোষক মোবারকে শয়ন করছেন, বসছেন, আবার বেরিয়ে এসে আমার কোন অসুবিধে বা প্রয়োজন আছে কিনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করছেন। মাঝে-মধ্যে বিভিন্ন রকমের খেলনাগুলি ব্যবহার করছেন। তাঁর জন্য নির্ধারিত টয়লেটটি আমাকে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে

ঘরের লোকজনকে নির্দেশ দিলেন। আমি ঐ রাতে কয়েকবার টয়লেটে গিয়েছিলাম। রাত একটা-দু'টার দিকে তিনি ঘরের লোকজনকে মেহমানের জন্য মিষ্টি আনতে বললেন। বাবাজান নিজে অতুলনীয় বিনয় সহকারে আমাকে খাওয়ানোর জন্য মিষ্টির প্লেট ধরে রইলেন। আমি অত্যন্ত সংকোচ করে কিছু খেলাম। সারা রাত জেগে থেকে মাঝে মাঝে নিজ থেকে হাসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তাঁর রহস্যপূর্ণ কালাম বুঝার সাধ্য আমার ছিল না। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসলে তাঁর জন্য খাবার আনতে বললেন, সামান্য আহার করে তাঁর বিছানা মোবারকে দরজার বিপরীত দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। দরজা খোলা, কোন নড়াচড়া নাই। একটানা শুয়ে থাকলেন ঘুমিয়ে থাকার মত। পরে আমি বুঝতে পেরেছি তিনি ঘুমান নাই। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের নামাযের আজান শুনে আমি নামায পড়তে মসজিদে গেলাম। নামায শেষে ঘরে এসে বাবাজানকে ঠিক একই অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখলাম। কোন পরিবর্তন, নড়াচড়া সাড়াশব্দ নেই। আমি দরজার কাছে বসে রইলাম। সূর্য উঠার পর অনেক বেলা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ভক্তবৃন্দ জড়ো হতে শুরু করেছে। বাবাজান অবিকল শুয়ে আছেন। মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আনুমানিক বেলা ১০টার সময়ে স্বাভাবিক জাগানো অবস্থার ন্যায় পরিষ্কার নম্রভাবে বললেন, "প্রফেসর সাহেব, আপনি কানুনগোপাড়া চলে যান"। অনুমতি পেয়ে আমি সালাম জানিয়ে কনুনগোপাড়া কলেজের বাসার দিকে রওনা দিলাম। তাঁর মেহেরবাণীতে আমার ছেলে আরোগ্য লাভ করে। সর্বদা স্মরণ করি, দু'ঘন্টাধিক সময় কীভাবে সংকুচিত হল! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আমার বিজ্ঞানমনস্ক মন শুধু তড়পায়, যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক কোন সমাধান খুঁজে পাইনা। আবার বাস্তবকেও অস্বীকার করতে পারি না। আসলে আল্লাহ্‌র অলির পক্ষে অসম্ভব যে সম্ভব। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করি এই করুণাধারা থেকে যেন কখনো বঞ্চিত না হই।

বর্ণক: মো. মোস্তফা কামাল, সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

আত্মীয় প্রতিবেশী সংযোগ সম্পর্ক

অলিরা আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত বা স্বভাব ও রাসূলে করিমের (দ.) সিফত বা গুণাবলিতে বিভূষিত। তাই তাঁরা সাধারণের মধ্যে বাস করেও অসাধারণ। বড় দাদা হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর শৈশবকাল হতে বাবা-মা, ভাই-বোনদের শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসায় সেবা-যত্ন ও আদর করতেন। সাধনার তুংগ সময়ে অত্যধিক জজ্‌বা অবস্থায় মারমুখো হলেও যখনি সলুক বা শান্ত থাকতেন তখনকার অমায়িক ব্যবহার অতুলনীয়। রওজা শরিফ পুকুরের বাগান বাড়িতে আলাদা করে দেওয়ার পরও বাবাকে দেখতে আসতেন। সেবক-সেবিকা সত্ত্বেও নিজ হাতে সেবা করতে চাইতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রতিবেশী সকলের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করতেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে আত্মীয়দের বাড়ি-বাসায় গিয়ে দেখাশুনা ও খবরাখবর নিতেন। তাঁর মত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আমাদের অন্য ভাইদের কারও পক্ষে সম্ভব হয় না।

১৯৮৪ সালের ২২ চৈত্র উরসের আগে এক রাতে স্বপ্ন দেখি, নানাজান হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর রওজা শরিফে আমি ভীষণ কান্নাকাটিতে রত; রওজাটা মাটির গভীরে। ক্রিম হলুদ রংয়ের একখানা চাদর গায়ে দিয়ে তিনি সেখানে শায়িত এবং পা দুটি নাড়ছেন। বাবা রওজা শরিফ মাঠের উত্তর প্রান্তে এসে ডাক দিলেন, 'দিদার, এদিকে আয়'। বাবার পরনে ছিল তাঁর চিরায়ত পোশাক-লুঙ্গি, ফতুয়া ও টুপি। ডাক শুনে ভিতর থেকে বাইরে এসে দেখি সুন্দর আয়না ঘেরা মোটা পর্দা লাগানো রওজার ভিতর থেকে পর্দা একটু সরিয়ে নানাজান আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। সে রাত ছিল বৃহস্পতিবার। একদিন পর শনিবার রাত ১১টায় ফটিকছড়ি থেকে নির্বাচিত সাবেক এম.পি নুরুল আলম চৌধুরী আমার চকবাজারের বাসায় এসে বললেন, 'আপনার বড় দাদা নীচে আপনাকে ডাকছেন'। খবর শুনেই এমন ভয় লাগলো তেমন অতীতে আর কখনো লাগে নি। কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি এক পা বাইরে রেখে গাড়িতে গা এলিয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'ক'দিন থেকে আপনার জন্য মন পুড়ছে, তাই দেখতে এলাম'। আমার অনুরোধে বাসায় আসেন। দুধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে দুজনকে দুই কাপ দুধ পরিবেশন করি। কিছুক্ষণ পর ক্ষুধা

লেগেছে জানালে খানার ব্যবস্থা করি। কচু শাক, ডিম ও মুরগীর মাংস ছিল। কচু শাক দিয়েই বেশী ভাত খেলেন। চৌধুরী সাহেবকে শাক দিলেন না। কেমন তৃপ্তি পেয়েছেন জানিনা, দাদাকে সারা জীবনে অত বেশী পরিমাণ ভাত খেতে কখনো দেখি নি। রাত আড়াইটার সময় বিদায় বেলায় দরজার বাইরে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ঠিক নানাজানের মত মৃদু হাস্যময় চেহারায় বলেন, "আমি যা দিই খেতে হয়, আমার কথা মানতে হয়"। বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি পারবো না'। অতঃপর বলেন, 'বাবা নিষেধ করেছেন'? উত্তর দিলাম, 'আপনি তো সব জানেন'। অট্টহাসিতে যেন ফেটে পড়লেন এবং বললেন, 'আপনার টাকা-পয়সা লাগবে কি? লাগলে বলবেন, ট্রাক ভরে দশ, বিশ পঞ্চাশ লাখ, কোটি টাকা পাঠিয়ে দেবো'। বললাম, গাউসে পাক ও আপনার দয়ায় আপাতত আমার কোন অভাব নেই, আমি পরম সুখেই আছি'। তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

বর্ণক: শাহ্ সুফি ডা. সৈয়দ দিদারুল হক, নায়েব মোন্তাজেম, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিঃ, কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।

১৯৬৬ সালের ৯ মাঘ হযরত সাহেব কেবলার স্বপ্ন নির্দেশে আপন পিতা হতে আনুষ্ঠানিক খেলাফত লাভের পর উপস্থিত আশেক ভক্তগণ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে প্রচুর টাকা নজরানা দেন। তিনি পরনের লুঙ্গির কোচড় ভরে সমুদয় টাকা আন্দর হুজরায় পিতার সামনে ঢেলে দিয়ে বলেন, "বাবাজান, টাকাগুলো আপনি রাখুন। টাকা দিয়ে আমি কি করবো"! 'পারিবারিক খরচের জন্য টাকাগুলো বউয়ের হতে দিয়ে দাও' পিতার উক্তি। তিনি উত্তর দিলেন, 'পারিবারিক প্রয়োজন তো মেজভাই দেখে থাকেন'। উত্তর শুনে স্নেহার্দ পিতার চোখ জলে ভরে উঠে। ১৯৭৮ সালের ১০ মাঘ উরসের রাত ৯টার দিকে এক লোক হক মন্‌জিলে অফিস ঘরে এসে বলে, 'আমি গুণে দেখেছি গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল হতে এই মন্‌জিলে ২টি হাদিয়া (গরু-মহিষ) বেশী হয়েছে। কথাটি শুনে এন্তেজামিয়া কমিটির তখনকার সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম বলে উঠেন, তাহলে বড় মন্‌জিলকে ডিফিট্ দিয়ে আমরাই ফার্স্ট হলাম। তারপর জবেহের অনুমতির জন্য কমিটির সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান কোম্পানী হুজরা শরিফে দেখা করলে বাবাজান বলেন, "সুপারসিটি ভাল নয়।

আমার ভাইদের বিশেষ করে মেজ মিয়া ও সেজ মিয়ার ক্ষতি হয় মত কোন কিছু করবেন না”।

১৯৮৩ সালের ঈদের দিন বিকালে বাগে হোসাইনীতে দাদা-দাদীর যিয়ারত সেরে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের শিশুরা বড় আব্বু ও বড় মাম্মীকে সালাম করতে হক মন্‌জিলে আসেন। তিনি সকলকে আদর আপ্যায়ন করেন। ডাক্তার মামার বড় ছেলেকে প্রথমে জেঠা, পরে বাবা বলে সম্বোধন করেন। অতঃপর শিশুদের উদ্দেশ্য করে বলেন, বাবাজানকে রওজা শরিফ হতে তুলে এনে কাচারি ঘরে একটা পালংক (খাটে) এ বসিয়ে রাখলে ভাল হয় না! অবাক চোখে শিশুরা তাঁর দিকে নীরব চেয়েই থাকেন।

বোন ভগ্নিপতি ও ভাগিনা-ভাগিনীদের সাথে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। কৈশোর ও সাধনার প্রথমভাগে মেজ বোনের নিকট বেশী যেতেন। বড় বোনের প্রথম স্বামী ছিলেন তাঁর শিক্ষক ও ৪র্থ বোনের স্বামী মীর জিয়াউদ্দিন ছিলেন তাঁর সহপাঠি। তৃতীয় ভগ্নিপতি এস.এম. তাহের ও ছোট ভগ্নিপতি চৌধুরী এন.জি. মাহমুদ কামাল ছিলেন তাঁর বন্ধুর মত। কামালিয়াত অর্জনের পর ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ বোনের বাসায় বহুবার অবস্থান করেন। বড় বোনের বড় ছেলে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী ও মেজ বোনের মেজ ছেলে সৈয়দ রফিক উদ্দিন তাঁর নিকট হতে আধ্যাত্মিক মেহেরবানী প্রাপ্ত। দ্বিতীয়জন তাঁর জীবনকালেই ওফাতপ্রাপ্ত হন।

১৯৮৬ সালের ৭ নভেম্বর শুক্রবার বিকাল ৪টায় গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল হতে ভাইদের আনবার জন্য ড্রাইভার নাজিমকে গাড়ি দিয়ে পাঠালেন। খবর পেয়ে পায়ে হেঁটে ছুটে আসেন মেজ ভাই মন্‌জিলের মোন্তাজেম শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল হক (মা.জি.আ.) ও সেজ ভাই মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক (মা.জি.আ.)। নিজ ভবনের দোতলায় চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করে পারিবারিক নানা বিষয়ে আলাপ করেন। অতঃপর নিজেও ভাইদের সঙ্গে হেঁটে পুরান বাড়ি আহমদিয়া মন্‌জিলে গমন করেন। সেই মন্‌জিলের ভিতরে পিছনের দিকে বিভিন্ন পাওয়ারের কয়েকটি ইলেকট্রিক বাল্ব নির্দেশ দিয়ে লাগালেন। তারপর ভিতর বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। চেয়ার দেওয়া হলেও মেজ ভাই ও তিনি পরস্পরকে অনুরোধ করতে করতে কারো বসা হয় না। ফলে চেয়ারখানি খালি পড়ে থাকে।

সেখানেও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নানা বিষয়ে ভাইদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয়। রাত ১১টার দিকে তিনি রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর পাড় দিয়ে হেঁটে হক মন্‌জিলে ফিরে আসেন।

গাউসিয়া রহমান মন্‌জিলে একবার কয়েকজন হিন্দু অতিথি আসেন। গরুর মাংস মিশ্রণের ভয়ে হিন্দুরা অনেকে দরবারে মাংস খেতে চান না। তাই তাদের জন্য মাছ থাকলে ভাল, না থাকলে সংকট। কোন পুকুর না থাকাতে এক শাহ্‌জাদার বিবি বাবা ভাণ্ডারীর উদ্দেশ্যে আক্ষেপ করে বলেন, "এত কিছু দিলেন। একটা পুকুর দিলেন না। এত আর্জি আবেদন জানালাম কোন সমাধান নেই। ভাণ্ডারী তোর ভাণ্ডার কি খালি? আমরা বেইজ্জত হলে বুঝি তুই খুশি"? কিছুক্ষণ পর চট্টগ্রাম শহরের বাকলিয়া নিবাসী গাউসিয়া হক মন্‌জিল এন্তেজামিয়া কমিটির সদস্য তাহের উদ্দিন সওদাগর নিজেদের পুকুর থেকে মাছ ধরে রান্না করা ৫টি বড় টিফিন বাটি করে শাহানশাহ্ বাবাজানের জন্য নিয়ে আসেন। বাবাজান খাদেম বেঁটে সেকান্দরকে ভিতর বাড়ি থেকে একটা বড় পাত্র আনিয়ে সব মাছ সে পাত্রে ঢেলে সেকান্দরের মাথায় দিয়ে বাবাজান নিজে মাছগুলো সে পরিবারে পৌঁছে দিয়ে বলেন, 'অমন করে বলবেন না। মুনিবের মেহেরবাণীতে আমাদের কীসের অভাব'। তাহের উদ্দিনও বাবাজানের পিছু পিছু তথায় গমন করে ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলেন।

ষাট দশকের প্রথমার্ধের ঘটনা। তখন বাবাজান তাঁর বাবার পরিবারে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে থাকতেন। রোববার সাপ্তাহিক সরকারি ছুটির দিনে রীতিমত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থাকতাম। এক রোববার সকালে বাবাজান আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর এক মামীর হাতে ১০০ টাকার একখানা নোট দিয়ে বলেন, 'সিন্দুকে ভালমতে হেফাজত করে রাখবেন, আর কোন অসুবিধা থাকবে না'। ১৯৭৬ সালের আষাঢ় মাসে বাবা ভাণ্ডারী গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্বপ্ন নির্দেশে তাঁর এক পুত্রবধু একবার গাউসিয়া হক মন্‌জিলে এসে নিজ হাতে রান্না করে মন্‌জিলের সকলকে খানা পরিবেশন করেন।

তাঁর বড় মামার বড় ছেলে হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ সামশুল হুদা মাইজভাণ্ডারী (র.) বয়সে একটু বড় ছিলেন। কোন সময় সেদিকে গেলে তাঁকে

দেখে আসতেন, নির্দেশ মত চা ও সিগারেট পরিবেশন করতেন। বাবাজানের একমাত্র ছেলে রাহবারে আলম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) সাহেবের খত্‌নার অনুষ্ঠানে দরবারের সকল আওলাদদের দাওয়াত করা হয়। কোরমা-পোলাও পাক হয়। কেউ নিজে না এসে খানা নিতে পাঠালে তাও পরিবেশন করা হয়। হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ সামশুল হুদা মাইজভাণ্ডারী (র.) সাহেব খানা নেয়ার জন্য নূর মোহাম্মদ নামক একজন ভক্তকে একটা সিলভারের জাম দিয়ে পাঠান। খানা দেব কিনা বাবাজানকে জিজ্ঞাসা করার মনে ইচ্ছা জাগে। জিজ্ঞাসা করলে বাবাজান বলেন, খানা নিতে যে পাত্র পাঠিয়েছেন সেটা আমার নিকট নিয়ে এসো। জামটা তাঁর হাতে দেওয়া হলে তিনি সেটা বুকে নিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে খাটে শুয়ে পড়েন। খানাতো দিলেনই না পাত্রটা ফেরত চাইলেও দিলেন না। আমরা না বুঝলেও নিশ্চিত কোন কারণ থাকতে পারে।

পূর্ব মাইজভাণ্ডার কাজী বাড়ির ডাক্তার কাজী মাহবুব সাহেবের বড় ছেলে অধ্যাপক কাজী আখতার বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর চাচা কাজী ফরিদ সাহেব এক আলাপে আমাদের বলেন, বড় বদ্দা হুজুর অর্থাৎ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে এখন থেকে 'বাবাজান' বলতে হবে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত অলির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক চলে না। তবু প্রতিবাদ করে বলি, রক্ত সম্পর্কীয় খালাত ভাইকে আপনি বাবা ডাকবেন আমি তা মানতে পারি না, মানি না। অতঃপর আমি শহরে চলে আসি। বিষয়টা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ২৮ ডিসেম্বর বিকেলে চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের পশ্চিমে নজির আহমদ চৌধুরী সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে এক কাজে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একখানা জীপ আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চোখ ফিরিয়ে দেখি সামনের আসনে কালো চশমা চোখে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বসে আছেন। আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "আল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন না এবং কাউকে জন্মও দেন না। অথচ তিনিই তো জন্মদাতা-সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির এ রহস্য কয়জনে বুঝে জী"। একথা বলেই জীপখানা সাঁ করে চলে গেল। গাড়ি চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে বহুক্ষণ আমি বিহ্বল দাঁড়িয়েই থাকি। আসলে খোদায়ী রহস্য বুঝা ও বুঝানো দুটো বড়ই কঠিন।

শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের সাথেও বাবাজানের সম্পর্ক ছিল মধুর। বৃদ্ধা শ্বাশুড়িকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে চাইতেন। বিনয়ী শ্বাশুড়ি বলতেন, 'বাবাজান'! আপনি

তো আল্লাহ্‌র অলি, কদমবুচি করে আমাকে গুণাহ্‌গার করবেন না। আউয়াল আখের একটু দয়ার নজর রাখলেই ধন্য হব। স্ত্রীর সহোদর দু'ভাই আবদুল মালেক চৌধুরী ও আবু তালেব চৌধুরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অত্যধিক সম্মান করতেন। ফলমূল, মিষ্টি, নাস্তা নিয়ে তাঁদের বাড়িতে বাসায় দেখতে যেতেন। স্ত্রীর বোনদের শুধু যে বুবু ডাকতেন তা নয়, আপন বোনের মত শ্রদ্ধা করতেন ও দেখতে যেতেন। ভায়রা ভাই বদিউল আলম চৌধুরীকে খুবই পছন্দ করতেন। বহুবার নিজে গিয়ে গাড়িতে করে দরবার, শহর ও কক্সবাজার পর্যন্ত বেড়াতে নিয়ে গেছেন। সামনে বসিয়ে নানা সুস্বাদু দ্রব্যাদি খাওয়াতেন, আরামের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর মেহেরবানীতে চৌধুরী সাহেবের ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক মর্যাদায় চট্টগ্রামে বহুল পরিচিত। অপর ভায়রা ভাই সালেহ আহমদ চৌধুরীর প্রশংসা করে বলতেন তাঁর মত ভাল মানুষ হয় না। এ আত্মীয়ের অকাল ইন্তিকালে ১০ জন ছেলে-মেয়েসহ গোটা পরিবার অসহায় হয়ে ভীষণ কান্নাকাটি জুড়ে দিলে সকলকে সান্তনা দিয়ে বলেন, কাঁদবেন না, ভাই সাহেব আল্লাহ্‌র হুকুমে চলে গেলেও আমরা তো আছি। এই পরিবারের চট্টগ্রামের রেয়াজউদ্দিন বাজার চৈতন্য গলির বাসায় তিনি সস্ত্রীক দু'তিন বছর ছিলেন। দৈনন্দিন বাজারসহ বাসার সবকিছুর প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর আস্থা আশ্বাস ও দয়ার ছায়ায় এক চরম অসহায় অবস্থা হতে এই পরিবারের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা-ব্যবসা বাণিজ্য ও সামাজিক মর্যাদায় এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যা ছিল কল্পনাতীত। চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে রেজাউল করিম চৌধুরী ৪ বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান চাচা নুরুল আলম চৌধুরীকে পরাজিত করে ১৯৮৮ সালে হারুয়ালছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সবার ছোট দুই সন্তান ইকবাল, ইবনুও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। মেয়েরা সবাই ভাল ঘরে বিবাহিত, স্বামী সন্তান সন্ততি নিয়ে পরম সুখের সংসার। সেজ ছেলে রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে বাবাজানের বড় মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। পরবর্তীকালে দরবারের নানা কাজে নিয়োজিত এবং বর্তমানে কেন্দ্রিয় কমিটির সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত। স্ত্রীর বড়বোনের শ্বশুর বাড়ি বাঁশখালী থানার কালীপুরে। স্বামী তদানীন্তন প্রখ্যাত উকিল আজিজ আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর ১৯৭৫ সালে তার কবর যিয়ারতের পর পুত্র অধ্যাপক ইউসুফ জাফর চৌধুরীকে বলেন, "আপনার বাবা অত্যন্ত

ভালোমানুষ ছিলেন, কবরে খুব শান্তিতে আছেন, আল্লাহ্‌র অলিদের স্তরে চলে গেছেন'। তাঁর দয়ায় সেই শনের ছাউনি দোতলা বাড়ি এখন তাঁর নির্দেশমত ৬ ভাইয়ের বিশাল দোতলা পাকা দালান। বাবাজানের নির্দেশে শহরের বাসা এবং উক্ত বাড়িতে ২টা আসন শরিফ রয়েছে। ভাই সবাই এবং ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। আসন শরিফের খেদমতে সবাই রত।

স্ত্রীর খালাত ভাই সিএসপি এস.এম. শফিউল আযম জীবনের এক দুঃসময়ে তাঁর কৃপা পেয়ে দেশের কেবিনেট সেক্রেটারী এবং পরে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঢাকা গেলে আযম সাহেবের ছোট ভাই সহিদুল আজমের মোহাম্মদপুরস্থ ইকবাল রোডের বাসায় উঠতেন। সেখানে থেকে আযম সাহেবের বাসায় গিয়ে খবর নিতেন। প্রতিবেশী দক্ষিণ ও পশ্চিম মাদারবাড়ির যথাক্রমে মতিঝিলস্থ ব্ল্যাক এন্ড হর্জ এর ম্যানেজার সৈয়দ হাবিবুর রহমান ও অর্গাননের ম্যানেজার আইয়ুব আলী, মামা বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) সৈয়দ আবুল ফয়েজ সাহেবসহ পরিচিত সকলের বাসায় অথবা অফিসে খোঁজখবর নিতেন। প্রতিবেশী আয়ুব আলী সাহেব বলেন, ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আমার প্রথম ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। আমি নিজ সন্তানকে দেখার আগে ভাণ্ডার শরিফ থেকে একটি জীপ গাড়িতে তিনি ঢাকা পৌঁছে সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে ছেলেকে দেখে দোয়া করেন। তিনি একবার আমাকে বলেন, যা কিছু প্রয়োজন আমাকে বলবেন, অন্যখানে যাবেন না। তাই সারা জীবন অন্য কোন অলির দরবারে যাই নি। তিনি বলতেন, "মহব্বতের লোকজনদের দেখা শুনা না করলে মহব্বত মরে যায়"। তিনি আরও বলেন, "রূহের মত মহব্বত (ভালবাসা)ও আল্লাহ্‌র নূর, রূহ্‌ যেমন দেখা যায় না মহব্বতও তেমনি অদৃশ্য। রূহ্‌ দেহের সাথে, মহব্বত মানুষসহ সকল কিছুর সাথে সম্পর্কিত"।

মানুষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে একদিন সাহস করে তাঁর সমীপে নিবেদন করি, বাবাজান, আর্জি আবেদন ফরিয়াদ নিয়ে কত লোক দূর-দূরান্ত হতে কষ্ট করে আপনার নিকট আসে। দরজা বন্ধ থাকলে তারা মনে বড় দুঃখ পায়। দয়া করে দরজাটা খোলা রাখলে সবার জন্য ভাল হয়। তিনি বলেন, "দরজা খোলা থাকলে লোকেরা টাকা দিয়ে স্তুপ করে ফেলবে। বন্ধ থাকলে দরবারের পোক-জোঁক ডাহুকগুলো কিছু কিছু পায়। তা না হলে ওরা বাঁচবে কী করে? ওদের তো কোন চাকুরি-বাকুরী ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। আমরা কি টাকা রোজগার করতে

এসেছি? আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করতেই তো এসেছি। টাকা-কড়ি, দুনিয়া পূজার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। টাকা পয়সা জীবনকে কলুষিত করে; আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ভুলিয়ে রাখে। অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ মাত্রই কলুষিত"। বাবাজান শুধু নিজ বা নিজ পরিবারের কল্যাণ কামনা করেন নি। দরবারের সামগ্রিক কল্যাণকে তিনি নিজ কর্তব্য করে নিয়েছিলেন।

বর্ণক: সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌, পিতা- সৈয়দ লুৎফর রহমান, সৈয়দ পাড়া, গ্রাম- বক্তপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

শরীরে মশা-মাছি বসে না

৭/৮ বছর ধরে কখনো সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ, কখনো একটানা মাসাধিক কাল তিনি আমার বড় বোন সৈয়দা রিজিয়া বেগম প্রকাশ লেদু বুবুর চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়া ব্যাটারী গলির বাসায় গিয়ে থাকতেন। সেখানে বড় ভাই সৈয়দ নাজিম উদ্দিনের বিধবা স্ত্রী ও দু'শিশু কন্যাসহ আমিও থাকতাম। দিনে রাতে বহুলোক তাঁর নিকট আসতো। তাদের চা-নাস্তা ও খাবার পরিবেশন করতাম। বহুবার তাঁর পবিত্র শরীর টিপে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। কখনো দেখেছি তাঁর উদোম শরীরে মশা মাছিও বসেনা। আবার কোন সময় দেখেছি লাশের মত পড়ে আছেন, সারা শরীর ছোট লাল পিঁপড়ায় ছেয়ে আছে। জীবিতকালে নির্দেশমত হযরত সাহেব কেবলা (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ও বাগে হোসাইনীতে যিয়ারত সেরে তাঁর হুজরায় আর্জি আবেদন পেশ করতাম। জীবনের বহু বিপদ সংকটে তাঁর অবারিত দয়া-মেহেরবাণী পেয়েছি। বুবু-ভাতিজা-ভাতিজীসহ পিতা-মাতা হারা আমরা ক'জনের অন্তরে পিতৃস্নেহের যে হাহাকার ছিল, তাঁর স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসায় তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর দয়ায় অসহায় পরিবারের মেয়ে ভাতিজী সৈয়দা শাহানা বেগম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এম.এ. মান্নান সাহেবের পুত্রবধূ (বড় ছেলে আবদুল লতিফ টিপুর সাথে বিবাহিত)। কোরআনের সূরা আহযাবের ৬ ও ৪০ আয়াতের মর্মমতে এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর ভাইদের অনুসরণে সম্পর্কে জেঠাত ভাই হলেও বুবুসহ আমরা তাঁকে বাবাজান ডাকতাম। তিনি বলতেন, "আল্লাহ্‌র অলিরা মানুষের রূহানী পিতা। তাই বাবা ডাকা উচিত। নতুবা ফয়েজ রহমত পাওয়া যায় না"।

বুবুর পরিবারকে শহরের সম্পত্তি হতে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে শত্রু পক্ষের নানারকম নির্যাতনে হতাশ হয়ে ভাই-বোন দু'জনে ভিতর বাড়িতে রান্নাঘরে বসে একান্ত

আলাপ করছিলাম, শত্রুর অনিষ্ট হতে বাঁচানোর মত অত শক্তি বোধহয় বাবাজানের নেই। একথা বলা মাত্র বাহির বাড়ির নিজ কক্ষ হতে চোখের পলকে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, "এক মুহূর্তে জগতকে পানি করে আবার বানাতে পারি– এমন ক্ষমতা আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। একটু ধৈর্য ধরুন"। কিছুদিন পর প্রধান নির্যাতনকারী ঢাকা যেতে ট্রেনে মারা গেলে সম্পত্তি হতে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায়।

বর্ণক: সৈয়দ মফিজ উদ্দিন, পিতা- সৈয়দ সিরাজুল হক, গাউসিয়া আমিন মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন বাড়ির সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ্ বি.এ.বি.টি. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি হযরত বাবা ভাণ্ডারীর ২২ মহর্‌রম ওফাতের তারিখ স্মরণে প্রতি চান্দ্র মাসের ২২ তারিখে ফাতেহা করতেন। একবার বোয়ালখালী থানার চরণদ্বীপ দরবার শরিফের মাইজ্যা মিয়া হযরত মাওলানা খায়রুল বশর ফারুকী (র.) সেই ফাতেহার দিন বি.টি. সাহেবের বাড়িতে ৫০/৬০ জনসহ অতিথি হন। আতিথেয়তার সংস্থান না থাকাতে বি.টি. সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিকে শাহানশাহ্ বাবাজান একটা ছাগল জবেহ করে ভাত ও মাংস রান্না করে আমাকে দিয়ে বি.টি. সাহেবের ঘরে পৌঁছিয়ে দেন। এই ব্যবস্থায় শাহী মেহমান ও গৃহস্থ উভয়েই পরম আনন্দিত হন। মসজিদের পূর্বের কুয়া খরিদের জন্য বাবাজান আমার দ্বারা ৫০০ টাকার এক বান্ডিল টাকা বি.টি. সাহেব ও ইব্রাহিম সাহেবের নিকট পাঠান। দু'জনকে হক মন্‌জিলে ডেকে আলাপ করেন এবং খানা খাওয়ান। তাঁরা দু'ভাইকে তিনি মামু সাহেব বলে ডাকতেন।

বর্ণক: মোহাম্মদ সেকান্দর (চিরকুমার), পিতা-মৃত আবদুল সালাম, গ্রাম-কাঞ্চননগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। সাবেক খাদেম গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল ও গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ।

বাবার আমলে আমাদের পরিবার ছিল গরীব। বাবা চাষবাস পরিশ্রম করে সংসার চালাতেন। পরিবারের আরেকটি আয়ের উৎস ছিল একখানা গরুর গাড়ি। গাজীকালু পুঁথি পাঠ করে মার মনে তাঁদের দেখার বাসনা জাগে। শাহানশাহ্ বাবাজান আমাদের ঘরে এসে মাকে বলেন, 'আমি গাজী; দাদা সামশুল হুদা

কালু'। বাবাজানের আম্মাজান বেঁচে থাকতে উভয় পরিবারের সহজ যাতায়াতের জন্য সীমানা দেয়ালে একখানা দরজা ছিল। সে দরজা দিয়ে তিনি সর্বদা আমাদের ঘরে আসতেন। শৈশবে বাবাকে হারিয়ে একবোন ও মা-সহ কায়ক্লেশে আমাদের পরিবার চলতো। ফলে আপা চাইলেন কোন অর্থশালী বিত্তবান পরিবার হতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে; যাতে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। এক ধনী পরিবারের মেয়ে দেখতে সাতবাড়িয়া দরবার উরসের সময় গমন করি। মেয়েটি সে দরবারের এক আত্মীয়ের। কী কারণে মেয়েটি উরসে আসে নি। আদর আপ্যায়ন ও ব্যবহারে দরবারের মেজ মিঞা ফজলুল হক সাহেবকে বাবার মত ভাল লাগে। তাঁর মেয়ে আছে শুনে সেখানে আত্মীয়তার জন্য খবর নিলাম। আমি ভাণ্ডার শরিফের আওলাদ বলে তিনি আত্মীয়তায় উৎসাহী হলেন। কিন্তু আপা ওখানে আত্মীয়তার ঘোর বিরোধী। তিনি চট্টগ্রাম শহরের এক ধনীর মেয়ে ঠিক করলেন। সঠিক সিদ্ধান্তের আশায় শাহানশাহ্ বাবাজানের দ্বারস্থ হতেই বলেন, 'সাতবাড়িয়া দরবারের মেয়েটা বিয়ে করলে ভাল হবে'। বাবাজানের অনুমতি পেয়ে বিয়ে সেখানেই হয়ে গেল। প্রথম ছেলে জন্মের পর দেখা গেল মাথা দু'ভাগ। চট্টগ্রাম জামাল খান রোডস্থ ডাক্তার শাহাদাত হোসেন থেকে চিকিৎসা করালাম। চট্টগ্রাম পাঠানটুলির গুলজার খানের বাড়িতে ছেলের মাসহ ছেলেকে বাবাজানের কদমে পেশ করে দয়া প্রার্থনা করি। বাবাজান ছেলেটাকে মাদ্‌রাসায় আরবি পড়াতে সিদ্ধান্ত দিলেন। তাই বড় ছেলে সৈয়দ আরিফ মঈন উদ্দীন আহমদকে নানুপুর মোজাহারুল উলুম গাউসিয়া সিনিয়ার মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়েছি। বাবাজানের অবারিত দয়ায় তেমন কোন বড় ডিগ্রীধারী না হলেও পরিবার পরিজন নিয়ে পরম সুখে আনন্দে আছি। প্রতি ভোর ও সন্ধ্যায় অন্তত: দৈনিক দু'বার তাঁর পবিত্র রওজায় হাজিরা দিয়ে ভক্তি জানাই।

বর্ণক: সৈয়দ সামশুল আরেফীন (বাবুল), পিতা- সৈয়দ মহিউদ্দিন, গাউসিয়া আমিন মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ।

আত্মীয় সম্পর্কে তিনি আমার ফুফাত ভাই। বয়সে প্রায় ২০ বছরের বড়। দাদা ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী উদার। দরবারের স্বত্ব দখল নিয়ে ত্রিশের দশক হতে ষাটের দশক পর্যন্ত ফুফার সাথে পুরানবাড়িসহ আমাদের বহু মামলা-মোকদ্দমা বশতঃ মনোমালিন্য ছিল। তাই আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া একপ্রকার বন্ধই ছিল। দাদা সে বাঁধা মানতেন না। সর্বত্র তাঁর অবাধ যাওয়া আসা ছিল। বাবা-মাসহ সকল মুরুব্বী তাঁকে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন এবং অত্যধিক স্নেহ করতেন। মুরুব্বীদের তিনি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা-সমীহ করতেন। ছোটদেরকে তিনি খুবই আদর স্নেহ করতেন। ফুফা পূর্ব বাড়িতে আলাদা করে দিলে সেখানেও আমার যাতায়াত ছিল। কখনো স্ব-ইচ্ছায় কোন কোন সময় লোক পাঠিয়ে ডাকতেন। হুজরায় তাঁর সঙ্গে বেশ ক'বার হারমোনিয়াম-ঢোলক বাজিয়ে জিকির মাহ্ফিল করেছি। তিনি তন্ময় হয়ে শুনতেন এং মাথা নেড়ে "আল্লাহ্ আল্লাহ্" শব্দ করতেন। যখনি যেতাম ভাবীকে ডেকে চা-নাস্তা-খানা ও ফল, মিষ্টি-দুধ-দধি কত কিছু খাওয়াতেন। একবার এমন এক মুরগীর কলিজা খাওয়ালেন অত বড় জীবনে আর কোনদিন দেখিও নি। জজ্বা অবস্থায় থাকলে ভয় হতো। শান্ত থাকলে সুখ দুঃখের কথা বলে দয়াপ্রার্থী হতাম। ১৯৮৪ সালে তাঁর দোয়ায় রোসাঙ্গিরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। ১৯৮৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পুনঃ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়ে তাঁর দোয়াপ্রার্থী হলে বলেন, 'একবার তো ছিলেন, আবার কী দরকার। ভাণ্ডারীর গদিতে বসে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করুন'। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ভাণ্ডারীর গদী শরিফই জীবনের শেষ ভরসা! তাঁর পবিত্র মহান সত্ত্বার প্রতি জানাই শত সহস্র ভক্তিপূর্ণ সালাম।

বর্ণক: শাহ্জাদা সৈয়দ সদর উল উলা, পিতা- সৈয়দ মাহবুবুল বশর, গাউসিয়া রহমান মন্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ।

সূত্রঃ ১৯৮৪ সালে ২২ চৈত্র সকালবেলা বড় ভাবীর চিকিৎসার্থে তিনি হক মন্জিলে এসেছিলেন। বিদায়কালে অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। সঙ্গে ছিলেন শাহ্ সুফি সৈয়দ শহিদুল হক, সৈয়দ আহমদ হোসাইন শাহরিয়ার, ডাক্তার সাহেবের বড় ছেলে রুবাব ও অন্যান্য।

রাষ্ট্রীয় সামাজিক স্তরের মত আল্লাহ্‌র অলিদের মধ্যে উঁচু নিচু মান-সম্মান মর্যাদা এবং প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক কার্যকর। সমকালের অন্য অলিরা তাঁকে সমীহ সম্মান করতেন, এমনকি ভয়ও করতেন। সাধনার প্রথমপর্বে একদা তিনি খাদেম কবিরসহ জজ্‌বাহালে ফটিকছড়ি থানার আজিমনগর গ্রামে ধুরুংকুল নামক স্থানে গমন করে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন। সে সময় নানুপুর নিবাসী বিশিষ্ট শিল্পপতি মির্জা আবু আহ্‌মদ সাহেবের গাড়িতে করে হযরত মতিউর রহমান শাহ্‌ (র.) নাজিরহাটের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে গাড়ি হতে নেমে যান। যতক্ষণ তিনি তথায় ছিলেন শাহ্‌ সাহেব ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি চলে আসলে শাহ্‌ সাহেব পশ্চিম দিকে চলে যান। এভাবে দেখা-সাক্ষাতে সর্বদা তাঁকে সম্মান করতেন। হযরত মতিউর রহমান (বি.এ) শাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাপন্থী একজন কামেল অলি-উল্লাহ্‌।

১৯৭৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ২৮ অগ্রহায়ণ ভোরে বাবাজান বাহির থেকে একটা রিক্সাযোগে মন্‌জিলের তৎকালের বড় কাচারির পশ্চিম পাশে এসে নামলেন। আমাকে দেখে বলেন, আহ্‌লা দরবার শরিফের জনাব কাজী সাহেব কেবলার ছেলে মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব ইন্তিকাল করেছেন, তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাতে এক প্যাকেট আগরবাতি ও সুগন্ধী জল ছিটানোর ১টি আয়নাযুক্ত গোলাপদানী। অথচ ভোর রাতেও তিনি হুজরা শরিফে ছিলেন। দিনের ১১টার পর মাওলানা সাহেবের ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছে। ব্যবহৃত টেবিল ফ্যানখানা হক ভাণ্ডারী নিয়ে আসার কিছুদিন পর ১৯৮২ সাল ১৩ ডিসেম্বর ২৯ অগ্রহায়ণ কাজী সাহেবের বড় ছেলে হযরত মাওলানা কাজী মাজহারুল ইসলাম প্রকাশ বড় হুজুর ওফাতপ্রাপ্ত হন। ফটিকছড়ি থানার নানুপুরের হযরত ওবেদুল হক শাহ্‌ (র.), নিচিন্তাপুরের হযরত চুন্নুমিঞা শাহ্‌ প্রকাশ খারু ফকির (র.), চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজারের সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন শাহ্‌ (র.) প্রকাশ লেংটা মামা, হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ গ্রামের মোহাম্মদ মিঞা ফকির, উদালিয়ার গুরামিয়া ফকির প্রকাশ খারু ফকির (র.) (মাযার মনিয়া পুকুর), হযরত সুলতান আহমদ শাহ্‌ (র.) (মাযার কালুরঘাট) তাঁকে শ্রদ্ধাসমীহ করতেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খলিফাদের মধ্যে মির্জাপুরের হযরত মাওলানা সৈয়দ তফাজ্জল হোসেন শাহ্‌ (র.), চন্দনাইশ

থানার হযরত মাওলানা আহ্‌মদ ছফা শাহ্ (র.), হযরত মাওলানা নুরুচ্ছাফা শাহ্ (র.), হাটহাজারী ফরহাদাবাদ দরবার শরিফের হযরত মাওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.), চট্টগ্রাম শহরের আলকরণের হযরত বেলায়ত আলী শাহ্ (র.), গাউসে পাকের খাস খাদেম হযরত ছৈয়দ মিঞা ফকির (র.) তৎকালে জীবিত সকল মাইজভাণ্ডারী খলিফার পবিত্র স্নেহে তিনি ধন্য হয়েছিলেন।

উনিশ্‌শ' আশি সালের ঘটনা। জনাব হাফেজ আহমদ শাহ্ (র.) প্রকাশ চুনতি শাহ্ সাহেব চট্টগ্রাম শহরে আন্দরকিল্লায় জনৈক ধনী ব্যক্তির বাসায় অবস্থান করছিলেন। সন্ধ্যায় শাহানশাহ্ বাবাজান জীপযোগে সেখানে পৌঁছলে শাহ্ সাহেব উঠে দাঁড়ান। অতঃপর 'আমি কিছু না, আমি কিছু না' বলে হেঁটে প্রধান সড়কের দিকে চলে গেলেন, সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ প্রকাশ টুনু কাওয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যে রাতে শাহ্ সাহেব ইন্তিকাল করেন তিনি এস.এম. মর্তুজা হোসেনের চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদস্থ বাসভবন ইফ্‌কো কমপ্লেক্সে ছিলেন। শাহ্ সাহেবের ইন্তিকালের খবর শুনার কথা বলে ভোর রাতে তিনি একটা রেডিও খোঁজ করেন। শহরে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছার পূর্বে সকালবেলা মর্তুজা সাহেবকে নিয়ে তিনি চুনতি গমন করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শহরে ফেরত আসেন।

বোয়ালখালী উপজেলার গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রথম খলিফা হযরত মাওলানা শেখ অছিয়র রহমান ফারুকী (র.) প্রতিষ্ঠিত চরণদ্বীপ দরবার শরিফের মাইজ্যা মিঞা নামে খ্যাত হযরত মাওলানা খায়রুল বশর ফারুকী (র.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ যখনি আসতেন কিছু সময় শাহানশাহ্ বাবাজানের নিকট থাকতেন। তিনি কামেল ছিলেন। ওফাতের পর তাঁর অসিয়ত অনুসারে ব্যবহৃত লাঠিসহ কিছু জিনিসপত্র তাঁর বিবিজান হক মন্‌জিলে পাঠিয়ে দেন। সেগুলো স্মৃতিকক্ষে রক্ষিত আছে।

ফটিকছড়ি বিবিরহাট ও উপজেলা অফিস পাড়ায় হযরত নবিদর রহমান ফকিরের (র.) (মাযার বিবির হাটের দক্ষিণে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুর পাড়ে) অবাধ বিচরণ ছিল। কামেল ফকির হিসেবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। একদা ফটিকছড়ি সহকারী ভূমি অফিসে তাঁর সাথে দেখা। তিনি আমাদের চা-নাস্তায়

আপ্যায়ন করালেন। কিছুদিন পূর্বে রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম নিবাসী আহামদ গণি মাস্টারের মেজ ভাইয়ের যুবক ছেলে ফসিউল আলম এই ফকিরের সাথে কী বেয়াদবী করায় অকাল মৃত্যু ঘটে। অবুঝ ছেলেকে এভাবে কঠোর শাস্তি দেওয়া ঠিক হলো কি? একথা বলার সাথে জজ্‌বাহালে বলতে লাগলেন, 'আমি কেন শাস্তি দেব; যার শাস্তি সে টেনেছে। আমি তোমাকে চিনি। জিয়াউল হক মিঞা ক্ষমতা একটু পেয়েছে তাতে তোমার কী'? আমি বেয়াদবী হয়েছে ভেবে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কিছুদিন পর একদা দরবার শরিফ পৌঁছে দেখি এই ফকির হক মন্‌জিলের দক্ষিণের গেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'শাহানশাহ্‌কে সালাম দিতে এসেছিলাম'। ফকির দরবেশগণ জজ্‌বা অবস্থায় যা বলেন তা খোদায়ী শক্তির বিকাশ। সলুক অর্থাৎ শান্ত অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্রত্ব অকপটে মেনে নেন। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান কাগতিয়ার হযরত হারেস শাহ্ (র.) প্রকাশ হারেস ফকির কামেল ব্যক্তি হিসেবে সে অঞ্চলে বহুল পরিচিত; মাযারও সেখানে। তিনি একবার চৈত্রমাসী উরস শরিফে এসে শাহানশাহ্ বাবাজানের সাথে দেখা করেন। বাবাজানের নির্দেশে তিনি বেশ কিছু সময় আমাদের সাথে অফিস ঘরে অবস্থান করেন। দরবার পাকের আদব সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন 'আমি নির্দেশিত হয়ে এ মহান অলির দরবারে এসেছি। তাঁর সম মর্যাদার কোন অলি বর্তমান জগতে নেই। আমিও এ বিশ্বঅলির কৃপাপ্রার্থী'। প্রশ্রাব করার জন্য তিনি দরবারের সীমানা ছেড়ে নানুপুর বিলে চলে যান।

১৯৮৯ সালের আরেক ঘটনা। জীবিত থাকতে হক ভাণ্ডারী বাবাজান চট্টগ্রাম বন্দরের কিছু অফিসারকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং বিপদে আপদে দয়া মেহেরবানী করতেন। ফলে জিন্দা অলির প্রতি মানসিক দুর্বলতা বশত: কুতুবদিয়ার শাহ্ সাহেবের আগমনের খবর পেয়ে স্বীয় জামাতা চট্টগ্রাম শহরের পাঠানটুলীর মাওলানা ব্রাদার্স এর বাসায় চট্টগ্রাম বন্দরের সর্ব জনাব মো. গোলাম রসূল (পরিচালক প্রশাসন), এ.এন.এম.এ মুমিন (সচিব), ক্যাপ্টেন আমিরুল ইসলাম (উপ-সংরক্ষক), আমানত উল্লাহ্ (পাইলট), আবদুল মান্নান (নিরাপত্তা বিভাগ) হুজুরের সাথে দেখা করেন। বাসায় ফিরে সে রাতে গোলাম রসুল সাহেব স্বপ্নে দেখেন, হাশরের মাঠ – কোটি কোটি মানুষের মহা সমাবেশ। সে মাঠের মধ্যখানে ঘেরা দেওয়া একটি উঁচু মঞ্চ। শাহানশাহ্ বাবাজান তাঁর বিপুলসংখ্যক

আশেক ভক্তদের হাত ধরে টেনে টেনে সে মঞ্চে নিরাপদ বেষ্টনীতে তুলছেন। তন্মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার জহুরুল হক (সদস্য প্রকৌশলী) ও ইঞ্জিনিয়ার আলী নবি চৌধুরী (মোটরযান বিভাগ) এই দুজনকেও তোলা হয়। যারা কুতুবদিয়ার শাহ্ সাহেবের নিকট সাক্ষাতে যান নি। যারা সেখানে গেছেন তারা বাবাজানের নিকটস্থ হলে তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। ফলে মঞ্চে উঠার সুযোগ না পেয়ে তারা কাঁদতে থাকেন। পরদিন মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ এসে শাহানশাহ্ বাবাজানের একমাত্র পুত্র ও বেলায়তি উত্তরাধিকার হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) সাহেবের নিকট করজোড়ে ভুল স্বীকার করে প্রত্যেকে একটি করে ছাগল হাদিয়া দিয়ে বাবাজানের পবিত্র রওজায় কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যুবা বয়সে বায়াত হওয়ার ইচ্ছা জাগলে মিরসরাই উপজেলার স্বনামধন্য পীর মাওলানা একরামুল হক লতিফি ও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা সুন্দরপুর নিবাসী হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ্ (র.) সাহেবের পুত্র মাওলানা মাহমুদুল হক প্রকাশ মাওলানা বদরের কথা স্মরণ করি। ঢোলবাদ্য সহকারে সামা মাহফিল জায়েয কিনা কাঞ্চনপুরের এক মোনাজেরা (বিতর্ক) মাহফিলে উভয় মাওলানার পক্ষে বিপক্ষে সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি হলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। চট্টগ্রাম হালিশহরে হযরত হাফেজ মুনির উদ্দিন শাহ্ (র.) সাহেবের খলিফা নিজ গ্রামের মাওলানা মীর আহমদ মুনিরীর স্মরণাপন্ন হলে তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ, হাসপাতালে যাচ্ছি। ফিরে আসলে দেখা করবে'। কিন্তু তিনি সেখানে মারা যান। আমি তখন এক মসজিদে ইমামতি করতাম। চট্টগ্রাম শহরে বলুয়ার দিঘী খানকায় হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (র.) সাহেব আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে গেলাম। মনে মনে তিনবার আর্জি করি, আমি মহান আল্লাহ্ ও প্রিয় নবির (দ.) রেজামন্দি হাসিলের আশা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। কোন উত্তর আসে না। তারপর গেলাম চট্টগ্রাম শহরের ধনিয়ালাপাড়া বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের নিকট। সেখানেও আগের মত আর্জি পেশ করে কোন ইতিবাচক সাড়া পেলাম না। ভারতের ফুরফুরা শরিফের গদীনশীন পীর মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী চট্টগ্রাম টাইগার পাশ মামু ভাগিনার মাযার সংলগ্ন খানকায় আসলে সেখানে গিয়ে একইভাবে আবেদন করি। সেখানেও কোন খবর পেলাম না। বুঝতে পারলাম অন্তর্যামীর সাথে সংযোগ না থাকলে অন্তরের খবর জানে না। তাই অলি হিসেবে যারা পরিচিত তাঁদের দরবারে যেতে মনস্থ করি।

একদা সাগর পাড়ি দিয়ে কুতুবদিয়া দ্বীপে আবদুল মালেক শাহ্’র দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। একদিন একরাত অপেক্ষা করে কোন সাড়া না পেয়ে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিলে খাদেমকে ডেকে শাহ্ সাহেব বলেন, ‘ওই লোককে চলে যেতে বল; সময় মত তার কাজ হবে’। সেই সময়টা আর আসে না। তাই এস্তেখারা করলাম। তাতেও কোন ফল হয় না। আল্লাহ্‌র অলিদের রওজা যিয়ারত ও নামায পড়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ্‌র মহান দরবারে মোনাজাত করতে থাকি। একবার মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের সাজ্জদানশীন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক (মা.জি.আ.) মাইজভাণ্ডারীর নিকট আমার আর্জির বিষয় জানালাম। তিনি বলেন, ‘আপনার আর্জি সুন্দর, মুনিব কবুল করুন’। শহর হতে বাড়ি আসার পথে একদা হাটহাজারী উপজেলার মনিয়াপুকুর পৌঁছলে দেখি ঢোলবাদ্য ও গরু মহিষ নিয়ে এদকল লোক কোথায় যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম তারা এয়ার মোহাম্মদ ফকিরের খোশরোজে যাচ্ছে। বুকভরা আশা নিয়ে একদিন এই ফকিরের আস্তানায় হাজির হলাম। এনায়েতপুর গ্রামের পূর্বপ্রান্তে হালদা নদীর বেড়ী বাঁধের ভিতরে এক লম্বা ঘরে একটা খাটে তিনি বসা। বেশীরভাগ সময় জজ্‌বাহালে থাকেন। ফরিয়াদী বহু লোক উপস্থিত। সাম্য সুন্দর পুরুষ চুল দাড়ি ২/৪টা পাক ধরেছে। মনে মনে বার ২ আর্জি পেশ করে কোন উত্তর না পেয়ে আরেকবার আর্জি জানিয়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি বলে উঠেন, ‘কেউ যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের রেজামন্দি হাসিল করতে চায় দরবার শরিফ হক বাবাজানের নিকট চলে যাক। বেলায়তের বর্তমান সম্রাট, তিনি প্রেসিডেন্ট সব ক্ষমতার মালিক, যা চান করতে পারেন’। অতীতে শাহানশাহ্ বাবাজানের প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না। ছোটকালে মা-বাবার সাথে হযরত সৈয়দ আবদুল হাদী সাহেবের ওখানে যাতায়াত করতাম। তিনি বাবা ভাণ্ডারীর সহোদর ছোট ভাই। দু’দিন হক মন্‌জিলে অপেক্ষা করে ফিরে আসি, বাবাজান ছিলেন না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তিনি স্বপ্নে আমাকে বায়াত করান। একদিন হুজরা শরিফে জানালায় দাঁড়িয়ে অনেক মানুষের ভীড়ে সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করতে পারছিনা বলে মনে মনে আর্জি করলে বলেন, “হরদম (সবসময়) আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করবেন”।

বর্ণক: মোহাম্মদ হারুন, গ্রাম- রাংগামাটিয়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আমেরিকা থেকে কখন ফিরলেন

১৯৮৪ সালের কোন এক সন্ধ্যায় শাহানশাহ্ হুজুর আমাদের বাসায় তশরিফ আনেন। ভিতরে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকা থেকে কখন ফিরলেন? আমি কখনো আমেরিকা যাইনি, যাওয়ার কোন পরিকল্পনাও নেই। তাই তাঁর প্রশ্নের কী জবাব দেবো ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলাম। অতঃপর আমার সেজোদা, তাঁর ছোট ভগ্নিপতি সাহেবের বাসায় চলে গেলেন। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী খুশিতে দৌঁড়ে এসে বলে, দাদা হুজুর যখন বলছেন নিশ্চয়ই আপনি আমেরিকায় যেতে পারবেন। কথাটা এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিলাম।
১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ করে প্রস্রাবের নালিতে কষ্ট অনুভূত হয়। শাহ্জাদা ডা. সৈয়দ দিদারুল হক সাহেবকে জানালে তিনি প্রস্রাব পরীক্ষার পরামর্শ দিলেন। পরীক্ষায় কিডনীতে পাথর ধরা পড়ে। ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। বড় বুবু শুনে আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার ছেলে মুজিবুল গণি চৌধুরীকে টেলিফোন করেন। সেখানে চিকিৎসা খরচ পাঁচ লাখ টাকা লাগবে বলে জানায়। বললাম আমার পক্ষে ৫০ হাজার টাকা যোগাড় করাও অসম্ভব। বুবু ছেলেকে টেলিফোনে পুনঃ বলেন, তোমার মামা কোন টাকা দিতে পারবেনা। সব তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে; এটা আমার নির্দেশ। ভাগিনা রাজি হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পরিচালকের সাথে টেলিফোনে আলাপ করি। তিনি আমেরিকা দূতাবাসে টেলিফোন করেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর (আনিসুল ইসলাম মাহমুদ) চাচা আমেরিকা সফরে যাবেন; তিনি প্রবীণ আইনজীবী। দূতাবাসে হাজির হওয়া মাত্র এক নিগ্রো মহিলা আগ বাড়িয়ে আমাকে 'ওয়েলকাম' – স্বাগতম জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যান। পরদিনই ভিসা হয়ে গেল। টিকেটের টাকার জন্য চিন্তিত ছিলাম। নজির আহমদ চৌধুরী রোড মার্কেটের ঘরগুলো দীর্ঘদিন ধরে খালিই পড়ে থাকে। ভিসা হওয়ার পরদিন এক লোক এসে দুই কামরা ভাড়া চাইলে ২ লাখ টাকা জামানত দাবী করলাম। লোকটা তাতেই রাজী হয়ে টাকা দিল। অন্য এক সূত্র হতেও কিছু সাহায্য পেলাম। সবকিছু গুছিয়ে ৪ দিনের মধ্যে পাড়ি দিলাম।

ডাক্তার ভাগিনা সিটি কানেকটিকিউট স্টেট বোস্টনের সেইন্ট ফ্রান্সিস হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই অপারেশন করে কিডনীর পাথর বের করা হয়। সেজোদার মেজ মেয়ে শম্পার জামাতা (চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ

নেতা মরহুম এম.এ. আজিজ সাহেবের ছোট ভাই সাবেক এম.পি.এ. মজিদের ছেলে) ৪ ভাগিনা ও বধূরা নিয়মিত হাসপাতালে ফুল-ফলাহার নিয়ে দেখতে আসতো। এই রোগ হতে সেরে উঠলে হার্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মিন্‌কিন্‌ আমার হার্ট পরীক্ষা করে বলেন, আপনার লায়ন হার্ট, খুব ভাল। সুস্থ হওয়ার পর আত্মীয়রা ক'মাস বেড়াতে অনুরোধ করে। হাসপাতাল হতে বের হয়ে কোথায় কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে আত্মীয়রা প্রোগ্রাম তৈরি করে। এমন সময় **১৮-৮-৮৯** রাতে স্বপন দেখলাম, বড়দাদা শাহানশাহ্‌ হুজুর হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফের বারান্দায় দাঁড়ানো। তাঁকে দেখে আমিও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশে বললেন, এখানে কি কাজ নেই? জানতে চাইলাম আমি কী পারবো? তিনি পুনরায় বললেন, করতে তো হবে। যিনি কালাম করে আমেরিকা পাঠালেন তিনি যখন ডাক দিয়েছেন আরতো থাকা যায় না। মনের ভিতরে দেশে ফিরে আসার তীব্র তাগিদ অনুভব করি। ভাগিনাকে বললাম, সব প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকেট কেটে আমাকে দেশে ফেরত পাঠাও; ডাক এসেছে, আর থাকা চলে না।

বর্ণক: এডভোকেট বিজি মাহমুদ জালাল - সাধারণ সম্পাদক, আন্‌জুমান-এ মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীয়া কেন্দ্রিয় পর্ষদ। ঠিকানা: নজির আহমদ চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

উন্নয়নে নতুন যুগের সূচনা

"আমি দেখতে পাচ্ছি যে, পয়লা বৈশাখ হতে একটি নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে; দরবার পাকের খেদমতের জিম্মাদারী আমি ছেড়ে দেবো"। **১৯৭৪** সালের ৬ এপ্রিল এই কালাম করেন অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। জিম্মাদারী ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশের সাথেই খেলাফত প্রদত্ত বড় পুত্র শাহানশাহ্‌'র বেলায়তি অর্জন পূর্ণতা লাভ করে। কখনো বার বছর, শত বছর অথবা সুনির্দিষ্ট সময়কালকে এক যুগ বলা হয়ে থাকে। এখানে শেষটিকেই বুঝানো হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। বড় ছেলের স্বতন্ত্র আবাসকে একটি ধর্মীয় মন্‌জিলে উন্নিতকরণ লগ্নে তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য গভীর তাৎপর্যময়। এই নতুন যুগের একটি আধ্যাত্মিক দিক অন্যটি জাগতিক। নিজের যোগ্য বিশ্বস্ত প্রিয় কিছু মুরিদকে দায়িত্ব দিয়ে গাউসিয়া হক মন্‌জিল গঠন

এবং মন্‌জিলে উরস অনুষ্ঠানাদি চালুকরণ মাত্র ৭ মাসের মধ্যে। 'মাইজভাণ্ডার খোশরোজ শরিফ' শিরোনামে পোস্টার ও দাওয়াতনামা ছেপে এন্তেজামিয়া কমিটি শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর জন্মদিন উদ্‌যাপনের সূচনা করে ১৯৭৬ সালে। একমাত্র বাবা ভাণ্ডারী ছাড়া তখন পর্যন্ত দরবারে অন্য কারো জন্মদিন বা খোশরোজ পালন করা হতো না। ১৯৮২ সালের ৪ মার্চ ২০ ফাল্‌গুন হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মাইজভাণ্ডার শরিফের প্রথম সেমিনার। অছিয়ে গাউসুল আযমের ওফাত পরবর্তী ৪০ দিনের ফাতেহা উপলক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে "মাইজভাণ্ডার শরিফের উন্নয়নে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী'র ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন জামাল আহমদ সিকদার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব ডা. সৈয়দ দিদারুল হক, মাওলানা নেছারুল হক (শিক্ষক– নাজিরহাট জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা), মাওলানা মুফ্‌তি ফয়েজ উল্লাহ্ (শিক্ষক– গহিরা আলিয়া মাদ্‌রাসা), ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চ.বি.), এডভোকেট বিজি মাহমুদ জালাল, মাওলানা সৈয়দ মাহফুজুল করিম প্রমুখ। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের এই সেমিনারকে কভার করে আত্মপ্রকাশ করে আনজুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর মুখপত্র 'জীবনবাতি' সাময়িকী, পরে মাসিক। প্রধান সম্পাদক– সৈয়দ শহিদুল হক, সহকারী সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদার ও আবুল কালাম। এই সেমিনার ছিল মাইজভাণ্ডারী সংস্কৃতির মাইলফলক। ইতিপূর্বে এই অঙ্গন বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল। একই বছর ১০ পৌষ খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে হক মন্‌জিল হতে প্রকাশিত হয় জামাল সিকদার রচিত, 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' জীবনীগ্রন্থ। ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। হারুয়ালছড়ি নিবাসী গাউসিয়া রহমানিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাজী হারুন উর রশিদের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলা জজ জনাব আবদুর রউফ। লেখকসহ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব সৈয়দ বদিউজ্জামান, কাজী ফরিদ উদ্দিন এবং সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ প্রমুখ। পরদিন এন্তেজামিয়া কমিটি আয়োজিত ভাণ্ডার শরিফ আহমদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' শীর্ষক সেমিনারে

প্রবন্ধ পাঠ করেন জামাল আহমদ সিকদার। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন দৈনিক আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুল আজিজ খান, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল গফুর, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, গহিরা এফ.কে. জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার মোহাদ্দেস মাওলানা মুফ্‌তি ফয়েজ উল্লাহ্‌, সাংবাদিক মাহবুব উল আলম, সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সৈয়দ বদিউজ্জামান। পরের বছর হতে চট্টগ্রাম শহরে, ১৯৯৩ সাল হতে রাজধানী ঢাকায় সেমিনার হচ্ছে। সে ধারা মন্‌জিলের সংগঠন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ও আশেকানে হক ভাণ্ডারীর শাখাসমূহে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। অন্য মন্‌জিল এবং শাখা দরবারসমূহেও এই কার্যক্রম দ্রুত বিস্তার ঘটে।

১৯৮৩ সালে ৭ সেপ্টেম্বর বিপণী বিতানের স্বর্ণের দোকান 'কারু কাঞ্চন'-এর মালিক পাঁচকড়ি বাবু ও সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহকে সাথে নিয়ে শাহানশাহ্‌ বাবাজান পার্বত্য শহর রাঙ্গামাটি বেড়াতে যান। সেখানে তিনি পৌরসভা চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর তবলছড়ি বাজারের কর্ণফুলী হোটেলে উঠেন। এক আলাপে বখ্‌তেয়ার সাহেবকে দেখিয়ে বলেন, ইনি আমার বাবাজানের খলিফা গাউসুল আযমের শানে, বাবাজানের শানে, ২৫টি বই লিখেছেন। আমার সেখানে ৫০/৬০ লাখ টাকা খরচ করে ক'বছর উরস করাতে এখন লোকজন পোক জোঁকের মত ভিড় করছে'। অতঃপর চৌধুরী সাহেব বাবাজানের নির্দেশে বখ্‌তেয়ার সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করেন। আসলে বই লেখার কথা বলে বখ্‌তেয়ার শাহের মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের শান মান প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকারই স্বীকৃতি দিলেন।

মাত্র নয় দিনের প্রচণ্ড তাড়াহুড়োর মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের ১০ মাঘ উরস উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'আলোকধারা' সাময়িকী, আতুর ঘর চট্টগ্রাম কেসিদে রোডের হোটেল টিউলিপের তিন তলার সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহের আস্তানা। উনি সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, প্রকাশক হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.), নির্বাহী সম্পাদক জামাল আহ্‌মদ সিকদার, পরিচালনা সম্পাদক সৈয়দ বদিউজ্জামান, প্রচার বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা সম্পাদক

শামসুল আলম। পবিত্র কোরআনের বাণী “আল্লাহু নুরুস্‌সামাওয়াতে ওয়াল আরদ” – ‘আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর আলো’, এই বাক্যাংশ অবলম্বনে পত্রিকার নামকরণ করেন জামাল আহ্‌মদ সিকদার। ১৯৯৫ সালের ২৬ আশ্বিন হতে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার অন্যতম সহ সম্পাদক মো. মাহবুব উল আলমের সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে মাসিক আলোকধারা। ইন্টারনেট ঠিকানা হল: www.sufimaizbhandari.org.bd এবং ই-মেইল: sufialokdhara@gmail.com

মন্‌জিলে তখন আমরা বাঁশ-ছনে নির্মিত বড় কাচারি ঘরে (পরে বিলুপ্ত) থাকতাম। ১৯৭৮ সালে একদা বাবাজান সে ঘর হতে তাড়িয়ে স্কুল ঘরে থাকতে দেখিয়ে দেন। তথায় ক'মাস থাকার পর ছাত্রদের লেখাপড়ার অসুবিধা হচ্ছে বলে স্কুল পরিচালনা কমিটি আপত্তি করে স্থান ত্যাগে অনুরোধ করে। অতঃপর স্কুলের পিছনে বাঁশ-ছনে আরেকটি ঘর তৈয়ার করে ভক্ত-মেহমানদের রাত্রি যাপনের সংস্থান করা হয়।

প্রথমে মন্‌জিলে উরস অনুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্ধারিত হয়েছিল তৎকালীন হুজরা শরিফ বা বর্তমান রওজা শরিফের পশ্চিম উত্তরের অল্প স্থানটুকু। সমাগম বাড়তে আরম্ভ করলে গরু মহিষ জবেহ, মাংস কুটা-পাক ও ভাত বিভাগকে সরিয়ে নেয়া হয় বর্তমান পারিবারিক ভবনের পূর্বে, ভরাট করা ছোট পুকুরের উত্তরে। সমাবেশ আরও বাড়লে ভাণ্ডার শরিফ আহ্‌মদিয়া প্রাইমারী স্কুল ঘর ও মাঠ (পরে উত্তর পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত) এলাকা অনুষ্ঠান বৃত্তে নিয়ে আসা হয়। ১৯৮৪ সালের ১০ মাঘ উরসে বাবাজান মন্‌জিল এলাকা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শুধু স্কুলঘর ও মাঠে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন। ফলে জায়গা বাড়ানোর চেষ্টা চলে। মন্‌জিল সংলগ্ন পূর্ব দিকের ০.০৭ শতক জমি কানি প্রতি ৩৬,০০০.০০ টাকায় দরদাম ঠিক করে শহর হতে টাকা যোগাড় করে পরের সপ্তাহে দরবারে পৌঁছার পূর্বেই ৪৮,০০০.০০ টাকা দামে সে জমি অন্য মন্‌জিলে বিক্রি হয়ে যায়। বাগে হোসাইনীর সংলগ্ন পূর্ব ও দক্ষিণে ইতিপূর্বে ক্রয় করা ভূমি ছিল জলাভূমি ধানক্ষেত। উপায়হীন অবস্থায় কমিটি সভায় স্কুলের পিছনের কাঁচা ঘরটি পশ্চিমে সরিয়ে তথায় ৫ তলা ভবন নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্‌জিলে সমগ্র এলাকা একটা খসড়া মাস্টার প্ল্যানে সাজিয়ে ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা) চৌধুরী ইয়াসিন বিল্লাহ্‌কে দিয়ে বাবাজানের কাছে উপস্থাপন করা হলে তিনি একই

প্ল্যানে সামনের মসজিদ পুকুরের উত্তর পাড়ে একটি পাকা ঘাট সংযুক্ত করতে বলেন। ভবনের নক্‌শা বাবাজানকে দেখানো হলে ৬ তলা করার পরামর্শ দেন। ৬ ফুট বারান্দাসহ ভবনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৯৬×২৭ ফুট; ভিত্তি দিতে অনুরোধ জানালে বখ্‌তেয়ার শাহকে দিতে বলেন। ১৯৮৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর নির্মাণ কাজ শুরু করে এক তলা নির্মিত হলে দরবারের এক বর্ষীয়ান মুরুব্বী বখ্‌তেয়ার শাহকে জিজ্ঞাসা করেন বিল্ডিং কয় তলা হবে। ছয়তলা শুনে বলেন, নাতি! এত দীর্ঘ ভবনে তুমি কি স্কুল খুলবে? বখতেয়ার শাহ্‌ উত্তর দেন, আপনি শিক্ষক হতে রাজি হলে কাল থেকেই শুরু করে দেব। অতঃপর হাসতে হাসতে বলেন, তোমাদের দূরদৃষ্টি প্রশংসনীয়। আমি তিন তলা করে ভুল করেছি। ভবিষ্যতে আমিও তোমাদের মত ছয়তলা করবো। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ভাণ্ডার শরিফে ৪ তলার চেয়ে কোন উঁচু ভবন ছিল না। ৫-৬ তলা অন্য বিল্ডিংগুলো এই ভবনের অনুসরণে নির্মিত। হক মন্‌জিলের ছয় তলাই মাইজভাণ্ডার শরিফে প্রথম দৃষ্টিনন্দন ইসলামিক আর্চ শোভিত ভবন, অবশ্য রওজা মাযার ছাড়া। ভবনটির মূল নক্‌শা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিন এবং স্থাপত্য নক্‌শা করেন মেহেদীবাগের রাস্‌ এসোসিয়েটস্‌-এর কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার মোহিতুল আযম। ২৫ তলা করে এই ভবনে রাউজান উত্তর গুজরা নিবাসী ভক্ত এহছানুল হক চৌধুরীকে ২টি লিফট লাগাতে পারবে কিনা জানতে চান। মাঝিরঘাট চট্টল পরিবহনের মালিক এ.কে. ব্যাণার্জী, লতিফ দোভাষ এন্ড কোং এর মালিক আবদুল লতিফ দোভাষ, গহিরা কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের মালিক প্রফুল্ল চন্দ্র সিংহ, প্রত্যেকে ২ ট্রাক করে রড সিমেন্ট এবং সদরঘাটের আকতার এন্ড কোং এক মিনি ট্রাক সিমেন্ট ও ষাট হাজার টাকা বকেয়া ছেড়ে দিয়ে ভবন নির্মাণে সহযোগিতা করেন।

মাইজভাণ্ডার শরিফ টেলিযোগাযোগও তাঁর অবদান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী টিএন্ডটি বিভাগের জেনারেল ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে যিয়ারতে আসেন। টেলিফোন সংযোগ দেওয়ার অনুরোধ করলে মন্ত্রী নাজিরহাট এক্সচেঞ্জ হতে লাইন টেনে সংযোগ দেয়ার জন্য জি.এম.-কে সরাসরি নির্দেশ দেন। বাবাজানের নিকট আত্মীয় চট্টগ্রাম পাঠানটুলি খান পরিবারের আলহাজ্ব আকমল খানের ব্যয় নির্বাহে ২০৪ নং টেলিফোনটি সংযোজিত হয়। একই মন্ত্রীর অনুমোদনে দু'বছরের মধ্যে মাইজভাণ্ডার শরিফে

এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। মাইজভাণ্ডারে মন্‌জিলসমূহের আওলাদ উত্তারধিকারীদের মধ্যে স্বাভাবিক দুনিয়াদার না হয়েও ভক্ত জায়েরীনদের অসুবিধা উপলব্ধি, উন্নয়ন চিন্তা প্রসারণ ও বাস্তবায়নে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী একক অনন্যতায় উন্নীত ও অভিষিক্ত।

দৌলতপুর নিবাসী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া নিজের জীপখানা শাহানশাহ্ বাবাজানকে ব্যবহার করতে দেন। এই গাড়িতে চড়ে তিনি মাঝে মধ্যে দাঁতমারা শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া আসা করতেন। সত্তর দশকের শেষ দিকে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের তৎকালীন চীফ ইঞ্জিনিয়ার জহুরুল হক সাহেবকে বলেন, 'মামা, রাস্তায় ধূলাবালির জন্য দাঁতমারা যেতে আসতে খুবই কষ্ট হয়। আপনি রাস্তাটা পাকা করে দিবেন কি'? আবার আশির দশকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম বন্দরের মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার উপরোক্ত ব্যক্তি, ইঞ্জিনিয়ার আলী নবি চৌধুরী, হাইড্রোগ্রাফার হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে গহিরা কালাচাঁন্দের হাটে তখনকার ভাঙ্গা পুল ও রাউজান উত্তর সর্ত্তার নদী ঘাটে নিয়ে যান। তাদেরকে প্রথম পুলটি মেরামত এবং দ্বিতীয় স্থানে একটি নতুন পুল তৈরি করে দিতে নির্দেশ দেন। অথচ তারা কেউ সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন না। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর তখন গঠনই হয় নি। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যাদের দ্বারা যে কাজের সম্ভাবনা নেই কেন তাদেরকে অহেতুক নির্দেশ দিলেন? আল্লাহ্‌র অলিদের বহু কাজ প্রতীকী, বিপুল প্রভাবযুক্ত ও সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। সুফিবাদী সাহিত্য ও ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার বহু প্রমাণ রয়েছে। এসব হক ভাণ্ডারীর প্রতীকী কর্মকাণ্ড। লক্ষ্য করা যায় যে, এদেশে তখন থেকে দেশব্যাপী সড়ক মহাসড়কের পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। মেঘনা-গোমতী ব্রীজ (দাউদকান্দি) ও উত্তর বঙ্গে বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু এবং খুলনার রূপসা ও পাবনায় পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের সূচনা হয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠিত হয়ে গ্রামীণ পাকা রাস্তা ও পুল কালভার্ট নির্মাণের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

১৯৭৮ সালের ঘটনা। শাহানশাহ্ বাবাজান জীপ গাড়িতে করে কক্সবাজার হতে চট্টগ্রাম ফিরছিলেন। কক্সবাজার-কুতুবদিয়া সড়কের সংযোগস্থলে পৌঁছে ড্রাইভার নছুকে গাড়ি থামাতে বলে গাড়ি থেকে নেমে একটা রিক্‌শায় চড়ে কুতুবদিয়া চালাতে বললেন। রিক্‌শাওয়ালা স্টিমার ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যাবে জানালে সফরসঙ্গী মৌলবী কুদ্দুস কুতুবদিয়া যেতে স্টিমারে সাগর পাড়ি দিতে অনেক

কষ্ট হবে, চট্টগ্রাম চলে যাওয়া ভাল হবে মন্তব্য করলেন। বাবাজান বলেন, তুমি চুপ করতো! অতঃপর রিক্‌শায় চড়ে মগনামা স্টিমার ঘাটায় পৌঁছে কুতুবদিয়া দ্বীপের দিকে বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকেন। আশির দশকের শেষ ভাগে পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের খুলনা উপকূল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক বিশাল চর জেগে উঠছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণের ৫ এপ্রিল ২০০১ সংখ্যায় দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে কুতুবদিয়ার দ্বীপ একাকার হয়ে যেতে পারে বলে একটি সংবাদ নিবন্ধ প্রচারিত হয়।

শাহানশাহ্ বাবাজান খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ময়ূরখিল মৌজায় তাঁদের পারিবারিক খামারে মাঝে মধ্যে জীপ গাড়িতে করে বেড়াতে যেতেন। এক রাতে খামারের ম্যানেজার ইদ্রিস এর নিকট হতে ৪ ব্যাটারী টর্চ নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী জ্বালিয়ে রেখে বলেন, এই পার্বত্য এলাকায় ইলেকট্রিক আসবে, বাতি জ্বলবে, ট্রেন চলবে। এটা বিগত সত্তর দশকের শেষ দিকের ঘটনা। নব্বই দশকের মধ্যে সে খামারে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। তিন পার্বত্য জেলার প্রধান প্রধান শহর, বাজার ও গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। অথচ দেশের উন্নত সমতল অঞ্চলের ত্রিশ শতাংশে দু'হাজার সালেও বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। যেখানে কোন কলকারখানা নেই অনুন্নত দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া আশ্চর্যজনক ঘটনা বটে! অদূর ভবিষ্যতে ট্রেন যোগাযোগও গড়ে উঠবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী।

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক হতে পূর্বমুখী নাজিরহাট-মাইজভাণ্ডার শরিফ সড়কের শুরুতে দৃষ্টিনন্দন 'বাবে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী' গেটটি হক মন্‌জিলের নাজিরহাট ও আশপাশের শাখা কমিটির ভক্তদের উদ্যোগ অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নির্মিত। ১৯৯৫ সালে নির্মিত এ গেটের দু'বছর পর মাইজভাণ্ডার শরিফ রাস্তার মাথায় 'শানে গাউসিয়া আহমদিয়া' গেটটি নির্মিত হয়। জীবনের শেষ সময় তিনি অবস্থান করেন কর্ণফুলী নদী ও পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের নিকটস্থ চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে। ওফাতের দিন পতেঙ্গা সৈকত পরিদর্শন করে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত তাঁর শেষ সফর। হয়তো এ দু'স্থানকে ঘিরে বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি হতে পারে অনন্ত সফল সম্ভাবনা।

তার সংযোগ ছাড়া ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে রেডিও, টিভি, মোবাইল সংযোগ সম্ভব হলে আউলিয়াদের সাহায্যে আরো বেশী কিছুর কোন প্রমাণ কি আমি দেখতে পাবো? বহু বছর ধরে এমনি এক প্রশ্ন মনে জেগে থাকে। শাহানশাহ্ বাবাজানের

হুজরা শরিফের সামনে আমি প্রায়ই অবস্থান করতাম। একদিন বাবাজান হুজরা শরিফে এক ব্যক্তিকে ‘আল্লাহ্ আল্লাহ্’ জিকির করতে নির্দেশ দিলেন। লোকটির জিকিরের হাল্ হয়না। বাবাজানের ব্যাটারী সিস্টেম একটি রোবট ছিল। রোবটটি নিয়ে হুজরা হতে বের হয়ে নিজেই লাগান। পরক্ষণে সুইচ অন করলে রোবট “টক্ টক্” যত শব্দ করে ততই লোকটি “আল্লাহ্ আল্লাহ্” শব্দ করে। এভাবে অনেকক্ষণ। তারপর বাবাজান রোবট বন্ধ করে আন্দর হুজরায় ঢুকে গেলেন। লোকটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল। বিজ্ঞানী যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমার জিজ্ঞাসার ফয়সালায় বাবাজান প্রমাণ করলেন, যন্ত্রের সাহায্যেও মানুষের কল্‌ব বা হৃদপিণ্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

বর্ণক: শাহেদ আলী চৌধুরী, পিতা-মরহুম ফজলুল হক চৌধুরী – প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হারুয়ালছড়ি, ইউনিয়ন পরিষদ, ফটিকছড়ি।

হতাশায় আশা, মরণে জীবন

১. একদিন আমার হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। মনটা বড়ই আনচান করছে। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে ঘর হতে বের হয়ে বাড়ির সামনের দোকানে এলাম। দোকানের পাশ দিয়ে চলে গেছে আরাকান রোড। গাড়ি চলছে। মন চাইলো দরবারে যেতে। কাউকে কিছু না বলে গাড়িতে উঠে পড়লাম। সোজা চলে গেলাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। অতঃপর গাউসিয়া হক মন্‌জিলে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, গুটিকয়েক মানুষ বেড়ার আমদানী খানায় বসে আছে। আমাকে দেখে তৌহিদ ফকির বললেন– ‘মামা, বাবাজান আছেন; দেখতে চাইলে দেখে আসুন’। মনে সাহস হলো। কারণ তখন শাহানশাহ্ বাবাজানের সামনে কেউ যেতে পারা দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখলাম, তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। কথা বলছেন আকাশের সাথে, বাতাসের সাথে, সৃষ্টিরাজির সাথে। মহোত্তম সে সময়টিতে আমার অবস্থান জেনে তিনি উচ্চারণ করলেন আমার জীবনের কিছু গোপন কথা। সেই অজানা কথার অনেক ইতিহাস আমাকে মুখে মুখে বলতে হলো। বললাম। মনে তৃপ্তি আর হৃদয়ে প্রশান্তি আসলো। মনে হলো আমার প্রয়োজনে তিনি আমাকে এনেছেন তাঁর কাছে। পরিশেষে আমি আবার আমদানী খানার অফিসে চলে এলাম। এর কিছুক্ষণ পর তিনি বের হলেন; স্মরণীয় আমতলায় দাঁড়ালেন।

তাঁর কাছে একজন গেলেন পা মোবারক ধরতেই এক থাপ্পর দিলেন। সেই ব্যক্তি দৌড়ে চলে আসেন। এসে তো মহাখুশি। শুধু বলছে, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। কেন বলেছেন সে কথা আমার আজও অজানা। পরক্ষণে আরেকজন লোক কাছে গেলে তাকে এক লাথি, সে ব্যক্তি কাতর কণ্ঠে অন্যদিকে চলে গেলেন। বাবাজানের মুখ থেকে জজ্‌বাহালে প্রচুর শব্দ বের হচ্ছে। সবাই এদিক সেদিক পালানোর চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি আসলেন গাড়ি করে। সে ব্যক্তি বাবাজানের সামনে এলে তিনি শান্ত মনে সুন্দর সুন্দর কথা উচ্চারণ করেন। একটু আগে যা ঘটেছে তার কোন রেশ নেই। তিনি বললেন, আমি ইব্রাহিমকে পাঠিয়েছি গাড়ির জন্য। একটু বের হবো। আগন্তুক বললেন, আমার গাড়ি আছে, সেটা করে যেতে পারেন। বাবাজান বললেন, 'না গাড়ি আসবে'। তখনই একটি গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন জেনারেটর ড্রাইভার ইব্রাহিম। সেই জীপ গাড়ি করে বাবাজান চলে গেলেন। আমি চলে আসলাম বাড়িতে। সেই দিনের সদুপদেশ দুই যুগ পরে আজো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি সত্যিই মহিয়ান।

বর্ণক: আবু সুলতান চৌধুরী, আকুবদন্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২. ১৯৮৬ সাল। মুসলমানদের মহা পবিত্র শবেক্বদরের রাত। সবাই ইবাদতে মগ্ন। রাত তখন সাড়ে এগারটা। হঠাৎ ঘরের দরজা কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখলাম, ড্রাইভার রফিক। কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগে রফিক বললো, "বাবাজান গাড়িতে, আপনাকে ডাকছেন"। রফিকের কথা শুনে দ্রুত নিচে গেলাম। বাবাজান হুকুম করলেন, "চলেন দরবারে যাই"। কালবিলম্ব না করে একই গাড়িতে করে দরবারে পৌঁছলাম। তখন রাত প্রায় আড়াইটা। শবে ক্বদরের রাত। প্রচুর মানুষ দরবারে। কিন্তু বাবাজানের কাছে কেউ ভিড়তে পারছে না। বাবাজান পুকুরের পূর্ব পাড়ে গিয়ে বসে গান ধরলেন, "সে যে কেন এলো না, কিছু ভালো লাগে না -----"। উপস্থিত সবাই একজন অন্যজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। বাবাজান কী বলছেন!!! উল্লেখ্য, ৮৭ ও ৮৮ সালের শবে ক্বদরের রাতে বাবাজান আমি অধমের বাসায় অবস্থান করেছেন।

৩. ৬ ডিসেম্বর **১৯৯২**। **শহরে** উত্তেজনা বিরাজ করছে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গন নিয়ে। দুপুরে আমি যাচ্ছি ব্যবসায়িক কাজে কাস্টমসে। পথিমধ্যে শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভব করলাম। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সেখান থেকে বমি বমি ভাব নিয়ে ফিরে আসি বাসায়। বন্ধুবর ডা. রুকুনুজ্জামান আমাকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করে দেন। সেখানে ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি বোর্ড বসান। কিন্তু কোন কিছু করতে তারা ব্যর্থ হন। অন্যদিকে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে শিরা অচল দেখে আমাকে মৃত ঘোষণা করেন। আমার সহধর্মিণী আমাকে মৃত দেখে চিৎকার করে বাবাজানের নাম উচ্চারণ করে সিজদায় পড়লেন। অনেক্ষণ পর এক নার্স আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মুখের কাপড় সরে গেছে দেখে ডক্টর রুমে খবর দিলে ডাক্তার এসে আবার শিরা পরীক্ষা করে দেখলেন আমি বেঁচে আছি। তাৎক্ষণিক মেডিকেল ইমারজেন্সিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরদিন বিকাল সাড়ে ৪টায় জ্ঞান ফিরে আসে। এ আমার বেঁচে থাকা!!

৪. ব্যবসায়িক কাজে দুবাই যাবো। অনুমতির জন্য গেলে তিনি বললেন, আমার জন্য একটি 'গ্রীন রোলেক্স' ঘড়ি আনতে হবে। আমি মেহেরবাণী চাইলাম। প্রায় **১২** দিন পর বাংলাদেশে ফিরে আসার সময় ঘড়িটা নিজের হাতে লাগালাম (কাস্টমসের লোকের দৃষ্টি অন্যদিকে প্রবাহিত করবে মনে করে কাজটি করেছিলাম)। তবু কাস্টমসকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়না। তারা আমাকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে সন্ধ্যার সময় দু'জন সিকিউরিটি দিয়ে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। পরদিন সকালে দরবারে গেলে বাবাজান আমাকে দেখামাত্র ঘড়ির কথা জিজ্ঞেস করে ঘড়ি নিয়ে নেন। পরে এ রকম আরো একটি ঘড়ি বাবাজানের জন্য আনানো হয়েছিল আমি অধমকে দিয়ে। বাবাজানের অনেক মেহেরবাণী আমি পেয়েছি। অনেককে মেহেরবাণী করতে দেখেছি। আমার সে সময়কার স্বচ্ছল অবস্থা এ সময়কার অবস্থার মধ্যে অনেক তফাৎ। তিনি আমাকে যে মেহেরবাণী করেছেন, তার চেয়ে এখন আরো দ্বিগুণ বেশী মেহেরবাণী করছেন। তাঁর অনুগ্রহে আমার বেঁচে থাকা।

বর্ণক: (২-৪) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, হোটেল মার্টিন, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

দরবারের ক্ষতি অন্যের লাভ

১. কাটিরহাট বাজারে বাবাজানের খোশরোজ শরিফের মিটিং হচ্ছে। অনেক লোকের সমাবেশ। মিটিং শেষে আমি একটি সিগারেট পান করলে এক লোক আমার উপর চড়াও হয়। আমি বিব্রতবোধ করলাম। পরে লোকটি স্বপ্নে দেখলেন, 'তাকে পুলিশে দৌড়াচ্ছে। বাবাজান বলছেন, যেখানে মিটিং হয়েছে সেখানে আমি ছিলাম। ইউসুফ অনুমতি নিয়ে সিগারেট খেয়েছে। সে অনুমতি ছাড়া সিগারেট খায়নি'। এ স্বপ্নের পরে লোকটির ভুল ভেঙ্গে যায় এবং আমাকে সব ঘটনা খুলে বলে। অতঃপর আমি সিগারেট পান করা ছেড়ে দিলাম।

২. ফরহাদাবাদের মফিজ সম্পর্কে আমার স্ত্রীর বড় ভাই। তিনি হক মন্‌জিলের উরসে জবেহবাদ বেঁচে যাওয়া গরু মহিষ বিক্রি করতেন। উরসের পরে একদিন একজন ক্রেতার কাছ থেকে ২০০ টাকা কম নিলেন। বাবাজান স্বপ্নে মফিজকে বলেন, 'যেখানে মহিষ বিক্রি করেছেন সেখানে আমি ছিলাম। ২০০ টাকা কম নিয়েছেন তাতে এন্তেজামের ক্ষতি হবে তো'। পরে আমিসহ বাবাজানের হুজরার পশ্চিম জানালার পাশে গেলাম। বাবাজান শোয়া অবস্থায়, অনেক ডাকলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকালেন না। বললাম বাবাজান ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দিন। আর কখনো এমন ভুল হবে না। বাবাজান বললেন, 'এমন ভুল করবেন না জ্বী। ভুল করবেন না জ্বী। ২০০ টাকা তো। ওখানে রাখুন জ্বী'।

হাদিয়াকে দয়া মহব্বত

৩. এক মানুষ ফরিয়াদ পূরণে দরবারের জন্য একটি গরু কিনতে নিয়ত করেন। তাকে পরামর্শ দিলাম, আপনি আস্তে আস্তে কিছু টাকা জমা করুন। উরস আসলে একটি ষাঁড় কেনা হবে। উরস শরিফের সময় ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যে গরু নেয়ার কথা তা নিয়েছেন? বললেন, আমার কাছে তেমন টাকা নেই। আমি জমিয়েছি মাত্র তিনশত টাকা। ঠিক আছে ৩০০ টাকা নিয়ে বাজারে চলুন। বাবাজান যদি আপনাকে কবুল করেন তাতে কোন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দরবারে মুসাবীয়ার পাশে এক হিন্দু বাড়ির লোক একটি ষাঁড় বিক্রির জন্য হাটে নিতে দরবারে মুসাবীয়া চাচ্ছে গরুটি কেনার জন্য। কিন্তু বিক্রেতা দিচ্ছে না। কারণ পাশের বাড়িতে জবেহ করার সময় দেখলে হয়তো

খারাপ লাগবে। আমরা গরুটির কাছে গেলে বিক্রেতা বলেন, এখন আমাকে টাকা পয়সা দিতে হবে না, পরে দিবেন। মালিক গরুটি ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। পরদিন ভোরে গরুটিকে গোসল করানোর পর বাবাজানের দরবারে নিয়ে আসেন। সৈয়দ নুরল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌, জামাল সিকদার, হক সাহেব ও আমি বাবাজানের কাছে গেলাম। বাবাজান বেরিয়ে এসে বললেন, 'বড় ভাল হয়েছে। বড় ভাল হয়েছে, ষাঁড় এনেছেন। নিয়ে জবেহ করে দিন'। আমরা খুশি হয়ে বাবাজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালাম। গরু জবেহ করার প্রস্তুতি নিলে বাবাজান আবার এসে হাজির। বললেন, "গরু জবেহ করবেন না যে, গরুটি পূর্বদিকে আম গাছ তলে বেঁধে রেখে কুঁড়া-পানি খাওয়ান, আদর মহব্বত করুন"। গরু আর জবেহ করা হলো না। যিনি নিয়ত করেছেন তাকে বলেছিলাম নিয়তের আগে কিনে আদর মহব্বত করতে হয়। উরসের দিন কিনলে হবে না। আগে কিনতে হবে। বাবাজান কবুল করেছেন ঠিকই। জবেহ করার কথাও বলেছেন, কিছু কর্ম বাকী ছিল বলে এইরকম হল।

বর্ণক: কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ, কাজী বাড়ি, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

দরবারে আসুন, ভাল হবে

আমাদের পূর্ববংশধর কেউ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ মানতো না। দরবারী সিলসিলায় বিশ্বাসী কাউকে ভালবাসতেন না। ধারাবাহিকতায় আমার অবস্থাও তদ্রূপ। শাহানশাহ্‌ বাবাজানের পূর্ববাড়িতে আগমনের বৎসর। একদিন মায়ের কঠিন বিমারের কারণ নির্ণয়ে হাজিরা দেখতে রাউজান এক বৈদ্যের নিকট যাই। সেখানে হাজিরা সংক্রান্ত ব্যস্ততায় আসরের নামাযের সময় হয়ে এলো। তখন গাড়ির যোগাযোগ নেই। ভরা বর্ষার মওসুম। বৃষ্টিমুখর দিন। রাউজান হতে পায়ে হেঁটে নানুপুর যখন পৌঁছি তখন প্রায় ৯টা। চিন্তা করছি রাতে কেমন করে পায়ে হেঁটে বর্ষার থৈ থৈ মাঠ-ঘাট পেরিয়ে সঙ্গীবিহীন অবস্থায় একলা বাড়ি যাবো। মনে উঁকি দিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জামে মসজিদের কথা। সেখানে রাত্রি যাপন করে সকালে কাঞ্চনপুরে চলে যাব। ভাবনা মাত্রই ভাণ্ডার শরিফের দিকে পথ চলতে শুরু করি। রাত্রি ১১টার সময়ে ভাণ্ডার শরিফ জামে মসজিদের সামনে এসে পৌঁছি। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রতি নজর করতে দেখি কিছু লোক দৌঁড়ে মসজিদের দিকে আসছেন। সারাদিন খানাপিনা নেই। পরিশ্রান্ত।

শাহানশাহ্ বাবাজান মন্‌জিলে আছেন শুনে দেখার ইচ্ছা জাগে। আমি যে মাইজভাণ্ডারীতে বিশ্বাসী নই তাও ভুলে গেছি। শাহী দরজার ভিতরে প্রবেশ করে বাবাজানের চেহারা মোবারক দেখলাম। কিন্তু তিনি দ্রুত হুজরায় ঢুকে গেলেন। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করে হাতে থাকা ছাতা, টর্চলাইট পাশে রেখে হুজরা শরিফের সামনে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় এসে পড়ি। এরি মধ্যে বাবাজান পুনরায় বের হয়ে অন্য লোকদেরকে আবারো সরিয়ে দেন। সামনে এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করেন, "মামু সাহেব, বাড়ি চলে যান"। এইভাবে দুইবার বলার পর বাবাজান নিজ হস্ত মোবাক দ্বারা আমার বাহু বেষ্টন করে আমাকে বসা থেকে উঠিয়ে পবিত্র জবানে বলেন, "মামু সাহেব, বাড়ি চলে গেলে ভাল, বাড়ি চলে যান"।

পবিত্র কালাম সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান না থাকায় আমি কিছু বুঝিনা। আমি শাহী দরজা আসলে অপেক্ষমান লোকেরা আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে বাবাজানের সাথে কী কথা হয়েছে। আমাকে চলে যেতে বলেছেন জানালে তাঁরা বলেন, কী ব্যাপার? এতো রাতে কেমনে যাবেন, মসজিদে শুয়ে থাকেন। অন্যরা আরো কিছু বলে থাকলেও মনে নাই। রাত প্রায় বারোটা-সাড়ে বারোটার সময় দরগা পুকুরের দক্ষিণ পাড় হয়ে হযরতের রওজা শরিফকে সম্মান জানিয়ে বাবাজান কেবলা কাবার রওজা শরিফের সামনে যাই। সেখানে আমাদের এলাকার দিদারের বাপ বলে এক লোক খাদেম হিসাবে নিয়োজিত। তিনি আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন (তিনিও জানেন আমি দরবার শরিফে বিশ্বাসী নই), আপনি খানাতো খান নি? আমাদের অবশিষ্ট খানাও ভিতরে পৌঁছে দিয়েছি, কী করি। চলেন আমার সাথে শুয়ে থাকেন। আমি বললাম, আমি চলে যাব। এই বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবাজান কেবলার রওজার পশ্চিম-উত্তরে দমদমা অভিমুখে যাত্রা করি। ছোট নানা শফিউল বশর সাহেবের ছয়তলা বিল্ডিং যে জায়গায় হয়েছে, তার পশ্চিমে একটি সাঁকো ছিল। সেখানে পৌঁছে আমার মনে হলো এত পানি, রাত্রিকালে একা একা কেমন করে এতদূরে যাব! এই কথা মনে হওয়া মাত্র আমার সামনে কিছু লোকের কথার আওয়াজ শুনে টর্চলাইটের আলো ফেললাম। বেশ কয়েকজন মুরুব্বী লোক সামনের দিকে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পিছু নিলাম। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দমদমা হতে আমার আগে-আগে এ লোকগুলো আমার টর্চের আলোর সীমানার ভিতরে

হাঁটতে থাকেন। এভাবে আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তার তেমোহনী পৌঁছি। এ সময় আমার মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়, মানুষগুলি কারা? তাই অন্য একটি রাস্তা দিয়ে খুব জোরে হেঁটে তাঁদের অগ্রভাগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। না; তাঁদের আর দেখা গেলো না। ভয়ে কাঁপতে থাকি। সেখান থেকে কোন প্রকারে বাড়িতে পৌঁছি।

আমার স্ত্রীকে ডেকে তুলি এবং বুঝতে চেষ্টা করি মাইজভাণ্ডার শরিফ হতে আসতে আমার কত সময় লাগলো। ভেবে দেখলাম, ২০/৩০ মিনিটের বেশী নয়। আশ্চর্য্য হলাম কেমন করে এতো কম সময়ে এলাম। ইতোমধ্যে আমার স্ত্রী খাবার নিয়ে আসলে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি। নিদ্রা আসতেই শাহানশাহ্ বাবাজান স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে বলেন, "মামু, ডরায়েছেন নাকি? দরবারে আসবেন। ভাল হবে"।

পরের দিনও আমি দরবারে আসি নি। হাজিরাতে মায়ের অসুখের যে প্রতিকারের ব্যবস্থা দিয়েছে, তা কার্যকর করি। তখন হতে আমার আম্মা সুস্থবোধ করতে থাকেন। দ্বিতীয় রাতে ঘুমালে তখনও বাবাজান স্বপ্নে বলেন, 'তুমি আসলেনা কেন? আমার কথা শুননা? দরবারে আসবে'। তার পরের দিন দরবারে আসি। এসে জানলাম বাবাজান আছেন। কিন্তু দরজা বন্ধ। মনস্থির করি, বাবাজানের সাথে সাক্ষাৎ না করে যাবো না। তিনদিন পর দেখা পেলাম। তবে তেমন কোন কথা হয় নি। সে অবধি আমি দরবার শরিফ যাতায়াত করে শাহানশাহ্ বাবাজানের কদমে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। প্রথম দেখার রাত্রে বাবাজান আমাকে বাড়িতে আসার তাগিদ না দিলে মায়ের জীবন নাশ ঘটত। বাবাজান দূরদৃষ্টিতে তা দেখেছেন বিধায় মা আরো ২০-২২ বৎসর বেঁচেছিলেন। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবার প্রতিই আল্লাহ্‌র অলিরা দয়া করে থাকেন।

বর্ণক: আলী আহমদ, পিতা-মরহুম আবদুর রশিদ, গ্রাম-কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মৃত্যু নয়, জীবন বদল

একবার একটি স্বপ্ন দেখলাম– 'বাবাজান দরবার শরিফের কল ঘরের ওখানে রাস্তায় একটা চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে বললেন, ঘরের চালের উপরে উঠার জন্য। আমি ভয় পেলাম। বাবাজান পুনরায় হুকুম করলেন। উঠে দেখলাম তেরপাল ছাউনি। তাঁর নির্দেশে তেরপাল গুটিয়ে নিলাম'। এই স্বপ্নের কথা অন্য

একজনকে বললে তিনি আমাকে মৃত্যু ভয় পাইয়ে দেন, আমি যেন ওখানে না যাই। মনে ভয় লেগেই থাকে। ফলে বাবাজানের সাথে আমি আর যোগাযোগ করি না।

পরে একদিন আমি লক্ষ্মীছড়ি যাচ্ছিলাম। মাইজভাণ্ডারী খামারের পাশ দিয়ে যেতে হবে। বাবাজান দেখবেন বলে আমি যাচ্ছিলাম নৌকা করে; যেতেই দেখলাম বাবাজান ধুরুং নদীর পাড়ে বসা। কাসেম মাঝি আমাকে বললেন, ওইতো বাবাজান বসে আছেন। আমি ধরা পড়ে মাঝিকে বললাম, মাঝি আমাকে নামিয়ে দাও; বাবাজানের সাথে দেখা করবো। যথারীতি নেমে গেলাম। বাবাজান আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কী? আমি বললাম ভাত। 'কার জন্য'? মুখ ফসকে বেরিয়ে আসলো আপনার জন্য (আসলে এই খাবার ছিল আমার নিজের জন্য)। বললেন, ঐদিকে রাখো। আর বললেন, 'নৌকা দেখ। আমি চলে যাবো'। নৌকার মাঝিকে বাবাজানকে নেয়ার জন্য বললে, আসার সময় নেবে বলে মাঝি চলে গেল। বাবাজান বসে আমি দাঁড়িয়ে। দেখলাম অনেক বড় হয়ে যাচ্ছেন বাবাজান। আমার চেয়ে অনেক বড়। মনে হলো বিশাল পাহাড়ের সমতুল্য উঁচু হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, 'ভয় পাচ্ছেন কেন; আমি আছিনা? আমি থাকতে কাউকে ভয় পাবেননা'।

তারপর খামার বাড়িতে চলে গেলেন। সাথে আমিও গেলাম। আমি যাওয়ার সময় দোকান থেকে কিছু কিনতে না পেয়ে খালি হাতে গেলাম। দেখলাম বাবাজান বিছানায় শোয়া। আমি পৌঁছামাত্র একটি কুকুর সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কুকুরের পালিয়ে যাওয়া দেখে আমার ভয় লাগছিল। পরে কুকুর যেখানে বসেছিল সেখানে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। বাবাজান ভিতরে নিজের কাজে ব্যস্ত। অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম। বাবাজান নিজের কাজের মধ্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। মনে মনে আরজি পেশ করলাম। বাবাজান আমি এসেছি দোয়ার জন্য। একবার ভাবলাম ফেরত যাই। তারপর দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলাম। বাবাজান মুখ ফিরে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন; কী চাই। বললাম, দোয়া চাই। বললেন, দোয়া তো আমার ইচ্ছা। বাবাজান আপনার ইচ্ছা যেমনি, তেমনি আমাকে দোয়া করুন। বাবাজান বলেন, এক টুকরা মাছ খাবেন? বললাম, আপনার ইচ্ছা। এবার তিনি এগিয়ে আসছেন আমার দিকে– হাতে স্যান্ডেল। মনে ভয় এলো। এবার না কী আমাকে মারেন!! আমি পালাতে চাইলাম। পালাতে পারলাম না।

সব শক্তি যেন হারিয়ে ফেললাম। মানুষ স্বপ্নে যেভাবে দৌড়াতে পারেনা, সেভাবে আমিও নড়তে পারলাম না। বাবাজান এসে আমাকে ধরলেন এবং মাথার উপর স্যান্ডেল দিয়ে আলতো করে একটি টোকা দিলেন। পরে ঘাড়ে এবং কোমরে দুটি টোকা দিতে দিতে কী যেন বিড় বিড় করে বললেন। বুঝতে পারি নি। বাবাজান আমাকে একটি ধাক্কা দিয়ে কী বললেন, তাও বুঝতে পারি নি। সাথে সাথে আমি সিজদায় পড়লাম 'তুমি আমার মুর্শিদ–তুমি আমার আউয়াল-আখের' বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এরপর তিন বছর আমি ঘর সংসার বিরাগী ছিলাম। অতঃপর জীবন নৈতিকতায় বদলে গেল।

বর্ণক: জামিল আহামদ, ছমুরহাট, মানিকপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

কর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়

একদিন চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান প্রশাসন কর্মকর্তা জনাব গোলাম রসূল, জনাব আলী নবি চৌধুরী, ক্যাপ্টেন রমজান আলীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দরবারে যাচ্ছেন। সাথে আমারও যাওয়ার সুযোগ হল। রওনা দিলাম। যেহেতু আমি ছিলাম দারোয়ান পদের কর্মচারী সেহেতু ক্রমিক হিসেবে আমার মান ছিল অনেক নিচে। তাই কর্মকর্তাদের কাছে যেতে আমাকে সেভাবে যেতে হতো। গাড়িতে মনে মনে আরজি পেশ করলাম, বাবাজান, আমাকে যদি এই কর্মকর্তাদের সাথে একটু পরিচয় করে দিতেন তাহলে বাবাজানের গোলাম হিসেবে এরা আমাকে একটু আদর করতেন এবং চাকুরি ক্ষেত্রে ভাল হতো। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। আমরা সবাই গিয়ে দরবারে হাজির হলাম। বাবাজানের সাথে সবাই দেখা করেন। সবার শেষে আমি গেলাম। বাবাজান আমাকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার মান্নান মামা, দরবারের কাজে অনেক কষ্ট করে..."। তখন বন্দর কর্মকর্তারা আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণে বাবাজান চট্টগ্রামী ভাষায় আবার বললেন, "আপনি থাকুন, এঁরা চলে যাক"। উল্লেখ্য, গোলাম রসূল সাহেবরা গিয়েছিলেন দরবারে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করার জন্য। বাবাজানের নির্দেশে তাঁরা চলে আসেন। আমি থেকে গেলাম। তখন আমার ভিতর একরকম টেনশন। কারণ সকালে আমার চাকুরিতে হাজিরা। কী বুঝ দেব উপরস্থকে। সারারাত একটু ঘুম-একটু চেতন অবস্থায় কাটালাম। বাবাজান সোবেহ্ সাদেকের সময় আমাকে ডেকে নিয়ে সকাল সাতটা

বাজার আগেই নিজের গাড়ি করে আমাকে নিয়ে বন্দরে পৌঁছালেন। আমি যথারীতি চাকুরিতে যোগদান করি। বাবাজান ছিলেন অসীম ক্ষমতাবান। আশেকের মনের কথা অনায়াসে জানতে পারতেন। এই ঘটনার পর হতে বন্দরের পদস্থ অফিসারদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

বর্ণক: আবদুল মান্নান সিকদার, নিরাপত্তা বিভাগ, চট্টগ্রাম বন্দর।

স্মরণমাত্র হাজির ও হজ্বে হাজিরা

১. **১৯৭৯** থেকে **১৯৮৮** খৃস্টাব্দে ওফাতের আগ পর্যন্ত শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) অনেকবার আকমল খান সাহেবের বাসভবনে অবস্থান করে তাঁকে ধন্য করেন। এই দীর্ঘ সময়ের অসংখ্য উজ্জ্বল মুহূর্তের সামান্য কয়েকটি বর্ণনা।

১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মকালের কোন এক শনিবার। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সকালে আকমল খানকে সামনে দেখেই বললেন; "বড়দা, একটি ট্যাক্সি আনুন। নতুন ট্যাক্সি"। আকমল খান সাহেব সাধারণ লুঙ্গি ও জামা পরিহিত অবস্থায়ই রাস্তার পানে ছুটলেন। প্রত্যেক ট্যাক্সির দিকে চোখ ফেলেন। না, প্রতিটি ট্যাক্সিই পুরাতন। পাঠানটুলী রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে এগুতে থাকেন। এমন সময় তাঁর সামনে দাঁড়ালো একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভার পরিচিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, "মামা সাহেব (শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী) কি আপনার ওখানে আছেন?" হ্যাঁ, আছেন। কেন?

আমার গাড়ির মালিক (খান বাহাদুর আমানত খান রোডের দীপালী হোটেলের মালিক) নতুন গাড়ি বাঁধিয়েছেন। বলেছেন, সর্বপ্রথম এ গাড়িতে শাহানশাহ্ হুজুরকে বসানোর জন্যে। সকাল থেকেই তাঁকে খুঁজছি তিনি যে সব জায়গায় থাকেন সে সব জায়গায় পাইনি। আমার এক ট্যাংকি তেল ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। পাম্প থেকে আবার তেল ভরে নিয়ে শেষে আপনার বাড়ির দিকেই আসছিলাম।

আকমল খান ধপ্ করে উঠে পড়লেন ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই দেখেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে। গাড়িতে উঠার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছেন। গাড়ি থামতেই টুস্ করে উঠে পড়লেন। বললেন, চলুন।

আকমল খান আর নামবার কিম্বা কাপড় বদলানোর সুযোগ পেলেন না। গাড়ি দেওয়ানহাট ওভার ব্রীজের উপর দিয়ে চালাবার নির্দেশ দিলেন। গাড়ি দেওয়ান হাট ওভার ব্রীজ পার হয়ে উত্তর দিকে চলছে। হঠাৎ বললেন, একটু গোলপাহাড়ের কাছ দিয়ে গেলে ভালো হয়না? আকমল খান একটা টেলিভিশন মেরামত করতে দিয়েছিলেন সেখানে এক দোকানে। সে কথা প্রকাশ করলেন শাহানশাহ্ হুজুরের কাছে। তিনি বললেন, ভালো কথা আমরা টেলিভিশন দেখবো।

ট্যাক্সি গোলপাহাড়ের মোড়ে আহমদিয়া ইলেকট্রিকের সামনে যেতেই নুরুল আবসার নামে ফটিকছড়ি থানার ধুরুং নিবাসী এক ব্যক্তি একটা চলমান ট্রাকের তোয়াক্কা না করেই ওটার সামনে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে এসে ট্যাক্সির উপর প্রায় ধপ্ করে নিজেকে ছুঁড়ে মারেন এবং কাতর স্বরে বলতে থাকেন, বাবাজান আপনি কোথায়? আপনাকে বিষ্যুদবার থেকেই খুঁজছি। পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে তাঁর সামনে পেশ করে বললেন, নুরুল হক আপনার জন্য এ ঘড়িটা রেখে গেছে। বিষ্যুদবার সে এসেছে। আপনাকে অনেক খুঁজেছে।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী ঘড়িটা হাতে পড়লেন। এখানে রয়েছে এক বিরাট ঘটনা। ধুরুং নিবাসী নুরুল হক মাস্কাট যাবার জন্যে দোয়া চাইতে শাহানশাহ্ হুজুরের কাছে গেলে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ ভরসা যান, আমার জন্যে একটা ঘড়ি আনবেন"।

নুরুল হক মাস্কাটে চাকরী করতে থাকেন। এক বৃহস্পতিবার সকালে নিয়োগকর্তা তাকে দারুণ বকাঝকা করে। এমনকি তার গায়ে হাতও তোলে। নুরুল হক চরম বেদনা ও হতাশায় নিজ কক্ষে দরজা দিয়ে বসে থাকেন। বিদেশ-বিভূঁইয়ে একা। বেতনের সব টাকা মালিকের হাতে গচ্ছিত। দেশে আসার সময় একসাথে নিয়ে আসবেন। বেলা বারোটা। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এমন সময় পিঠে কার নরম হাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করলেন। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। তসলিম জানালেন। শাহানশাহ্ হুজুর বললেন, "মামু সাহেব, আপনি বাড়ি ফিরে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে"। দুপুর বেলা খাবারের সময় হয়ে এসেছে। নুরুল হকের মনে শাহানশাহ্‌কে আপ্যায়নের কথা এলো। বললেন; চলুন, কিছু খেয়ে নিই। একথা বলে দরোজা বন্ধ করে রাস্তায় নামলেন।

শাহানশাহ্ হুজুর তাকে আগে আগে যেতে বললেন। কয়েক কদম সামনে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকালেন। দেখেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী নেই। নুরুল হকের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার উপক্রম। এ মুহূর্তে তার পূর্ণমাত্রায় মনে হলো যে তিনি বিদেশের মাটিতে। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী এ বিদেশের মাটিতে এসেছিলেন তার পাশে। বিষন্ন মনে দুপুরের আহার আর নামায সেরে আবার ঘরে ফিরলেন। ভাবছেন কী হবে? কী করবেন? এমন সময় নিয়োগকর্তা তার কক্ষে হাজির হয়ে তাকে কাজে যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি দেশে ফিরে যাবো। মালিক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তার বিশ্বাস হতে চাইছিল না। তিনি নুরুল হকের কাছে মাফ চাইলেন। বললেন, স্ত্রীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হওয়ায় মনমেজাজ ঠিক ছিল না। তাই তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। তিনি অনুতপ্ত। তার কথা নুরুল হককে বিশ্বাস করানোর জন্য স্ত্রীকেও নিয়ে এলেন। মহিলাও একই কথা বললেন। অনুরোধ করলেন কাজে যোগ দিতে। কিন্তু নুরুল হক অত্যন্ত বিনীতভাবে তার অক্ষমতার কথা জানালেন। বললেন, এ সপ্তাহেই বাড়ি চলে যাবেন। অবশেষে নিয়োগকর্তার চাপাচাপিতে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর ঘটনার কথা খুলে বললেন। বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন এই দম্পতি। নুরুল হকের সব পাওনা বুঝিয়ে দিলেন এবং অগ্রিম বেতন দিতে চাইলেন। নুরুল হক বললেন, আমি যখন আসবোনা, তখন আপনার অগ্রিম টাকা নিয়ে কী লাভ! মালিক বললেন, তুমি যাচ্ছো যাও। তবে আমার ঘরের দরোজা তোমার জন্য সবসময়ে উন্মুক্ত থাকবে। তিনি নিজে গিয়ে বিমানের টিকেট নিয়ে দিলেন। বিদায় দিলেন। এ ঘটনার পরের বৃহস্পতিবারেই নুরুল হক স্বদেশের মাটি অর্থাৎ চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। ফিরে এসেই শাহানশাহ্ হুজুরকে খুঁজছিলেন ঘড়িটা দেবার জন্যে। না পেয়ে গ্রামের বাড়ি ধুরুং যাবার আগে ঘড়িটা রেখে যান আবসারের হাতে।

২. গোলপাহাড়ের সামনে ট্যাক্সি ছাড়বার সময় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বললেন, "বড়দা, একটু ইউনুস ভাই সাহেবের কাছে গেলে ভালো হয়না"? ইউনুস ভাই সাহেব মানে জনাব ইউনুস দারোগা। শহরে তাঁর বাসা মোমিন রোড চেরাগী পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে। আসার সময় আকমল সাহেবকে বললেন; বড়দা ইউনুস ভাই সাহেব আমার সাথে কিছু মস্করা করবেন। আপনি তাতে কিছু

মনে নেবেন না। তিনি হজ্ব করে এসেছেন। হাজীদের দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ।

ট্যাক্সি ঘরের দুয়ারে পৌঁছল। ইউনুস সাহেব তখন পায়চারী করছিলেন সামনের ঘরে। মাত্র চারদিন আগে পবিত্র হজ্বব্রত সমাপন করে এসেছেন। পরস্পর কুশল বিনিময় করলেন। ইউনুস সাহেব শাহানশাহ্ হুজুরকে তাজীম করে বসালেন। পবিত্র মক্কা-মদিনা থেকে আনা খুরমা, খেজুর আর জমজমের পানি সামনে রাখলেন। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সেগুলোকে অত্যন্ত তাজীম করলেন। জমজমের পানিকে কপালে-মাথায় রেখে সম্মান দেখালেন। ইউনুস সাহেব বললেন, সেদিন হঠাৎ করে লুকিয়ে গেলেন কোথায়? আপনিও তো এবার হজ্বে গিয়েছিলেন। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী কথাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেই ইউনুস সাহেব বললেন, উম্মেহানীতে নামায আদায়ের সময় আমার একটু দূরে একই সারিতে আপনাকে দেখেছি। নামায শেষে আপনাকে ধরতে গেলাম। আপনি নেই। আমার সাথে লুকোচুরি!

শাহানশাহ্ হুজুর তাঁর স্বভাবসুলভ দরাজ অথচ কোমল গলায় বলতে থাকেন, ভাই সাহেব বলেন কী? বলেন কী? আর কথা বাড়াতে না দিয়ে তিনি ইউনুস সাহেবকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কল্বের সকল মকান বা আলেম-আমর সফলভাবে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর গৌরবান্বিত পূর্বসূরীদের মতোই। সময়-দূরত্ব-স্থান ও জড়ত্বকে তিনি আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। পবিত্র কল্বের শক্তিসঞ্জাত তাঁর দৃষ্টি বা নজর ছিল সর্বদর্শী ও সর্বব্যাপী।

৩. ট্যাক্সি চলতে থাকে। বললেন, বড়দা বাঁশখালী চলুন।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর কোলে পাঁচশো টাকার নতুন নোটের বান্ডিল। ট্যাক্সি যখন কালুরঘাট সেতুর মাঝামাঝি এলো তখন ঐ ঘড়ি আর ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিলটা আকমল খান সাহেবকে রাখতে দিলেন। কালুরঘাট সেতু পার হবার পর পূর্বদিকে বাজারে ট্যাক্সি একটু থামলো, যারা ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়ালো এবং চাইলো তাদেরকে একটা করে পাঁচশো টাকার নোট দিতে বললেন।

রাতে গিয়ে পৌঁছলেন বাঁশখালীর কালীপুরে তাঁর ভায়রা ভাই উকিল আজিজ মিয়ার বাড়িতে। রাতে তাঁদেরকে দেখে বাড়ির সবাই যেমন হতভম্ব, তেমনি

তটস্থ। শাহানশাহ্ অন্দর মহলে গেলেন না। দেউড়িতেই থাকলেন। এক ভাগ্নি এবং এক ভাগ্নে ঐ বছরের বি.এ. পরীক্ষার্থী। দু'দিন পর তাদের পরীক্ষা। ভাগ্নিকে আকমল খানের এবং ভাগ্নেকে নিজের পা টিপতে বসিয়ে দিলেন। খান সাহেব কিছুক্ষণ পর অনতিদূরে নিজের শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসার অজুহাতে বেরিয়ে পড়লেন। রাত বারোটায় পৌঁছলেন। সেখানে এত রাতে এ পোষাকে তাঁকে দেখে সবাই হতভম্ব। সেখান থেকে আবার ফিরে এলেন উকিল আজিজ মিয়ার বাড়িতে। সকাল পাঁচটায় শাহানশাহ্ হুজুর বি.এ. পরীক্ষার্থী ভাগ্নেকে পাঠানটুলী যেতে বললেন।

আরেকদিন বাঁশখালীর জলদির ওয়াজেদ আলী মিয়ার বাড়িতে শাহানশাহ্ বাবাজান তশরিফ নেন। সে বাড়ির বড় পুত্রবধূ (মোস্তফা আলী মিয়ার স্ত্রী) প্রবীণ মহিলা। তিনি রকমারী পিঠা, নাস্তা বানাবার ধূম লাগিয়ে দিলেন। খাসী জবাই করলেন। তাগাদা দিলেন, আজ খেয়ে যেতে হবে। বাড়িময় উৎসবের আয়োজন। কিন্তু শাহানশাহ্ হুজুর এক উসিলায় ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আকমল সাহেব খানার আয়োজনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বললেন, চাকর-বাকর সহ বাড়ির সবাই খাবে। ট্যাক্সি চালাতে বললেন চট্টগ্রাম শহরের দিকে। এসে পৌঁছলেন কালুরঘাট সেতুর পূর্ব প্রান্তে। তখন ট্রেন আসছিল। সেতুতে উঠার গেট বন্ধ। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। এমন সময় মাস দেড়েক বয়সের এক বাচ্চা কোলে নিয়ে এক দরিদ্র মেয়ে ট্যাক্সির পাশে দাঁড়ালো। শাহানশাহ্ তাকেও দিলেন পাঁচশো টাকার একটা নোট। বললেন, মেয়েটা দরবার শরিফ যাচ্ছে। টাকা নিয়ে মেয়েটা সামনের দিকে এগোয়। আকমল সাহেব প্রস্রাবের অজুহাতে ট্যাক্সি থেকে নেমে কৌতুহলবশতঃ মেয়েটার কাছে জানতে চাইলেন কোথায় যাবে। সে তার সন্তানের অসুস্থতার মুক্তি কামনায় দরবার শরিফ যাচ্ছে বলে জানালো। আকমল সাহেব তাকে ঐ নোটটা পাঁচশো টাকার বলে জানালেন এবং তা কাউকে না দিতে সতর্ক করে দিলেন। কালুরঘাট সেতু পার হয়ে মোহরায় এক বাড়িতে ঢুকলেন। হস্তস্থিত দিয়াশলাই জ্বালালেন। মেঝে বিছানা, কার্পেটে আগুনের ছাঁট লাগলো। অল্পক্ষণ পর একই ট্যাক্সিতে আকমল সাহেবের বাসায় ফিরলেন। ভাগ্নেকে বাঁশখালী ফেরত পাঠালেন। ভাই-বোন দু'জনেই অনায়াসে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করে যায়। লেখাপড়ার সাথে মুরুব্বীর খেদমতের প্রয়োজনীয়তা এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীরা ভুলে যাচ্ছে। সেবা

গ্রহণ করে তিনি যেন তাদের দায়িত্ব সচেতন করলেন। পরীক্ষা পাশে মুরুব্বীদের দোয়ার ভূমিকাও থাকে।
মাত্র ক'টা দিনে সংঘটিত এসব ঘটনাকে সাধারণত অলৌকিক বলেই অভিহিত করা হবে। ট্যাক্সি মালিকের আগ্রহ-টেলিভিশন মেরামত–নুরুল হকের প্রদত্ত ঘড়ি তাঁর হাতে পৌঁছানো – সবটা যেন অতি নিপুণভাবে সাজানো একটা চলমান নাটকের গোছানো কয়েকটা দৃশ্য।

লোকসানের বদলে আশাতীত লাভ

৪. এক সময়ে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী প্রথমবারের মতো পূর্বানুমতি নিয়ে আকমল খান সাহেবের ঘরে প্রবেশ করেন। বহুপূর্ব থেকেই এই দুই পরিবার ছিল আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর কাছে আড়াইশো টাকা চাইলেন। আকমল সাহেবের কাছে ছিল মাত্র আড়াইশো টাকা। টাকাটা তিনি নীরবে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আকমল সাহেব বন্দর থেকে ফিরছিলেন চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে। তাঁর আমদানী করা স্ক্র্যাপ নিয়ে জাহাজ এসেছে। স্ক্র্যাপ খুব খারাপ। প্রায় সাত লাখ টাকা লোকসানের আশঙ্কা। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁকে হঠাৎ বললেন বন্দরে যাবার কথা। সঙ্গে গেলেন। স্ক্র্যাপবাহী জাহাজে মেস রুম, অফিসার রুম সর্বত্র হাঁটলেন। হেজের উপর দিয়েও পায়চারী করলেন। একের পর এক দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে চললেন। একসময় জাহাজ থেকে নেমে আসলেন। ততক্ষণে চারদিকে তাঁকে দেখার জন্যে শত শত লোকের ভিড় জমে গেছে। এ যাত্রায় আকমল সাহেবের লোকসান দূরে থাক, তাঁর ভাষায় উল্টা লাভ হয়েছিল নয় লাখ টাকা।

আরেকবার ১৯৮০ সনের কথা। শিপিং কর্পোরেশনের জেনারেল কার্গো আমদানীর টেন্ডার দিলেন। জামানত দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। মোট প্রয়োজন প্রায় দেড় লাখ টাকার। কথাটা বললেন শাহানশাহ্ হুজুরকে। বললেন টাকার কথাও। শাহানশাহ্ বললেন, কাগজ বেচবেন আর কী?
ইতোমধ্যে আকমল সাহেব দিয়েছেন 'হিজবুল বাহার' এর ক্যাটারিং এর টেন্ডার। ক্যাটারিং এ অভিজ্ঞতা ছিল খানের। সাকুল্যে টেন্ডার পড়ে নয়টা। তবে টেন্ডার তিনি পাবেন এটা নিশ্চিত। দু'জন টেন্ডার দাতা আকমল সাহেবের কাছে এসে তাঁর টেন্ডার ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে দাম অফার করলো দেড় লাখ টাকা। আকমল

সাহেব চাইলেন তিন লাখ টাকা। ঐ দু'জন বললো, বাকী ছয়জনের টেন্ডার তারা ম্যানেজ করে নেবে। শেষে রফা হলো দু'লাখ টাকায়। টেন্ডারের কাগজপত্র বিক্রি হয়ে গেল। দু'লাখ টাকা নিয়ে শাহানশাহ্ হুজুরের সামনে রাখলেন। তিনি জানতে চাইলেন কীসের টাকা। বিনয় সহকারে হাসিমুখে খান সাহেব বললেন, কাগজ বেচা টাকা। আপনি নেন। শাহানশাহ্ হুজুর সেখান থেকে দশ হাজার টাকা রাখলেন। আকমল সাহেব শিপিং কর্পোরেশনের টেন্ডারের কাজে লেগে গেলেন। ঐ কাজে তাঁর অনুমিত দেড় লাখ টাকা নয়, শেষ পর্যন্ত এক লাখ নব্বই হাজার টাকারই প্রয়োজন হয়েছিল।

আলোর মেলায় সালাত আদায়

৫. শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর সাথে কক্সবাজার ও টেকনাফ সীমান্তে যাবার সুযোগ হয়েছিল আকমল সাহেবের। একবার কক্সবাজারে গিয়ে উঠলেন হোটেল সায়মানে। ম্যানেজার তাঁকে চিনতো। দেয়াশলাই জ্বেলে কার্পেট পুড়বে আশঙ্কায় সে হোটেলে রুম নেই বলে জানালো। হোটেল কর্তৃপক্ষ সেখানে ছিলেন। আকমল সাহেব তাঁকে বলার পর তিনি নিজ কামরাটি দিয়ে দিতে বললেন। আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক সাহেব শাহানশাহ্ হুজুরের আশ্রয়ে থাকা মানুষ। তাঁর প্রদত্ত কিছু সিগারেট ও দেয়াশলাই শাহানশাহ্ হুজুরের সঙ্গে ছিল। তিনি সব দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন। কার্পেটে ফেললেন। কার্পেটে আগুন লাগা দূরে থাক, একটা দাগও লাগে নি।

কক্সবাজার সৈকতে প্রকৃতির শোভা দেখছেন আর কাল্‌বের গভীর থেকে উচ্চারণ করছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। কখনো বা বলছেন, আল্লাহ্। কখনো বা কারো উদ্দেশ্যে জানাচ্ছেন, সালাম। আকমল সাহেবকে হঠাৎ বললেন, বড়দা আজ ঈদ। আতর, নতুন পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি আনালেন। পরলেন। ঈদের মতো করে কোলাকুলি করলেন। আকমল সাহেব আরো জানান, তাঁর সাথে অবস্থানকালে যতোক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কিছু খাবার প্রস্তাব করতেন, ততোক্ষণ কিছু খাবার কথা তাঁর মনে হতো না কিম্বা ক্ষুধা বোধ করতেন না।

আকমল সাহেব একবার টেকনাফ সীমান্তে শাহানশাহ্ হুজুরের সফরসাথী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জীপ থেকে নেমে শাহানশাহ্ হুজুর হেঁটে সোজা চলে গেলেন এক সীমান্ত চৌকিতে। একজন অফিসারের নাম বলে তিনি আছেন কিনা

জানতে চাইলেন। ঐ অফিসার ছিলেন না। তবে জওয়ানরা তাঁকে গার্ড অব অনার দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। অন্যান্য কর্তারা তাঁকে তাযিমের সাথে বসালেন। আপ্যায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর আকমল সাহেবকে নিয়ে বের হলেন। সীমান্তে পাতানো কামানগুলো ধরে ধরে দেখলেন। বললেন; বড়দা, এগুলো দিয়ে শত্রু মারা হয়। সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা তাঁকে কি আগে থেকেই চিনতো?..... এই চৌকি সফরের অল্প দিন পরেই এখানে বিপুল পরিমাণ চোরাই মাল ধরা পড়েছিল।

চৌকি থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটেন। নিকটে জেলে পাড়ার দিকে এগুলেন। দরিদ্র জেলেরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসলো। তাদেরকে দিতে লাগলেন মুঠো মুঠো টাকা। তারা প্রাণভরে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁকে। ফেরার সময় বললেন, বড়দা, এরা বড়ো গরীব। কিছুই পায়না।

ফেরার পথে টিলাময় একটা জায়গায় এলেন। পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। পূর্বে উঠছে গোলাকার চাঁদ। আকমল খানের ভাষায় তিনি এতো বড় ও সুন্দর চাঁদ আর কখনো দেখেন নি। প্রকৃতির সেই অপরূপ সৌন্দর্য আকমল খানকে মুগ্ধ করে ফেললো। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী শান্ত ধীরভাবে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন দিগন্তে। কয়েক মুহূর্ত পর আকমল খানকে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। শাহানশাহ্ একটু এগিয়ে গেলেন। আকমল সাহেব তেরছা চোখে দেখলেন, শাহানশাহ্ ক্ষুদ্র এটা পাহাড়ী জলাশয় থেকে পানি তুলে অজু করলেন। তারপর পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। নামাযের নিয়ত করলেন। সিজদায় অবনত হলেন মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।......

আকমল খান বলেন, শাহানশাহ্ হুজুরের মুখে কোরআন তেলাওয়াত অনেকেই শুনেছেন। তাঁকে নামায পড়তে দেখেছি শুধু আমিই। নজিরবিহীন দৃশ্য আমার জীবনের পরম পাওনা।

ঋণ স্বীকার: সূত্র: ১–৫ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দূরত্ব ও সময়জয়ী এবং প্রতিবন্ধকতাভেদী স্বাজ্ঞার কিছু তথ্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকমল খানের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন, মো. মাহবুব উল আলম, মাসিক আলোকধারা, জুন '৯৮।

শাহজালালের সিলেটে ইট শিথানে

১. শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সিলেট গিয়েছিলেন ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। সঙ্গে ছিলেন শিশুর মতো সরল খাদেম তৌহিদ ফকির। সরল প্রাণে বাবার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা সহজ কিন্তু কঠিন কাজটা ব্যতীত তৌহিদ ফকিরের অন্য কোন জ্ঞান-বুদ্ধি তেমন আছে বলে মনে হয় না। তাঁর ভাষা পল্লী বাংলার মতোই গ্রাম্য। বিদ্যা আর বুদ্ধি দিয়ে যা আয়ত্ব করতে হয়, সেটার ধারে কাছে নেই। বিশ্বাস আর আত্মনিবেদনের এক তরীতে ভেসে বেড়ায়। ২০০৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেও তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া হক মন্‌জিলে 'গোলামী' করে যাচ্ছেন ---- যেমন করতেন তাঁর অতি আদরের 'জিয়া হক বাবার' জীবদ্দশায়। তৌহিদ ফকির শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে সম্বোধন করেন 'জিয়া হক বাবা' বলতেন। গভীর রাতে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঝিমিয়ে আসে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের কোলাহল, তখন নীরবে-নিঃশব্দে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রতি কোণায় কোণায় চক্কর মারতে থাকে তৌহিদ ফকির। তার দৃষ্টি এড়াবার জো আর নেই। তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এ মন্‌জিলের আঙ্গিনায় ঢুকবার কিম্বা বের হবার সাধ্য নেই কারো। গভীর রাতে কোন মুসাফির, কিম্বা ফরিয়াদী কিম্বা ভক্ত এখানে এলেন তো, তৌহিদ ফকিরের প্রথম প্রশ্ন, মামা কিছু খেয়েছেন তো? ঐ সময়েও কিছু খাদ্যদ্রব্য মুখের সামনে এনে হাজির করার এক স্নিগ্ধ আকুতি এই তৌহিদ ফকিরের।

২. এই বুনো ফুলের মতো ক্ষুদ্র অথচ সাদা মনের মানুষটা তার 'জিয়া হক বাবাজানের' সঙ্গে সিলেট সফরের কিছু চিত্র বর্ণনা করেন। পথচলার সময় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাকে যেসব জায়গা চিনিয়ে দিয়েছিলেন, সেগুলো মনে গেঁথে গেছে। সিলেট পৌঁছেন ট্রেনে। তখন রাত। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী এক 'সম্বলহীন মুসাফিরের' মতোই স্টেশনের প্লাটফর্মে শুয়ে পড়েন মাথার নীচে ইট দিয়ে। তৌহিদ ফকির বলেন, এ সময় আমার কলিজা ফেটে যেতে চাচ্ছিল। হায় 'মাইজভাণ্ডার সিংহাসনের সম্রাট' এখানে সিলেট রেল স্টেশনের ধুলিশয্যায়। সিলেটের মাটি সেই গেরুয়া রঙের মাটি, যে মাটির নমুনা হযরত শাহ্ জালালের (র.) হাতে তুলে দিয়ে তাঁর পীর বলেছিলেন এ মাটির সাথে সামিল মাটিতে

আস্তানা গাঁড়তে। এই মাটিরই সন্তান হাছন রাজা নিজেকে স্বীয় পরম প্রিয়ের ইচ্ছার নাটাইয়ের ঘুড়ি হিসেবে ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে এক অজ্ঞাত অভিমানে গেয়েছেন:
“মাটিতে মিশাইব আমার সোনার বরণ কায়া”।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই মাটির সাথে নিজের মাটির দেহ মিশিয়ে দিয়ে কোন নিগূঢ় বার্তা কিংবা সম্পর্ক অনুভব করতে চেয়েছিলেন, কে জানে? পৃথিবীর ইতিহাসে সার্থকতম সুফি তাপসী রাবেয়া অর্থাৎ হযরত রাবেয়া বসরী (র.) দীন-হীন জরা-জীর্ণ জীবনের প্রতি এক অতিন্দ্রীয় আকর্ষণে সমকালীন দার্শনিক-সুফি-বিত্তবানদের অর্থসম্পদের তোহফার প্রস্তাব হেলায় ঠেলে ইটের শিথানে মৃত্তিকা শয্যায় শুয়ে দারিদ্রের ঐশ্বর্য-ভূষিতা হয়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাতারে। হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনীর (র.) মাযারধন্য সিলেটের মাটিতে শুয়ে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সে মহান দর্শনের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এসেছেন।

তৌহিদ ফকির তার শিশু সুলভ সরল কণ্ঠে যা জানালেন তার বর্ণনা-সংক্ষেপ হলো:
স্টেশনে এভাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর এক লোক তাঁকে দেখে অনেক মিনতি করে নিয়ে গেলেন। কোথায় তারা থাকলেন, তার সঠিক বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারলেন না। দু'একদিন পর তৌহিদকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, টাকা আছে কিনা? 'না' বোধক জবাব শুনে আবার বললেন, দরবার শরিফ গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আনতে পারবে কিনা? সিলেটে তখন চলছিল রাজনৈতিক গোলযোগ। গোলাগুলি। ত্রাস আর হরতাল। তৌহিদ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। শাহানশাহ্ হুজুর বললেন, স্টেশনে নাজিরহাটের একজন লোক আছে......'। রাত গেলো। পরদিন ভোরে স্টেশনে এলেন তারা। পাঁচশো টাকার নতুন নোটের বান্ডিল থেকে একটা নোট দিয়ে প্রথম শ্রেণির দুটো টিকেট কাটতে বলেন। স্টেশনে পায়চারি করতে করতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন। ট্রেনে আসতে আসতে প্রত্যেক স্টেশনেই কৌতুহলী শিশুর মতো নেমেছেন। একটু হেঁটে আবার ট্রেনে উঠেছেন। তৌহিদ এক মুহূর্তের জন্য তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি। তিনি বলেন; মা'জান আসবার সময় বার বার বলে দিয়েছেন, এক মুহূর্তের জন্য যেন তাঁর কাছ ছাড়া না হয়।

ট্রেনে আসার সময় এক স্টেশনে দুটো ডিম কিনে এক ছেলেকে দিলেন পাঁচশো টাকার নোট। ছেলেটা ঐ নোটটা হাতে পেয়ে একেবারে দে ছুট। ভাংতিটা ফেরত দেয়না। শাহানশাহ্ মৃদু হাসেন। তৌহিদ নীরবে চেয়ে থাকেন। ডিম দুটো খেলেন না। ট্রেনের লাগেজ তাকের উপর রাখলেন এবং উচ্চারণ করলেন; যার ইচ্ছা সে খাবে।
কিছুপথ অতিক্রমের পর এলো একজন টিকেট চেকার। প্রথম শ্রেণির ঐ কামরায় ফ্যানটা ঘুরছিল না। টিটিকে বললেন ফ্যানটা চালিয়ে দিতে। সে জানালো ফ্যান অচল। তিনি বললেন, ফ্যানে থাপ্পড় মারুন। টিটি বেচারা বিপাকে। ট্রেন সার্ভিসের দুরবস্থা এবং এ ব্যাপারে সরকারি কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে দু'চার কথা বললেন টিটিকে। এরপর নিজে উঠে ফ্যানে মৃদু থাপ্পড় মারলেন। ফ্যান ঘুরতে শুরু করলো। টিটি এ দৃশ্য দেখে বাক্যহারা। তাঁর পরিচয় পেয়ে বিনয়ে লুটিয়ে পড়ে।

ঢাকায় এসে তিনশো টাকা দিয়ে হাঁস কিনেন দুটো। তারপর কিনেন পাঁচশো টাকার আইসক্রিম। তা শিশুদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বললেন। এ সময় কার কী একটা কথায় স্বগতভাবে উচ্চারণ করেন, "দরবার আমি হিসাব করে চালাব"।

ত্রাসের নবি নয়, মস্ত বড় অলি

৩. তৌহিদ ফকির জানালেন, সিলেট যাবার আগে শাহানশাহ্ হুজুর গিয়েছিলেন টাঙ্গাইলের সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃশ্য সুবিশাল অঙ্গনে জামে মসজিদের সামনে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর মাযার যিয়ারতে। ঢাকায় যে বাসায় তিনি উঠেছিলেন, সে বাসা থেকে বেরিয়ে তৌহিদ ফকিরকে পাঁচশো টাকার আঙ্গুর কিনতে বলেন। তখন শাহানশাহ্ হুজুরের গায়ে ছিল শুধু গেঞ্জি। তৌহিদকে বলেন খুব ভালো আঙ্গুর নিতে। তৌহিদ দোকানীর কাছে গিয়ে শাহানশাহ্ হুজুরের নাম করে আঙ্গুর খরিদ করলেন। এরপর গাড়িতে করে রওয়ানা হলেন। আঙ্গুরগুলো যত্ন করে নিলেন। গাড়িতে বসে বিভিন্ন ইমারত দেখিয়ে তৌহিদকে সেগুলোর পরিচয় দিতে থাকেন। তৌহিদ বলেন, বাবা আমাকে ঢাকা শহর দেখাইছেন। গাড়ি একদিকে যায় আর বলেন, এটা চিনেন মামু? এটা শেরে বাংলার মাযার, সোহ্‌রাওয়ার্দীর মাযার। ..... এটা সংসদ ভবন। ...... এটা বিমান বন্দর। ...... অনেকক্ষণ পর গাড়ি একটা পুকুর পাড়

দিয়ে ঢুকল। যেখানে থামল, সেখানে একটা পাকা মাযার। জিজ্ঞেস করলেন, মামু এটা চিনেন? বললাম, না বাবা; আমিতো আর আসি নাই। বললেন, এটা মাওলানা ভাসানীর মাযার। অনেক বড় নেতা, মস্ত বড় অলি। ‘জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও’ আন্দোলনের উদ্‌গাতা মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে (র.) বিদেশী সাংবাদিকরা লকব্ দিয়েছিলেন ‘প্রফেট অব ভায়োলেন্স’ বলে, আর যুগের বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী এই আজীবন সংগ্রামী ও সাচ্চা ইসলামের তাবেদার পুরুষের স্বীকৃতি দিলেন ‘মস্ত অলি’ আখ্যায়িত করে। মাযারের ভেদরে ঢুকলেন। হাত তুলে মোনাজাত করলেন। অনেক লোক তাঁকে দেখতে এলো। ঐ পাঁচশো টাকার আঙ্গুর তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বললেন। বাবাজান সেখানে ঘন্টা দুয়েক ছিলেন।

৪. তৌহিদ ফকিরের সাথে কথা বলার সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন শাহানশাহ্ হুজুরের নিত্য সফরসঙ্গী মৌলবী আবদুল কুদ্দুস। তৌহিদের মুখে মাওলানা ভাসানীর মাযার যিয়ারতের কথা শুনে মৌলবী কুদ্দুস বললেন– বাবাজানের সাথে ভক্ত মীর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবদুল লতিফ, ড্রাইভার রফিক ও আমি টাঙ্গাইল সফর করি। সময়টা সম্ভবতঃ ১৯৭৮। তখন মাযার পাকা হয়নি। যিয়ারত শেষে বাবাজানের নির্দেশে মোনাজাত পরিচালনা করেন মীর আহমেদ। তারপর তিনি মাযারের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর চারশ’ টাকার মোমবাতি কিনে আনতে পাঠালে অনেক খোঁজাখুঁজি করে দু’শ টাকার সংগ্রহ করা যায়। একটা ছড়ি দিয়ে মাযারের চতুর্দিকে ছক এঁকে দিলে সে ছক বরাবর মোমবাতি জ্বালানো হয়। সেলিম জাহাঙ্গীরের মুখে শুনেছি কর্তৃপক্ষ শাহানশাহ্ বাবাজানের মোমবাতির ছকের উপর মাযার কাঠামো গড়ে তোলেন। এ তথ্য যিয়ারতে গিয়ে সেলিম সাহেব মাযারের খাদেমের নিকট জেনেছেন। বাতি জ্বালিয়ে বাবাজান মাযারে আতর ছিটান এবং মাওলানা সাহেবকে অলি-উল্লাহ্ বলে মন্তব্য করেন। এ সফরের সময়ে তিনি ঢাকার টিকাটুলির স্টার হোটেলে উঠেছিলেন বলে মৌলবী কুদ্দুস জানান।

ঘুষের টাকা ও সাপের আড্ডা

৫. তৌহিদ ফকির শাহানশাহ্ হুজুরের সাথে একবার কক্সবাজার সফরের অভিজ্ঞতার কথাও বললেন। সেখানে তাঁরা একটি হোটেলে ছিলেন। এ সময় একজন লোক বহু টাকা নিয়ে বাবার কাছে আসে। কিন্তু শাহানশাহ্ বাবার সাফ জবাব– 'ঘুষের টাকা নেব না'।

এ সফরের সময় একবার পথে গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে যাবার সময় তৌহিদ ব্যাকুল স্বরে বলেন, বাবাজান ওখানে সাপ থাকতে পারে আপনাকে কামড়াবে। জবাবে তিনি বলেন, বাবাজান আমাকে সাপের আড্ডায় বাড়ি দিয়েছেন। সাপ আমাকে কামড়াবেনা।........

ইতিহাস বলছেঃ হযরত রাবেয়া বসরীকেও (র.) হিংস্র জানোয়ার-স্বাপদরা সমীহ করতো। তাঁর কোন ক্ষতি করতোনা। তিনিও ছিলেন ফানাফিল্লাহ্ এবং শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীও তা-ই।

ঋণ স্বীকারঃ সূত্রঃ ১-৫ সিলেটের ইটের শিথানে মৃত্তিকা শয্যায় এবং টাঙ্গাইলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে মাওলানা ভাসানীর মাযার যিয়ারতে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) খাদেম তৌহিদ ফকিরের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক নিবন্ধ, মো. মাহবুব উল আলম, মাসিক আলোকধারা, ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

জীবনের তরে ঋণী

চন্দনাইশ সাতবাড়িয়া হাই স্কুলের শিক্ষক মাওলানা ফজলুল করিমসহ নানা লোকের মুখে প্রশংসা শুনেছি। সাক্ষাতের আশায় ছিলাম, ব্যাংক অডিটের কাজে চট্টগ্রাম সফরে এলে একদা চট্টগ্রাম দামপাড়া ব্যাটারী গলির আস্তানায় হাজির হলাম। তিনি আছেন কিনা এক লোককে জিজ্ঞাসা করলে আছেন বলে জানান। দরজা খোলা অন্ধকার কক্ষে সাহস করে ঢুকে গেলাম। পরিচয় জানতে চাইলে জানালাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যতক্ষণ লাগুক না দেখে ফিরবোনা। অমনি বললেন, 'বাতি দেন'। বাতির সুইচ কোথায় জানিনা, হাতড়িয়ে বাতি জ্বালালাম। প্রথম দেখলাম তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা। আবার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম কোন সেবা না করে ফিরব না। তখনি বললেন, 'একটু গা টিপে দেন'। কিছুক্ষণ সেবার পর বললেন, 'চলুন একটু বেড়িয়ে আসি'। ট্যাক্সি নিয়ে মেহেদীবাগ এক

নেভী অফিসারের বাসায় গেলেন। ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় দিতে চাইলাম। লোকটি গেল না, ঘন্টাখানেক পরে ফিরলেন। আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে ট্যাক্সিওয়ালাকে নির্দেশ দিয়ে আমার বাসা কোথায় জানতে চাইলেন। বললাম ব্যাংক অডিট করার জন্য ঢাকা থেকে এসেছি; বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে উঠেছি। সে ট্যাক্সিতে ব্যাংক ভবনে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তিনি পুনঃ ব্যাটারী গলির আস্তানায় ফিরে গেলেন। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিতে চাইলেও আমাকে সুযোগ না দিয়ে তিনি দিয়ে দিলেন। কত বড় অলি উল্লাহ্; আমাকে জীবনের তরে ঋণী করে গেলেন। আমার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হলো আমি তৃপ্ত, আমি ধন্য।

বর্ণক: মাহফুজুল হক আনসারী, পরিসংখ্যান অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান অফিস, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

দয়াল দাতা বিশ্বঅলি

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিকমত বা উন্নত কৌশল শিক্ষা দেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে অসীম শক্তি দেওয়া হয়। উত্তম স্বভাবের লোকেরাই শুধু সে কল্যাণকর শিক্ষা গ্রহণ করে" (সূরা বাক্বারা : ২৬৯)। মহামহিম স্রষ্টা তাঁর বিশাল সৃষ্টি জগতকে এক মহাহিকমতের উপর সংস্থাপন করেছেন। এজন্য জগতসমূহের কার্যভার হিকমতের অধিকারী আল্লাহ্র অলিদের উপর অর্পিত। 'অলিয়ুন' আরবি শব্দ, যার অর্থ – বন্ধু, মালিক, অভিভাবক ইত্যাদি। এটি আল্ কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র পবিত্র নামসমূহের একটি। অথচ নবি বা রাসূল বলে আল্লাহ্র কোন নাম উল্লেখ নেই। অলিরা সাধারণত নিজের পরিচয় গোপন করে থাকেন। ফলে অধিকাংশ মানুষ তাঁদের বুঝতে পারে না। প্রসিদ্ধ নবিদের মত উঁচু মর্যাদার অলিরা আবার নিজেরাই বিভিন্নভাবে নিজেদের পরিচিতি প্রকাশ করেন, যাতে তাঁদের কল্যাণ শক্তি দ্বারা মানুষের উপকার হয়।

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) জন্মসূত্রে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ্ (ক.) এবং হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র রক্তের উত্তরাধিকার। তাঁদের প্রথম জন খাতেমুল অলদ্ বেলায়তে মোকাইয়াদা পর্বের পূর্ণতাকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকা বা স্বাধীন ধর্ম মতবাদী যুগের সূচনাকারী বিশ্বঅলি। যিনি দাবি করেছেন রাসূলের (দ.) দুই

বেলায়তি তাজের শেষেরটি পেয়েছেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর মহান হিকমতি শক্তির প্রতিনিধিত্ব চলতেই থাকবে। অন্যজন প্রথম ব্যক্তির খেলাফত লাভ করে নিজ চরিত্রে স্রষ্টার সূক্ষ্ম গুণরাজি আয়ত্ব করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর চুপ থেকে জীবন জগতের হিকমতি কাজ পরিচালনা করেন। ফলে বিশ্বকর্মকর্তৃত্বের প্রধান কার্যকারক হিসেবে তিনিও নিঃসন্দেহে বিশ্বঅলি। একই পরিবারে আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা সমকালের তুলনাহীন সুফি তত্ত্বজ্ঞানী সুলতানে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.); যিনি এই সাধকের জনক ও দীক্ষাগুরু। জীবনের দীর্ঘসময় কঠোর-কঠিন ইবাদত রিয়াজত-স্মরণ সাধনায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী নিজেকে শুদ্ধতম পবিত্রতায় অভিষিক্ত করেন। ফলে আল্লাহ্র মূলগত পবিত্রতা ও অর্জিত পবিত্রতার স্বাভাবিক মিলন ঘটে। এই তিন মহান আউলিয়ার প্রতিনিধিত্ব পেয়ে তিনি নিজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অলির আসন লাভ করেন। চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকা নিবাসী বিশিষ্ট ভক্ত মীর আহমদ কৌতুক করে একবার বলেন, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তো রাসূলের বেলায়তি তাজ পেয়েছিলেন। অলি হলেও আপনার ভাগ্যে বোধ হয় তেমন কিছুই জোটে নি। উত্তরে তিনি দাবী করেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গাউসিয়াতের দুই তাজের একটি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.), অন্যটি হযরত মাওলানা সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে দিয়েছেন, যেটি পরে আমি পেয়েছি"। এমন সর্বোচ্চ মর্যাদার একাধিক অলি-উল্লাহ্ একই পরিবারে আবির্ভাব বিশ্ব সুফি সভ্যতার ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

'সুরতে হক্কী'-মহানবির (দ.) অসংখ্য রূপের মধ্যে সর্বোত্তম। মহাসত্যের প্রকাশ 'ওহী' আগমনের সময়ে তিনি যেরূপে বিরাজ করতেন। তখন সবকিছু ভুলে তিনি বিভোর হয়ে যেতেন, মুখমন্ডলে রক্তিমাভা ধারণ করতেন। এটাই সকল চেতনার মূলধারা মগ্নচৈতন্য। চরম সাধনায় রাসূলুল্লাহ্র বেলায়তের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব পেয়ে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী অধিকাংশ সময় 'সুরতে হক্কী' বা খোদার প্রেমে বিভোর থাকতেন। আল্লাহ্র পক্ষ হতে একটি মাত্র জজ্বা (দীপ্ত শিহরণ) হাজার বছরের রিয়াহীন (লৌকিকতাহীন) ইবাদতের চেয়ে উত্তম (আল-হাদিস)। প্রখ্যাত সুফি কবি হযরত হাফেজ সিরাজী এঁদের সম্বন্ধে বলেন, "পর্দার অন্তরালে যে রহস্য তা বিভোর চিত্তদের নিকট খোঁজ কর। যেহেতু এ অবস্থা উঁচুদরের সুফিদের নিকটও

থাকে না”। রাসূলের (দ.) রহমতের নূর দিয়ে গঠিত হয়েছে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগতসমূহ। তাই তাঁর পূর্ব প্রতিনিধিত্ব ছাড়া জগতে জীবন চলে না, চলতে পারে না। জগত বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমীর (র.) উদ্বৃত স্বয়ং রাসূলের হাদিস– “বলেছেন নবিবর আমার উম্মতে, আছে মোর সমকক্ষ গুণে আর হিম্মতে”।

চট্টগ্রাম বিপণী বিতান নীচ তলার প্রথম শ্রেণির সেলাই দোকান আলমগীরস্‌ এর বোম্বেওয়ালা মালিক মোহাম্মদ আলমগীর প্রকাশ লালা সাহেব এক বিকালে আমাদের আন্দরকিল্লার বাসায় আসেন। আমি কাপড় পরে বের হচ্ছিলাম। কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলে বললাম, এক মস্ত বড় অলি-উল্লাহ্‌ শাহানশাহ্‌'র কাছে যাচ্ছি। তিনি তাঁর বোনের বাসা মাদারবাড়িতে আছেন। সঙ্গে যেতে চাইলে তাকেও সঙ্গে নিলাম[১]। সেখানে পৌঁছে আলমগীর সাহেব বিস্মিত হয়ে তাঁকে অনেকক্ষণ দেখলেন। অতঃপর কিছু মাসায়েল সম্পর্কে জানতে চাইলে শাহানশাহ্‌ হুজুর বুঝিয়ে বলেন। এটা ১৯৭৩ সালের ঘটনা।

বিদায় নিয়ে রিক্‌শায় করে ফিরার পথে আলমগীর বলেন, কলকাতায় থাকতে বহু বছর পূর্বে এক স্বপ্ন দেখেছিলাম। এক বিরান মরুভূমিতে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। আরবি জোব্বা পরা নূরানী সুরতের এক মানুষ পথ দিয়ে আসছেন। পিছনে অনেক লোক। অগ্রগামী লোকগুলো সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে বলাবলি করছে 'রাসূলুল্লাহ্‌' আসছেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে স্ত্রীকে বলি এবং শুকরিয়া নামায আদায় করি। আজ আপনার সঙ্গে এসে দেখলাম ইনিই তিনি একেবারে হুবহু চেহারা। আমি ধন্য হলাম। এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মিরসরাই উপজেলার মঘাদিয়ার জমিদার কেনু মিয়া চৌধুরী বাড়ির মনজুর কাদের চৌধুরী। ১৯৮৪ সালে তাঁর কাপাসগোলাস্থ বাসভবনে একবার ঢাকা নিবাসী পাশা কাওয়ালের মাধ্যমে হযরত সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌কে (র.) দাওয়াত করেন। ইউসুফ আলী ফকির, সৈয়দ কামরুল আহসান, এহসানুল হক, সৈয়দ আবু জাবের, সৈয়দ জিয়াউল হক (ফরদাহাদাবাদ দরবার শরিফ), সৈয়দ মাহবুব হোসাইন (রুনু) সহ আমরা ১০/১৫ জন দাওয়াত ও জিকির মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। মনজুর কাদের সাহেব বলেন, আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম– এক পরিচিত লোক আমাকে সংবাদ দেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন। আমি যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই।

বাড়ি গিয়ে দেখলাম শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) আমাদের ঘরে খাটের উপর বসে আছেন। আমি তাঁকে যথাযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধা জানিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম। বখ্তেয়ার শাহ্ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আপনি যত শীঘ্র বাবাজানের সাথে দেখা করে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে দয়া প্রার্থনা করবেন। এটা উত্তম স্বপ্ন হলেও একটা বিপদের ইঙ্গিত আছে। চৌধুরী সাহেব তখন পতেঙ্গা জি.ই.এম. প্ল্যান্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তিনি বাবাজানের সাথে দেখা করেছেন বলে শুনিনি। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে ক্যান্সার ধরা পড়লে সুচিকিৎসার জন্য তিনি (মনজুর সাহেব) লন্ডন গমন করেন এবং তথায় মারা যান।

মুসলমানদের সাত ঈমান বা বিশ্বাসের একমাত্র রাসূল ব্যতীত অন্য ছয়টি অদৃশ্য। ধর্ম প্রচারের ২৩ বছরে রাসূল (দ.)ও পর্দা করেন। অতঃপর রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সাহাবা, হাক্কানী রাব্বানী আলেম ও অলি-উল্লাহ্গণই ১৪ শত বছর ধরে ধর্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখেন। ইবাদত-রিয়াযতে (স্মরণ-সাধনায়) আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত এই অলিদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

"তোমরা কি দেখ না? আল্লাহ্র মহাকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে তোমাদের নির্দেশের অধীন করেছেন এবং আল্লাহ্র প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত নিয়ামত (দান বা উপহার) তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করা হয়েছে" (সূরা লোকমান : ২০)।

'মুমিনের অন্তরেই আল্লাহ্র সিংহাসন' (আল-হাদিস)। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে আকরাম (দ.) বলেছেন, 'আমি আশা করি আমার উম্মতে এমন নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকের আবির্ভাব হবে, যিনি কিয়ামতকে অর্ধ দিবস পিছিয়ে দিতে সমর্থ হবেন'। অর্ধ দিবস কত সময় হযরত সা'দকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, ৫০০ বৎসর (হাদীস – আবু দাউদ)।

পবিত্র কোরআনে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত'–সৃষ্টির সেরা বলে সম্মানিত করা হয়েছে। এই মানুষ কি সব মানুষ? পশুত্ব বর্জন করে পূর্ণ মানবতায় যাঁদের উত্তরণ ঘটেছে তাঁরাই সৃষ্টির সেরা – সেই মানুষ। স্রষ্টার স্বভাবে যাঁরা স্বভাবিত, স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত, স্রষ্টার শক্তি দ্বারা শক্তিমান।

১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে শাহানশাহ্ বাবাজান একবার চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার কালীপুর গ্রামের উকিল বাড়িতে যান। উকিল আজিজ আহমদ চৌধুরী তাঁর ভায়রা ভাই। উকিল সাহেবের সেজ ছেলে বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক ইউসুফ জাফরকে তাদের পরিবারের সকলের থাকার জায়গা হয় মত উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম করে ২/৩ তলা একখানা পাকা ঘর করতে বলেন। জাফর[২] সাহেবের বিনয়ী উত্তর, আমাদের অত টাকা কোথায়? আপনি দোয়া করুন। একথা শুনতেই তিনি জজ্‌বা হালে ইংরেজিতে বলতে লাগলেন, "I have got an administration. I administer the whole world form here" অর্থ– 'আমার একটা প্রশাসন আছে, যেখান থেকে এ বিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত'। নিত্য সফর সঙ্গী মৌলানা কুদ্দুস বলেন বাবাজান প্রায় বলতেন "ভাণ্ডারী কোথাও বিনা প্রয়োজনে যায় না; সৃষ্টির কল্যাণে নানা স্থানে ঘুরি ফিরি। জাহের বাতেন জিয়ার হুকুমত"। দৃশ্যত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণকে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখা গেলেও তাদের কার্যাবলী অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন একজন অলি উল্লাহ্ অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ। এটা যুগ যুগান্তর হতে চলে আসছে এবং কিয়ামত অবধি চলতেই থাকবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্র প্রধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হলে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বলতেন, 'সে তো চাকর ছেলে, সে কী রাষ্ট্র চালাবে? রাষ্ট্র তো আমিই চালাই'। যুগ পরিচালক বিশ্বঅলির নিকট রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ ঘরের চাকর বাকরের মতই, যখন ইচ্ছা ক্ষমতায় বসান, আবার যখন ইচ্ছা ক্ষমতা হতে তাড়িয়ে দেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে ঘটে বলে এসব ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছুই জানতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী ও উল্লেখযোগ্য কারামত প্রকাশে জজ্‌বা অবস্থায় তিনি উপস্থিত লোকজনদের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ও বাংলায় একটা প্রশ্ন প্রায় করতেন, Do you know me? 'তোমরা কি আমাকে চিন'? ১৯৭৭ সালের ২৮ আশ্বিন সকাল বেলা বিদায় নিতে হুজরা শরিফে বাবাজানের সাথে দেখা করি। বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ শরিফ শেষে আশেক ভক্তগণ বিদায়ী সাক্ষাত করছেন। বোয়ালখালী উপজেলার খিতাপচরের ভক্ত রৌশন আলী অনুযোগ করেন, বাবাজান! আজমির শরিফ যাওয়ার জন্য মানত করেছি, আপনার অনুমতি নিতে পাসপোর্ট সাথে এনেছিলাম। তাতে একজনের দেওয়া আপনার নজরানার দশ টাকার একখানা

নোটও ছিল; সব পকেটমার নিয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি জানতে চান, ‘কষ্ট করে অতদূরে কিসের জন্য যাচ্ছেন? দুনিয়াতে চাওয়ার এমন কি আছে যা আমরা দিতে পারি না’? শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি আরও বলেন, প্রবাদ আছে– ‘ঘরের গরু ঘাটার ঘাস খায়না’। কোন কিছু চাওয়ার জন্য আপন ভক্তদের অন্য কোন দরবারে যাওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তবে যিয়ারতে যেতে নিষেধ করেন নি। তিনি প্রায় বলতেন, “মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ, বাগদাদ শরিফ, আজমির শরিফ আমাদের পুরান বাড়ি”।

পূর্ববর্তী প্রখ্যাত অলিদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। ১৯৮৬ সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম বন্দরের অফিসার মোহাম্মদ গোলাম রসূল, প্রকৌশলী আলী নবি চৌধুরী, বন্দর হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. আবদুল মান্নান শাহানশাহ্ বাবাজানের সাথে তাঁর হুজরা শরিফে দেখা করেন। বহু আশেক ভক্তের ভীড়। সকলকে তাড়িয়ে অফিসারবৃন্দকেও বিদায় দিয়ে বলেন, “কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে হযরত শাহজালাল (র.) হুজুর আসবেন। তাঁর সাথে জরুরী আলাপ আছে। তাই আজ একটু কষ্ট করে চলে যান”। আরেকবার উপস্থিত লোকজনকে হক মন্‌জিলের গেটের বাইরে বের করে দিয়ে গেট তালাবদ্ধ করে জজ্‌বা হালে বলেন, “গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) সাহেবের সাথে টেলিফোনে গোপনীয় বিষয় আলাপ করবো লোকজনের জন্য তাও পারিনা। দুনিয়ার আবদার নিয়ে শুধু বক্‌বক্ বক্‌বক্ করে”। দারোয়ান ও খাদেম তৌহিদ ফকিরকে কড়া নির্দেশ দিলেন, খবর না দিলে এদিকে যেন কেউ না আসে। অন্যান্যদের সাথে সেখানে বক্তপুর সৈয়দ পাড়ার ডা. সৈয়দ নিজাম উদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন।

“গন্‌জে বখ্‌সে ফয়েজে আলম মজহারে নূরে খোদা, নাকেসাঁরা পীরে কামেল, কামেলারা রাহনুমা”। অর্থ– হযরত দাতা গন্‌জে বখ্‌শ (র.) দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র রহমত ও জ্যোতির বিকাশস্থল। তাঁর দয়ায় নগণ্যরা হন কামেল অলি-দরবেশ, কামেল অলিরা হন অসংখ্য মানুষের মুক্তিপথ দিশারী। তাঁর আসল নাম হযরত আলি হাজভিরী (র.) ‘গন্‌জে বখ্‌শ’ তাঁর লকাব। এই মহান অলির মর্যাদার নিরিখে হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশ্‌তি আযমীরী (র.) রচিত এই কবিতাংশ তাঁর রওজা শরিফে প্রদর্শিত রয়েছে। তিনি ছিলেন হযরত জুনাইদ বোগদাদীর (র.) সিলিসিলার প্রখ্যাত পীরে কামেল। পাকিস্তানের লাহোরে তাঁর রওজা শরিফ।

চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের এককালের সভাপতি সুফিবাদে বিশ্বাসী সরল সদালাপী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চৌধুরী এন.জি. মাহমুদ কামাল সাহেব একদা গুণগুণ করে উপরোক্ত কাব্যাংশ জপ্‌তে জপ্‌তে তাঁর মনে এই ধারণা আসে যে, হযরত দাতা গন্‌জে বখ্‌শ (র.)ই দুঃখী মানুষের ফরিয়াদ আর্জি পূরণে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, অন্য কেউ নয়। মনে এই ধারণা নিয়ে নিজ বাসায় অবস্থানরত শাহানশাহ্‌ বাবাজানের কাছে যেতে শুনতে পান তিনি তখন পবিত্র কোরআন হতে সুললিত কণ্ঠে পাঠ করছেন, "ফাজকুরুনী আয্‌ কুরুকুম্‌ ওয়াশকুরুলী ওয়া তাকফুরুন" অর্থ– অতএব আমাকে (আল্লাহ্‌) স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না (সূরা বাক্বারা : ১৫২)। অতঃপর বাংলা ভাষায় বলেন, "আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার এ করুণাধারা জীবন মরণ হাসর পর্যন্ত"। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবারও বলেন, "দরবার হতে কিছু পেতে হলে ভক্তি শ্রদ্ধায় মানতে হয় এবং সাধ্য অনুসারে নিয়ত মানত করে চাইলেই আশা পূর্ণ হয়। চাকুরির প্রমোশন, ব্যবসার উন্নতি, নিঃসন্তানের সন্তান লাভ, পরিবারের শান্তি, দুঃসহ রোগমুক্তি, মান-সম্মান সম্পদ-দুনিয়াবী (পার্থিব) সবকিছুর জন্য একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার ঘেরা-বেড়াকে বলে গেলেও কাজ হবে[৩]। জজ্‌বা হালে (দীপ্ত কণ্ঠে) তিনি বলতে থাকেন "দুনিয়াতে এমন কি আছে যা আমরা দিতে পারি না, আপনি কি কিছু কম পেয়েছেন?" অতঃপর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে কামাল সাহেব বলেন, এক অসহায় অবস্থা হতে আপনি আমাকে মুক্ত করেছেন, আমি আপনার অনেক দয়া দান পেয়েছি। উভয় জগতে যেন আপনার দয়া হতে বাদ না পড়ি। আমি তওবা করলাম, আমাকে ক্ষমা করুন, এমন ভুল আর কখনো হবে না। নিঃসন্দেহে আপনি দয়াল দাতা বিশ্বঅলি, শাহানশাহ্‌ হক ভাণ্ডারী। সূর্যের মত আপনিই আপনার অদ্বিতীয় তুলনা।

সূত্র: ১. এডভোকেট বি জি মাহমুদ জালাল - সাধারণ সম্পাদক, আনজুমান-এ মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী কেন্দ্রিয় পর্ষদ। ঠিকানা: নজির আহমদ চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

২. প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেড. এম. এ্যাপারেলস্‌ লিমিটেড, দেওয়ান হাট, চট্টগ্রাম। ৭ বছরের মধ্যে পাকা ভবনটি নির্মিত হয়।

৩. এসব বাণীর সাথে বহু লোক পরিচিতি। অসংখ্যবার তিনি এসব বাণী উচ্চারণ করেন। যেসব আশেক ভক্ত মানুষের কাছে দরবারের শান মান প্রচার করেন তাঁরাও দরবারের ঘেরা বেড়ার মত। তাঁদের মাধ্যমেও আর্জি আবেদন কবুল হয়।

শাহানশাহ্ তো খোদার লকব্

শাহানশাহ্! নবির হাদিসে এটা তো আল্লাহ্র লকব্ (পদবী)। ব্যক্তির মান-মর্যাদা বাড়াতে এ লকব্ ব্যবহার করে লেখক নিশ্চয় শিরিক (অর্থ– আল্লাহ্র সাথে অংশীদার) করেছে, বলেন নানুপুর ওহাবী মাদ্রাসার এক শিক্ষক আলেম। 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' বইটি হাতে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন রাউজান উত্তর সর্ত্তার ভাণ্ডারী ভক্ত আবুল খায়ের। নানুপুর বাজারে বইটি দেখে সে আলেম আরও বলেন, শাহানশাহ্ শব্দটি বাদ দিয়ে লেখককে অবশ্যই তওবা করতে হবে। তবে যদি আল্লাহ্ তায়ালা এ কবিরা গুনাহ্ (বড় পাপ) মাপ করেন। এ ঘটনা **১৯৮৩** সালের বইয়ের প্রথম প্রকাশের পর। ধর্ম সম্পর্কে অল্প জ্ঞান হেতু নাজেহাল ভক্তটি দরবারে ফিরে লেখক হিসেবে আমার কাছেই জবাব দাবি করেন। বললাম, ওনার কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন বলুন, "আন্তা মাওলানা ফান্সুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন; অর্থ– আপনি আমাদের রক্ষক অভিভাবক প্রভু, কাফের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য করুন"। আরবি শিক্ষিত আলেমগণ কি আমাদের রক্ষক অভিভাবক? তাদের নামের সাথে মাওলানা শব্দ ব্যবহার কি শিরিক নয়? আবুল খায়ের আমার উত্থাপিত প্রশ্ন সে আলেমকে বললে তাহ্কিক (পর্যালোচনা) করে পরে বলবেন বলে তখন যে এড়িয়ে গেলেন পরে আর কোন উত্তর আসে নি। শাহানশাহ্ শব্দটি আরবি নয়, ফার্সি, হাদিসের উল্লেখ আসলে ভাঁওতাবাজী। বহুকাল ধরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শব্দের অপপ্রয়োগ ও বিকৃত ব্যবহার মর্মবাদী মুসলমানদের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে রয়েছে। মাওলানা, আল্লামা, হুজুর, মাস্তান, মৌলবাদী শব্দগুলো তন্মধ্যে অন্যতম। কষ্টকর রিয়াজত সাধনা করে যে ব্যক্তি 'রূহানী উরুজে সায়রে মায়াল্লাহ্' (অর্থ– আত্মার উন্নয়নে আল্লাহ্র সঙ্গে থাকা অবস্থা) অর্জনে সৃষ্টি জগতব্যাপী ফয়েজ বা অনুগ্রহ বিতরণে সক্ষম তিনিই তো মওলার প্রতিনিধিত্ব মূলে মাওলানা। আল্লামা বা মহাজ্ঞানী ওই ব্যক্তি যার খোদায়ী রহস্য জ্ঞান বা ইলমে হাকিকত অর্জিত। যে কোন প্রশ্ন করার সাথে সাথে যিনি প্রশ্নকারীর বুঝ জ্ঞানের বরাবরে উত্তর দিতে সক্ষম। ওই ব্যক্তিই হুজুর; যিনি মাশুক আল্লাহ্ সমীপে এবং শত স্মরণকারীর নিকট একই মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারেন। যেমন– হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) একই সাথে ৭০ পরিবারে দাওয়াত খাওয়া। অন্য অলিদের জীবনেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্র

প্রেমে নিজ শারীরিক অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যিনি খোদায়ী জজ্‌বাতে প্রতি পলে পলে প্রদীপ্ত হন তিনিই তো মাস্তান। যাঁর কুন্‌ ফায়াকুন্‌ অর্থাৎ হও বলার সাথে হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জিত। সর্ব সৃষ্টির মূল আল্লাহ্‌র সাথে যাঁদের সরাসরি সংযোগ রয়েছে তারাই মৌলবাদী। এসব খোদায়ী গুণাবলি অর্জনে তিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষা আবশ্যকীয় জরুরী নয়। 'উম্মিয়ে পাক' মহানবির পবিত্র নিরক্ষতার অনুদানে নিরক্ষর লোকও উল্লেখিত খোদায়ী গুণাবলি পেতে পারে। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ্‌ বলেন, ইয়াহদিয়াল্লাহু লিনূরীহি মাইয়াসাঁউ। অর্থ– "আল্লাহ্‌ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূর বা জ্যোতির সংযোগ দেন" (সূরা নূর : ৩৫)। ইদানিং দেশের পত্রপত্রিকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ডাকাতদের মাস্তান এবং খোদায়ী নূরী সংযোগকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকেই বলা হচ্ছে মৌলবাদী? এসব পবিত্র শব্দের বিকৃত ব্যবহার ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। আমরা এই বিকৃতির জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এক বর্ষিয়ান আলেম আজাদী বাজারে এক ওয়াজ মাহ্‌ফিলে শ্রোতাদের প্রশ্ন করেন, "আপনাদের ফটিকছড়িতে ইদানিং নাকি এক শাহানশাহ্‌র আবির্ভাব হয়েছে; শাহানশাহ্‌ তো বহু শাহ্‌ থাকে, ওরা কারা?" ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। 'শাহ্‌' শব্দটির অর্থ– মহৎ, মহান, শ্রেষ্ঠ, বড়, বাদশাহ্‌ ইত্যাদি। ইয়া বড় শরীর, খান্দানী বংশধর, বিপুল ধনে ধনী, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, মাদ্‌রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি শাহ্‌? কোন সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা পীর কিংবা খলিফা, মাদ্‌রাসা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা পরিচালক, কোন সুবক্তা বর্ষিয়ান আলেমকে 'অলি-উল্লাহ্‌, শাহ্‌' ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করেছে এ সমাজের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। আসলে অলি বা শাহ্‌ কারা এই প্রশ্ন নিয়ে মুখোমুখি হলাম অছিয়ে শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) মহোদয়ের। তিনি বলেন, "হক্কুল একীন অর্থাৎ উচ্চতর বিশ্বাসের অধিকারী যাদের আর্জি ফরিয়াদ তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়, তাঁরাই শাহ্‌। বাবাজানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আশেক ভক্ত রয়েছে যাদের আর্জি ফরিয়াদ তৎক্ষণাৎ কবুল হয়। তাদের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি শিক্ষিত, আরবি পড়া আলেম, কিছু নিরক্ষর লোকও রয়েছে। বিশ্ব সমাজে বিপুল সংখ্যক লেবাসী নামধারী 'শাহ্‌'ও থাকেন যাদের তুলনা সজীবতা ও গন্ধহীন প্লাস্টিক এবং কাগুজে ফুল। বিপুল মুরিদের সংখ্যা,

বড় মজলিস মাহ্ফিল কিংবা বিশাল জানাযা কামেল হওয়ার দলিল নয়, খোদার নূরী সংযোগই একমাত্র দলিল। খোদা রাসূলের নূরী প্রতিনিধিত্ব মূলে বাবাজান হক ভাণ্ডারী সর্বজয়ী শাহানশাহ্"।

হায়াত রিজিকের ভাণ্ডার

১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখ থেকে সপ্তাহকাল সময় বাবাজান পোর্ট কলোনীতে আমার বাসায় দয়া করে অবস্থান করেন। মাঝখানে একবার কক্সবাজার ঘুরে আসেন। ২৪ জানুয়ারি ১০ মাঘ উরসের দিনও এখানেই ছিলেন। তিনি যে বিছানায় ছিলেন সেটার নীচে ৫০,০০০ টাকা রাখেন। ভক্ত দর্শনার্থীদের কেউ কোন ফাঁকে নিয়ে যাবার আশঙ্কায় টাকাগুলি আমি অন্যখানে সরিয়ে রাখি। টাকার খোঁজ করলে আমার হেফাজতে আছে বলে জানাই। খরচের জন্য চাইলে ৪০০০ টাকা দিয়ে আবার চাইলে ৬০০০ টাকা দিয়ে বাকি টাকা দরবারে মা'জানের কাছে পাঠাবো বলে জানালাম। কেন জানতে চাইলে বললাম, আমরা ভাণ্ডার শরিফে গিয়ে খাই, থাকি তাতে কত খরচ। সব টাকা এখানে খরচ করে ফেললে দরবার কিভাবে চলবে? গুরু গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মাইজভাণ্ডার শরিফ হায়াতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার, সেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দেন। বখ্তেয়ার মামা ও জামাল সিকদার জমি কিনে, বিল্ডিং ও সেমিনার করে ২৪ লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছে" বলেই হাসতে লাগলেন।

একবার বাবাজান আমার বাসায় এসে একটা ব্যাগ হাতে দিয়ে বলেন, মামা, আপনার অনেক টাকা দরকার। তাই কিছু টাকা নিয়ে এলাম। গুনে দেখি ২৭ লক্ষ টাকা। বড় ছেলেকে আমেরিকা পাঠাতে তখন টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। বড় ছেলে ও একমাত্র মেয়ের ভাল পরিবারে বিয়ে হয়েছে। বড় ছেলে সস্ত্রীক আমেরিকায়, ছোট ছেলে বি.এ. পাস করে চট্টগ্রাম বন্দরে নিরাপত্তা কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং মেয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন স্বামীর সাথে কখনো বিদেশ, কখনো স্বদেশে। বাবাজানের অবারিত দয়ায়, জীবনে যা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না আমরা তা পেয়েছি। কোন পীর-অলি থেকে কেউ এত মেহেরবাণী পেয়েছে বলে আমি শুনি নি।

বর্ণক: আলী নবি চৌধুরী, প্রকৌশলী, মোটর যান বিভাগ, চট্টগ্রাম বন্দর, কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

বাবাজানের ওফাতের পর তাঁর ক'টি বাণীর সাথে উপরের বাণীটিও আগের হুজরা শরিফের দেয়ালে লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৮৯ সালে একদা ফটিকছড়ির এমপি (১৯৯৬–২০০১) আলহাজ্ব রফিকুল আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে ক'জন লোকসহ নানুপুর গাউসিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মুঈনউদ্দীন সাহেবও বাবাজানের রওজা শরিফ যিয়ারতে আসেন। বিদায়কালে তিনি আমাকে বলেন, ভাই সাহেব, এসব না লিখলে কি হয়না? কোরআন-হাদিসের সঙ্গে এ সবের কোন মিল নেই। বললাম, আল্লাহ্‌র অলির জবান থেকে কোরআন-হাদিসের বিপরীত কোন বাণী কেন তাঁদের কর্ম আচরণও খোদায়ী নীতির বিরুদ্ধ হতে পারে না। আপনি ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। আমার অনুরোধে বললেন, এখন বেশী আলাপ করার সময় সুযোগ নেই, সঙ্গীদের সাথে চলে যেতে হবে; পরে কোন সময় আলাপ হবে। বললাম, আপনার যখন সময় হচ্ছে না আপাততঃ কোরআনের সূরা ফাতেহার 'আন্ আমতা আলাইহিম' শব্দ দুটো একটু তাহ্‌কিক অর্থাৎ পর্যালোচনা করে দেখবেন। প্রায় ৫/৬ মাস পর ১০ জন আলেম নিয়ে তিনি পুনঃ রওজায় কোরআনখানি করতে আসলে বললাম, আশা করি আজকে আপনার আপত্তির উপর আলোচনা হতে পারে। তিনি আমার হাত ধরে বলেন, আমি তো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, প্রতি রাকাতে আপনার উল্লেখিত শব্দগুলি পাঠ করে থাকি অথচ কখনো অর্থ ও ভাব পর্যালোচনা করে দেখি নি। আলেম না হলেও শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী নিশ্চয় আপনাকে তাঁর কালাম বুঝবার মত দয়া করেছেন। আপনার কথাই ঠিক। আন্ আমতা আলাইহিম শব্দের অর্থ যাদেরকে নেয়ামত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত (শক্তি) থেকে কিছু কার্যকরী শক্তি উপহার দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম শহরে এক ঘরোয়া আলোচনায় ক'জনের এক ঝাঁক প্রশ্ন– হায়াত, মাউত, রিজিক, দৌলত আল্লাহ্‌র কুদরতি হাতে বলেই ছোট বেলা হতে আলেম ওলামা ও মুরুব্বীদর কাছে শুনে আসছি। অথচ আপনাদের প্রচার-প্রচারণায় বলা হচ্ছে এসব নাকি মাইজভাণ্ডারে। মাইজভাণ্ডারে কতবার যিয়ারতে গেছি। আমরা তো বড় কোন গুদাম ভাণ্ডার দেখি নাই। বললাম, আল্লাহ্ তো নিরাকার, তাঁর কুদরাতি হাত কী সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন। প্রসঙ্গক্রমে উপরের ঘটনা উল্লেখ করি। অতঃপর তাদের কাছে জানতে চাইলাম, শিশুকাল হতে সারাজীবন কত

লক্ষ-কোটি কথা বলেছেন আপনাদের সে কথার গুদামটা কোনখানে এবং কোন পদ্ধতিতে কথাগুলো গুদামজাত বা স্টোরিং করা আছে আমাকে একটু দেখান। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাঁরা বলেন, দেহযন্ত্রের বিশেষ খোদায়ী কৌশলে মানুষ কথা বলে থাকে। জীবনভর অদেখা কথা বলার ভাণ্ডার যেমন সকল মানুষকেই উপহার দেওয়া হয়েছে তেমনি প্রিয় বন্ধুদের কি বিশেষ ক্ষমতা উপহার দেওয়া আল্লাহ্‌র জন্য অসম্ভব? মাইজভাণ্ডার শরিফের ফয়েজ বরকতে যাদের আয়ু, আয়, সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের জন্য কি বাক্যটি প্রযোজ্য নয়? পবিত্র কোরআনের সূরা লোকমানের ২০ আয়াতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কি দেখনা, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ সমস্তই তোমাদের নির্দেশের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছেন তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামত বা অনুগ্রহসমূহ? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজানা হেতু আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে। তাদের না আছে কোন পথ নির্দেশক না আছে কোন দীপ্তমান কিতাব"। এই আয়াতে সুস্পষ্ট যে, সকলের জন্য আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ লাভের সুযোগ থাকলেও অতি অল্প সংখ্যকই এই অপরিমেয় অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন। এই আয়াত মতে সমগ্র সৃষ্টি জগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর অনুগৃহীত প্রিয়জনদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়োজিত। এখানে আন্দাজী প্রশ্ন অবান্তর।

ইসরাইল-লেবানন সংঘর্ষ ও তারপর

উনিশ্‌শ' বিরাশি সালের জুন মাস। বিশ্বের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও জনতার মুখে আলোচ্য বিষয় ইসরাইল-লেবানন সংঘর্ষ। ইসরাইলী মন্ত্রী পরিষদের ৬ জুনের সিদ্ধান্তে পাঁচ শতাধিক ট্যাংক ও প্রায় ষাট হাজার ইসরাইলী সৈন্য ৬৩ মাইল সীমান্ত অতিক্রম করে লেবাননে প্রবেশ করে। আন্তর্জাতিক আইন কানুনকে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মোনাচেম বেগিন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন ট্যাংক ও সৈন্যদের বুটের তলায় গুড়িয়ে দেয়। কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া লেবানন এক অসম চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইসরাইলী লক্ষ্য প্যালেস্টাইনি জাতির সংগ্রামী সংগঠন পিএলও এবং তাদের দক্ষিণ লেবাননের দামুর সিডানের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো। দুনিয়ার বুক হতে প্যালেস্টাইনি জাতিকে নির্মূল করতে হবে। নিরঙ্কুশ করতে হবে ইসরাইলী

জাতির অবস্থান ও ক্ষমতা। এক কালের নিগৃহীত ইসরাইলীরা ভুলে গেছে ইতিহাসের শিক্ষা। জার্মানীর গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইসরাইলীকে ছাই করে কুখ্যাত হিটলার তো সেটাই চেয়েছিলেন। ইতিহাসে হিটলার ও নাজি বাহিনী ঘৃণিত আবর্জনায় পরিণত। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, গ্যাস চেম্বারের ছাই থেকে বেরিয়ে ইসরাইলী জাতি এখন আরেক নাজি বাহিনী এবং বেগিন ও শ্যারনরা কুখ্যাত হিটলারেরই প্রতিভু।

মধ্যপ্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড লেবানন। বৈরুত যার রাজধানী। যুদ্ধের তেমন অবকাশ কখনো ছিল না। মুসলিম ও খৃষ্টান দুটো জাতি পরস্পর সহঅবস্থানে থেকে সরকারি প্রশাসন, সৈন্যবাহিনী সহ সকল ক্ষেত্রে প্রায় সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই ছিলনা জাতিগত কোন বিভেদ। ১৯৭১ সালে স্বীয় শাসন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী প্যালেস্টাইনিদের নিজ দেশের সীমানা থেকে উৎখাত করার জন্য বাদশাহ হোসেনের নির্দেশে জর্দান বাহিনী অতর্কিতে প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে হানা দেয়। ফলে তারা আশ্রয়চ্যুত হয়ে লেবাননে প্রবেশ করে আশ্রয় শিবির গড়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতায় বর্ধিত মুসলমানের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের ভয় দেখিয়ে কুটকৌশলী ইসরাইল লেবাননী খৃষ্টানদের হাতে নিয়ে তাদের দ্বারা খাড়া করে খৃষ্টান মিলিশিয়া বাহিনী। শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব; পরিণতি আনে গৃহযুদ্ধ। পুড়তে থাকে লেবাননের শান্তি এবং বৈরুতের সৌন্দর্য। খৃষ্টান মিলিশিয়া বাহিনীর গুপ্ত আহ্বানেই ইসরাইলী বাহিনী লেবাননে প্রবেশ করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য অতর্কিতে হামলা করে প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থার সর্বশক্তি চিরতরে ধ্বংস করা। বিশ্বজনমত জানার আগেই রক্তাক্ত ছুরিটা ধূয়ে মুছে সাফ করে নির্বোধ ভালো মানুষ সেজে খৃষ্টান-মুসলিম বিবাদ মিটানোর ভূমিকায় শান্তির ললিত বাণী আওড়াবে। বেগিন হয়তো পরাশক্তি মুরুব্বীদের সুপারিশে একটি নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যাবেন।

ঠিক এমনি সময়ে চট্টগ্রাম শহরে দামপাড়া ব্যাটারী গলি আবদুল গণি সওদাগরের বাড়িতে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) জজ্‌বা হালে যুদ্ধের নানাবিধ খেলনার অস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত। কোনটা বিমান বিধ্বংসী কামান, কোনটা এসএলআর, ট্যাংক বিমানসহ অনেক কিছু। সৈন্য, বাস, ট্রেন ও নানাবিধ খেলনা যুদ্ধাস্ত্র কাত, চিত, কোনটা ভেঙ্গে সারা ঘরময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ব্যাটারী চালিত বিমান বিধ্বংসী কামানের সুইচটা কয়েকবার টিপে ধরলেন। গুলি ছোঁড়ার শব্দ বের

হলো, যেন শত্রুর যুদ্ধবিমান ঘায়েল করলেন। আবার এসএলআর নিয়ে সৈনিকের মতো তাক করে যেন কোন শত্রুকে গুলি করলেন। তখন সে আবাসে গমণকারী সকলেই এ দৃশ্য দেখেছেন। প্রতিটি অস্ত্র দিয়ে তিনি যেন শত্রুর আগ্রাসন ব্যর্থ করছেন। যুদ্ধ শেষ হলে খেলনাগুলো সরিয়ে ফেলেন। **১৬, ১৭** ও **১৮** সেপ্টেম্বর পশ্চিম বৈরুতে 'শাতিলা ও সাব্‌রা' উদ্বাস্তু শিবিরে খৃষ্টান মিলিশিয়ার বর্বর হামলার দিনগুলোতে তিনি কক্ষের দরোজা, জানালা বন্ধ করে অস্থির পায়চারী ও বিড় বিড় করে কী যেন বলেন। এ তিন দিন তিনি দানাপানি স্পর্শ করেন নি। জানালার ফাঁকে এ সময়ে কখনো কখনো তাঁকে অঝোরে কাঁদতে দেখা গেছে। বিশ্বঅলি'র মানসপটে তবে কি শাতিলা-সাব্‌রার মর্মান্তিক দৃশ ভেসে উঠেছিল?

ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার শীর্ষস্থানীয় নেতা শহীদ আবু জিহাদ সাব্‌রা ও শাতিলা হত্যাজজ্ঞের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, "**১৯৮২** সালের **১৬** সেপ্টেম্বর মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পর প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে জেগে উঠি। দেখলাম, ইসরাইলী ও লেবাননী খৃষ্টান মিলিশিয়া বাহিনী বুলডোজার নিয়ে শাতিলা ক্যাম্পে ঢুকে সবকিছু গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাণভয়ে পলায়নরত ফিলিস্তিনীদের যাকেই সামনে পাচ্ছে গুলি করে হত্যা করছে। মহিলা ও শিশুদের জড়ো করে একত্রে গুলি করলো। ইসরাইলী বাহিনীর পাশবিক বর্বরতার ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখেছি। তারা কয়েকজন মিলে একজন ফিলিস্তিনী যুবতীকে প্রথমে ধর্ষণ করে পরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। আমাকে সবচেয়ে ব্যথিত করেছে ড্রেনে হাজার হাজার শিশুর মৃতদেহ। যদিও আমি তেল-যা আতারে তিনটি এবং সাব্‌রায় একটি সন্তানকে হারিয়েছি তা সত্ত্বেও এই হত্যাযজ্ঞ আমাকে সর্বাধিক মর্মাহত করেছে। ইসরাইলী গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার পূর্বে এক সাক্ষাতকারে মাতৃভূমির জন্য শহীদ এই নেতা বলেন, "আমার পরিবারের একেকজন সদস্য আমার হৃদয়ের একেকটি টুকরো। কিন্তু জন্মভূমির তুলনায় তাদের কোন মূল্য বা গুরুত্ব নেই। আমার আটটি ছেলে কিন্তু জন্মভূমি মাত্র একটি; আমার পবিত্র জন্মভূমি প্রাণের চেয়ে প্রিয় ফিলিস্তিন। কবে সে জন্মভূমি জবরদখল মুক্ত হবে এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমরা চল্লিশ বছরের অধিককাল ধরে সংগ্রামে রত আছি"। বর্বর হামলার শিকার হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু, আবালবৃদ্ধ নরনারীর মৃতদেহ বিশ্ববাসীকে যেন প্রশ্ন করলো, কী আমাদের অপরাধ? আমরা তো আপনাদেরই মতো স্বাধীন মাতৃভূমিতে বাঁচতে চেয়েছিলাম।

সারা লেবানন যখন গভীর ঘুমে অচেতন রাতের অন্ধকারে চেঙ্গিস হালাকুর প্রেতাত্মা ইসরাইলী বাহিনীর ছত্রছায়ায় তস্কর মিলিশিয়া বাহিনী শাতিলা ও সাব্রা উদ্বাস্তু শিবিরে চালায় ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর হামলা। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বাতাসে ভেসে আসে বুলেটের শব্দ, মৃতের আর্তচিৎকার, নির্বিচারে হত্যা করা হয় বৃদ্ধ-নারী-শিশু। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের পর্দায় সারা বিশ্ব এ লোমহর্ষক মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড দেখে হতবাক। ধিক্কার উঠে জাতিসংঘ চত্বরে, পত্র-পত্রিকায়, বৈঠক আসরে বিশ্বের সর্বত্র।

উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনিদের উল্লেখযোগ্য কোন অস্ত্র অথবা সুশিক্ষিত দক্ষ কোন সৈন্য বাহিনীও ছিলনা। ইসরাইলী ও খৃষ্টান মিলিশিয়ার আধুনিক অস্ত্রের তুলনায় তাদের অস্ত্র খেলনা মাত্রই। তবু চব্বিশ ঘন্টার অপারেশন তিন মাসে গড়ালো। বারো হাজার প্যালেস্টাইনী শরণার্থী নিহত হয়। পনের লক্ষ ঘর ছাড়া ও ছয় হাজার বন্দী। শর্তহীন আত্মসমর্পনে পরাশক্তি ব্যর্থ হলো। শর্ত নির্ধারিত হলো প্যালেস্টাইনিরা লেবানন থেকে সসম্মানে সরে যাবে সুদান, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, ইরাক, মিশর, জর্দান ও ইয়ামেনে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় অপসারণ পর্ব। সরে গেলো প্যালেস্টাইনি বাহিনী, কিন্তু থেকে গেলো ইসরাইলী বাহিনী। অতঃপর লেবাননের প্রেসিডেন্ট খৃষ্টান মিলিশিয়া নেতা বশির জামায়েল স্বীয় দলীয় সদর দপ্তরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত হন।

আরবের কোন দেশে স্বধর্মীয়দের উপর যখন ইতিহাসের জঘন্যতম হামলা চলছে, তখন আরব ও বিশ্বের ইসলাম হেফাজতকারী রাষ্ট্র প্রধানেরা কেউ আমেরিকা, কেউ রাশিয়ার হট লাইন খুলে বসে আছে শিখিয়ে দেয়া বুলির অপেক্ষায়। নিজেদের শাসন ক্ষমতার স্বার্থে একটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানাতেও তারা ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ ঘটনায় বিশ্বজনমত বিক্ষুব্ধ হলে অতঃপর ২০ সেপ্টেম্বর আরব লীগ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা (রাষ্ট্রপ্রধানেরা নয়) তিউনিসে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। ততদিনে ঘাতক ইসরাইলী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও জনতার বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। পেন্টাগণ-ক্রেমলিনের রোষানল এড়িয়ে বৈঠকে যৌথ প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো– “আমরা এই জঘন্যতম ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি। জাতিসংঘ প্রস্তাব কার্যকরী করা হোক (যে সমস্যার অকার্যকরী প্রস্তাব সংখ্যা তখন ৫০৯ এ দাঁড়িয়েছে)। গঠন করা হোক প্যালেস্টাইনিদের স্বাধীন আবাস ভূমি”। কে গঠন করবে তা কিন্তু বলা হলো না।

কোন সংগ্রাম লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে থেমে গেলেও আবার শক্তি সঞ্চয় করে; আবার লড়াই করে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত, আশ্রয় হতে উৎপাটিত, সংগ্রামে বারবার পরাজিত হয়েও প্যালেস্টাইনি মুক্তিসংস্থা হাল ছেড়ে দেয় নি। নতুন প্রেক্ষিতে শুরু হবে সংগ্রাম। তাদের নেতা ইয়াসির আরাফাত তিউনিসের নতুন সদর দফতর থেকে আবার সংগ্রামের ডাক দেন; "যেখানেই থাকি বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত, মাতৃভূমির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত; আমাদের সংগ্রাম চলবেই"।

প্রার্থীত সে বিজয় আসবে আরব ও বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে। যেমন এসেছিলো অতীতে, দ্বিতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে, মিশরের সুলতান বীর সালাহউদ্দিনের নেতৃত্বে। তাই যুগের বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বলেন, "হে বিশ্ব মুসলিম, আমার দিকে তাকাও! বিশ্ব মুসলমানদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগ (মুসলিম ঐক্য) গড়তে হবে"।

ইরানী বিপ্লবের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক

প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি ইরান। হাফেজ সিরাজী, শেখ সাদী, ফেরদৌসী, আল্ বেরুনীর গর্বিত ইরান। শাহ্ গোষ্ঠীর দোর্দন্ড প্রতাপে অবনত ইরান। জগতপ্রিয় সুবাসিত লাল গোলাপের প্রসিদ্ধ ইরান। মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেম-গোলাপ নুরজাহানের জন্মভূমি ইরান। শাহী শাসনের গুপ্ত ঘাতক সাভাকের আতঙ্কিত ইরান। রাজতন্ত্রের ত্রাস বিপ্লবী ডক্টর মোসাদ্দেকের পরাজিত ইরান। অবশেষে খোমেনীর বিজয়ী ইরান।

রং-বেরংয়ের ফেস্টুন পতাকা আর অসংখ্য তোরণে অপরূপ সজ্জিত তেহরান। ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী এই ইরানী রাজধানী। রাতের তেহরান সে আরেক দৃশ্য। নিয়নবাতির রঙ্গিন আলোর বন্যায় যেন বিদিশা। আকাশ থেকে বিমানযোগে নিক্ষিপ্ত ফরমান 'মিছিল করো, নৃত্য করো, ঢোলক বাজিয়ে জয়ধ্বনি দাও, মহান শাহ্ দীর্ঘজীবি হও। রাজদ্রোহী নিপাত যাক। জয় রাজতন্ত্র'। উৎসব বাজেট আশি কোটি রিয়াল। শাহী রাজবংশের দু'হাজার পাঁচশ সিংহাসন আরোহন স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব। পাহলভী রাজতন্ত্রের পঞ্চাশতম রাজ্যাভিষেক। নিমন্ত্রীত সারা বিশ্বের যত রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। উদ্দেশ্য দেখিয়ে দেয়া রেজাশাহ্ পাহলভীর দোর্দন্ড শাসনে 'প্রাচ্যের অজেয় শক্তি ইরান'।

পথে-পার্কে রেস্তোরাঁ-ক্লাবে লাল-গোলাপের মত ইরানী সুন্দরী নারীর অপরূপ সমারোহ। তেহরান বিমান বন্দরে দম ফেলার ফুরসৎ নেই। এসেছেন পরাশক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন আরবের বাদশাহ্, আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অভ্যর্থনার সারিতে দাঁড়ানো রাজ-মন্ত্রীবর্গ নড়তে পাচ্ছেন না। রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় মহান শাহ্ করমর্দনে হাতের ঝাঁকুনীতে এবং আলিঙ্গনে নিজেই টাল্ মাটাল; মুখে স্মিত গর্বের হাসি। উনিশ্ শ' সাতাত্তরের এমনি সময়ে শাহানশাহ্ হকভাণ্ডারী হুজরা থেকে বেরিয়ে চতুরার (কাচারি) সামনে খোলা মাঠে দু'পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে বসে দ্রুত সিগারেট টানছিলেন। তখন সকাল ন'টা। প্রচণ্ড দীপ্ত কণ্ঠে ইংরেজিতে বললেন, "শাহ্ অব ইরান, শাহ্ অব ইরান, আই মার্ডার ইউ, আই মার্ডার ইউ। ডু ইউ নো মি? অর্থ– ওহে ইরানের শাহ্! আমি তোমাকে হত্যা করছি। তুমি কি আমাকে চিন? চতুরা ঘরে বসে আমরা কান খাড়া করে শুনলাম এ বজ্রকণ্ঠ। সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্ সাহেবের নিকট বাক্যের অর্থ জানতে চাইলে বলেন, "ইরানের শাহ্'র জন্য সামনে বড় বিপদ আছে"।

খোমেনী তখন প্যারিসে পরবাসী। শাহ্ শাসিত ইরান তরঙ্গহীন-শান্ত। উৎসব শেষের আমেজ না মিটতেই পারস্য সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কেত। আটাত্তর সালের সাত জানুয়ারি শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্তে তেহরানের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় খোমেনীর বিরুদ্ধে মানহানিকর এক প্রবন্ধ। কোম্ শহরে একটি প্রতিবাদী মিছিল রাস্তায় নামে। সরকারি পুলিশ এদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অতঃপর তাব্রিজ-সিরাজসহ ইরানের সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। দিন দিন মিছিল মিটিং বাড়তে থাকে। সরকার প্রমাদ গুনলো। আট সেপ্টেম্বর ছালেহ স্কোয়ারে বিক্ষোভরত জনতার উপর শাহী সেনাবাহিনী গুলি চালালো। প্রায় সাড়ে চার হাজার ইরানী শাহাদাত বরণ করলেন। নভেম্বরে নামলো তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গুলি চললো। শহীদ হলেন পঁয়ষট্টি জন ছাত্র।

বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে গেল প্রত্যন্ত পল্লী পর্যন্ত। শাহীতন্ত্রের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রাণে মরার সিদ্ধান্ত নিলো। সর্বত্র একই আওয়াজ, 'শাহীতন্ত্র ধ্বংস হোক' খোমেনীকে ফিরিয়ে দাও, ইসলামী শাসন কায়েম করো' 'বিপ্লব জিন্দাবাদ'। বিক্ষোভের তান্ডবে রেজাশাহ দিশেহারা। তবু তর্জনী উঁচিয়ে সিংহের গর্জনে

বললেন, “তোমাদের জন্য কী না করেছি। অস্ত্র-সৈন্য-শক্তিতে মধ্য এশিয়ায় ইরানকে শ্রেষ্ঠ করে গড়েছি। বিক্ষোভ বন্ধ কর। না হলে হিতে বিপরীত হবে”। নিজের পক্ষপুটের মানুষগুলো পর্যন্ত দল বেঁধে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিচ্ছে। অতঃপর বেতার-টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে পরাজিত শাহের আবেগমথিত আবেদন, “ভুল হয়তো হয়েছে; সংশোধন করে নেবো। এসো ইরানের ঐতিহ্যকে রক্ষা করি। সুখী সমৃদ্ধ ইরান গঠনে সরকার ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি”।

ডক্টর মোসাদ্দেককে হারিয়ে ইরানী জনতা একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে ভুলের অনেক দাম দিতে হয়েছে। আর নয়, বিপ্লবকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। হত্যার বদলে হত্যা। সারাদেশে ধর্মঘট হরতালের আগুন জ্বলে উঠলো। রেজাশাহ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। বিপ্লবের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল শাহী তখ্‌ত তাউস।

পয়লা ফেব্রুয়ারী উনিশ্‌শ’ ঊনআশি সাল। লাখো লাখো জনতার মর্মবিদারী শ্লোগান ও সংবর্ধনায় বরিত হয়ে প্রবাস থেকে দেশে ফিরলেন ইরানী বিপ্লবের নেতা খোমেনী। শাহ্ সুদিনের বন্ধুদের দরোজায় দরোজায় ধর্ণা দিয়ে ফিরলেন, মরক্কো-মিশর-আমেরিকা। খোমেনীর হুমকি নয়, মাইজভাণ্ডারী শাহানশাহ্ অদৃশ্য বন্দুকের গুলিতে অবশেষে ধরাশায়ী ইরানের মহাপ্রতাপশালী সম্রাট রেজাশাহ্ পাহলভী। মিশরের মরুবালিতে চিরতরে ঘুমিয়েছেন ময়ূর সিংহাসনের শেষ মহারাজ।

ইরানে অচিন্তনীয় রাজনৈতিক উলট-পালটের মূলশক্তি খোমেনী না অন্য কেউ? দুনিয়াব্যাপী বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকরা মনে করেন খোমেনীই বিপ্লবের মহানায়ক। সম্ভবত তিনি নিজেও তাঁর সফলতার মূল শক্তি সম্পর্কে জানতেন না। ঘটনার বিবরণে দেখা যায়, খোমেনী নিজে দেশ হতে নির্বাসিত হয়ে প্রতিবেশী দেশ ইরাকে দীর্ঘ ৮ বছর অবস্থান করেন। এই সুযোগে তিনি সে দেশের সরকারকে আস্থায় এনে তাদের সেনাবাহিনী দ্বারা সরাসরি আক্রমণ করে দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করতে পারেন নি। সেদেশের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থেকে বিপ্লবী বাহিনী গঠন করে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধে সরকারকে বিব্রত করে কোন মীমাংসার ক্ষেত্র তৈরি করতেও পারেন নি। মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে দেশে প্রবেশ করে নেতৃত্ব দিয়ে সংগ্রামী

কাফেলা তৈরি করে অথবা নিজ জীবন বিসর্জন দিয়ে গতিশীল কোন সংগ্রামও গড়ে তুলতে পারেন নি।

বাইরের কোন চাপ অথবা কোন কার্যক্রমে বিরক্ত হয়ে আশ্রয়দাতা দেশ তাঁকে ৮ বছর পর অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য করেন। পরবর্তী ৮ বছর খোমেনী সুদূর ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে ছিলেন নির্বাসিত। যেখান থেকে উল্লেখিত কোন পথেই দূরত্ব ও ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার দরুণ ইরানকে স্বৈরাচার মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। সেখান থেকে বিভিন্ন লোকের মারফত তিনি দেশে প্রেরণ করেন তার কিছু ক্যাসেটবন্দী ভাষণ, নীতি নির্দেশ ও কর্মসূচী। শুধুমাত্র এই ক্ষীণকণ্ঠ প্রচারে একটা দেশের শক্তিশালী সরকারকে হঠানো মোটেই কি সম্ভব? রেজাশাহ পাহলভীর অনুগত প্রশাসন, গোয়েন্দা বাহিনী, বিশাল পুলিশ-সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী সমর্থকদের পদচারণায় গোটা দেশের কোথাও আন্দোলনের কোন সুযোগও তেমন ছিল না। প্রশ্ন হতে পারে তবে কীভাবে ইরানে বিপ্লব ঘটলো। পবিত্র কোরআনে বারংবার সীমা লঙ্ঘনকারীদের পরিণতি নির্দেশ করা হয়েছে কঠোর কঠিন শাস্তি এবং ধ্বংসের প্রমাণ হিসাবে আদ্ সামুদ প্রভৃতি জাতির উল্লেখ রয়েছে। শাহ্ গোষ্ঠীর কুশাসনে জাতীয় সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন, পাপাচারের বিকাশ, দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের উপর অবিচার, অত্যাচার ও নির্যাতনে বহু পূর্বেই শাসক সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছিল। তাই আল্লাহ্‌র মনোনীত যুগ প্রতিনিধি বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সরাসরি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতেই আঘাত করেন, যাতে ক্ষমতার সহায়ক শক্তি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে না পারে। রাস্তায় ট্রাফিক পয়েন্টে যতক্ষণ লাল বাতি জ্বালানো থাকে ততক্ষণ সকল গাড়ি থেমে থাকে, যখনি সবুজ বাতি জ্বলে উঠে অমনি ধীর দ্রুত সকল গতির গাড়িই চলতে পারে। অর্থাৎ রাস্তা বাধামুক্ত হলে যে কোন চালক গাড়ি চালাতে পারে। ইরানী বিপ্লবও তদ্রুপ। এখানে খোমেনীর ভূমিকা গাড়ি চালকের, এ জন্য শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর বর্ণনায় খোমেনীর কোন উল্লেখ নেই। 'তুমি কি আমাকে চিন'? পরাক্রমশালী অত্যাচারী সম্রাটের প্রতি নিজ ক্ষমতা পরিচিতির প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি শাশ্বত খোদায়ী শক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন।

কখনো কায়া কখনো হাওয়া

১০-১২-৮৪ সোমবার বিকাল ৪টা। অফিসের কাজ শেষে বাসায় যাওয়ার জন্য দোতলা হতে নীচে নামলে পরিচিত এক লোক ডেকে দেখায় বাবাজান চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসে ঢুকছেন। চট্টগ্রাম সমবায় ব্যাংকের চাকুরে ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট হুরপাড়া নিবাসী আবু আহমদ ফকিরকে সামনে পেয়ে বাবাজানের সাথে দেখা করতে আমরাও সে অফিসে ঢুকে পড়ি। সারা অফিস ভবন তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। অফিসের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কই? আমরা তো দেখি নি। তাঁকে চিনতে আমার কি ভুল হতে পারে? কত শতবার দরবারে হাজিরা দিয়েছি, কাছে বসেছি, কথা বলেছি। চাক্ষুষ দেখলাম, অথচ তিনি যেন হাওয়া হয়ে গেলেন। পরদিন সন্ধ্যায় কেসিদে রোডের হোটেল টিউলিপে বখ্‌তেয়ার মামার আসরে ঘটনাটি উল্লেখ করতেই মিরসরাই নিবাসী ইয়াসিন বিল্লাহ্ প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। ওই সময় আমি দরবারে তাঁর সাথে প্রায় ঘন্টাকাল ছিলাম। জেনেছি গত ১৫ দিনের মধ্যে তিনি কোথাও যান নি, মাইজভাণ্ডার শরিফে ছিলেন। দু'জনের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেলে বখ্‌তেয়ার শাহ্ বললেন, দু'জনই ঠিক দেখেছেন। কামেল অলিরা একই সময় একাধিক স্থানে অবস্থান করা সম্ভব। অতীতে তেমন বহু নজির বই পুস্তকে জানা যায়।

বর্ণক: নুরুল আলম (পিওন), পূবালী ব্যাংক লিঃ, আন্দরকিল্লা শাখা, চট্টগ্রাম। বাড়ি-সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

ঈদের দিন সন্ধ্যার পর আজিম নগরের মৌলবী কুদ্দুস সাহেব হক মন্‌জিলে এসে খুশির সাথে বলেন, আজ আমার ঈদ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছে। শহরে স্টেডিয়ামে নামায পড়ে দামপাড়া ব্যাটারী গলির আস্তানায় গিয়ে বাবাজানকে সালাম করে আমি প্রথম তাঁর সাথে ঈদের সেমাই খেয়েছি। কাছে বসে বহু রসালো আলাপ করেছি। মন্‌জিলের প্রধান কর্মকর্তা সৈয়দ ওবায়দুল আকবর বলেন, আপনি এসব কী বলছেন। আমরা সকালেও নামাযের পর দু'বার তাঁকে ঈদের সালাম করেছি। গতকাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি কোথাও যান নি। তর্ক করে দু'জন এক সাথে হুজরায় গিয়ে দেখেন, দরজা জানালা বন্ধ, বাবাজান ভিতরে আছেন।

রাউজান বাস স্টেশনের দোকানদার এককালে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের খাদেম আবদুল মালেক ঈদের পরদিন মাইজভাণ্ডার শরিফ ঈদের যিয়ারতে এসে বর্ণনা করেন গতকাল ঈদের বিকেলে শাহানশাহ্ হুজুর আমার দোকানে তশরিফ নেন। একজন পরিচিত লোক সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে সেখানে পৌঁছেন। চা নাস্তা সেরে আবার শহরের দিকে চলে যান। এসব ঘটনা ১৯৮৪ সালের ঈদুল ফিতরের।

মাইজভাণ্ডার শরিফ রাস্তার মাথা হতে আগত হাদিয়ার গরু মহিষগুলোকে দরবারের আমদানি খানা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমি অভ্যর্থনা বিভাগের প্রধান। ১৯৭৮ সালের ২৭ আশ্বিন খোশরোজ শরিফের দিন বেলা প্রায় ৩টা। দুপুরের খানা খেয়ে বাবাজান কী করছেন হুজরা শরিফের জানালায় উঁকি মেরে দেখতে গেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, জামাল সিকদারের মহিষ কি পথে দিগ্‌দারী করছে? আমি কী উত্তর দেবো ইতঃস্তত করে বাইরে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনঃ ভিতরে দৃষ্টিপাতে দেখি বিছানায় চাদরখানা পড়ে আছে তিনি নেই। হুজরা শরিফ আন্দর বাড়ি ও গোটা দরবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। রাস্তাঘাট এমনকি বাথরুমও বাদ গেল না। কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। বাবাজানের পরিবারবর্গ ও ভক্তদের মধ্যে চাপা ভয়-আতঙ্ক উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা, তিনি কোথায় গেলেন। আবার আসবেন তো! হতবিহ্বল অবস্থায় ঘুরে ফিরে এসে জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি। আচানক চাদরের মধ্যে নড়ে উঠে জানতে চাইলেন, কোন খবর পেলেন? বললাম, না বাবাজান। সিকদার সাহেব দরবারে পৌঁছলে জানলাম, বিবিরহাটের দক্ষিণে মহিষ দুটো রশি ছিঁড়ে রাস্তা ছেড়ে ধান ক্ষেতে নেমে পড়ে। তুলতে চাইলে দৌড়ে কিছুদূর গিয়ে নিজে নিজেই শান্ত হলে দরবারে আনা সহজ হয়। বাবাজানের ঘটনা সিকদার সাহেব আমার কাছে শুনে বখ্‌তেয়ার সাহেবকে জানালে বলেন, নিশ্চয় বাবাজান আপনার কষ্ট লাঘব করেছেন। এ রকম আল্লাহ্‌র কামেল অলিরা কখনো কায়া কখনো হাওয়া। অর্থাৎ দেখতে সাধারণ মানুষের মত মনে হলেও আসলে তাঁরা অনন্য সাধারণ। উল্লেখ্য যে, সিকদার সাহেবের পূর্ববর্তী উরসের মহিষ হাদিয়া দরবারে আনতে গোলমাল করায় পথে জবেহ করে আনতে হয়েছিল।

বর্ণক: সৈয়দ নুরুল গণি, পিতা-মুন্সি সৈয়দ শফিক উল্লাহ্, সৈয়দ পাড়া, গ্রাম- বক্তপুর, উপজেলা- ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সূর্যের ঝলসানো আলোতে দপ্ করে জ্বলে উঠে

বিশ্বজনীন চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই অনুভব করেন এই মহাবিশ্ব একক কোন মহাশক্তি অথবা সমন্বিত শক্তি নিচয়ের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র– যিনি জগৎসমূহের রব্" রব শব্দের অর্থ 'সৃষ্টিকর্তা', পালনকর্তা ও বিবর্তনকর্তা, আল্লাহ্‌ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ সকল কিছুতে (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু কণিকাতেও) বিরাজিত"। বর্ণিত আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টির পর ধ্বংস ও ধ্বংসের পর পুনঃ পুনঃ নতুন সৃষ্টি সব কিছুরই কর্তৃত্ব এক আল্লাহ্‌র। রবুবিয়াত কীভাবে কাজ করে আল্ কোরআনে তার বিস্তৃত বর্ণনা না থাকলেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন: (হে মোহাম্মদ সা.) নিশ্চয় সকল জগতের দয়া-শক্তি (রহমত) করে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে"। স্বয়ং রাসূলের (দ.) দাবি– "আমি আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোতি হতে এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত আমার নূরে সৃষ্ট"। সৃষ্টি জগতের বিকাশ ও সচলতা নিশ্চিতভাবেই এই দয়া শক্তিরই কার্যকারণে চলে। এই শক্তি প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কার্যকর। নবুয়তি ধারার পর বেলায়তি ধারা। আল্ কোরআনে এই বলে মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে "তোমরা রব্বানী হয়ে যাও" (সূরা আল এমরান: ৭৯)। ইবাদত-রিয়াযতের দ্বারা মানবিক অহংবোধ মুক্ত হতে পারলেই এই 'রাব্বানিয়াত' নামক খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। এরূপ ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিই বিশ্বঅলি বা যুগ পরিচালক মোজাদ্দেদ। সব যুগে এমনি একজন সৃষ্টি জগতের প্রাণস্বরূপ বিরাজিত থাকেন। তিনিই সর্বশক্তির সমন্বয়কারী; এই ব্যক্তিত্বের জ্যোতি ছাড়া সবকিছু অচল।

এমন সর্বশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) তাঁর কসিদায়ে গাউসিয়াতে দাবী করেন "জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগৎ আমার রাজ্য, আমার অনুগত ও নির্দেশে পরিচালিত"। হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশ্‌তি আজমিরী (র.) এই শক্তি বলেই "আনাসাগর" নামের হ্রদের পানি একটি মাত্র লোটায় ভরে রাখতে সক্ষম হন। পৃথ্বিরাজ এর সেনাবাহিনী পাহাড়ের নীচে অবস্থানরত নিরস্ত্র মুসলিম সাধকদের প্রাণে মারার জন্য পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেওয়া কয়েক টন ওজনের পাথরখানা খাজা সাহেবের আঙ্গুল ইশারায় পড়তে পড়তে সেই যে থেমে গেল সাতশ' বছর ধরে তেমনিই রয়েছে

অথচ পড়ে যাচ্ছে না। খোদায়ী মহাশক্তি বলেই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) বলেছেন, "আমার চাদরের নীচে এসো, আসমান জমিন, আরশ কুরসি, লৌহ কলম, বেহেশ্ত দোযখ এক পলকে দেখিয়ে আনবো"। দরবারের পুকুরে লোটা মেরে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে বাঘের আক্রমণ হতে ভক্তকে বাঁচানো এই শক্তিরই কর্মকাণ্ড। এই ধারাবাকিহতায় মহান অধ্যাত্ম সাধক শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজের বিপুল শক্তি সম্পর্কে বলেন,

(এক) "রহমতুল্লিল আ'লামীন রাসূলের রহমতের সীমা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মকক্ষতা।"

(দুই) "আমার একটা প্রশাসন আছে, যেখান থেকে এ বিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।"

(তিন) "আমার দরবার আন্তর্জাতিক সামরিক প্রশাসক অফিস, আমি ভেঙ্গে চুরে সব ঠিক করি।"

(চার) উনিশ্‌শ' পঁচাত্তর সালের ঘটনা। ২৭ আশ্বিন হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) খোশরোজ পবিত্র জন্মদিন – সকাল ৯টায় শাহানশাহ্ বাবাজান তাঁর হুজরা হতে বের হয়ে গেটের সামনে এসে উপস্থিত। এন্তেজামিয়া কমিটির সহ-সম্পাদক চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার মির্জাপুর নিবাসী মাওলানা সৈয়দ জহুরুল কাদের আজাদকে প্রশ্ন করেন, "ডেকোরেশন হয়নি কেন? বৃষ্টির জন্য হয়নি বলে উত্তর দিতেই অত্যধিক জজ্‌বাহালে বলে উঠেন, 'বৃষ্টি! কীসের বৃষ্টি? আমাকে চিন?" একথা বলতেই তাঁর মুখমণ্ডল শত সূর্যের ঝলসানো আলোতে দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়। অতঃপর মেঘ-বৃষ্টি কেটে আকাশ সহসা রোদে ভরে যায়। নির্দেশ মত ডেকোরেশন-সাজসজ্জা করে খোশরোজ শরিফ উদযাপিত হয় (জীবনীর অন্যত্র, পৃঃ ১৭১)।

(পাঁচ) ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই মানুষের তৈরি (আমেরিকা) প্রথম আণবিক পরমাণু বোমা ট্রিনিটি মেক্সিকোর আলমোগোচোয় ভোর ৫টা ২০মি. ৩৪সে. ফাটানো হলে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড অগ্নি গোলকের দিকে তাকিয়ে সেই বোমা তৈরির পয়লা নম্বর বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেন হাইমার নাকি আবৃত্তি করেছিলেন ভগবদ্গীতার শ্লোক। কারণ বিস্ফোরণের ভয়াবহতা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের কথা– "আমার জ্যোতি সহস্র সূর্যের একত্র তেজের সমান; আমি স্বয়ং মহাকাল....... সর্বহন্তা"।

উপরোক্ত এক হতে তিন নম্বর উক্তিতে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর অর্জিত খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের ধারা, তাঁর বেলায়তি ক্ষমতার সীমা-পরিধি, সেই ক্ষমতা কাজে লাগানোর প্রণালী বা সিস্টেম এবং মানবজাতিসহ মহাবিশ্ব পরিমণ্ডলে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কার্যকারিতা বর্ণনা করেন। পাঁচ নম্বর ঘটনায় ক্ষুদ্র পরমাণুর বিপরীতধর্মী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত মহাবিধ্বংসী শক্তির প্রচণ্ডতার সাথে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকে বর্ণিত অধ্যাত্ম পৌরুষে সঞ্চিত মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ৪নং ঘটনা। এখানে অণু পরমাণুর বস্তু শক্তি নয়, সাধকের অধ্যাত্ম সাধনায় অর্জিত মহাশক্তির প্রচণ্ড বিকাশ কোন আচার আয়োজন ছাড়াই প্রদর্শিত। এটা মূলশক্তি প্রদর্শন নয়; দর্শকের সহন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় যতটুকু সম্ভব। লক্ষ লক্ষ শহীদের ত্যাগ শৌর্য বীর্যের প্রতীক রক্তাক্ত সূর্য বা উদিত সূর্য আমাদের জাতীয় পতাকায় স্থান পেয়েছে। আসল সূর্যের সাথে এ সূর্যের কোন তুলনা কি চলে? অধ্যাত্ম পুরুষেরা মানব সমাজে মহাশক্তির প্রতীক বা চিহ্ন হিসাবে বিচরণ করেন বলে সাধারণ মানুষ তাঁদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে বুঝে উঠতে পারে না।

মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিল হতে প্রকাশিত আলোকধারা সাময়িকী ১৯৮৫ সালের চৈত্রমাসী উরস শরিফ সংখ্যায় 'বিন্যস্ত সালাত' শীর্ষক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সঠিক না বুঝে ক'জন বিশিষ্ট সুন্নী আলেম অনাহুত বিতর্ক সৃষ্টি করে মোকাবিলার জন্য তারিখ ঘোষণা করলে দরবারের মর্যাদার জন্য শঙ্কিত হয়ে হুজরায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে আর্জি জানাই। তিনি যে সমাধান দেন তাতেও অন্তর হতে ভয় দূর না হলে উপরের দিকে দৃষ্টিপাতে লুকোচুরিতে চাপা কণ্ঠে বলেন, "I am The Power" (আই এ্যাম দি পাওয়ার) অর্থ– "আমিই তো মহাশক্তি"।

ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ইংরেজি Power শব্দের বাংলা অর্থ করা হয়েছে, কর্মক্ষমতা, কর্তৃত্ব, শাসন, প্রভাব, বল, শক্তি, গতি সম্পাদন শক্তি, বেগ, প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র, সামরিক বল বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি প্রভৃতি। 'পাওয়ার' শব্দের আগে 'দ্যা' বা 'দি' শব্দ থাকাতে পরের শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, পাওয়ার বা মহাশক্তির সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা। এই মহান সাধকের জীবনকালের কিছু অলৌকিক ঘটনা ও বিভিন্ন উক্তিতে বুঝা যায় মহাবিশ্বের মৌলবল বা বলসমূহের সমন্বয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য নয়

যে ব্যক্তি যে পীরের মুরিদ অথবা যে অলি উল্লাহ্ ভক্ত তাকে অন্য পীর অলিদের চেয়ে উপযুক্ত ও বড় মনে করা ধমীর্য় মতে দোষণীয় নয়। তবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্য উপযুক্ত মর্যাদাবান পীর-অলিদের প্রতি অবজ্ঞা অসম্মান দেখানো ধর্মমতে বৈধ বা জায়েয নয়। তবু 'রিয়া' বা অহংবোধের কারণে শুধু ভক্ত-মুরিদ নয় পীর-অলিদের বংশধর এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়রা বিনাকারণে ভিন্ন ত্বরিকাপন্থী পীর ফকিরদের প্রতি অবহেলা ও বেআদবী প্রদর্শন করে থাকে। পীর-অলিদের মধ্যে মর্যাদাগত যে উঁচু নীচু স্তর আছে তা ওইসব লোকেরা বুঝতে চায় না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য সংহতি এবং নিজেরাও। আসল না জেনে ধারণা প্রসূত বাড়াবাড়ি মূর্খতাই বটে। এই মূর্খতা ও অহংবোধের কারণে অন্য দরবারের কিছু ভক্ত আওলাদ, অন্য পীরদের মুরিদানের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং কিছুসংখ্যক আলেম শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে চলতেন। তবু তিনি বিভিন্নভাবে তাদের ভুল সংশোধনে প্রয়াসী ছিলেন।

চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেন নিবাসী শেখ বজলুর রহমান সাহেবের বাসায় সাপ্তাহিক মাইজভাণ্ডারী জিকিরে সামা মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হত। মাহ্ফিলে বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্তদের সমাবেশ হত। সেদিন বাবা ভাণ্ডারীর দৌহিত্র আজিমনগর দরবারের সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম প্রকাশ গায়েবী ধন মিঞার মুরিদ মৌলবী আফজল, হালিশহরের টুনু চৌধুরী, চান্দগাঁর নুরুল হুদা চৌধুরী, সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ প্রকাশ টুনু কাওয়ালসহ বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। মৌলবী আফজল সুন্দর সুরে মিলাদ পড়তেন। একই বাসায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী অবস্থান করলেও অন্যের মুরিদ হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে মৌলবী সাহেব শাহানশাহ্ হুজুরকে এড়িয়ে চলতেন। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সেদিন অন্য এক রুমে লেপমুড়িয়ে বিশ্রামে ছিলেন। মাহ্ফিল শেষে আমরা খোশ আলাপ করছিলাম। হঠাৎ দরজা খুলে তিনি আমাদের সামনে এসে জলদগম্ভীর সূরে পাঠ করলেন পবিত্র কোরআনের এ আয়াত "লা নুফার্‌রেকু বাইনা আহাদিম্ মির্ রাসূলিহি" অর্থ– 'আল্লাহ্‌র রাসূলদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না' (সূরা বাক্বারা: ২৮৫)। আয়াতটি পাঠ করেই তিনি নিজ কক্ষের দরোজা পুনঃ বন্ধ করে দিলেন। আল্লাহ্‌র নবি রাসূলদের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। সবাই এক

তাওহিদ ও এক রেসালতের জিম্মাদার প্রচারক প্রকাশক। বজলুর রহমান সাহেব বলেন, আমি নিশ্চিত যে মৌলবী আফজালসহ তেমনি সংশয়বাদীদের লক্ষ্য করেই তিনি আয়াতটি পাঠ করেন যাতে সংশ্লিষ্টরা ভুল শুধরে নিতে পারে।

তথ্যঋণ: উদারতা ও আদবের প্রতীক শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (র.) মাসিক আলোকধারা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৮।

নামায আল্লাহ্‌র হিকমত

নামায সম্পর্কে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মূল কিতাব 'বেলায়তে মোত্লকায়' অছিয়ে গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর বর্ণনা– কোরআন পাকের আদেশ **(১)** "আকিমুস্সালাতা লেজিক্‌রী" অর্থাৎ "আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম বা বিন্যস্ত কর"। আরবিরা পতিত খিমা বা তাবুকে খাড়া করা বা বিন্যস্ত করার জন্য 'আকীম' শব্দ ব্যবহার করে। যথা "আকীমুল খিমাতা" অর্থাৎ পতিত তাবুকে বিন্যস্ত করা। **(২)** "লা তাকুনূ মিনাল গাফিলীন" অসতর্ক বা গাফেল হইওনা। অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রীয় মুখ-জবান কানসহ দিলের (অন্তরের) অন্তস্থলে যেন ধ্বনিত হয়। **(৩)** এয়া আইয়ুহাল্ লাজিনা আমানু লা-তাকার্‌রাবুস্সালাতা ওয়া আন্তুম সুকারা হাত্তা তা'য়ালামু মা তাকূলুনা, অর্থ– বিভোর চিত্ত অবস্থাতে নামাযের কিনারেও যাইওনা; যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝিতে পার তোমরা কী বলিতেছ (সূরা নিসা: ৪৩ আয়াত)। ইহা আদেশ-নিষেধ-মূলক আয়াত। ঐ ব্যক্তিরাও এই আদেশের অন্তর্ভূক্ত; যাহারা পার্থিব দুনিয়াবী চিন্তাধারায় বিভোর। যদিও তাহারা নামাযের মধ্যে মুখে সব কিছু পড়ে বরং রুকু, সজিদা কেয়াম, কছুদ ইত্যাদি করে অথচ তাহাদের মন খোদা স্মরণে বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল ও মোনাজাত বা প্রার্থনায় সজাগ-চিত্ত নহে এবং গাফেল ও বেখবর। এইগুলি নেহায়েত মনন প্রকৃতি সম্পন্ন বস্তু। মন এই দিক সেই দিক দৌড়াদৌড়ি করিলে ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া আনিয়া পাহারা দেওয়া এবং পশুর মত তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করা দরকার। ইহাতে মহিষ গরু প্রভৃতি জানোয়ারের মত মানবের পশু প্রকৃতিও পোষ মানিতে অভ্যস্ত হয়। এই ব্যবস্থা পশু স্তরের লোকদের জন্য; যাহাদের নফ্স বা মানব সত্ত্বার প্রকৃতি 'আম্মারা' বা পাপকার্য্যে উৎসাহী এবং যাহাদের বিচরণ-ক্ষেত্র বা অবস্থান-নাছুত বা দৃশ্যমান জগত। তাই মাওলানা রুমী মসনবিতে বলেন– "পাঁচ ওয়াক্ত নামায পথ দেখানো

নামাযই বটে। খোদার প্রেমিকগণ সবসময় নামাযে রত থাকে। পানি খাওড়ী পাখি যেমন সারাদিন পানিতে থাকিয়াও তাহার জলতৃষ্ণা মিটাইতে পারেনা; সেইরূপ এশ্‌ক বা খোদা প্রেম-বিভোর চিত্ত মানব নির্দিষ্ট ওয়াক্ত মতে নামায আদায় করিয়াও তৃপ্ত হয় না বরং তাহারা 'সব সময়েই' নামাযে বা খোদা স্মরণে রত থাকে' যেইরূপ কোরআন বলে– 'অহুম ফি সালাতেহিম দায়েমুন"।

তাফ্‌সিরে ইবনে আরবিতে আছে, খোদার প্রেমাগ্নি মনে জাগ্রত করার নাম নামায বা সালাত। যেহেতু 'সাল্‌য়ুন' ধাতু হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ ধামাচাপা আগুন জাগ্রত করা। যেমন পবিত্র কোরআন বলে "তাস্‌লা নারুন হামীয়া" অর্থাৎ দোজখীদের জন্য আগুন তেজদার বা জাগ্রত করা হইবে। ইহা নামাযের আভ্যন্তরীন দিক এবং দ্বিতীয় স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। ইহা তরিকতের "লাওয়ামা" বা অনুতাপ স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া "মোল্‌হেমা" – অর্থাৎ খোদার প্রেরণা বা "এল্‌হাম" ইত্যাদি স্তরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।
পবিত্র কোরআন পাকের সূরায়ে "আন্‌কাবুত" এর ৪৫ আয়াতে "আকীমু" শব্দ দ্বারা বিন্যস্ত করার বা কায়েম করার নির্দেশ পাওয়া যায়। যাহা "হাইয়াতে কজাইয়া" অর্থাৎ রাসূল করিম (দ.) হইতে নামাযের যেই নির্ভুল নিয়ম পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেও প্রচলিত ভাষায় সালাত বা নামায বলে। এই জন্য হাদিসে কুদ্‌সীতে "অর্ধেক নামায আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার জন্য উল্লেখ আছে"। ইহাতে রূহানী উৎকর্ষ ও সামাজিক উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন–

১। প্রথম আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সঙ্গে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া সংসার নির্লিপ্ততা ঘোষণা করা এবং হাত বন্ধ করিয়া পূর্ণভাবে এই নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করা হয়।

২। রুকুতে ঝুঁকিয়া পশু স্তর হইতে সামনে ফেরেশ্‌তা স্তরের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব ব্যক্ত করা হয়।

৩। কয়ূদ বা বসা অবস্থায় এই নাসুত জগতে নিজকে পাহাড় পর্বত সদৃশ স্থিত জড় পদার্থ মনে করিয়া খোদার ইচ্ছা শক্তির বাহন বলিয়া ঘোষণা করা।

৪। সজিদাতে পড়িয়া নিজেকে স্রষ্টার অনুগত প্রশংসাকারী ও 'তস্‌বীহ' বলার সঙ্গে ফেরেশ্‌তার মত পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয়।

৫। "তাশাহুদ" বা আত্তাহিয়া পড়ার সময় নবি করিম (দ.)-এর মে'রাজ সময়ে আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাতে দরূদ, সালাম পাঠ অনুকরণ করা হয়। অর্থাৎ বসার

পর প্রথম অবস্থায় নবি করিম (দ.)-এর বাণী 'আত্তাহিয়াতু" ইত্যাদি খোদার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার সময় আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক "আস্‌সালামু আলাইকা" ইত্যাদিতে নবি করিম (দ.)-এর প্রতি সালাম ও রহমতে কামেলার প্রতিদান ঘোষণা করা হয় এবং নিজ ও মোমেনদের প্রতি শান্তি বাণী প্রদান করা হয়। এইরূপ ভাবের আদান প্রদানের পরক্ষণে ফেরেশ্‌তা-জগত হইতে "আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা" ইত্যাদি বাণীতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এবং তাঁহার বংশধর ও পূর্ববর্তী হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরূদ সালাম প্রার্থনা করা হয়। পরে নবি করিম (দ.) কর্তৃক কুতুবে এরশাদের মকামে "রব্বানা আ'তিনা" ইত্যাদিতে দুনিয়া ও পরকালের শান্তি মুক্তি, জগদ্বাসীর জন্য হেদায়ত, এরশাদি বা হেদায়তকারী দাবীও প্রার্থনা করা হয়।

৬। সালাম দ্বারা সায়র ফিল্লাহ্‌র পর সায়র মা'আল্লাহ্, জগদ্বাসীর শান্তি মুক্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়; যাহা সার্বজনীন প্রেম প্রীতি ভালবাসার নির্দশন।

এই ইবাদত বা উপাসনা পদ্ধতি বিশ্ব নবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা-আহমদ মোজতবা (দ.)-এর এক অপূর্ব দান। ইতিপূর্বে এইরূপ নিখুঁত সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন সুন্দর উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিলনা। ইহার আহ্বান পদ্ধতিটিও নেহায়েত সার্বজনীন শ্রুতিমধুর ও অর্থবোধক। ইহা মোক্ষ বা মুক্তিকামীদের জন্য সমানভাবে সতর্ককারী। ঘড়ির কাঁটার মত ইহা দিনে পাঁচবার মানবকে সতর্ক করে ও বন্ধুর ন্যায় সজাগ করে এবং নিরলস সৎকর্ম প্রেরণা দান, দেহমন, কাপড় চোপড় পবিত্র, বিশ্ব পালনকর্তার স্মরণ বা "জিকির", মনন প্রভৃতি অনুরাগ জাগ্রত করে।

শুচির দিক দিয়ে অজু, কাপড় ইত্যাদির পবিত্রতাও সভ্যতার উন্মেষকারী। এই নামায বা উপাসনা অবস্থায় যখন মানব নিজকে বা নিজ সজাগ সত্ত্বাকে তালাশ করে তখন বুঝতে পারে, সে কোন স্তরে আছে।

"আম্মারা, লাওয়ামা, মোলহেমা, মোতমাইন্না, রাজিয়া, মর্জিয়া বা কামেলা ইত্যাদিতে নিজ পরিচয় লাভ করা তখন তাহার জন্য সহজ হইয়া পড়ে। তাই পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে– "আস্‌সালাতু মি'রাজুল মোমেনীন" অর্থাৎ নামায বিশ্বাসীদের উন্নতির সোপান। [সূত্রঃ বেলায়তে মোত্‌লাকা ১৬৯-১৭৩ পৃষ্ঠা, চতুর্থ সংস্করণ।]

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্ত ও তাঁর নিকট আগত লোকদের নামাযের জন্য উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত ও নির্দেশ করতেন। ফটিকছড়ি থানার পূর্ব ফরহাদাবাদ নিবাসী প্রখ্যাত শিক্ষক সুলতান আহমদ বিএবিটির মেজ ছেলে মাহবুব আলী তালুকদার সহ তাঁর নিকট দোয়াপ্রার্থী একদল লোককে লক্ষ্য করে বলেন, "ওবা নামায পড়বেন। ভাত খেলে নামায পড়তে হয়"। দর্শনার্থীদের তিনি প্রায় বলেন, "নিয়মিত নামায রোজায় অভ্যস্ত হলে আয় বৃদ্ধি, রোগশোক মুক্তি ও দেহমন সুস্থ থাকে"। "হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর, সব সমস্যা মিটে যাবে"। সর্বমহলে এগুলো তাঁর বহুল আলোচিত বাণী।

ওফাতের ঠিক এক মাস পূর্বে ১২-৯-৮৮ তারিখের ঘটনাটি। সেদিন তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের অফিসার্স কলোনীতে ডেপুটি কনজারভেটর ক্যাপ্টেন রমজান আলী সাহেবের বাসায় ছিলেন। তাঁর গাড়ির ড্রাইভার রফিক সেবা করতে করতে তাঁকে প্রশ্ন করে 'নামায কী'? বাবাজানের উত্তর, "আল্লাহ্র হিকমত'। নামায না পড়লে কী হয়? একই ব্যক্তির অপর প্রশ্নের জবাবে বলেন, "হিকমতের ক্ষতি হয়"। ক্যাপ্টেন সাহেবের বড় ছেলে ঘটনাটি ভিডিও ক্যাসেটে ধারণ করে রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, এটিও তাঁর একমাত্র জীবন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ইন্না মিনাস্-সিরি হিকমাহ্ অর্থ– নিশ্চয় অনেক কবিতা হিকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞানময় –আল্ হাদিস। সর্বোত্তম বিষয়বস্তুকে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা জানাকে 'হিকমত' বলে – (লিসানুল আরব) আরবি অভিধান। শিল্প বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম বিষয়গুলোকে যে ব্যক্তি আয়ত্ব করে তাকে হাকিম বলা হয়। এ স্থলে হিকমত দ্বারা ব্যবহারিক অর্থাৎ প্রায়োগিক জ্ঞান বুঝায়। সমগ্র সৃষ্টিজগত এক হিকমত বা মহাকৌশলের উপর স্থাপিত ও পরিচালিত। নামায বা সালাত সম্পর্কে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর জ্ঞান যে কত ব্যাপক তা সাধারণ মানুষের ধারণারও বাইরে। ইল্মে বেলায়তের মিরাজ প্রাপ্ত ফকিহ্ ও ফকিরগণ এ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারেন। তিনি জগত জীবন সম্পর্কে উদাসীন হলেও শরিয়তের কোন বিধি নিষেধের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ, প্রতিবাদ কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি।

ভাগ্যের দুয়ার খুলতে পারে

শৈশবে বাবাকে হারিয়েছি। গরীব পরিবার। বড় ছেলে হিসেবে তাই রুজি-রোজগারের সন্ধানে **১৯৯১** সালের মে মাসে সৌদি আরব এসেছি। দেশে থাকতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ যাওয়া-আসা করতাম। জাঁহাপুরের জীবনী ফকিরের ছেলে তফাজ্জল হোসেনের সাথে পরিচয় হলে হক মন্‌জিলের সংযোগ হয়। বড় বোনের বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা সমাধানে হক ভাণ্ডারী বাবাজানের কাছে বহুবার গিয়েছি। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিপদে আপদে আমরা তাঁর অপরিমেয় দয়া পেয়েছি। প্রবাসে থাকলে এমনিতেই দেশের প্রতি মমত্ব বাড়ে। একজনের মারফতে বাবাজানের জীবনী শরিফ পেয়ে আগ্রহ সহকারে পড়তে আরম্ভ করি। ভূমিকা নিবেদনে 'বিনীত ভাষণ' এ লেখক লিখেছেন 'প্রগাঢ় ভক্তি ও সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে এ বই পাঠ করুন হয়ত সৌভাগ্যের দ্বার খুলতে পারে'। এ লেখার প্রতি গভীর বিশ্বাসে রাতে ঘুমাবার সময় অতি পাক পবিত্র হয়ে দোয়া দরূদ পাঠ করে বাবাজানকে একবার দেখার আশায় আর্জি করে শয়ন করি। ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন দেখি–

এক বিরাট মাঠের এক পাশে ৩/৪ ফুট উঁচুতে একটা অতি সুন্দর শাহী রাজপ্রাসাদ। মাঠে দাঁড়িয়ে সে দিকে তাকিয়ে দেখি প্রাসাদের ভিতরে এক নূরানী আলোর বৃত্তে হেঁটে বারান্দায় আসছেন হক ভাণ্ডারী বাবাজান। তাঁর পরনে চেক লুঙ্গি গায়ে ঘি রংয়ের হাফ হাতা গেঞ্জি, নূরানী দীপ্ত চেহারা। সাথে সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্। তাঁর পরনে সাদা লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, মুখে দাড়ি, মাথায় বাবরী চুল। বখ্‌তেয়ার শাহ্‌কে সেখানে দাঁড়াতে বলে বাবাজান আমার নিকট এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি হতবিহ্বল আনন্দ আতিশয্যে ভয়ে কাঁপতে ও ঘামতে থাকি। দীর্ঘক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে আবার হেঁটে প্রাসাদের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। অতঃপর বখ্‌তেয়ার শাহ্‌কে নিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে পুনঃ আলোকবৃত্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জেগে দেখি সারা শরীর ঘামে ভিজে একাকার। কৃতজ্ঞতায় তাযিমী সিজদায় লুটিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

বর্ণক: মোহাম্মদ সেলিম চৌধুরী, পিতা- মৃত মোহাম্মদ সোলায়মান চৌধুরী, গ্রাম ও ডাকঘর-হুলাইন, উপজেলা-পটিয়া, চট্টগ্রাম। বর্তমানে- রিয়াদ, সৌদি আরব।

আল্লাহ্‌র পানি খাস তাবার্‌রুক

১৯৮৭ সালের ১০ পৌষ খোশরোজ শরিফে মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার জহিরুল হক সাহেব ও আমাদের ছেলেরাসহ নেয়াজ তাবার্‌রুক একসাথে খেয়ে পানি খাওয়ার জন্য একটা জগ ও গ্লাস নিয়ে হুজরা শরিফের (বর্তমান রওজা শরিফের) পূর্ব-দক্ষিণের টিউবওয়েলে চাপ দিলে পানি উঠে না। কলে পানি নাই। মন্‌জিলের অফিসে এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি-সম্পাদক মামা বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ ও জামাল সিকদার সাহেবকে পানি না পাওয়ার অভিযোগ করলাম। তাঁরা উল্টো আমাকেই বিষয়টি শাহানশাহ্‌ বাবাজানকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর হুজরা শরিফের পূর্বের জানালায় গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে চাপকলে পানি নেই বলে জানালে বলেন, আল্লার পানি খাওয়া ও চা দোকানে ব্যবহার চলতে পারে, পায়খানা প্রশ্রাবখানায় ব্যবহার করায় আল্লাহ্‌র পানি আল্লাহ্‌ উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌ চাইলে পানি আবার দিতেও পারেন।

এই নলকূপ শাহানশাহ্‌ বাবাজান নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত: ১৯৭৯ সালের ঘটনা। একদা ১০,৫০০.০০ টাকা দিয়ে খাদেম রুহুল আমিনকে ঠিকানা বলে চট্টগ্রাম শহরের কেসিদে রোড হোটেল টিউলিপে সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহের কাছে পাঠালেন। বলে দেন, বখ্‌তেয়ার মামুকে বলবে দরবারী আবদুর রহমান মিস্ত্রীকে খোঁজ করে আদমজীর জি আই পাইপসহ টিউবওয়েলের যাবতীয় সরঞ্জাম কিনে এক সঙ্গে পাঠাতে। টাকা আরও লাগলে পরে দিয়ে দেব। জুবিলী রোড সেফুুরী মেশিনারী স্টোর হতে কিনে মিনি ট্রাকে করে সে রাতেই মালামাল দরবারে পৌঁছে। পরদিন কাজ শুরু হয়। বাবাজান নিজ পবিত্র হাতের শাহাদাত (অনামিকা) আঙ্গুলের মাটিতে ৬ ইঞ্চি সাইজের একটা বৃত্ত এঁকে ঠিক মাঝখানে আঙ্গুলে সেন্টার চিহ্নিত করে দেন। ২৩০ ফুট গভীরে যাওয়ার পর কাজ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন যদিও উপরস্তরে পানযোগ্য পানির সরবরাহ ছিল। বড় সাইজের মগে করে প্রথম পানি বাবাজানকে পান করতে দেওয়া হলে তিনি বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে অর্ধেক পানি পান করে বাকি অর্ধেক 'আল্লাহু আকবর' বলে পুনঃ নলকূপে ঢেলে দিতে বলেন। সেজ ভাই শাহ্‌ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক (মা.জি.আ.) সাহেবকে বাগে হোসাইনী হতে যিয়ারত করে বের হতে দেখে তাঁর কাছে এক গ্লাস পানি পাঠালে তিনিও বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে পান করেন। অতঃপর

সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিলে উপস্থিত সকলে পান করেন। এই বলে সতর্ক করেন যে, "এই পবিত্র পানি শুধুমাত্র খাওয়া ও চা দোকানে চা ভাত তরকারিতে ব্যবহার চলবে। পায়খানা প্রশ্রাবখানায় ব্যবহার করা চলবে না। করলে আল্লাহ্‌র পানি আল্লাহ্‌ উঠিয়ে নেবেন"। নির্দেশিত হয়ে ভক্ত আজিম নগর নিবাসী মৌলবী আবদুল কুদ্দুস ক'দিন পর শহর থেকে একখানা সতর্কবাণী সংবলিত সাইনবোর্ড তৈরি করে এনে টিউবওয়েলের পাশে লাগিয়ে দেয়। মসজিদ পুকুরের উত্তর পাড়ে রাস্তার দু'পাশের দোকানদারগণের কেউ কেউ এই সতবর্কবাণী না মেনে পায়খানা প্রশ্রাবখানায় ব্যবহার করে। ফলে ক'বছর পর নলকূপে পানি উঠা বন্ধ হয়ে যায়। কমিটির পক্ষ হতে বারংবার অনুরোধ করা হলেও বাবাজান নলকূপ মেরামত কিংবা পানির ব্যবস্থা করতে রাজি না হয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র পানি অনাচার করাতে আল্লাহ্‌ উঠিয়ে নিয়েছেন, আমি কী করবো?

এক মাসের মধ্যে ১০ মাঘ উরস শরিফে বাবাজানের খেদমতে হাজির হলে বলেন, মামু সাহেব, নলকূপ চেপে দেখুন পানি আছে কিনা। গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। অফিসে খোঁজ নিয়ে পাহারাদার খাদেম তৌহিদ ফকিরকে তালা খুলে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর কল চেপে গ্লাস নিয়ে সঙ্গীরাসহ প্রাণভরে সে পবিত্র পানি পান করি। খোঁজ নিয়ে জানলাম। দু'দিন পূর্বে বাবাজান এক গ্লাস পানির অর্ধেক পান করে বাকি অর্ধেক মন্‌জিলের জেনারেটর চালক ইব্রাহিমের হাতে দিয়ে শুষ্ক নলকূপে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলে ঢেলে দিয়ে কল চাপতে নির্দেশ দিলে আবার পানি উঠতে থাকে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, সব পানিই তো আল্লাহ্‌র। সেটা ঠিক; কিন্তু কোন নবি ও অলির নির্দেশিত বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোরআন ও হাদিস অনুমোদিত। যেমন কাবাঘর, হাজ্বরে আসওয়াদ, উস্‌তুনে হান্নানা, জমজমের পানি ইত্যাদি। শাহানশাহ্‌ বাবাজান নির্দেশিত এই পানিরও নিশ্চয় বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যা সকলের জন্য কল্যাণকর। ওফাতের পর থেকে সেই নলকূপের 'আল্লার পানি' রওজা শরিফের খাস তাবার্‌রুক। এই পবিত্র পানি ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ মানত নিয়ত আর্জি আবেদনের ফলপ্রসূ উসিলা বা মাধ্যম।

বিবর্তিত জীবনের মানচিত্র

জীবন যেহেতু শরীর নির্ভর, তাই মহাপুরুষদের শরীরের বিবরণী জানাও গুরুত্বপূর্ণ। শৈশব হতে তাঁর শরীর ছিল হালকা পাতলা ও নাতিদীর্ঘ, গায়ের রং উদয়কালীন পূর্ণিমা চাঁদের মত তামাটে। মাথা গোলাকার, চুল ঘনকাল নরম, কপাল প্রশস্ত, দীর্ঘ টিকালো নাক, চোখ ও কান স্বাভাবিক আকৃতি, দু'চোখের ভ্রূ আলাদা, মাঝারি সাইজের সাদা দাঁত, মুখমণ্ডল লম্বাটে, দাড়ি পাতলা। আজানু লম্বিত বাহু, নরম হাতে সুস্পষ্ট রেখা, সরু কলমি আঙ্গুল, চওড়া ঘাড় ও বুক। কেশহীন বুকের মধ্যখানে গর্ত, মেদহীন পেট। মসৃণ পিঠ, শিড়দাঁড়া বরাবর একটু ভাঁজ, সমতল কোমরের গ্রন্থি সন্ধিতে টোল। নাতিপুরুষ্ট নিতম্ব ও দুই উরু। লম্বা-পাতলা পায়ের পাতা, আঙ্গুল সরু। শরীরের উপরাংশের চেয়ে কোমর হতে নীচের অংশ দীর্ঘ। খাওয়া ঘুম পরিমিত ও গোসল ছিল নিয়মিত।

কলেজ জীবন পর্যন্ত কাপড় চোপড় চালচলন ছিল শৌখিন। তিনি প্যান্ট শার্ট জুতা স্যান্ডেল কখনো কখনো স্যুট-হ্যাট, ধুতি-পাঞ্জাবীও পরিধান করতেন। তিনি ছিলেন বন্ধু বৎসল, আমুদে ও খেলাধুলা প্রিয়। স্বভাব শান্ত, আচরণ বিনয়ী, কণ্ঠস্বর মধুর এবং কথাবার্তা ছিল যুক্তিপূর্ণ। ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল স্বভাবজাত।

আধ্যাত্মিক সাধনার সূচনাকাল হতে দ্রুত বদলে যায় তাঁর জীবনচিত্র। খাওয়া ঘুম, গোসল সবকিছু অনিয়মিত হয়ে যায়। মাসাধিককালের গোসলহীন শরীরে কোন দুর্গন্ধ নয় বরং এক প্রকার স্নিগ্ধ সুগন্ধ ছিল। মেজাজ কখনো জজ্‌বা-গরম হাল, কখনো আনমনা-আত্মভোলা। আবার কখনো ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন এমন সব কাজে সাধারণ মানুষের চোখে যেগুলোর কোন গুরুত্বই ছিল না। নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও দুঃখী মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। অত্যাচারী মানুষ দেখলে বজ্রের মত কঠোর আচরণ করতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর আতিথেয়তা ছিল অতুলনীয়। মনে হতো তিনি অত্যধিক ধূমপায়ী ছিলেন। সিগারেটে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া টেনে তা মুখের অগ্রভাগ থেকে বাইরে ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দিতেন। কোন সময় দেখা যেত সিগারেট মুখে বার বার ম্যাচ জ্বালালেন কিন্তু সিগারেট জ্বল্‌লো না। যে ব্র্যান্ডের সিগারেট পান করতেন, তাঁর ওফাতের সাথেই সে ব্র্যান্ড উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ঘুরে বেড়াতেন দেশের শহর

গ্রামের নানাস্থানে। তাঁর হাঁটা স্বাভাবিক মনে হলেও সঙ্গীদের দস্তুরমত দৌড়াতে হত।

রিয়াজত পরবর্তীকালে তিনি প্রায় লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরিধান করতেন। কোন কোন সময় উদোম গায়ে অথবা শুধু গেঞ্জি পরে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। ১৮ দিন পর বন্ধ মুখ খুলতে যে দুটি দাঁত মরে গিয়েছিল বাকি সময় সেগুলো কালোই থেকে যায়। ওফাতের পূর্বে তাঁর ক'টি দাঁত পড়ে যায়। কখনো তাঁর গুরুতর কোন রোগ হতে দেখি নি। শেষ দিকে চুল দাড়ি অধিকাংশ পেকে যায়। ১৯৮০ সালের দিকে পিতার ওফাতের পূর্বে তাঁর শরীরে কাঠামোগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। পীরে ত্বরিকত পিতার কাছ হতে পাওয়া এত্তেহাদী ফয়েজ (সার্বিক অনুগ্রহ) এর ফলে তাঁর শরীরের কোমর হতে উপরাংশ একটু বেঁটে, মুখে ও পিঠে জরুল জাতীয় দাগগুলো ভেসে উঠে, যে রকম তাঁর পিতা ও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ছিল। এ সময় শরীরও একটুখানি স্থুল হয়ে পড়ে। জগত বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইসলামের গৌরব হযরত ইমাম গাজ্জালী এক দরবেশকে উপদেশ দিতে বললেন, "আমি একটানা চল্লিশ বৎসর আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে রত ছিলাম। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে আমার মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর কিংবা কোন উন্নতি না দেখে হতাশ হয়ে পড়ি। অতঃপর কম খাওয়া, কম কথা বলা, কম নিদ্রা ও লোকের সাথে কম মেলামেশার ব্রত গ্রহণ করি। এর পর আমি আকাশের দিকে তাকালে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত দেখতে পাই। কোন কিছুই আমার দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আবার যখন মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন সাত তল জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আমি দেখতে পাই"। শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী সাধনাকাল হতে চারটি বিষয়কে চরিত্রগত করে নিয়েছিলেন– **(১)** অল্প আহার **(২)** স্বল্প কথা **(৩)** রাত্রি জাগরণ এবং **(৪)** লোকালয়ে বাস করেও নির্জনতা অবলম্বন। ফলে তাঁর দৃষ্টিতেও সমগ্র সৃষ্টি জগত সমুদ্ভাসিত হওয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষ্যণীয়।

একবার সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌কে তিনি নিজেই বলেন "মামু সাহেব, ছয়মাসে একবার ঘর হতে বারান্দায় বের হই; কাজের জন্য একেবারে সময় পাই না"। ওফাতের বছর খানেক পূর্বে নিত্য সফরসঙ্গী মৌলবী কুদ্দুস বাবাজানকে তাঁর বয়স কত জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'পাঁচ বছর'। মৌলবী সাহেব হিসাব কষে বয়স ষাট বছর বলে তাঁর সম্মতি আশা করলেও তিনি চুপ থাকেন। জীবন

সায়াহ্নে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফাকে (র.) বয়স কত জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'দুই বছর'। উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হলে বলেন, 'আউলাদে রাসূল (দ.) হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহ্-এর সোহবতে ত্বরিকার সবক গ্রহণ করে সত্যিকার আমলের দুই বছরই আমার মৌলিক বয়স'। অনুরূপভাবে গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) তাঁর বয়স পাঁচ বছর বলে মন্তব্য করেছিলেন।

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসের প্রচণ্ড গরমে কয়েকটা কম্বল মুড়ে শুয়ে থাকতেন আবার পৌষ-মাঘের কন্‌কনে শীতে আপন হুজরা শরিফে কয়েকটা পাখা চালিয়ে বসে থাকতেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বিশ্বঅলি, আল্লাহ্‌র সমগ্র জাহানে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ, আমরা যদিও গরমের মধ্যে কম্বল মুড়ে বা শীতের সময় পাখা ছেড়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু এর হাকিকত হল তিনি যখন গরমে কম্বল মুড়ে শুয়েছিলেন তখন তিনি এমন কোন জায়গায় অবস্থান করেছিলেন বা এমন কোন দেশে অবস্থান করছিলেন যেখানে তখন ছিল শীতকাল। আর তিনি যখন শীতে পাখা ছেড়ে বসেছিলেন তখন এমন কোন জায়গায় অবস্থান করছিলেন যেখানে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। এখানে একটা ঘটনা প্রণিধানযোগ্য– একদা রাসূল পাক (দ.) বাইরে থেকে নিজ ঘরে প্রবেশ করলে বিবি হযরত আয়েশা (রাদি.) নবিজির শরীর, দাড়ি ও টুপি মোবারকে পানি দেখে জিজ্ঞেস করেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আপনার শরীর মোবারকে পানি কেন? রাসূল (দ.) প্রতিউত্তরে বলেন– বৃষ্টির পানি। বিবি আয়েশা (রাদি.) বলেন, আরব দেশে বেশ কিছুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ আপনি বৃষ্টিতে ভিজে আসলেন। রাসূল (দ.) বলেন, "হে আয়েশা আমি শুধু আরবের নবি নই, আল্লাহ্ যতটুকুর জন্য রাব্বুল আলামীন আমি ততটুকুর জন্য রহমতুল্লিল আলামিন। আমি এখন এমন এক দেশ থেকে আসছি যেখানে এখন বৃষ্টি হচ্ছে"। আর শাহানশাহ্ বাবাজানের কালাম, "রহমতুল্লিল আলামিন রাসূলের রহমতের সীমা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মক্ষমতা"। কবি দার্শনিক ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলেন,

"এমন পাখির 'হাল' ও 'মকান' কিছুই কি এরা (মানুষ) জানে
উড়ে চলে যে নিঃসীম আকাশে প্রতিপলে প্রতিক্ষণে!"

প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী অলি

পৃথিবীর শক্তির মূল আধার হল সূর্য। সূর্য প্রতিদিন সরবরাহ করে থাকে গড়ে প্রায় ১২ লক্ষ ৬ হাজার বিলিয়ন অশ্বশক্তি। অথচ এই বিপুল পরিমাণ অশ্বশক্তির এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র একভাগ এসে পৌঁছায় আমাদের পৃথিবীতে। সূর্য প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে, তা কল্পনাতীত। আমাদের বিশাল এই পৃথিবীর সমস্ত উপরিভাগে যদি এক হাজার কিলোমিটার পুরু বরফ জমে থাকে, তবে সেই বরফ, এক ঘন্টার চাইতেও কম সময়ে গলে যাবে প্রচণ্ড সৌরতাপে। কিন্তু সূর্যের এই প্রচণ্ড তাপশক্তির দু'শো কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে আসতে পারে। পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৩ হাজার মাইল।

পবিত্র কোরআন ও অন্য ধর্মগ্রন্থসমূহে সাত স্তরবিশিষ্ট সৃষ্ট জগতের বর্ণনা রয়েছে। আবার ইসলামী শাস্ত্র বিশারদদের বর্ণনায় আঠার হাজার মতান্তরে চল্লিশ হাজার অথবা আশি হাজার সৃষ্ট জগত বা আলমের সংখ্যা উল্লেখ দেখা যায়। যথা– আলমে দুনিয়া (পৃথিবী), আলমে নাসুত (দৃশ্যমান জগত), আলমে নবাতাত (উদ্ভিদ জগত), আলমে জামাদাত (জড় পদার্থ), আলমে হাশরাত (জীব জগত), আলমে বরজক (মধ্য জগত), আলমে আখেরাত (পরজগত), আলমে মালকুত (ফেরেশ্তা জগত), আলমে জবরুত (মহাত্ম্য জগত), আলমে লাহুত (ভগবৎ জাগত), আলমে আরওয়া (আত্মা জগত), আলমে হাহুত (তন্ময় জগত) ইত্যাদি। বহু গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় অতি ছোট হলেও আমাদের পৃথিবীও কত বিরাট বিশাল। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ঘণত্ব মাপা সম্ভব হলেও এখনও জানা সম্ভব হয় নি কত লক্ষ কোটি স্থলচর, জলচর, আকাশ চর, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ এখানে রয়েছে। কত প্রকার তাদের জাতি প্রজাতি, কেমন স্বভাব চরিত্র, কত প্রকার গাছ লতা পাতা গুল্ম, ফুল ফল ফসল এ মাটিতে জন্মায়। তাদের কত শ্রেণি রকম ভেদ প্রভেদ প্রকৃতি। এ মাটির নীচে কত সম্পদ-তেল, তামা, দস্তা, সীসা, স্বর্ণ, হীরা, কয়লা, বারুদ, পাথর, প্রচণ্ড শক্তির তেজস্ক্রিয় বালু তার কতটুকুই বা জানা সম্ভব হয়েছে। পুকুর নদী, খাল-বিল, সাগর, মহাসাগরে কত প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, হাঙ্গর, তিমি, অক্টোপাস, ডলফিন ইত্যাদি রয়েছে জীব বিজ্ঞানীরা সে তালিকাও পূর্ণ করতে পারে নি। যে পানি দিয়ে আগুন নেভানো

হয় সে পানিতেই যে আগুন (বিদ্যুৎ) আছে তা জানতে লেগেছে কত হাজার বছর। সূর্যের আলো সোলারে বন্দী করে বাড়ি ঘর কলকারখানার বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের চিন্তাও অতি সাম্প্রতিক। বাতাস বা শূন্য হতে বিদ্যুৎ আবিষ্কার এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। জলস্থল অন্তরীক্ষ অথবা শূন্যে মহাশূন্যে আরও কত মহামূল্যবান সম্পদ সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তা কল্পনারও অতীত। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আধুনিক বিজ্ঞান চাঁদের বুকে মানুষ পাঠাতে সক্ষম হলেও চাঁদকে এখনো মানুষের আরেকটি আবাস-বাড়ি করে গড়ে তুলতে পারে নি। আলপিন হতে বিমান রকেট অনেক কিছু তৈরি করেছে, কিন্তু কাছের গ্রহ মঙ্গলে মাত্র 'খেয়াযান' প্রেরণ সম্ভব হলেও মানুষের পদচিহ্ন পড়তে এখনো বহু দেরী।

লক্ষ কোটি নক্ষত্র এখনো বিজ্ঞান তথা মানুষের নাগালের অনেক দূরে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ আবিষ্কার করে মানুষের গড় আয়ু বাড়াতে পারলেও জড়া মৃত্যুর কাছে এখনো অসহায় পরাজিত। তবু বিজয়ী মানুষের সন্ধানী কাফেলা ছুটে চলেছে বিরতিহীনভাবে। এত বিচিত্র এত শ্রেণি প্রকারের বিশাল কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র একটি মাত্র জগত আমাদের এই পৃথিবীর। আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি জগতের কর্মপ্রবাহ কত বিশালতর হতে পারে তা মানব জাতির ধারণারও বাইরে। আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত জ্ঞান গোচরভাবে সৃষ্টির প্রসার বা ব্যাপ্তি কতদূর? অর্থাৎ এ তুঙ্গ প্রসারতায় মানুষের জ্ঞান কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে? এ প্রশ্নের সন্ধানও বৈজ্ঞানিকেরা করেছে। তারা সম্প্রতি চারশ' কোটি আলোক বর্ষ দূরের কেয়াশারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এ আবিষ্কারের পরেও তারা বলছে যে, এখানেই শেষ নয়। শেষ অশেষের মধ্যেই আছে। এ সৃষ্টি জগতের বস্তু বিস্তৃতির শেষ যে কোথায় তা তারাও যেমন জানে না, আমরাও তেমনি জানি না। কেউই জানে না। হয়তো এটা চিরকাল মানব জাতির অজানাই থেকে যাবে। এভাবেই হয়তো কথাটি বলা যেতে পারে যে, মানুষের জানার যেখানে শেষ হবে, হয়তো সৃষ্টি জগতের শেষ তার চেয়েও আরো অনেক অনেক দূরেই থেকে যাবে।

মাথার উপরে নীল যে সামিয়ানাকে আমরা আকাশ বলি আসলে তা বিশালতম এক মহাশূন্য। সৌর জগতকে লক্ষ কোটি তারকার নানা গ্যালাক্সী-ছায়াপথ-নীহারিকা ইত্যাদি সবকিছু অনন্ত অসীম মহাশূন্যে পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণে সৃজিত গতিপথ ও অবস্থানে বিরতীহীনভাবে তীব্র গতিতে সাঁতরে চলেছে কোন

এক নির্দিষ্ট মন্‌জিল বা গন্তব্যে। আল্লাহ্‌র যতকাল ইচ্ছা এ সৃষ্টিপ্রবাহ এভাবে চলতেই থাকবে। এখনো এই দ্রুত বিকাশমান মহাশূন্যের কূল-কিনারার হদিস মিলে নি, আধুনিক বিজ্ঞান হন্যে হয়ে খুঁজছে। এই মহাশূন্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে এক মহাশক্তি-আল্লাহ্‌র অপার রহমত। পবিত্র কোরআনের পরিভাষায়, "ওয়া'মা আরসাল্‌না'কা ইল্লা রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন"–'নিশ্চয়; আপনিই সকল জগতের রহমত'। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই এই পবিত্র শক্তি সত্ত্বার মানবিক রূপ; মানব জাতির জন্য বিধানদাতা, সতর্ককারী, সাক্ষী ও মুক্তিদাতা। সৃজন প্রক্রিয়ার শুরুতে পরম করুণাময় মহামহিম স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রথম প্রচণ্ড জজ্‌বা'ই বিজ্ঞানীদের 'বিগব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণ। আল্লাহ্‌র জাতি নূরের এই প্রথম বিকাশের নাম নূরে আহমদী বা মোহাম্মদী। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট হাজার হাজার জগত ও সে সব জগতের বস্তু-প্রাণীসহ সবকিছু অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত-সৃজন পালন ও বিবর্তনের সীমাহীন পরিধি জুড়ে যে বিশাল ও সূক্ষ্ম কার্যক্রম নিরবধি চলছে তার প্রাণশক্তি হচ্ছেন নূরে মোহাম্মদী (দ.) তথা রাহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন– জগত সমূহের করুণাধারা। সমস্ত নবিরা তাঁর পক্ষেই খোদায়ী প্রতিনিধি। নবি যুগের পর আল্লাহ্‌র অলিরা এই মহান প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত। জামান বা যুগ সংস্কারক বিশ্বঅলি, খলিফাতুল্লাহ্ আলাল্ আরদ্ব 'পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' (আল-কোরআন)।

পবিত্র নবি বংশে জন্মগ্রহণকারী এই মহান ব্যক্তি একনিষ্ঠ ইবাদত রিয়াযতে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধিত্ব পেয়ে জীবনের চল্লিশ বছর বয়সে দাবী করেন–

"রাহমাতুল্লিল আ'লামীন রাসূলের রহমতের সীমা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মক্ষমতা"।

"আকাশের উপরে বসে আমি আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলি এবং নীচের দিকে জগতের কাজ কর্ম পরিদর্শন করি"।

"আমার দরবার আন্তর্জাতিক প্রশাসন অফিস, যেখান থেকে এই বিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত"।

যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এ যুগের মানুষ কোন কিছুই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। উপরের বাণীগুলো তাই অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। সোনা খাঁটি কিনা কষ্টিপাথরে ঘষে দেখতে হয়। আয়না পরিষ্কার না হলে

সে আয়নায় ছবি সঠিকভাবে দেখা যায় না। তদ্রূপ এক অলি-উল্লাহ্ই অন্য অলি সম্পর্কে ঠিক বেঠিক বলতে পারেন। তাই আমরা এই অলির যথার্থ পরিচয়ের জন্য সমসাময়িক আরেক অলির মন্তব্য মূল্যায়ন তুলে ধরলাম। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বাবুনগর আজিজুল উলুম (ওহাবী) মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ মূসা সাহেবের বড় ছেলে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মাইজভাণ্ডারী (র.) কুত্বুল আকতাব হযরত মাওলানা গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর কৃপাদৃষ্টিতে তাঁর মত কথাবার্তা বন্ধ করে জীবনের সত্তর বছর বয়সেও শ্রেষ্ঠ রাসূল প্রেমিক হযরত ওয়ায়েজ করণী (রা.)-এর মত গলায় একটা গাঁঠুরী নিয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। আল্লাহ্র গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী এই অলি উল্লাহ্ বহুবার বলেছেন, "বংশগত পবিত্রতা ও অসাধারণ ইবাদত রিয়াযতে আমার মামু সাহেব হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী আল্লাহ্র এমন নৈকট্য লাভ করেছেন যেখানে আগামী এক হাজার বছরে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অলি"।

আল্লাহ্র দুটি শ্রেষ্ঠ গুণ সৃষ্টি পূর্বের মগ্নচৈতন্য (মগলুবুল হাল) স্বভাব এবং সৃষ্টি শুরুর প্রচণ্ড জজ্বা (দীপ্ততা) এই মহান অলি উল্লাহ্র চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল; যেহেতু অলিরা 'আয়নায়ে বারী' অর্থাৎ আল্লাহ্ দেখার আয়না বিশেষ। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে জীবনকালে দেখার দূর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী [যিনি ২০০২ সালেও জীবিত, বয়স ১৪৪ বছর] চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া উপজেলার পদুয়া নিবাসী প্রবীণ আলেম ও অধ্যাত্মজ্ঞানী মাওলানা সামশুদ্দিন আহমদ চাঁটগামী প্রকাশ বুড়া মৌলবী সাহেব এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী এমন এক উচ্চ মর্যাদার অলি উল্লাহ্, যাঁর ইচ্ছার উপর যুগের অন্য কামেল অলিদের ভালমন্দ নির্ভরশীল। তাঁর বেলায়তি দপ্তরের এমন ক্ষমতা যে, যে কোন চোরকে তিনি মুহূর্তে আবদাল বানাতে পারেন"।

উল্লেখ্য যে, তিনি বেতাগী দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা পীরে কামেল হাফেজ মাওলানা বজলুর রহমান (র.) সাহেবের বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা। সুফি মতবাদী গ্রন্থ মসনবি শরিফে আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী বলেন– "ঐ কামেল ব্যক্তির নিকট প্রতিদিন শত শত এল্হাম (দৈববানী) ও শত শত ফেরেশ্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসতে থাকে। যদি তিনি একবার হে আল্লাহ্ বলে ডাকেন আল্লাহ্ ষাট বার 'লাব্বায়েকা' বলে সাড়া দেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর এক 'মিরাজ' ভ্রমণ হয়ে

থাকে। তাঁর মাথায় এক বিশেষ তাজ পরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর দেহ এই পৃথিবীতে, রূহ্ 'আরশ কুরসী' উর্ধ্বে 'লা মকানে' থাকে। যা সালেক অলিদের ধারণারও বহু উর্ধ্বে। জীবিতকালে লক্ষ লক্ষ লোক শাহানশাহ্র এই দূর্লভ চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ্র গুণধর অলিদের দেখাও এক মহা সৌভাগ্য-ইবাদত। "ইন্না জিকিরাস্ সালেহীনা তাতাজ্জানূর রহ্মতি – অর্থ– পূণ্যবানদের স্মরণকালে আল্লাহ্র রহ্মত বর্ষিত হয়"। –আল্ হাদিস।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর জীবনকালে ১৯৮৭ সালে জীবনী গ্রন্থের অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে একটি মহল বিরোধিতার উদ্যোগ নেয়। তারই প্রামাণ্য প্রতিক্রিয়া নীচে উদ্ধৃত চিঠিখানা:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
২৩-০১-৯২ইং
শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদক
মাইজভাণ্ডারী সংসদ
উপজেলা ফটিকছড়ি
চট্টগ্রাম।
আস্সালামু আলাইকুম।
আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের অপার মহিমায় ভালই আছেন, আশা করি। আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী একজন শিক্ষক এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একজন নগণ্য ভক্ত। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ কেবলার (ক.) "জীবনী" প্রসঙ্গে জনৈক ভক্তের অনুরোধে আমি একটা সমালোচনা লিখতে বসেছিলাম। সমালোচনার বিষয় ছিল "জীবনি বিকৃতি কেন"। লিখতে গিয়ে হযরত নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্ ও শ্রদ্ধেয় জামাল আহমদ সিকদার (সাধারণ সম্পাদক) এর সমালোচনাই বারংবার আসছিল। অবশেষে লিখা চূড়ান্ত হলে রাত প্রায় দু'টার দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর–
আমি স্বপ্নে এক হুঁশিয়ারী সংকেত পেলাম। আমি মাইজভাণ্ডার শরিফে। উচ্চস্বরে আমাকে বলা হচ্ছে "ওহে, খবরদার! এটা এবং ওটা আমার মানুষ"। এটা বলার সময় মাইজভাণ্ডার শরিফের দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং ওটা বলার সময় উত্তর-পশ্চিম

দিকে আমার ধারণা মতো হাত উঁচিয়ে যথাক্রমে বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ এবং সিকদার (সাধারণ সম্পাদক)-এর বাড়ির দিকে দেখিয়ে দেয়া হয়।

পরদিন সকালে আমি উক্ত লিখা বাক্সবন্দি করলাম। কয়েকদিন পর অনুরোধকারী ভক্ত ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বপ্নের ব্যাপারটা খুলে বলা হলে তিনিও আমার সাথে একমত হয়ে উক্ত সমালোচনা পত্রিকায় না পাঠাতে বলেন। উল্লেখ্য, উক্ত স্বপ্নের পর থেকে আমার বদ্ধমূল ভুল ধারণাটুকু দূরীভূত হয় এবং শ্রদ্ধেয় নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ (র.) ও শ্রদ্ধেয় জামাল আহমদ সিকদার সম্পর্কেও পরিচ্ছন্ন আস্থা সৃষ্টি হয়। নিবেদন–

আপনারই বিশ্বস্ত – অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম দস্তগীর, ইংরেজি বিভাগ, পশ্চিম পটিয়া এ. জে. চৌধুরী কলেজ (পূর্ণকালীন) ও ইংরেজি বিভাগ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া (খণ্ডকালীন), ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

বাসাঃ মুজিব-উদ-দৌলা ম্যানসন, চতুর্থ তলা (পশ্চিম), ৭৮, পূর্ব নাসিরাবাদ সোসাইটি লেন, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ক্ষেত্রবিশেষে দুঃস্থের সেবা হজ্বে আকবর

পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার সিরিকোট নিবাসী কাদেরীয়া ত্বরিকার পীর হযরতুল আল্লামা হাফেজ সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ্‌ (র.) হুজুরের মুরিদ হলেও আমাদের পরিবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রতিও পূর্ণ আস্থাবান। তাই জীবনের নানা প্রয়োজনে সেখানে নিত্য যাওয়া আসা। ব্যবসার উপার্জন হতে কিছু কিছু সঞ্চয় করে হজ্বের জন্য টাকা যোগাড় করি। ১৯৮৩ সালে হজ্বে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর নিরাপদ সফরের জন্য মাইজভাণ্ডার শরিফ যিয়ারতে গমন করি। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ও বাগে হোসাইনীতে যিয়ারত করে হক মন্‌জিলে শাহানশাহ্‌ হক ভাণ্ডারীর হুজরায় দয়া প্রার্থী হলে বলেন, 'হজ্বে যেতে চান? আপনার হজ্ব তো কবুল হবে না'! কিছুক্ষণ পর পর তিনবার আর্জি করে একই মন্তব্য শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। শেষবার হজ্বের টাকাগুলো দিয়ে কী করবো জানতে চাইলে বলেন 'আপনার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ বিধবা ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে দুই যুবতী মেয়ে নিয়ে বিব্রতকর জীবন যাপন করছে। ঘরটি মেরামত করে মেয়েগুলোর বিয়ের ব্যবস্থা করুন'। বাড়ি ফিরে বুড়ির খোঁজ নিলাম। হজ্বের জন্য জমানো টাকায় বুড়ির

ঘরটি মেরামত করি এবং চেষ্টা-তদবির করে ভাল ঘরে বরে মেয়ে দুইটির বিয়েও সম্পন্ন করি। অতঃপর দরবারে গিয়ে নির্দেশিত কাজ করেছি বলে জানালে শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী খুশিতে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলেন, "হজ্বের টাকায় দুঃস্থ মানুষের সেবা হজ্বে আকবর (চার হজ্বের সমান পূণ্য)। আপনার তো হজ্বে আকবর কবুল হয়েছে"। আল্লাহ্‌র অলির পবিত্র জবানে শুভ সংবাদ শুনে আবেগে শরীর প্রকম্পিত, ঘর্মাক্ত ও চোখে নামে অঝোর আনন্দধারা। রাহ্‌মানুর রাহিম পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র মহামহিম দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া।

বর্ণক: আবদুল হাকিম সওদাগর, গ্রাম-ফতেয়াবাদ, উপজেলা-হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম।

(১) গাউসিয়া হক মন্‌জিলের মুখপত্র আলোকধারা ডিসেম্বর '০২ সংখ্যায় শাহানশাহ্ বাবাজানের ৩৭টি বাণী প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে হজ্ব সম্পর্কিত বাণীটিও ছিল। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আবুধাবী প্রবাসী ভক্তদের মাধ্যমে ঠিকানাবিহীন এক প্রচারপত্র আমাদের হস্তগত হয়। আনজুমানে তাহাফ্‌ফুজে ঈমান-আক্বীদা কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্রের শিরোনাম 'এসব কুফ্‌রী/গোমরাহীপূর্ণ বাণী কি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর' প্রচারপত্রে বাণীগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় আনাড়ী-আন্দাজী মনগড়া ও বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায়।

(২) মূলধারা সমাজ কল্যাণ সমিতির যাকাত সংগ্রহে ২০০৩ সালে রমজান মাসের প্রথম দিকে ঢাকা গেলাম। পূর্ব পরিচিত ফটিকছড়ি উপজেলার বক্তপুর নিবাসী ওয়ান ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৈয়দ নুরুল আমিন, ফটিকছড়ি ধুরুং নিবাসী দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের ডিএমডি মু. ইমামুল হক ও পটিয়া নিবাসী ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর ডিএমডি গাজী সালাহউদ্দিন সাহেবের সাথে স্ব স্ব অফিসে দেখা করে যাকাত সংগ্রহে সহযোগিতা চাই। আমার সঙ্গী ছিলেন দরবারী ভক্ত ঢাকার নিউ ইস্কাটন রোডের রাসেল মোটরস্ এর স্বত্বাধিকারী সাইফুদ্দিন আহমদ বাবুল। ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাতে তিনজন প্রায় অভিন্ন অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করলেন। বললেন, ঢাকার ধনী ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা তো ঠিকমত যাকাত দেয় না। রোজার শেষ সপ্তাহে পরিবার পরিজন সহ বন্ধুবান্ধবদের সাথে দল বেঁধে সৌদি আরবে ওমরায় চলে যায়। আসবে ঈদের

আগের রাত অথবা ঈদের পরদিন। ওমরা ছাড়া এক এক জন বহুবার হজ্ব করেন। যাকাতের জন্য তাদের নাগাল পাওয়াই মুশকিল।

(৩) ৮-৮-০৩ শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরে ফিরতে সাতকানিয়া নিবাসী নাজিরহাট আহমদিয়া মিল্লিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার এক শিক্ষক আলেমের সাথে বাসে পাশাপাশি সিটে বসলাম। আলাপের মাধ্যমে জানা যায় তিনি ২৫ বার হজ্ব করেছেন এবং জায়গা কিনে পাহাড়তলীতে একটি পাকা দোতলা বাড়িও করেছেন। বললাম, হজ্ব তো জীবনে একবার মাত্র ফরজ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.)ও জীবনে একবারই হজ্ব করেছেন। বললেন, মাদ্‌রাসার জন্য যাকাত সংগ্রহে প্রতি বছর সৌদি আরব যেতে হয়।

হজ্ব জীবনে একবার মাত্র ফরজ; যাকাত প্রতি বছর ফরজ। আবার সালাতে দৈনিক শত ফরজ পালন হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে সালাতের যতবার তাগিদ ঠিক ততবার যাকাতের তাগিদ রয়েছে। টাকার স্তুপ ভেঙ্গে দেওয়া অর্থাৎ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ইসলামের শান্তি ও সাম্য সর্বস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই কোরআনে আল্লাহ্ যাকাতের বারংবার তাগিদ দিয়েছেন। সালাত ও যাকাত রূহানী উরুজ অর্থাৎ আত্মার উন্নতি ঘটায়। ইসলাম মানুষের দায়িত্ব কর্তব্যকে দু'ভাগ করেছে; হক্কুল্লাহ্ – আল্লাহ্ প্রাপ্য; হক্কুল ইবাদ – মানুষের প্রতি মানুষের প্রাপ্য। হজ্‌রে আসওয়াদে চুমো দিলে আল্লাহ্ তাঁর প্রাপ্য ক্ষমা করতে পারেন। মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি জগতে মানুষের লেনদেন প্রাপ্য ঐ পাথরের চুমোয় তো মাফ হবে না। জ্ঞান সম্পদ সুযোগ ক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থাৎ ধর্মীয় নৈতিক জীবন যাপনের দ্বারা হক্কুল ইবাদ আদায় হয়। তদুপরি নির্ধারিত যাকাত, স্বতঃস্ফূর্ত দান খয়রাত এমনকি সালাত বা নামাযের সাথেও হক্কুল ইবাদকে যুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা মাউনে আল্লাহ্ ঐসব নামাযীদের প্রতি দূর্ভোগের ঘোষণা দিয়েছেন, "যারা এতিমদের প্রতি কঠোর, অভাবীদের খাদ্য দেয় না এবং প্রতিবেশীদেরকে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয় না"।

সবশেষে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) একটি কবুল হজ্বের বর্ণনা দেন– হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) কর্তৃক রচিত তাযকেরাতুল আউলিয়া হতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র.)-এর জীবনী দিয়েঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র.) পবিত্র হজ্বব্রত

সমাপ্ত করিয়া খানায়ে-কাবার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এ অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, আসমান হইতে দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করিলেন এবং আমার নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁদের একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার কত লোক হজ্ব করিতে আসিয়াছে? অপর ফেরেশ্‌তারা উত্তর করিলেন, 'ছয় লক্ষ'। প্রশ্নকারী ফেরেশ্‌তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তন্মধ্যে কতজনের হজ্ব কবুল হইয়াছে'? অপর ফেরেশ্‌তা বলিলেন, 'কাহারও হজ্ব এবার কবুল হয় নাই'।

একথা শুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র.)-এর মন খুব অস্থির হইয়া পড়িল এবং মনে মনে বলিলেন, 'আল্লাহ্‌পাকের এত বান্দা পৃথিবীর বিভিন্ন দূরপ্রান্ত হইতে এত কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিয়া বড় বড় মরুপ্রান্তর অতিক্রমপূর্বক হজ্ব করিতে আসিয়াছে, তাহাদের সকলের পরিশ্রম বিফলে গেল!'

অতঃপর সেই ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, 'দামেস্ক শহরে জনৈক মুচি আছে, তাহার নাম আলি ইবনুল মুওয়াফ্‌ফাক। সে যদিও হজ্ব করিতে আসে নাই, কিন্তু একমাত্র তাহার হজ্ব কবুল হইয়াছে। আর এবারের সমুদয় হজ্বযাত্রীকে আল্লাহ্ তায়ালা সেই মুচির ওসীলায় মা'ফ করিয়া দিয়াছেন'।

ইহা শুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র.)-এর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এখন দামেস্কের দিকে যাওয়া উচিত। তখনই তিনি দামেস্ক যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া আলী মুচির গৃহদ্বারে যাইয়া তাহাকে ডাকিলেন। সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'আমার নাম– আলী ইবনুল মুওয়াফ্‌ফাক'।

তিনি বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে'।

সে বলিল, 'বলুন'।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কী কাজ করেন।

সে বলিল, আমি জুতায় তালি লাগাই।

অতঃপর তিনি এই ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। সে বলিল, আপনার নাম কী?

তিনি উত্তর করিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মোবারক।

সে ইহা শুনিয়া এক বিকট চিৎকার করিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল। একটু পরে হুঁশ ফিরিয়া আসিলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র.) তাহাকে বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার আমল সম্বন্ধে অবহিত করুন।

সে বলিল, ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আমার হজ্বের বাসনা অন্তরে বিরাজমান এবং আমি জুতা সিলাই করিয়া সাড়ে তিনশত দেরহাম সঞ্চয় করিয়াছি। এ বৎসর আমি উক্ত সাড়ে তিনশত দেরহাম দ্বারা হজ্ব করিবার এরাদা করিলাম। একদিন আমার গর্ভবতী স্ত্রী আমাকে বলিল, প্রতিবেশীর ঘর হইতে গোশ্‌তের ঘ্রাণ আসিতেছে। সে গৃহে যাইয়া আমার জন্য কিছু গোশ্‌ত চাহিয়া আন। আমার গোশ্‌ত খাওয়ার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি প্রতিবেশীর বাড়িতে যাইয়া গৃহস্বামীর নিকট গোশ্‌ত চাইলে সে বলিল, 'ভাই। এই গোশ্‌ত তোমার জন্য জায়েয হইবে না। আজ সাত দিন পর্যন্ত আমরা বাল-বাচ্চাসহ পরিবারে উপবাস, কিছুই খাইবার জোটে নাই। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় একটি সদ্য মৃত গাধা হইতে কিছু অংশ আনিয়া তাহাই পাকান হইয়াছে'। আমি ইহা শুনিবামাত্র আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত এক প্রকারের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি দৌড়িয়া ঘরে গেলাম এবং সেই সাড়ে তিনশত দেরহাম আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, তুমি এই টাকা তোমার পরিবারের ও বাল-বাচ্চাদের জন্য ব্যয় কর। অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইহাই আমার আসল হজ্ব।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মোবারক ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'স্বপ্নে ফেরেশ্‌তারা আমাকে সত্যিই বলিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌পাক সত্য ও ন্যায় বিচারই করিয়াছেন'। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারকের (র.) এই ঘটনার বাস্তবতা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের সেদিনের বৈঠকে জীবনীকার ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি বখ্‌তপুর সৈয়দ পাড়া নিবাসী সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.), হাটহাজারী ফরহাদাবাদ নিবাসী উকিল ফোরক আহমদের ৪র্থ ছেলে মফিজুল ইসলাম, রাউজান উত্তর গুজরা নিবাসী আমিনুর রহমান কোম্পানী, রাউজান ডাবুয়া নিবাসী মাওলানা মুফ্‌তি অলি উল্লাহ্ সাহেবের একমাত্র ছেলে মাওলানা মোহাম্মদ হাসান, মন্‌জিলের অফিস কর্মকর্তা বাঁশখালী জলদি নিবাসী প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক মাওলানা নুরুল ইসলাম ও রাউজান মোহাম্মদপুর নিবাসী খাদেম আবদুল মালেক শাহ্ প্রমুখ।

আমরা ছোটকালে মুরুব্বীদের মুখে শুনতাম হজ্ব মানে হারিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ জীবনের (অনর্থক) সব কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে জীবনের বাকি সময় কাটিয়ে দেওয়া। এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ

বিপরীত। হজ্ব করেও আকাম-কুকাম নিরবচ্ছিন্ন করে যাচ্ছে। হজ্বের পরও খোদাভীতি ও হক না হক মেনে চলা অর্থাৎ জীবনের মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে না।

উপরে বর্ণিত ১,২,৩ নম্বর ঘটনা ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুসংখ্যক মানুষের মনগড়া সিদ্ধান্ত ও তাতে লেগে থাকার উদাহরণ। দেশে যেভাবে ধনসম্পদ ও ধনীর সংখ্যা বেড়েছে আনুপাতিক হারে যাকাত ও দান খয়রাত করা হলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করতো না। আল্লাহ্ ও রাসূলের যুগল উত্তরাধিকারী যুগশ্রেষ্ঠ অলি উল্লাহ্ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ মানুষের প্রাপ্য আদায়ে গাফেল মুসলমানদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করাই তাঁর হজ্ব সম্পর্কিত ঘটনা ও বাণীর তাৎপর্য বলে জ্ঞানী আলেম ওলামার অভিমত। এটা তাঁর মোজাদ্দেদে জামান – যুগসংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

আরবি 'শারআ' বা 'শরিয়া' শব্দের অর্থ– শুরু, পথ, পক্ষ, পদ্ধতি, জীবনযাত্রা, আইন ইত্যাদি। এই শব্দটি কোরআনে একবার মাত্রই উল্লেখিত। সূরা জাসিয়ার ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে মোহাম্মদ, জীবনযাত্রার জন্য আমি আপনাকে সরল পথ দেখিয়েছি"। আয়ারল্যান্ড, গ্রীণল্যান্ড, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর নিকটস্থ দেশসমূহ যেখানে ছয়মাস রাত ও ছয়মাস দিন সেখানে নামায রোজার শরিয়া বিধান কী হবে? তখন ফার্সি শব্দ নামায বা আরবি সালাত অর্থ রাবেতা বা প্রেমযোগ, আল্লাহ্র সার্বক্ষণিক জিকির বা স্মরণই সেখানে সালাতের মহোত্তম উপায়। ফার্সি রোজার রুজু থাকা এবং আরবি সিয়াম বা সংযমের অর্থ হয় মোরাকাবা বা ধ্যান ধারণা, গবেষণা, রিপুর তাবেদারী বর্জন। যাকাত ও হজ্বের ফরজ বিধান থেকে দরিদ্রদেরকে বাদ রাখা হয়। যেহেতু শুধুমাত্র টাকার বা সম্পদের গুরুত্ব দিয়েই এই দু'টি বিধানকে মূল্যায়ন করা হয়। এই দুই বিষয়কে শুধুমাত্র শরিয়া তথা শুরু দিয়ে মূল্যায়ন না করে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক মূল্যায়নে যাকাতের প্রকৃত অর্থ পবিত্র হওয়া বা পবিত্র করে নেওয়া হয়– তখন আল্লাহ্র জিকির বা গুণগানই প্রযোজ্য।

ব্যাপকতর দিক থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান, সৎসাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি অনুরূপ কাজের প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠাও জাকাতের অন্তর্ভূক্ত হয়। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত জ্ঞানীর যাকাত জ্ঞানচর্চা, শরীরের জাকাত সৎকর্ম।

জিনের দেশে বিচারক

মাইজভাণ্ডার শরিফ পৌঁছে বাবাজানের সাথে দেখা করার জন্য হুজরা শরিফে পশ্চিমের জানালা দিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি বিছানায় লেপখানা খালি পরে আছে। তিনি নেই। পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবাজান কি হুজরায় নাই? লোকটা জবাব দিলেন, এইতো ছিলেন। খাদেম রফিককে দিয়ে খবর নিলাম তিনি অন্দরেও নেই। তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। এরকম ঘটনা আগেও কয়েকবার ঘটাতে আশ্চর্য হলাম না। অপেক্ষায় থাকলাম, কখন তিনি আবার দেখা দেন। কতক্ষণ পর বিছানার লেপের মাঝে তিনি নড়ে উঠলেন। দৃষ্টি দিতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মামা ভাল আছেন'? বললাম আপনার দয়ায় ভালো আছি। বাবাজান এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন? "জীনের দেশে দুই দল জীনের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনির ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্ তায়ালা সে ঘটনার বিচারের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। আমার বিচারে উভয় পক্ষ খুশি হয়। তারা আমাকে বহু মূল্যবান মণি, মুক্তা, হীরা, জহরত উপহার দেয়। উপহারগুলো গ্রহণ না করে বললাম, ঘুষ নেওয়া যেমন বিচারকের জন্য জঘন্য অপরাধ, উপহার নেওয়াও ঘুষেরই নামান্তর। তাই এগুলো আপনারা ফেরত নিয়ে যান। এগুলো গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বিচারকের পদ হতে খারিজ করে দেবেন। তখন আমি সেখান থেকে ফিরলাম" তিনি সবিস্তারে জানালেন।

সূত্রঃ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখা কর্তৃক ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) ও বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর চন্দ্রবার্ষিকী ফাতেহা ২০০৫ উপলক্ষে চট্টগ্রাম মুসলিম হলে আয়োজিত আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও যিকিরে সামা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত চট্টগ্রাম বন্দরের সাবেক পরিচালক (প্রশাসন) জনাব গোলাম রসূল সাহেবের ভাষণ।

চরণ তলে সরল পথ

"আসমান-জমিন সৃষ্টি এবং দিবা-রাত্রির আবর্তন-বিবর্তনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে"। – আল্ কোরআন।

অনুরূপ আমাদের জীবন চলার মাঝখানে "ভবলীলা" – আলো আঁধারের রহস্যময় খেলা। এ খেলায় বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, চলছে-চলবে, আমরণ-

আমৃত্যু। কাজেই, পথ চলতে হবে অতি সাবধান সন্তর্পণে, নতুবা অবক্ষয়ের অনৈতিক আবর্তে হারিয়ে যাবার ভয়; অপরদিকে একটু আলো হলে কী নিশ্চিত পথ চলা, যেন দেখে শুনে পা ফেলা। আর তাই বুঝি আমরা মহান প্রভুর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি "ইহ্দিনাস্সিরাতাল মুস্তাকিম" "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও"। হ্যাঁ, সরল সঠিক পথ আলো ঝলমল জীবন চলার পথ-আল্লাহ্ রাসূলের নৈকট্য লাভের পথ। কিন্তু এ পথে যে প্রচুর বাধা, প্রচুর কাঁটা। কাজেই পথ চলতে হলে আলোর প্রয়োজন–প্রয়োজন সময়মত সঠিক নির্দেশনার। কিন্ত এ আলোর উৎস কী? কোথায় পাবো আমরা এ আলো? এ আলো প্রেমের আলো– এ আলো স্বর্গীয় আলো– এ আলো নূরে মোহাম্মদীর জ্যোতির্ময় আলো। প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কঠোর পরিশ্রম আর সাধনা করে আহরণ করতে হয় সেইসব জ্যোতির্ময় সিদ্ধ পুরুষ থেকে, যাঁরা কামালিয়াতের শীর্ষমার্গে, তাঁরা মানুষকে দেখান মুক্তির শাশ্বত পথ। যাঁদের সঠিক নির্দেশনায় বিপথগামী মানুষ খুঁজে পায় আলোর দিশা।

অলি-উল্লাহ্রা প্রেরণার ভাণ্ডার। স্বীয় আচরণ, কথাবার্তা, আর নিত্য-নৈমিত্তিক অলৌকিক ঘটনার দ্বারা উনারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দিতেও পারেন। তবে এ জন্যে চাই নিয়ম-নিষ্ঠা এবং সৎকর্ম অনুরাগ।

১০ পৌষ, ১৩৯৩ বাংলা। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার পবিত্র খোশরোজ শরিফ। লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার সহকারী কৃষি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সহকারী কৃষি অফিসার মোখলেসুর রহমান, জুনিয়র কৃষি অফিসার সায়েদ আলী সাহেব, সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাহেব এবং আমার মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ দরবার শরিফ যাই। দরবার শরিফ যখন পৌঁছি তখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায়।

দরবার শরিফ-অগণিত ভিড়। বিজলী বাতির বর্ণাঢ্য সমারোহে, সঙ্গীতের সুমধুর লহরী সব মিলিয়ে এ এক মন-মাতানো আয়োজন। খানিকটা দূরে জুতা খুলে নিতে হয়, এটা "আদব কা মোকাম"।

শাহানশাহ্ বাবাকে একনজর দেখার জন্য চেষ্টা চালালাম। না, সম্ভব হল না। সবাই অন্য রওজাসমূহ যিয়ারত করে এলাম, আগে কখনো আসি নি। শাহানশাহ্ বাবার হুজরা শরিফে গেলাম তাঁর পবিত্র দর্শনের জন্য। শাহানশাহ্

বাবাকে এক নজর দেখার সেই কী প্রতিযোগিতা কার আগে কে দেখবে। আমরা তখন পূর্বদিকের জানালা বরাবর বাইরে। আমার বৃদ্ধ বাবাও তৎপর হয়ে উঠলেন শাহানশাহ্কে দেখার জন্য– বার্ধক্যের দোহাই দিয়ে উপস্থিত কয়েকজনকে একটু সুযোগ দেবার মিনতিও জানালেন। কার কথা কে শোনে! আমি কিন্তু তখনও হা-করে দাঁড়িয়ে। অমনি– "কাইউম, তোমার আব্বারে তুমি আলগ্যি দাও" পরম শ্রদ্ধেয় সায়েদ আলী স্যারের কণ্ঠ। যেমনি কথা তেমনি কাজ। কালবিলম্ব না করে দু'পায়ের দু'হাটু জড়িয়ে আব্বাকে সোজা কাঁধের উপর। আব্বাতো খুশীতে আটখানা, উনি এখন সবার উপরে। জানালা দিয়ে চোখ পড়তেই চেয়ে দেখি-শ্বেত-শুভ্র-উজ্জ্বল আলোর স্বর্গীয় জ্যোতি বিকিরণ করে শাহানশাহ্ বাবা হাসছেন–হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছেন। এ এক অপরূপ শোভা। যা কাউকে বলা যায় না– বুঝানো যায়না, শুধু অনুভব করা যায়–অবলোকন করা যায়–আপন চিত্তে, আপন মনে আপন অনুভূতির উষ্ণ আমেজে। আমি শুধু চেয়ে রইলাম চেয়ে থাকলাম.....। হায়রে! বিভোর চিত্ত বুঝি একেই বলে! শাহানশাহ্ বাবা খাটের উপর শুয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বাবাকে নামিয়ে ছেলেটাকে কখন তুলে নিয়েছি কিছুই মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে– শাহানশাহ্ বাবাকে দেখে নয়-দশ বৎসরের অবুঝ ছেলেটিও বলেছিল "ইস্, আব্বা কী সুন্দর'। আর আমার বৃদ্ধ বাবাও উনার হাসি দেখে যারপরনাই মুগ্ধ।

আমার পাপচোখে আমি তাঁর রূপ দেখিনা, আমি দেখেছি আমার জন্মদাতার চোখ দিয়ে। কিন্তু ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কী? কী বুঝাতে চেয়েছেন শাহানশাহ্ বাবা? হ্যাঁ মা-বাবার সেবা করার সুস্পষ্ট নির্দেশ। মা-বাবার চরণতলে যে 'আলগ্যি দাও' পূণ্য পবিত্রতায় ভাস্বর এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞান; যার সুবাদে আমি দেখতে পেয়েছিলাম আমাকে – শাহানশাহ্ বাবার নূরে তজল্লীতে বিকশিত আমার প্রতিচ্ছবিকে। "যে নিজকে চিনেছে সে আল্লাহ্ ও রাসূলকে চিনেছে" যা এ পবিত্র কালামেরই জাগ্রত প্রতিধ্বনি। "আমাকে বুঝতে হলে কোরআন দেখ" – হ্যাঁ বাবা, এ তোমার প্রতিষ্ঠা-লব্ধ জীবনের সোনালী অহংকার – তোমার গৌরব। তুমিও যে কোরআন– সবাক কোরআন– নূরী কোরআন– চলমান কোরআন মানব কল্যাণে নিবেদিত-প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যাঁর কাজ কারবার আল্লাহ্-রাসূলের কথার সাথে হুবহু মিলে যায় তাঁর চরণে কেন মাথা ঠেকানো

যাবে না? কেন তাযিমী সেজদায় লুটিয়ে পড়ব না 'মা-বাবা-শিক্ষক ও মুর্শিদের চরণ তলে। কেন বিশ্বাস করবো না 'মসনবি' শরিফে হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.)'র কথা– "দুই দেখিও না, দুই জানিও না, কামেলকে খোদার জাতে বিলীন মনে কর"। কেন একাত্ম হবো না "যখন তুমি পীরের সত্ত্বাকে গ্রহণ কর, তখন খোদা ও রাসূলের সত্ত্বার অবস্থান তাঁর অস্তিত্বে বিদ্যমান মনে কর"।
বর্ণক: কাইউম চৌধুরী, ব্লক সুপারভাইজার, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিল্লা।

আল্লাহ্ ছাড়া কিছু নাই

আমি তাঁর বাবা অছিয়ে গাউসুল আযম এর মুরিদ। তাই শাহানশাহ্ হুজুরের প্রতিও ভক্তি বিশ্বাস রাখি। তাঁর কষ্টকর রেয়াজতের ঘটনাবলী কাছে থেকে দেখেছি, একদা এক বিষয়ে দোয়া চাইবার জন্য তাঁর নিকট যাওয়ার মনস্থ করি। খবর নিয়ে জানলাম তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফে নেই। চট্টগ্রাম শহরে রিয়াজউদ্দিন বাজার চৈতন্য গলি এক আত্মীয়ের বাসায় আছেন। এক বিকেলে হাজারী গলি আমার জনতা প্রেস থেকে বের হয়ে একখানা রিক্‌শা যোগে রওনা হই। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে না থেকে শহরে কেন আছেন? বোধ হয় শহরে থাকলে ধনী আশেক ভক্তদের নিকট থেকে বেশী নজরানা পাওয়া যায়। এ কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর নিকট পৌঁছি। সালাম দিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলে বলেন, "আমার কল্‌বে আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছু নেই, আমরা নজরানার কাতর নই কাজের প্রয়োজনে নানা স্থানে অবস্থান করি"। অতঃপর হুকুম দিলেন, "সেজদা করো"। তিনি দক্ষিণমুখী, আমি উত্তরমুখী। তাঁর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পূর্ব দিকে সরে পশ্চিমমুখী হয়ে সেজদা দিতে চাইলে, বললেন– "যেখানে আছ, সেখান থেকে দাও। এখন আমিই কেবলা"। অতঃপর আমি সেজদা আরজ পেশ করলাম।

বর্ণক: আবদুল মালেক প্রকাশ মুন্সী, কাদের মুন্সীর বাড়ি, নাজিরহাটের পূর্বপাশে, দৌলতপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

এমনিভাবে নির্দেশ দিয়ে যাদের কাছ থেকে সেজদা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় তাদের নাম যথাক্রমে–

মৌলভী আবদুল কুদ্দুস, আজিমনগর, রোসাংগীরি, আজিমনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সৈয়দ জিয়াউল হক, ফরহাদাবাদ দরবার শরিফ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সৈয়দ ওবায়দুল আকবর, পিতা- সৈয়দ মোসলেম উদ্দিন, সৈয়দ পাড়া, বক্তপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জহুর আহামদ, পিতা-সিদ্দিক আহামদ, গ্রাম-পূর্ব ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

খাদেমা ছেনোয়ারা বেগম (নুরুল হকের মা), গ্রাম- খিরাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সৈয়দা রিজিয়া বেগম, স্বামী-আবদুল গণি সওদাগর (প্রকাশ ব্যাটারী কোম্পানী), ব্যাটারীগলি, দামপাড়া, চট্টগ্রাম এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়জন নিকটতম আত্মীয়। এই তাযিমী সেজদা যায়েয থাকলেও যেখানে সেখানে না বুঝে সেজদা দিতে তাঁকে বহুলোককে নিষেধ করতে দেখা গেছে। বর্তমানের মত অতীতে মাইজভাণ্ডার শরিফে গণহারে সেজদা প্রথা চালু ছিলনা।

উল্লেখ্য যে, কিছুসংখ্যক ঘনিষ্ঠ সাহাবা বিভিন্ন ঘটনায় আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.)কে তাযিমী সেজদা করেছেন বলে হাদিস শরিফে তার বর্ণনা আছে। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) তাঁর প্রিয় সাহাবা হযরত বেলাল (রা.)কে কাবা ঘরের উপরে উঠে যোহরের নামাযের আযান দিতে নির্দেশ দেন। হযরত বেলাল (রা.) কাবা ঘরের উপরে উঠে বললেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্ (দ.), এত দিনতো কাবাকে কেবলা করে আযান দিয়েছি, এখন কোন মুখী হয়ে আযান দিব'? রাসূলাল্লাহ্ (দ.) বললেন, "এখন কেবলা আমি, আমার দিকে মুখ করে আযান দাও"। নির্দেশ দিয়ে তিনি সাফা পাহাড়ের উপরে গিয়ে বসলেন। অতঃপর আশেকে রাসূল (দ.) হযরত বেলাল (রা.) আযান দিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দ.) কাবা ঘরের চেয়েও তাঁর আশেককে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা দান করেন।

হাদিস শরিফে আছে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন কাবা শরিফের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমার বিশাল মর্যাদা রয়েছে,

সম্মান রয়েছে। কিন্তু মু'মিন বান্দার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে তোমার চেয়েও বেশি– (তিরমিজি–২০৩২, ইবনে মাজাহ্‌–৩৯৩২, তাবারানী–১০৯৬৬)।

এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রত্যেক নবি ও অলি নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তানো দায়িত্ব যখনি শেষ হয় এক মুহূর্ত দেরী না করে দুনিয়া ত্যাগ করেন। কোন কোন নবি হাজার বছর বেঁচেছিলেন। আবার সংসার বন্ধনহীন হযরত ঈসা (আ.) মাত্র ৩৩ বছর বয়সে এ জগত ত্যাগ করেন। একটি নতুন ধর্ম, একটি নবগঠিত রাষ্ট্র এবং মানুষে মানুষে সমতাভিত্তিক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন হতেই তেষট্টি বছর বয়সে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)ও এই পৃথিবী হতে পর্দা নেন। মুসলমানগণ তো বটে ভিন্নধর্মী বহু মনীষীরাও এই বিদায়কে প্রশান্ত মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। একটা জাগরণ সৃষ্টি করে অথবা সম্পন্ন করে তারা চলে যান। তেমনি শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীও অযুত মানুষের জন্য কল্যাণকর অবদান ও বাণী রেখে বিদায়ের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর জন্ম ঠিকুজীতে উল্লেখ ছিল ষাট বছর বয়সে একটি জীবন সংকট অতিক্রম করলে ৭৭ বছর বয়স পাবেন। ঘনিষ্ঠ ভক্তদের ধারণা ছিল তাঁর উপর অর্পিত খোদায়ী দায়িত্ব সম্পন্ন করতে তিনি আরও বহু বছর থাকবেন। তিনি যে চলে যাবেন স্বপ্ন ও বাস্তবে অজস্র প্রমাণ দেখেও ভক্ত কিংবা আত্মীয়রা আবেগবশত: যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন নাই। ফলে বিদায়ক্ষণে কেউ কেউ অসহায় শিশুর মত কেঁদেছেন।

টিনের ছাউনী দোতলা দু'কক্ষ ঘরটির বারান্দা ও উঠানে জড়ো হচ্ছেন ১০/১৫ জন লোক। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত দাউদ (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) ও আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। একে একে সকলকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী বলেন, 'তাঁদের নিকট চলে যাবার জন্য আমাকে ডাকছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন'। কেউ কিছু বলছেন না, সবাই নীরব। কথাগুলো শুনে পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে কেঁদে বলি, বাবাজান আমাকে কী করলেন? তিনি ঘরটির একটি কক্ষে প্রবেশ করে শয়ন করলেন, আমি উচ্চ স্বরে কাঁদতে থাকি। কিছুক্ষণ পর উঠে এসে আমাকে কী যেন বললেন, কিন্তু আমি কিছুই বুঝি নাই।

ঘুম থেকে যখন জেগে উঠি তখনও দু'চোখে অশ্রুধারা। ১৯৮৪ সালের ১ আগস্ট দেখা এ স্বপ্নের কথা একলা পেয়ে একদা সরাসরি তাঁকে জানালে বলেন– হ্যাঁ, চলে তো যেতেই হবে। কেউ কি দুনিয়াতে চিরদিন থাকে?

এই স্বপ্নের কথা বখ্‌তেয়ার মামার হোটেল টিউলিপের আসরেও বলেছি। তবে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় নি। ক্রমান্বয়ে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত বাবাজানের ওফাতের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছেন বলে শুনেছি।

বর্ণক: চৌধুরী মোহাম্মদ ইয়াসিন বিল্লাহ্, পিতা-চৌধুরী মোহাম্মদ ইলিয়াস, ১৭৫ সিরাজউদ্দৌলা সড়ক, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

৩১-১০-৮৪ বুধবার: ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি ঘাতকের গুলিতে নিহত হন। এই বিয়োগান্তক ঘটনার পর তিনি হুজরার মধ্যের কক্ষের পাকা চত্বরে বিছানা পেতে শুতে আরম্ভ করেন। দরবারে থাকলে ওফাত পর্যন্ত তিনি এই বিছানায় শয়ন করেন। ওফাতের পর হুজরায় দ্বিতীয় (পিতা নির্মিত ১ম কক্ষ) কক্ষে তাঁর শেষ বাসর রচিত।

৫-১১-৮৫ মঙ্গলবার: শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের খাদেম আবুল কাশেমকে নাজিরহাট হতে একটি পাম্প মেশিন এনে হক মন্‌জিলের নিজস্ব ছোট পুকুরটার জল সেচে ফেলতে আদেশ দেন। কাশেম ও রফিক নাজিরহাটে মেশিন না পেয়ে ফিরে আসে। পুকুরের সমস্ত জল সেচতে তিন হাজার টাকা চুক্তিতে কুলাল পাড়ার জানে আলম সওদাগরের মেশিনটা ঠিক করে। তিনি পুকুরের পূর্ব পাড়ে রাত ভর বসে মেশিন চালানো দেখেন। সকাল ১১টা হতে ২টা পর্যন্ত চালানোর পর বাবাজানকে বলে মন্‌জিলের প্রধান কর্মকর্তা সৈয়দ ওবায়দুল আকবর মেশিন বন্ধ করেন। পুকুর থেকে রুই, কাতাল, মৃগেল ও ছোট সব মাছ ধরে নির্দেশমত দরবার এলাকার দোকানদার, কুলাল পাড়া ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

২২-১১-৮৬ শনিবার: চট্টগ্রাম বন্দরের মোটরযান বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আলী নবি চৌধুরী সহকর্মীসহ দরবারে যিয়ারতে আসলে বলেন, "এই পুকুরটা ভরাট করে ঘর তৈরি করতে হবে। এখানে অনেক অনেক লোক আসবে"। তাদেরকে নিজের গাড়িতে করে শহরে পাঠিয়ে দেন।

১৫-৭-৮৭ বুধবারঃ হুজরায় সবচেয়ে বড় যে চেয়ারটা বেশী ব্যবহার করতেন; সেটা উল্টিয়ে একদিন রেখে পুনঃ ঠিক করে আবার বসেন।

২৮-১০-৮৭ বুধবারঃ সকাল ১০টায় হুজরার পূর্ব দিকের বাঁশের বেড়া উঠিয়ে পূর্ব পার্শ্বের পুকুরে ফেলে দিয়ে বাড়ি উদাম করে ফেলেন।

১-১২-৮৭ মঙ্গলবারঃ রাতে জেনারেটর চালক ইব্রাহিমকে নির্দেশ দিয়ে সংলগ্ন ভাণ্ডার শরিফ আহমদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ ও ২০০ ওয়াটের ২টি বাল্ব ফিট করান।

৯-১২-৮৭ বুধবারঃ দুপুর ১টায় ৬ তলা ভবনের চার তলায় নিজের বসার চেয়ারখানা উল্টিয়ে রাখেন।

১-৬-৮৮ বুধবারঃ বাঁশ-ছনে নির্মিত কাচাড়ি ঘরটি জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বাবাজানের অনুমতি নিয়ে পুনঃ নির্মাণের জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয়।

২০-২-৮৮ঃ আজ সকাল বেলা হুজরা শরিফের সামনে যে দুটি ঝাড় বাতি লাগিয়েছিলেন সেগুলো খুলে বড় কাচারিতে পাঠিয়ে দেন।

৬-৬-৮৮ সোমবারঃ আজ তাঁর মা'জানের বার্ষিক ফাতেহা শরিফ। সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুপ টুনু কাওয়ালের নেতৃত্বে রাতে জিকির সামা মাহ্ফিল শুরু হলে ১২টার পরে মধ্যের কক্ষের দরজা খুলে সামনের হুজরায় আসেন। তালা দেওয়া গ্রীলের বাইরে হুজরা শরিফকে সামনে নিয়ে মাহ্ফিল চলছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ও চেয়ারে বসে মাথা নেড়ে মাহ্ফিলের সাথে একাত্ম হন। সেবক যুবকদের মধ্যে ঢাকার কবির, কুলালপাড়ার রফিক, খাদেম রুহুল আমিনের ছেলে শহীদুল্লাহ্ ঢোলক হারমোনিয়াম ও গানের তালে নাচতে নাচতে বারে বারে বাবাজানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। মধ্যের কক্ষে ভক্ত মহিলারা এবং বাইরে বিপুল আশেক ভক্ত মাহ্ফিলে অংশ নেন। মাহ্ফিল শেষে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘক্ষণ মোনাজাত করেন। এইটিই এই ভঙ্গির একমাত্র মোনাজাত। বাবাজানের নির্দেশে ভিতর বাড়ি থেকে আনিয়ে ফজলী আমের টুকরা তাবার্‌রুক দেয়া হয়।

১০-৮-৮৮ বুধবারঃ বাবাজানের নির্দেশে সদ্য নির্মিত বড় কাচারির টিনের চাল ছাদ ঢালাইয়ের জন্য খুলে ফেলা হয়। হুজরা শরিফের পিছনের লোহার গ্রীল খুলে ফেলার নির্দেশে কাজ শুরু।

১৯-৮-৮৮ শুক্রবারঃ ভোরে শহরে গিয়ে একটা বড় পাঙ্গাস মাছ কিনে দরবারে রেখে আবার শহরে যেতে গাড়ি রাখার পাকা গ্যারেজটাও ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন।

১-৯-৮৮ বৃহস্পতিবারঃ ২৭ আশ্বিন অনুষ্ঠেয় বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ শরিফের সাধারণ প্রস্তুতি সভা। এই প্রথম শাহ্‌জাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.)'র দরবারী সভায় উপস্থিত হওয়া। সভায় বিপুল আশেক-ভক্তের উপস্থিতি। রাত ২টার পর হুজরার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে বড় জামাতা জসিম চৌধুরীকে বললেন, মামু ছাহেব, কাল সকালে মিস্ত্রী ডেকে হুজরার সামনে পিছনের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলতে পারবেন কি? মধ্যের দু'কক্ষ দেখিয়ে বলেন, এ দু'টোতে যেন কোন আঘাত না লাগে, ওগুলো আল্লাহ্‌ ঘর।

১০-৯-৮৮ শনিবারঃ গাড়ি রাখার পাকা দেয়াল টিনশেড গ্যারেজটা ভাঙ্গার কাজ শেষ। খাদেম কাশেমকে (পটিয়া) মধ্যের দুই কক্ষ ঠিক রেখে হুজরার বাকি দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলতে বলেন। ভক্ত বিল্লাহ্‌, জেনারেটর মিস্ত্রী ইব্রাহিম, হিন্দু থেকে নতুন মুসলমান আমিনুল ইসলামসহ ৫ জনকে দিয়ে হুজরার সামনের পিছনের বারান্দার দেয়াল ভাঙ্গার কাজ শুরু। গ্রীলগুলো পার্শ্বস্থ ছোট পুকুরের মাঝে নিক্ষেপ। কর্মীদের নাসপাতি, মিষ্টি দুপুরের খানা খাওয়ানো হয়। হুজরা শরিফের সামনে পিছনের দেয়াল কেন ভাঙ্গালেন প্রশ্নের উত্তরে শ্রেণি বন্ধু আবসার উদ্দিন চৌধুরীকে বলেন, 'এখানে শাহী দরবার হবে তাই'। চট্টগ্রাম শহরে প্রায় সকল বিশিষ্ট ভক্তের আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে দেখে আসেন; সঙ্গে ছিলেন ঈদগাহ্‌র সামশুল আলম।

তিনি প্রায় সময় হুজরার লোহার গ্রীলে তালা লাগিয়ে রাখতেন। নিজের জেলখানায় যেন নিজেই বন্দী। অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড়েও যেন প্রিয় প্রভুর স্মরণে বিঘ্ন না হয়। আক্ষেপ করে তিনি প্রায় বলতেন, "মানুষ আমার কাছে আসে টাকার জন্য, চাকুরির জন্য, ব্যবসার উন্নতির জন্য, রোগ থেকে মুক্তি ইত্যাদি দুনিয়াবী লাভের আশায়। ওসব পার্থিব ব্যাপারে কি এত কাছে আসতে হয়? গেটের বাইর হতে বাতি একটা জ্বালিয়ে আমার ঘেরা বেড়াকে বলে গেলেও কাজ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র খোঁজে, হেদায়তের জন্য কেউ আসেনা, তাই তালা বন্ধ করে রাখি যাতে ধান্ধাবাজ কেউ ভিতরে আসতে না পারে"। ঠিক সময়ে তিনি

বুঝতে পারলেন মিলনলগ্ন সন্নিকট, তাই আর তালা নয়, বাঁধা নয়, প্রতিরোধের দেয়ালটাই গুঁড়িয়ে দিলেন। মিলন বাসরে সকল শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষেরা আসুক। আর্জি-আবেদনে আর বাছবিচার নয়, পার্থিব অপার্থিব যেটাই হোক এখন হতে মঞ্জুরী বেহিসাবী– এটাই যেন তাঁর ইচ্ছা। তাই চিরমুক্ত সিংহ দুয়ার। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল এক নজর দেখার জন্য জানাযার আগে ও পরে হুজরা শরিফের চতুর্দিকে যে ভিড় হয়েছিল দেয়াল ভেঙ্গে দেওয়া না হলে ভিড়ের চাপে বহু লোক আহত ও প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

১২-৯-৮৮ সোমবারঃ চট্টগ্রাম বন্দরের অফিসার্স কলোনীর বাসায় ক্যাপ্টেন রমজান আলী সাহেবের বড় ছেলেকে ভিডিও করার সুযোগ দান।

৩০-৯-৮৮ শুক্রবারঃ বৃষ্টি বাদলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বাবাজানের কাছে আসতে দেখে সন্দেহ জাগে বিদায় কি আসন্ন? তাই কাছে যেতে মনস্থ করি। দারোয়ান তৌহিদ ফকিরকে বলে রাখি সামনের হুজরায় আসলে যেন আমাকে ডাকা হয়। রাত ১টায় শয়ন করি। একটু পরে ডাক দেয়। তিনি বড় চেয়ারে বসা। পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণের দেয়াল ভাঙ্গা। আমাকে দেখে কাছে যেতে এবং একটা ইজি চেয়ারে বসতে বললেন। সামনের প্রবেশ দ্বারে ব্যাটারী চালিত একটি পুলিশ রেসিং কার (খেলনা) পেরিয়ে কাছে গিয়ে তাযিমী সেজদা দিয়ে নিচে বসলাম। পশ্চিমের ভাঙ্গা দেয়ালের স্থানেও অনুরূপ আরেকটি গাড়ি, উভয় গাড়িতে লাল বাতি জ্বালানো। নিজ সমস্যার কথা জানালাম – অভয় দিলেন। পর পর নির্দেশে বড় মেজ ছোট সাইজের ১২+১২+১০টি ব্যাটারী তাহের সওদাগরের দোকান হতে এনে দেওয়া। দূরের ও আলোতে ঘরটা আবছা অন্ধকার। রান্নাঘর হতে বাবাজানের জন্য এক কাপ চা আনতে আমাকে দেখে মা'জান দাঁড়িয়ে গেলে পিছনে না দেখেই বললেন, 'কী হবে, সিকদার সাহেব' অর্থাৎ বেগানা কেউ নয়। রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) বাণী– সামনে পিছনে আমি এক বরাবর দেখি। মধ্যের কক্ষের দরজার উপরে টিউব লাইট দুটো ভাঙ্গা, বাতি ঠিক করতে মিস্ত্রী রফিককে ডাকতে বললেন। রাউজান দেওয়ানপুরের আবদুল নূর তাকে ডেকে এনে কাজে লাগালেন। একটা নাস্তার বাটি পুকুরে ফেলে দিলেন। পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে লোক ডাকতে বললে আবদুল নূর জেনারেটর মিস্ত্রী ইব্রাহিমকে ডেকে আনেন। দু'জনের কাজ শেষে বাতি জ্বলে উঠলে উচ্চস্বরে হেসে বলেন, আহা! কী সুন্দর। ভিতর বাড়ি

থেকে ৩টি বড় মিষ্টি আনিয়ে আমার হাতে দিয়ে একা খাওয়ার নির্দেশ ও বিদায়।

১-১০-৮৮ শনিবার: সকাল বেলা ৫১৫২ কারযোগে মাইজভাণ্ডার শরিফ হতে চট্টগ্রাম শহরে পাঠানটুলী আকমল খানের বাসায় যাত্রাবিরতি; বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ দেখা করে হাদিয়া কিনতে বাজারে যেতে অনুমতি প্রার্থনায় বাবাজানের মন্তব্য– 'এবারে ক'দিন ধরে বহু গরু মহিষ জবেহ করতে হবে। অনেক লোক সমাগম হবে'।

৬-১০-৮৮ বৃহস্পতিবার: আকমল খানের বাড়ি হতে সকাল ১১টার দিকে নিজের টয়োটা গাড়ি করে বাইরে যাত্রা। লুঙ্গি পরা শরীর উদোম। গাড়িচালক কাজী নাজিম উদ্দিন।

৮-১০-৮৮ শনিবার: রাঙ্গামাটি শহরে স্বর্ণটিলায় তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর ছোট বোনের বাসায় অবস্থান। গভীর রাতে ৪০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ। মৌলবী কুদ্দুস, রফিক ও নাজিমের কান্নাকাটি, শ্বাস প্রশ্বাস আবার সচল। ডাক্তারের পরামর্শে অনতিবিলম্বে হাসপাতাল প্রেরণ। রাতেই মৌলবী কুদ্দুস বন্দরে নবি চৌধুরীকে টেলিফোনে খবর দেন। চৌধুরী টেলিফোনে জসিম চৌধুরীকে বিষয়টি জানান।

৯-১০-৮৮ রবিবার: পরিচালক সোলায়মান চৌধুরীর সহায়তায় দেওয়ানহাট ফায়ার ব্রিগেড হতে এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া, বন্দর হাসপাতালের ডা. কিবরিয়া, ইঞ্জিনিয়ার আলী নবি চৌধুরী, বাবাজানের বড় জামাতা জসিম চৌধুরী, মেজ জামাতা ইঞ্জিনিয়ার কামালুর রহমান এর ভোরে রাঙ্গামাটি গমন, স্বর্ণটিলা হতে পুনঃ চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা। বাদশা হাজীকে পাশে বসিয়ে হজ্বের দোয়া পড়তে বলে একই সঙ্গে নিজেও পড়েন, "আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লা শরিকা লাকা লাব্বায়িক" অর্থ– 'হে আল্লাহ্‌, আমি হাজির, হে অদ্বিতীয় আমি উপস্থিত'। রাঙ্গামাটি কলেজের নিকট পৌঁছে একটি ট্যাক্সিতে হাজী সাহেবকে উঠিয়ে দিয়ে আদরের সাথে বললেন, মামা, আপনার কাজ আছে, আপনি বাসায় চলে যান। ট্যাক্সিওয়ালাকে একটি পাঁচশ টাকার নোট ভাড়া প্রদান, প্রকৃত ভাড়া ৩০ টাকা। অসুখের খবর পেয়ে রাঙ্গামাটির পথে রাউজানের বড় ভান্‌জনীতে বখ্‌তেয়ার শাহ্‌'রও কাফেলায় যোগদান। লালখান বাজারে সকলকে পেপসি-সেভেনআপ পান করানো, শেখ মুজিব রোড জামাল এন্ড সন্স-এর সামনে থামিয়ে জামাল

সিকদারের খোঁজ নেয়া, রমজান আলী সিকদারকে দোয়া করতে বলা, জেল রোডে হযরত আমানত শাহ্ (র.)-এর মাযার এবং পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে গমন, হাসপাতালে ভর্তি করতে চাইলে বিকালে ভর্তির কথা বলে চট্টগ্রাম বন্দর দক্ষিণ অফিসার কলোনীতে ক্যাপ্টেন রমজান আলী সাহেবের বাসায় গমন।

দুপুর ১২টার দিকে বাকলিয়ার তাহের উদ্দিন ও আবদুস শুক্কুর আমার দোকানে এসে খবর দিলেন বাবাজান গুরুতর অসুস্থ, বন্দর এলাকায় আছেন। তাদের সাথে সেখানে পৌঁছলে নির্দেশমত সামনে সোফায় বসলাম ও পরে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট এনে দিলাম। অতঃপর প্রথমে আমাকে পরে অন্যদের খানা পরিবেশন করতে বলে নিজে মাত্র ২/৩ গ্রাস কবুল। প্রায় ৩৫ জন ভক্ত-শিষ্যের সাথে সর্বশেষ ভোজনপর্ব। বার বার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ক'টি লাইন আবৃত্তি–

'যেতে নাহি দিব, 'যেতে নাহি দিব', সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতি
কাঁদছেন প্রাণপণে – 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপ্ত মুখে শিখা নিভেনারে।
"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন যেতে নাহি দিব, হায়!
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়"।

কখনো গুণগুণ করে গাইলেন–
"এই যে দুনিয়া কীসের লাগিয়া
এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই"।

বিকাল সাড়ে তিনটায় আবার গেলেন হযরত শাহ্ আমানতের (র.) মাযারে সেখান থেকে পতেঙ্গা সৈকত। ফিরতে কাস্টমস্ অফিসের দক্ষিণের ব্রীজের উপর গাড়ির চাকা ফুটা, আবারও শাহ্ আমানতের ওখানে যেতে চাওয়া। বন্দরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী জহিরুল হক, পরিচালক প্রশাসন মো. গোলাম রসূল, প্রকৌশলী আলী নবি চৌধুরী ও উপস্থিত ভক্তরা গাড়ি ঠেলে বন্দর হাসপাতালে নেওয়া। তিনি গাড়ি হতে নামতে চান না। ঘনিষ্ঠ

ভক্ত মৌলভী কুদ্দুস, এস.এম. মর্তুজা ও বোয়ালখালী আহ্‌লা দরবার শরিফের আওলাদ নাসের মিঞা দুই বাহু জড়িয়ে হাসপাতালের দোতলায় তোলা। ১নং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে ভর্তি; ২নং কেবিনে তাঁর একমাত্র পুত্র শাহ্‌জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানসহ পরিবারবর্গ থাকার ব্যবস্থা। ছোট ভাই ডাক্তার সৈয়দ দিদারুল হক সাহেব হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার আহমদ কবিরকে এনে পরীক্ষা করতে চাইলে ডাক্তারকে একটি কলা হাতে দিয়ে বলেন, খেয়ে বাসায় চলে যান। চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডা. এস.এম. আবদুল মান্নান সাহেব বলেন, মেশিন এনে ইসিজি করে দেখা গেল হার্টের গ্রাফ্ মাঝে মাঝে ছেঁড়া অর্থাৎ তিনি গুরুতর হার্টের রোগে ভুগছেন; অথচ রোগের কোন চিহ্ন তাঁর মধ্যে নেই। তিনি স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। ৬ ঘন্টা পর পর মরফিন ইনজেকশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তখনই একটা দিলাম। ঘুম আসেনা। ৬ ঘন্টা পরে আর একটা দিলাম। তবু ঘুম নেই। কেবলই বলছেন বাইরে বেড়াতে যাবেন: সফর করা সুন্নত। কার্ডিওলজিস্ট ডা. আহমদ কবির, সহকর্মী ডা. সালাম ও ডা. সাধন বাবুসহ অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, ঘুমের ইনজেকশন অকার্যকর। রাত ১০টার পর বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলে সুবোধ শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়েন।

দেখা-শুনা ও পাহারার দায়িত্ব নেন আবদুল মান্নান চবক, আবদুল মতিন চৌধুরী, আত্মীয় অধ্যাপক ইউসুফ জাফর, দু'ভাই ভক্ত-মানিক ও সফি। বন্দর কোর্ট হাউসে বাবাজানের জামাতা ও কমিটি সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা হয়[১]।

১০-১০-৮৮ সোমবার: সকাল ১১টায় মেডিকেল বোর্ড গঠন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ডা. আবদুল মান্নান, সিএমও/চবক, ডা. হারুন এসও/চবক, ডা. মোহাম্মদ ফিরোজ ও ডাক্তার সৈয়দ দিদারুল হক। সিদ্ধান্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার বিভাগে স্থানান্তর। রোগী সেখানে তো নয়ই হাসপাতাল ছেড়ে যেতে চান। ঘুমের জন্য হাইডোজ সিডাকসিন ৪ ঘন্টা অন্তর দেওয়া, কোন ফল হয়না। রোগী নির্ঘুম নিজ কাজে ব্যস্ত। ডাক্তারগণ বলেন, ঘুমের ঔষধ অকার্যকর হতে জীবনেও দেখি নি; এই প্রথম দেখলাম চিকিৎসা বিজ্ঞান ফেল। ডাক্তারদের বিশেষ করে তাঁর ছোট ভাই ডাক্তার দিদার সাহেবের নির্দেশে গেটে তালা দিয়ে

বাইরে পাহারার ব্যবস্থা। রোগীর মন্তব্য– আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ্ নিয়ে গেলে তালা দিয়ে কি রাখা যাবে?

১১-১০-৮৮ মঙ্গলবারঃ আবদুল মান্নানকে দিয়ে নিউ মার্কেট হতে ১ জোড়া হ্যান্ড গ্লাভ্‌স আনা, পছন্দ না হওয়ায় ভক্ত সফি সাহেবের দোকান সজনী হতে বদলানো। বাইরে যেতে গাড়ির ব্যবস্থা করার নির্দেশে গোলাম রসূল সাহেব প্রধান প্রকৌশলীর গাড়ি স্ট্যান্ডবাই রাখা। শাহ্ আমানত ও সৈকতে যেতে ছট্‌ফট; কিন্তু বের হলেন না। সর্বক্ষণ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' জিকির[২]।

সূত্রঃ

১. লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরী।

২. জীবন সায়াহ্নে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) – মো. গোলাম রসূল, শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, সম্পাদনা মোঃ মাহবুব উল আলম।

মহাজাতে মিলন – মহাজীবন

১২-১০-৮৮ বুধবারঃ দিবাগত রাত্রি (মঙ্গলবার) ভোর চারটার সময় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বন্দর হাসপাতালের নিজ কেবিন থেকে বেরিয়ে পাশের কেবিনে তাঁর সহধর্মীনিকে নামায পড়তে ডেকে দিলেন এবং একমাত্র পুত্র শাহ্‌জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীকে এক গ্লাস হরলিক্স খাওয়ার নির্দেশ দেন। শাহ্‌জাদা হাত মুখ ধুয়ে খেতে চাইলে বলেন, 'আজ না ধুয়েই খেয়ে ফেলুন'। তারপর একটি আপেল খেতে দিলেন। অতঃপর সহধর্মীনির কাছে অনুমতি চাইলেন, "হাসানকে নিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আপনার নিকট আবার ফিওে আসবো"।

ভোর ৭টায় হাসপাতাল হতে বের হয়ে গেলে খবর পেয়ে বখ্‌তেয়ার শাহ্ পুনঃ হাসপাতালে যেতে অনুরোধ করলে রাগতস্বরে বলেন, "বেত্বমিজি করোনা; তোমার কাজে তুমি যাও"। অতঃপর গাড়ি আনতে নির্দেশ, গাড়ির সামনের সিটে শাহ্‌জাদা হুজুর পিছনে বাবাজান ও আবদুল মতিন চৌধুরী, ৫১৫২ নং কার, চালক নাজিম। হাসপাতাল গেটের একটু ভিতর হতে সোজা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত; দেরী না করে ক্যাপ্টেন রমজান আলীর বাসায় এসে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কেমন আছেন"। সেখানে চা ও মিষ্টি কবুল করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের

প্রশাসনিক পরিচালক গোলাম রসূল বলেন, সকাল ৮টায় অফিসে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আলী নবি চৌধুরী টেলিফোনে জানান যে, বাবাজান তার বাসায় এসেছেন। ৮-১০ মিনিটে আমি সেখানে পৌঁছলে বলেন, 'আজ একটু আমার কাছে বসুন'। আমি তখন তাঁর পাশে বসে আমাকে দোয়া করতে বলি। অতঃপর তাঁর নির্দেশে হালুয়া-রুটি খেলাম। এরপর তিনি নবি চৌধুরীর বাসার ভিতরে পর্দা তুলে প্রত্যেক ঘরে উঁকি দিয়ে শেষে ড্রইং রুমে বসে পড়েন। তিনটি ম্যাগাজিন চেয়ে নিলেন। 'মস্তবড় অলি'র সাথে আমরা নাস্তা করতে পারিনা বলে শাহ্জাদা হুজুরকে আলাদা নাস্তা চা'র ব্যবস্থা। ভিতরের কক্ষে চৌধুরী কন্যাকে রেওয়াজ করতে দেখে হারমোনিয়াম চেয়ে নিয়ে নিজে ছায়াছবির এই গানটি দরদভরা কণ্ঠে গাইলেন–

এই যে দুনিয়া, কীসের লাগিয়া'
এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই।
ছায়াবাজি পুতুলরূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি
পুতুলের কী দোষ–
তুমি খাওয়াইলে আমি খাই (আল্লাহ্)॥
তুমি বেহেস্ত তুমি দোযখ তুমি ভালো মন্দ,
তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ।
আমার মনে এই আনন্দ
(আমি) কেবল আল্লাহ্ তোমায় চাই॥
তুমি হাকিম হইয়া হুকুম করো
পুলিশ হইয়া ধরো,
সর্প হইয়া দংশন করো
ওঝা হইয়া ঝাড়ো
তুমি বাঁচাও তুমি মারো
(আল্লাহ্) তুমি বিনে কেহ নাই॥

এমনি সময় প্রধান প্রকৌশলী/চবক, জহিরুল হক সাহেব সালাম করতে আসলে তাঁকে ডিম হালুয়া ও এক কাপ চা খেতে দেন। অফিসে যাওয়ার জন্য বারংবার এজাজত চাইলাম। তিনি বসতে বললে আমি পাশের রুমে শাহ্জাদা সৈয়দ

মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী ও মতিন সাহেবের সঙ্গে বসে রইলাম। ইতিমধ্যে বন্দর হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডা. আবদুল মান্নান এসে পুনরায় তাঁকে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য অনুরোধে বলেন, "হাসপাতালে গিয়ে ডিউটি করুন"। ১০টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজান আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে কক্সবাজার যেতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর নিজের গাড়ির সামনের সিটে শাহ্‌জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীকে উঠতে বলে পিছনের সিটে জহিরুল হক সাহেবসহ নিজে বসলেন। নাজিম উদ্দিন ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে রওয়ানা দিলেন। বাবাজানের নির্দেশে আমি, সর্বজনাব মান্নান, মতিন, মুন্না ও বিল্লাহ্‌সহ প্রধান প্রকৌশলীর গাড়িতে উঠে পিছনে পিছনে রওয়ানা হলাম।

বাবাজানের গাড়ি চান্দগাঁও সরাফত আলীর পেট্রোল পাম্পে তেল নেওয়ার জন্য থামলে আমি এবং মান্নান গাড়ি থেকে নেমে বিদায়ের এজাজত চাইলে দিলেন না। আমরা আর কোন কথা না বলে বাবাজানের গাড়ির পিছনে রওয়ানা দিলাম। বাবাজানের গাড়ি একটানা দ্রুত গতিতে চলতে চলতে বেলা ২:২৫ মিনিটের সময় কক্সবাজারের হোটেল সায়মানে গিয়ে থামলে আমরা গাড়ি থেকে নামলে বাবাজান পুনরায় গাড়িতে উঠার নির্দেশ দিলেন। তিনিও নামলেন না। খানিক দূর অগ্রসর হলে সমুদ্রের জলরাশি ও ঝাউগাছের ঝোপ দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রের দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টিপাতে নির্দেশ দিলেন, "বলাকা হোটেলে যাও"। কিন্তু বলাকা হোটেলে এসেও গাড়ি না থামিয়ে পুনরায় চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হলেন। আমাদের দারুণ ক্ষুধা পেয়েছে। কাছেই পথে বাবাজানের গাড়ি একটু থামার সাথে সাথে আমরা সেখানে নেমে কিছু কিনে খাওয়ার এজাজত চেয়ে পেলাম না। চকরিয়া আসার পর বাবাজান গাড়ি থেকে নেমে এস্তেন্‌জা (প্রস্রাব) করার জন্য পাশের জঙ্গলের দিকে গেলেন। প্রস্রাব করে ইসলামী কায়দায় কুলুখ করে পুনরায় গাড়িতে উঠে তাঁকে টলতে দেখা যায়। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে অতিরিক্ত ঘাম নির্গত হতে দেখে আমাদের মনে ভয় এসে গেলে। দুলাহাজারা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য আমরা তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি এজাজত না দিয়ে বলেন, Go ahead- সামনে চল। বাবাজানের পাশাপাশি বসে প্রধান প্রকৌশলী কী দেখেছেন জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'বাবাজান সবসময় আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল ছিলেন, পথে পথে সালাম জানাচ্ছিলেন এবং সালামের জবাব দিচ্ছিলেন'।

চকরিয়া পার হওয়ার পর বাবাজানের মুখমণ্ডল এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম বের হচ্ছিল এবং তিনি হাত দিয়ে বুকের বাম পাশ চেপে ধরেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার ব্যাথা বা অসুবিধার কথা উচ্চারণ করেন নি এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে রাজী হলেন না। তিনি কেবলই 'ইয়া আল্লাহু' 'ইয়া মুরশিদ' উচ্চারণ করেন। তবুও শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানের ঐ অনুরোধে পথে ২/১ জন ডাক্তারের নিকট গাড়ি থামিয়ে ঔষধ খুঁজেছি। কিন্তু কোন প্রকার ঔষধ পাওয়া যায় নি। অন্তিম অবস্থা বুঝতে পেরে শাহ্জাদা তাঁর নিজের প্রয়োজনে আরও কিছুকাল দুনিয়াতে থাকার আর্জি জানালে উপরের দিকে অঙ্গুলি ইঙ্গিত করেন অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহ্ আছেন। তারপর একটানা দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে দোহাজারী হাসপাতালে কিছুক্ষণের জন্য ভর্তি করানো হলে সেখানকার ডাক্তার বাবাজানকে অক্সিজেন এবং ইনজেকশন দেন। সেখানে অন্যদের রেখে আমি ও মুন্না প্রধান প্রকৌশলীর গাড়িতে চট্টগ্রাম শহরের দিকে রওয়ানা হই। চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছার আগে চান্দগাঁও পুলিশ ফাঁড়িতে এসে ও.সি. সাহেবের টেলিফোন থেকে ফোন করে আলী নবি চৌধুরীকে জানাই যে, বাবাজান গুরুতর অসুস্থ এবং তাঁকে দোহাজারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপনারা অবিলম্বে ডা. আবদুল মান্নান সহ জরুরী ঔষধপত্র নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে রওয়ানা দেন। আমরা সন্ধ্যা প্রায় ৬.৩০ মিনিটের সময় চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে পৌঁছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল বখ্তেয়ার, জামাল সিকদার ও বাবাজানের আত্মীয়গণসহ আলোচনায় বসি কিভাবে এ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সহ দোহাজারীতে প্রেরণ করা যায়। প্রায় ৭টার দিকে গাড়িতে করে শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান, মতিন চৌধুরী ও বিল্লাহ্ বাবাজানকে নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে এসে পৌঁছলে ভীষণ শোরগোল পড়ে যায়। তাঁকে পুনরায় বন্দর হাসপাতালের ১নং কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ সময় তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তবে মুখ থেকে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' জিকিরের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এভাবে তিনি জীবনের শেষ সফর সমাপ্ত করেন।

ডা. এস.এম.এ. মান্নান বলেন, হাসপাতালে আনার পর সহযোগী ডাক্তারগণসহ চেক আপ করে দেখলাম, দেহ অচেতন, শীতল। হার্টবিট, পালস্, ব্লাড প্রেসার কিছুই পাওয়া গেল না। অক্সিজেন এবং ইনজেকশন দিলাম। রাত ১২টার পর সুস্থ মানুষের মত শোয়া থেকে উঠে বসলেন। নির্দেশ দিয়ে অক্সিজেন, স্যালাইন

ইত্যাদি যাবতীয় চিকিৎসা সংযোগ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করালেন। অতঃপর এক গ্লাস পানি চেয়ে নিজেই পান করলেন। তারিখ জানতে চাইলে আলী নবি চৌধুরী ১২ অক্টোবর উল্লেখ করলে বলেন, "একটু পরে ঘড়িতে সময় রাত ১২টা অতিক্রম করলেই ইংরেজি ক্যালেন্ডারে হয়ে যাবে ১৩ই অক্টোবর, আসরের পর চাঁদের তারিখ পরিবর্তন হয়ে এখন ১ রবিউল আউয়াল; সূর্যোদয় থেকে বাংলা সনের ২৬ আশ্বিন। আপনাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে"। এখন কী করবেন জানতে চাইলে বলেন, "আমি 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' জিকির করছি; আপনারাও 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করুন" বলে কম্বল গায়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। এই নির্দেশে হাসপাতালের প্রথম ও নীচ তলায় সমবেত শত শত লোকের 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' জিকিরের শব্দে গোটা এলাকা এক অভূতপূর্ব পবিত্রতার রূপ ধারণ করে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ক্ষণকাল আগে। ডবলমুরিং নিবাসী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াস রিজভী ও বন্দর কলোনী মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু সাঈদের নেতৃত্বে হাসপাতালের ইবাদত খানায় চলছিল প্রায় ত্রিশজন আলেমের কোরআন তেলাওয়াত। এমনি পূত পবিত্র পরিবেশে রাত ১২টা ২৭ মিনিটে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জিকিরের শব্দে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে চিরস্থায়ী মিলনে ধন্য হলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন; অর্থ– নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্ হতে এবং আল্লাহ্‌তে প্রত্যাবর্তিত। ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহায়্যায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহ্ রাব্বিল আ'লামীন; অর্থ– আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য (৬:১৬২ সূরা আন্‌আম)। আল্লাহ্ প্রেমিক এই মহান অধ্যাত্ম সাধকের গোটা জীবন মহাগ্রন্থ কোরআনের আয়াত বা নিদর্শনে রূপান্তরিত। খণ্ড জীবন পেরিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন অনন্ত মহাজীবনে; জ্যোতির খন্ডিত বিচ্ছুরণ রূপান্তরিত হলো অখণ্ড জ্যোতিস্কে।

বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের তারিখও ১ রবিউল আউয়াল। বিদায় হজের পর ৮১তম দিবস সোমবার। অপর তথ্য অনুসারে সফর মাসের শেষ বুধবার। পরের সূত্র সত্য হলে বারেও মিল। কফিন পরিবারের সদস্যরাসহ রাতের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের একটা বড় গাড়িতে করে মাইজভাণ্ডার শরিফ পৌঁছানো হয়। দিনের আলো ফুটলে গাড়িতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো।

অশ্রুজলে শেষ বিদায়

‘একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পাড়ে
নিশীথ অন্ধকারে’। –কাজী নজরুল ইসলাম।

এ খবর ছড়িয়ে পরে মুখে মুখে শহর থেকে গ্রামে। ঘর থেকে ঘরে। হৃদয় থেকে হৃদয়ে। গাছের শাখায় হঠাৎ কেঁদে উঠে ঘুমভাঙ্গা পাখি। সকাল হতে না হতেই জনস্রোত ছুটে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে। প্রত্যেকের বুকভরা ব্যাকুল বেদনা। অন্তর জুড়ে প্রচণ্ড হাহাকার। মাত্র ৫৯ বছর ৯ মাস ১৯ দিন বয়সে তাঁর এই অকাল প্রয়াণকে কেউ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেনা। প্রত্যেক মানুষের একটি মাত্র প্রত্যাশা তাঁকে শেষবারের মতো একনজর দেখার। তাঁর জানাযায় শরীক হবার পুণ্য অর্জন করার। ভোরের সূর্য গাছের মাথায় ওঠার আগেই জনসমুদ্রের রূপধারণ করে মাইজভাণ্ডার শরিফ। সেদিন অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৮ খৃস্টাব্দের দিনটা ছিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিন। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এ জানাযা ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম জানাযাসমূহের অন্যতম।

এ সম্পর্কে চট্টগ্রামের প্রভাবশালী পত্রিকা দৈনিক আজাদীর ১৪ অক্টোবর সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম ছবি ও তিন কলাম শিরোনামে সংবাদ ছাপে:

জানাযায় পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ
শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র দাফন সম্পন্ন

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গতকাল বিকেল সোয়া চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পর পর তিন জামাতে পাঁচ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে মহান অধ্যাত্ম সাধক অলিয়ে কামেল হযরত গাউসুল আযম শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (র.) নামাযে জানাযা সম্পন্ন হয়। নামাযে জানাযার পর লক্ষ লক্ষ আশেক ভক্ত অনুসারীর বুক ফাটা আর্তনাদের মধ্যে তাঁকে তাঁর হুজরা শরিফে দাফন করা হয়।

স্মরণকালের বৃহত্তম এই জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গতকাল সকাল থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের ঢল সম্ভাব্য সকল প্রকার যানবাহনযোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে ছুটতে থাকে। জানাযার নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘন্টা আগে থেকেই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অন্যূন দুই বর্গ কিলোমিটার এলাকায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। জানাযার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে দরবার শরিফের মাঠ-রাস্তা-ঘরের অভ্যন্তর ছাদ-কার্নিস-অলি-গলি অর্থাৎ যে যেখানে পারে ঠাঁই করে নেয়।

পশ্চিমে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল থেকে পূর্বে প্রাইমারী স্কুল ময়দান পর্যন্ত তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। নাজিরহাট থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পথ ধরে গতকাল মাগরিবের পরেও হাজার হাজার মানুষকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে যেতে দেখা যায়। মুরাদপুর বাস স্ট্যান্ডে সারাদিন মাইজভাণ্ডারগামী জনতার ভিড়।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) শেষবারের মত এক নজর দেখার জন্য মানুষের ভিড় সামলানো দায় হয়ে পড়ে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যরা অসীম ধৈর্য সহকারে উন্মত্ত জনতাকে সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান। তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য অন্তহীন লাইনে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ তথা বাংলাদেশের সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে দেখা গেছে। নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা লাইন করে তাঁকে দেখার ব্যবস্থা করা হয়। জানাযার পূর্বে ও পরে কলেমা তাইয়্যেবা, আল্লাহু রাব্বি মোহাম্মদ নবি প্রভৃতি ধ্বনিতে সমগ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এক অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

আন্দরবাড়িতে আপন পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও মহিলা ভক্তদের বিদায় দানের পর হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফ মাঠে নেওয়ার সময় পবিত্র কফিনকে একটুখানি ছোঁয়ার জন্য ভক্ত অনুরক্তদের সেকী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে অসংখ্য জুতা স্যান্ডেল রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। জানাযায় পর পর ইমামতি করেন মাইজভাণ্ডার শরিফ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নুরুল ইসলাম ফোরকানী, সুয়াবিলের মাওলানা আবদুল মালেক শাহ্ ও মাওলানা আমির হোসেন। জানাযা শেষে লক্ষ লক্ষ ভক্তের হাহাকারের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আর অশ্রুর সাগর পেরিয়ে কফিন এলো তাঁর হুজরা শরিফে। ভিড় এড়ানোর জন্য দাফনের সময় শুধুমাত্র পারিবারিক সদস্য ও ক'জন আত্মীয়কে ভিতরে

ঢুকতে দেয়া হয়; আপন চার ছোট ভাই– শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল হক (মা.জি.আ.), শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক (মা.জি.আ.), শাহ্ সুফি ডাক্তার সৈয়দ দিদারুল হক (মা.জি.আ.) ও শাহ্ সুফি সৈয়দ শহিদুল হক (মা.জি.আ.), একমাত্র ছেলে শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মা.জি.আ.), নিকট আত্মীয় আবু তালেব চৌধুরী (দাঁতমারা), আয়কর উপদেষ্টা মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী (নারায়নহাট), বড় জামাতা রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী। রওজার ভিতরে নামেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকমল খান (পাঠানটুলী), অধ্যাপক ইউসুফ জাফর (বাঁশখালী), মেজ জামাতা ইঞ্জিনিয়ার কামালুর রহমান। এই তিনজনের একই মন্তব্য: "রফাতের ২২ ঘন্টা পরও শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর শরীর ছিল ভারহীন তুলার মত তুলতুলে নরম ও উষ্ণ, ঘামে ভেজা কাফন, মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম'। বেশী মাটি কেটে গভীর গর্ত করায় কফিন থেকে নামাতে অসুবিধার জন্য চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু হাত বাড়াতেই চোখের পলকে ওৎনহীন দেহটা মাটিতে শোয়ানো সম্ভব হয়"। তিনি চলে গেলেন লোক চক্ষুর অন্তরালে। চারিদিকে ১০ ফুট দেয়াল দিয়ে উপওে ৩ ইঞ্চি ঢালাই করা হয়। মূল রওজা আপনা আপনি কাবাঘরের আকৃতি লাভ করে।

দৈনিক আজাদী, পূর্বকোণ ও নয়াবাংলাসহ দেশের পত্র পত্রিকায় ক'দিন ধরে প্রকাশিত হয় খ্যাতনামা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবিদের শোকবাণী। শুধুমাত্র ওহাবী আলেম ও জামাত শিবিরের কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি। আশেক-ভক্তরা দেশে বিদেশে বহু স্মরণসভা আয়োজন করে এই মহাত্মার স্মৃতি আরও উজ্জ্বল করে।

চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম আওলাদে রাসূল (দ.) আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম মদনীর (র.) ওফাতের (১৯৬২ খৃ:) ২য় দিনে দেখেছি মুখমণ্ডলে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মত ঘাম। তৃতীয় দিনে দাফনের জন্য মদিনা শরিফ পাঠানো হয়। গাউসে ভাণ্ডারীর খলিফা হযরত মাওলানা অলিউল্লাহ্ (র.) রাজাপুরীও (কুমিল্লা জেলা) ওফাতের তিনদিনে দাফন পর্যন্ত অনবরত ঘেমেছিলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরেবাংলাকেও (র.) ওফাতের পরে ঘামতে দেখা গেছে।

বিশ্বাসের কালজয়ী ঠিকানা

শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি যুগে যুগে মহৎ গুণী ব্যক্তিদের কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়ে এসেছে। জীবনকালে তো হয়ে থাকেই মরণোত্তর কালেও কোন কোন গুণীজনের স্মৃতি স্মরণে গড়ে উঠে কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। মহান অধ্যাত্ম সাধক বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এক তুলনাবিহীন বিরল ব্যক্তিত্ব। সকল ধর্ম ও শ্রেণির মানুষের নিকট কিংবদন্তি সমপ্রিয় এই গুণীজনকে ভিত্তি করে জীবনকালেই গড়ে উঠেছে নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। কুল-প্লাবিত প্রেমজ দান-অবদানে অযুত ভক্তকে তিনি যেমন বিলিয়েছেন চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খার অবারিত ফসল; তেমনি বিশালতায় বেড়েছে তাঁর প্রেমজ আকর্ষণের পরিধি। প্রেমিক কবি হাফেজ সিরাজী প্রিয়তমার টোলপড়া গালের সরিষাসম ছোট তিলে এমন অপরূপ সুন্দরকে খুঁজে পেয়েছিলেন স্থাপত্যশৈলী সুশোভিত সমরখন্দ ও বোখারা নগরী যেন তাঁর কাছে কিছুই নয়। প্রেমাস্পদের জজ্‌বা সলুকে সিরাজীর মত প্রিয়ের সৌন্দর্য তিলকের সুষমা সুন্দর অনুভব করুক নাই বা করুক শাহানশাহ্‌র ভক্তজনেরাও অপ্রেমিক নন। মুগল সম্রাট শাহজাহানের মত বিত্তবৈভব ক্ষমতা না থাকলেও শাহানশাহ্‌র আশেকদের প্রেমজ স্বপ্ন-কল্পনা সম্রাটের চেয়ে কম বলা চলবে না। বিত্তের দেয়াল গুঁড়িয়ে দিলে প্রেমিকের অন্তর অভেদ-অভেদ্য। মিলন উৎসবকে সাজাতে আগেই যেমন শুরু হয় ফুল তোলা মালাগাঁথা তেমনি ভক্তরাও মুর্শিদের বিদায় পূর্বেই কত বিনিদ্র রজনী জেগেছে; আর বুনেছে স্বপ্ন-কল্পনার কত তাজ-তাজমহল। বছর খানেক এত থেকে উঁচু-নীচু-মাঝারি নানা আসরে সে কথা বলতে গিয়ে বিরক্তি তো পেয়েছি; ধমকও খেয়েছি 'এত তাড়া কিসের'? কত বছর পরে সে ঘটনা ঘটবে যেন নিশ্চিত জানেন! আমি কি জানতাম-না। তবু মনে জেগেছিল আগেভাগে প্রস্তুতির ধাপে বাগে হোসাইনী পিতামাতার সাজানো বাগানের একটু তফাতে ভাণ্ডার শরিফ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠই ছিল আমার ইচ্ছার স্থান। সুয়াবিলের লোকমান ফকির বলেন, স্বপ্নে দেখেছি হুজরা শরিফই হবে বাবাজানের পবিত্র রওজার স্থান। সৈয়দ বখ্‌তেয়ার শাহ্'র নিকট জানতে চাইলে বলেন, বিধান মতে প্রখ্যাত নবি অলিদের রওজা তাঁদের হুজরায় হয়ে থাকে যদি না ভিন্ন ইশারা নির্দেশ থাকে। মন্‌জিলের তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা সৈয়দ ওবায়দুল আকবর কথা প্রসঙ্গে জানান; বাবাজান তাকে বলেছেন, হুজরা ভেঙ্গে

সুন্দর একটা ঘর তৈরি করতে, সে ঘরে তিনি থাকবেন। আনুমানিক ওফাতের এক মাস পূর্বে ভক্ত চৌধুরী ইয়াসিন বিল্লাহ্‌কে হুজরার সামনে পিছনের দেয়াল ভাঙ্গার কাজে লাগিয়ে পুনঃ একই মন্তব্য করেন। **১৯৮৮** সালের **১৩** অক্টোবর (২৬ আশ্বিন) ওফাতের পর নির্দেশিত স্থানেই তাঁর মিলন বাসর রচিত।

চারদিনের ফাতেহার রাতে মন্‌জিলের অফিসে বসে আশেক-ভক্তদের সাথে আলাপের ফাঁকে নীচের লেখাটা একটা কাগজে লিখে পরবর্তীতে মটো করে রওজা শরিফে টাঙ্গিয়ে দিলাম।

কোন আশা পূরণে, দুঃখের অবসানে, সুখের খোঁজে
ইহ ও পর জগতের কল্যাণ এবং
আত্মার মুক্তি সন্ধানে,
এখন যেমন মানুষেরা আসে
তেমনি অনাদিকাল ধরে আসবে
কত শত-কোটি মানুষের দীর্ঘ মিছিল।
মৌমাছির মত বিন্দু বিন্দু শ্রম, সামর্থ্য ও ভালবাসায়
আমরাও গড়বো মানুষের বিশ্বাসের কালজয়ী ঠিকানা
এ বিশ্বঅলির মহান রওজা শরিফ।
আমরা আরও গড়বো এক গুচ্ছ প্রতিষ্ঠান
মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে।
নিবেদক –
আশেক-ভক্তগণ।

ভক্তরা যার যার নিজস্ব ভাব ভঙ্গিতে রওজা নির্মাণের অভিমত পরামর্শ দিতে লাগলেন। এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ দরবারী আসরে বিশিষ্ট ভক্তদের পরামর্শের সাথে একটা আন্দাজী ব্যয় বরাদ্দও জানতে চাইলেন। দরবারের আত্মীয়রাও নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় অর্থ সংগ্রহ, খরচের যুক্তিগ্রাহ্যতা ও সুন্দর রওজা নির্মাণের সহসা উদ্যোগ গ্রহণের তাগাদা দিলেন। ২৫ লাখের বেশী নির্মাণ ব্যয়ের পক্ষে কেউ সাহসী হলেন না। সকল পক্ষের মতামত জরিপের পর বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ হেসে বলেন, ‘আল্লামা রুমী (র.) মসনবি গ্রন্থে বলেছেন, প্রেমের ব্যাপারে যুক্তি খাটে না; এমন কী ন্যায় অন্যায়ও খাটে

না। প্রেমিকের মজ্‌হাবই আলাদা'। বিশ্বঅলির রওজা শরিফ হবে বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য সুন্দর নিদর্শন। শুধু ভক্ত আশেক নয়, সৌন্দর্য পিপাসু পর্যটকের মিছিলও যেন কালে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। আপনারা ভয় করবেন না, যত টাকা লাগে আমি যোগাবো। কোন অভিজ্ঞ স্থপতির নিকট হতে আমাকে প্ল্যান-নক্‌শা এনে দিন'।

তাড়া দেওয়াতে এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা গেলাম। প্রখ্যাত স্থপতি মজহারুল ইসলামের সাথে দেখা করার জন্য বাবাজানের ভক্ত মীর আহমদ সাহেবকে নিয়ে আবদুর রাজ্জাক (বাংলাদেশের প্রাক্তন পানিসম্পদ মন্ত্রী ১৯৯৬–২০০১ খৃ:) সাহেবের স্মরণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, উনি একে তো খুবই ব্যস্ত মানুষ; আবার আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করেন না। আপনারা বরং স্থপতি আলমগীর কবির সাহেবের সাথে আলাপ করুন। তিনিও স্বনামধন্য স্থপতি; আশা করি আপনাদের চাহিদা মিটাতে পারবেন। আমি বলে দিচ্ছি, বলে টেলিফোন করলেন। ধানমণ্ডির লেকের পাড়ে একতলা ছিমছাম সুন্দর অফিস; স্থাপত্য শিল্প লিমিটেড। আমরা সেখানে গেলাম। বাবাজানের ওফাত ও ফাতেহা উপলক্ষে চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী ও পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ ও ফিচার এবং জীবনী শরিফ হাতে তুলে দিলাম। মত বিনিময় হল। "আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস-আল্লাহ্‌র ঘর, সকল জাতির মিলনকেন্দ্র" এই বাণীসহ উল্লেখযোগ্য বাণীগুলো একটা কাগজে লিখে দিলাম; যাতে বাবাজানের পরিচিতি ও কাজের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। অতঃপর স্থপতি স্বয়ং ১০ পৌষ, ১০ মাঘ, ২২ চৈত্র উরস ও খোশরোজসমূহে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে সার্বিক অবস্থা অবলোকন করেন।

১৯৮৯ সালের ২৬ আশ্বিন বাবাজানের প্রথম বার্ষিক উরস শরিফ উপলক্ষে তিনটি মডেল তিনি দরবারে আশেক ভক্তদের নিকট উপস্থাপন করেন। প্রথম মডেলে বায়তুল মোকাদ্দাস; দ্বিতীয়টিতে শাপলা ফুল এবং অন্যটিতে পদ্ম ফুলের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত। অধিকাংশ ভক্ত বিশেষ করে বখ্‌তেয়ার শাহ্‌ এবং আমি নিজেও প্রথম মডেলটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করি। ভক্তদের এই চয়নের মূলে ছিল বাবাজানের পবিত্র কালাম ও ইসলামের অতীত ঐহিত্যের প্রতি দুর্বলতা।

শাহানশাহ্‌ বাবাজানের একমাত্র পুত্র ও মওলায়ী উত্তরাধিকার হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) সবার চেয়ে বয়সে নবিন হলেও

সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বেছে নিলেন শাপলা মডেলটি এবং মন্তব্য করলেন, "পদ্ম ফুল ভারতে হিন্দুদের মন্দির ও বাহাইদের মসজিদে ব্যবহৃত। বায়তুল মোকাদ্দাস তো আমাদের আছেই। শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল, যে প্রতীক অন্য কোথাও নির্মাণ স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়নি সেটি নিলাম"।

এভাবে নক্‌শা নির্বাচনের পর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একই সালের ১৪ জুন রওজা শরিফ নক্‌শা মডেল নিয়ে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভার যে সংবাদ দৈনিক আজাদী ও দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত তা নিম্নরূপঃ

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র রওজা শরিফের নক্‌শা

ব্যতিক্রমধর্মী নির্মাণ কৌশল, ইকোসিস্টেম শব্দ ব্যবস্থা, আয়নায় প্রতিবিম্বিত উজ্জ্বল নয়নাভিরাম আলো, বাইর থেকে দেখার সুবিধা বিধৃত আয়নার ঘেরা, এ্যালুমিনিয়াম ফেন্সিং, কাঠের কারুকাজ ও উপর নীচের মার্বেল পাথরের কাজ শেষ করতে প্রয়োজন বেশ ক'কোটি টাকা। এই বিপুল ব্যয় নির্বাহে বাবাজান তো কোন টাকা জমা রেখে যাননি। তাই ঢাকা চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাহায্য চাওয়ার জন্য তালিকা তৈরি ও যোগসূত্রের খোঁজ খবর নিতে তৎপর হলাম। নিজে থেকেই দরবারে ছুটে এলেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবারের সদস্য মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানী। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন কত টাকাই বা লাগবে, প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্যয়ের অংকটা শুনে বলেন, আমিতো ভেবেছিলাম বিশ পঁচিশ লাখ টাকায় হবে। তবু এ মহতি কাজে আমি যৎসামান্য পারি অংশ নেবো। কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের টাকায় রওজা শরিফ নির্মাণের ইচ্ছা দরবারেও ছিল না। আমাদের মনে শঙ্কা ছিল অত টাকা কোথা হতে কিভাবে সংগ্রহ হবে। এমনি সময় রাউজান থানার নোয়াজিশপুর নিবাসী বেকার যুবক মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী মঞ্জু আমাকে একা ডেকে তার একটি স্বপ্নের বর্ণনা দেন। কাজ আরম্ভের তারিখ নির্ধারিত হলে রওজা শরিফ নির্মাণে কোন টাকা পয়সা দিতে পারব না বলে রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে বাবাজান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাঁদছো কেন? উত্তর দিলাম, আপনার রওজা নির্মাণে দেওয়ার

মত আমার যে কিছুই নেই; তাই কাঁদছি। তিনি বললেন, 'তোমার কথায় মানুষ টাকা পয়সা দেবে না? তোমার চেষ্টায় লোকেরা যত টাকা দেবে আমার খাতায় তোমার নামেও তত টাকা জমা হবে। লোকদের কী বলবে? বলবে ভারতে হযরত খাজা আজমিরী (র.), চট্টগ্রাম শহরে হযরত আমানত শাহ্ (র.) ও মাইজভাণ্ডারে হযরত সাহেব (ক.) কেবলার রওজা শরিফে এখন যারা টাকা পয়সা দেয় সেগুলো তাঁদের খাদেম অথবা আউলাদেরা পায়, রওজায় লাগে না। যেহেতু রওজা তো আগেই নির্মাণ হয়ে গেছে। আমার রওজা নির্মাণের জন্যে যারা একটা টাকা কিংবা একটি নুড়ি পাথরও দেবে তা রওজা শরিফে লাগবে। তাদেরকে আমি দুনিয়া হাশর নশর সবখানে সাহায্য করবো'। তবু কান্না না থামলে বলেন, "তুমি কোন চিন্তা করোনা, গ্রাম-গঞ্জ হতে ১২৫ কোটি টাকা আসবে"। এই স্বপ্ন সংবাদে তহবিল সংক্রান্ত দুর্ভাবনা কেটে যায়। ফলে আশেক ভক্তদের চাপ থাকা সত্ত্বেও ধনী ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের নিকট সাহায্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত বাতিল করি। অতঃপর বাবাজানের দয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্মাণ চালানোর মত প্রয়োজনীয় টাকা আসতে লাগলো।

কাজ শুরুর পূর্বে (১৯৯২ খৃস্টাব্দ) স্থপতি আলমগীর কবির সাহেবের অকাল মৃত্যু হলে তদস্থলে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়ার উপর। প্রকল্প কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ার কামালুর রহমানকে (২য় কন্যার জামাতা– প্রোডাকশন ম্যানেজার, সিংগার বাংলাদেশ লি.), তত্ত্বাবধায়ক– ইঞ্জিনিয়ার আবদুল সবুর (নিকট আত্মীয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রকোশলী), নির্মাণ সহযোগী যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার চিত্ত রঞ্জন সরকার (ঐ) ও সমিত্র কুমার বড়ুয়া (ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার) এবং বিদ্যুৎ বিভাগের পরিদর্শক– ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান চৌধুরী (তৃতীয় কন্যার জামাতা– প্রকৌশলী, কাফকো লিঃ)। সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী (১ম কন্যার জামাতা)।

স্থপতি আলমগীর কবির কৃত মডেল ও পরিকল্পনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরামর্শসহ রিপোর্ট করার জন্য ১৯৮৯ সালে তাড়াহুড়োর মধ্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বাবাজানের একনিষ্ঠ ভক্ত ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার জহিরুল হক সাহেবকে প্রধান ও সর্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস এর অধ্যাপক প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মর্তুজা

বশির, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মহিউদ্দিন (নির্বাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন), সৈয়দ রফিকুজ্জামান (নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ), আবদুর রশিদ (প্রাক্তন সিডিএ টাউন প্ল্যানার), আলী নবি চৌধুরী (চট্টগ্রাম বন্দর), হাবিবুর রহমান (নাবলুস ট্রেডার্স, বারেক বিল্ডিং মোড়), আবদুল মান্নান (হলিউড রেডিও কর্পোরেশন, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম), আলী আশরাফকে (প্রকৌশলী সিডিএ) এই কমিটির সদস্য করা হয়। অতিরিক্ত উপদেষ্টা ও পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য উপাচার্য অধ্যাপক স্থপিত জামিলুর রেজা চৌধুরী ও বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট এন্ড টেকনোলজির (চট্টগ্রাম) অধ্যাপক মোজাম্মেল হক সাহেব।

গোলাকৃতি রওজা শরিফের পরিধি ১২০′ × ১২০′ ফুট ও উচ্চতা ৬৭′ ফুট এবং মিনারের পরিধি ২৩′ ফুট ও উচ্চতা ১৪০′ ফুট। স্থান সমস্যার কারণে রওজার পরিধি প্রথম দফায় ১০০′ × ১০০′ এবং পরবর্তিতে ৮৪′ × ৮৪′ ফুটে পরিবর্তন করা হয়। এই পরিমাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৯ সালের ৩ মার্চ ১৯ ফাল্‌গুন ১৩৯৫ ভিত্তি স্থাপন করেন যৌথভাবে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পুত্র ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) ও মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানী। ১৯৯৩ সালে ২৬ রমজান পবিত্র শবে ক্বদর রাতে অঝোরধারা বৃষ্টিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মহাউল্লাসে হাজার হাজার ভক্তের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় নির্মাণ কাজ। শুরুটাই ছিল প্রচণ্ড আবেগ, ভক্তি ও শক্তি বিমণ্ডিত প্রবল গতিশীল। পুরোনো পাকা ঘর ভাঙ্গা, মাটি কাটা ও ঢালাইয়ের কাজে স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণ করেন বাবাজানের দেশব্যাপী আশেক-ভক্তগণ। ১৯৯৮ সালের ২৬ রমজান ২৬ জানুয়ারি আরেক শবে ক্বদর রাতে অনুষ্ঠিত হয় নির্মাণ সমাপনী শোকরানা অনুষ্ঠান। অলংকরণের কাজ চলছে তা শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

SZHM Trust

এক নজরে
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ

পবিত্র কোরআন-হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ, প্রচার ও প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রপৌত্র এবং ত্বরিকার ধ্রুব নক্ষত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯২৮–১৯৮৮)-এর সম্মানিত উত্তরাধিকারী, অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক ২০১১ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী সাহেবকে ম্যানেজিং ট্রাস্টি হিসেবে মনোনিত করে 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এর কার্যক্রম ১৯৯৫ সাল থেকে চালু ছিল। এই ট্রাস্ট কুরআন ও সুন্নাহ্র আদর্শ ত্বরিকার বুজুর্গগণ তাঁদের জীবনে যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তারই আলোকে সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা ও সংঘাত নির্মূল করে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ট্রাস্ট মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূল শিক্ষা–বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সর্বজীবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও নিঃস্বদের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। সামাজিক ন্যায়বিচার ও একতা প্রতিষ্ঠা, মানুষের নৈতিক

চরিত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা ও সেবা প্রদান করে আসছে।

- ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন ৩১টি স্কুল ও মাদ্‌রাসায় ৪ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- মানবীয় সেবা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের আওতায় চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় ৫টি এতিমখানায় দুই শতাধিক এতিমকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ২০১৮ সাল হতে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পিছিয়ে পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ‘সবার জন্য শিক্ষা’ প্রকল্পের আওতায় ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৯৩ লক্ষাধিক টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় গৃহিত করোনাকালীন সময়ে আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত দেশব্যাপি ৫৭টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালেও যা চলমান থাকবে।
- শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী বৃত্তি তহবিল হতে ২৬৪৩ জন দরিদ্র্য, প্রতিবন্ধী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ১ কোটি ১৫ লাখ ২৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- এই ট্রাস্ট এম.ফিল এবং পিএইচডি গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে।
- এছাড়াও ২০২১ সাল হতে ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর সম্মানিত খলিফাগণের পুত্র ও কন্যা বংশীয় আওলাদগণের সন্তানদের আধুনিক ও যুগোপযোগি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে বিশেষ শিক্ষা বৃত্তি চালু রয়েছে।
- বর্তমান সময়ের নিরিখে দক্ষ ও সময়োপযোগি মানবসম্পদ উন্নয়নে এই ট্রাস্ট ২০১৫ সাল থেকে এই পর্যন্ত দুই শতাধিক দরিদ্র, মেধাবী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, মোবাইল সার্ভিসিং, রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, মটর ড্রাইভিং অটোমোটিভ, অটোক্যাড সহ বিভিন্ন কোর্সে কারিগরি বৃত্তি প্রদান করেছে।

- সমাজ এবং দেশের কল্যাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষকদের জ্ঞান ও শিক্ষাদানের আধুনিক কলা-কৌশল যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে।
- ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন 'যাকাত ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড' হতে ২০০৩ সাল থেকে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খাতে এ পর্যন্ত ৯ কোটি ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৮৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রান্তিক কৃষকদের সার ও বীজ বিতরণ, করোনা মহামারী দুর্যোগ প্রশমণে সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার প্রদান, সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের মাঝে ঈদ-উল ফিতরের দিন সকালে রান্না করা সেমাই বিতরণ, ছিন্নমূল শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতিসহ অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, ব্যবসায় পুঁজি, ঋণ পরিশোধ, অটোরিক্শা ক্রয়, বিদেশযাত্রা, মৎস্য খামার, হাঁস ও মুরগির খামার, সিএনজি চালিত অটোরিক্শা ক্রয়, সেচ পাম্প ক্রয়, কম্পিউটার প্রদান, ইট ভাঙ্গার মেশিন প্রদান, গবাদি পশুর খামার, কলের লাঙ্গল ক্রয়, সেলাই মেশিন প্রদান, মাছ ধরার জাল ও নৌকা ক্রয়, পুরাতন মোটর কার ক্রয়, শিক্ষা খাত, কনের বিবাহ, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা খাতে আর্থিক সহায়তা, গ্রামীণ নারীদের স্বাবলম্বী করণে উপকরণ হিসেবে ২টি করে ছাগল হস্তান্তর করা হয়।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আপদকালীন সহায়তা প্রদান, সীতাকুণ্ড বিএম ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আহতদের পাশে দাঁড়ানো এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, চন্দনাইশ, সাতকানিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় দূর্গতদের সহায়তা প্রদান করা হয়।
- এছাড়াও সাম্প্রতিকালে ফটিকছড়ির ভয়াবহ বন্যায় বানভাসী মানুষদের উদ্ধারের পর আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া, হাটহাজারী, সীতাকুণ্ড, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়ায় বন্যায় আটকে পড়া ১০ সহস্রাধিক দুর্গত পরিবারের মাঝে খাবার ও ত্রাণ বিতরণ করা হয়।
- দক্ষ নারী উন্নয়ন ও স্বাবলম্বীকরণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৯৫টি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ২,৮৩০ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের আওতায় ১৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯৫ হাজার ৫৮৮ জন দরিদ্র ও অসহায় রোগীকে প্রশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনামূল্যে ওষুধসহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬৫টি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৫২১ জনকে বিনামূল্যে ওষুধসহ চক্ষুসেবা প্রদান।
- দেশব্যাপী ৯৬২টি খৎনা ক্যাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৯,৬২০ জনকে বিনামূল্যে ওষুধসহ খৎনা করা হয়।
- প্রসূতি মায়েদের গর্ভধারণকালীন চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং দেশব্যাপি ৩১২টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ৭,৭৮৯ জন কিশোরীর নাক ও কর্ণ ছেদন করা হয়েছে।
- ২০১২ সাল হতে বার্ষিক উরস শরিফ সমূহে এই ট্রাস্ট চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলাধীন এমিতখানাসমূহের নিবাসীদের একবেলা খাবার সরবরাহ করে আসছে।
- ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ মহান ১০ পৌষ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ৯৬তম খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলার ৯৮৭টি এতিমখানা ও হেফযখানা, আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রমের ৫৭ হাজার নিবাসীদের মাঝে একবেলা খাবার পরিবেশন করা হয়। উল্লেখ্য, গত বছরও বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ৯৫তম খোশরোজ শরিফ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলার প্রায় ৭৩৬টি এতিমখানা ও হেফযখানা, আশ্রমের ৪১ হাজার নিবাসীদের একবেলা খাবার পরিবেশন করা হয়।
- এছাড়াও ট্রাস্ট চিকিৎসা, কনের বিবাহ, শিক্ষা, সিএনজি চালিত অটোরিক্শা ক্রয়, বিদেশযাত্রা, গৃহনির্মাণ, ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি খাতে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- এই ট্রাস্ট 'চট্টগ্রাম কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল'কে ১ কোটি টাকা এবং 'চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ক্যান্সার ইন্স্টিটিউট'কে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

- ক্যান্সারসহ জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তা প্রদান এবং অসহায়, দরিদ্র ও সংকটাপন্ন এ পর্যন্ত ৫৭জন কিডনী ডায়ালাইসিস রোগীকে সব রকম ডায়ালাইসিসে প্রায় ২৭,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম থ্যালাসেমিয়া সেবা কেন্দ্রকে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত রোগীদের ঔষুধ ও চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান হয়।
- করোনা মহামারীকালীন বৈশ্বিক সংকটে দেশের প্রায় ৭০ হাজার মানুষকে ত্রাণ বিতরণ, বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ফ্রি অক্সিজেন সেবা, দুর্দশাগ্রস্ত কয়েক হাজার পরিবারকে অর্থ সহায়তা, দাফন-কাফন প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে দাফন-কাফন কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রায় ৫ হাজারের অধিক রোগীকে ট্রাস্ট পরিচালিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত আলেম-উলামাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ট্রাস্টের বিশেষ আলেম সহায়তা তহবিল চালু রয়েছে।
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অসহায়দেরকে ধর্মীয় সহাবস্থান নীতির আলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়।
- সাধারণ দুঃস্থ তহবিল থেকে দরিদ্র ও সংকটাপন্ন আশেক-ভক্তদের সহায়তা প্রদান করা হয়।
- তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল 'মাসিক আলোকধারা' প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
- ইসলাম ধর্মীয় সঠিক আক্বিদা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ট্রাস্ট প্রকাশন 'আলোকধারা বুকস্' কর্তৃক অর্ধ শতাধিক বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- ট্রাস্টের গবেষণা ও প্রকাশনা উইং 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমি' ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে থাকে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ২০১০ সাল থেকে দেশ-বিদেশের সুফি গবেষক এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণের অংশগ্রহণে ৩টি জাতীয় এবং ৪টি আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন আয়োজন করেছে।
- ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও তাসাওউফের সুস্পষ্ট ধারণা নিশ্চিতে ১১টি উলামা সমাবেশ আয়োজন করেছে।

- আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রায় এক যুগ ধরে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলনের আয়োজন করছে।
- শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই ট্রাস্ট ১০টি শিক্ষক সমাবেশ আয়োজন করেছে।
- শিশু-কিশোরদের মাঝে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, মেধা-মনন ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১৭টি শিশু-কিশোর সমাবেশ আয়োজন করেছে।
- আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান – এই নীতিতে অটল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মীয় মত-বিরোধ নিরসনকল্পে এই ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও দেশবরেণ্য আলেমদের সমন্বয়ে সংলাপের আয়োজন করে থাকে।
- বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং তাসাওউফের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' ইসলামি আলোচনা অনুষ্ঠান 'আলোকধারা' প্রচারিত হচ্ছে।
- ট্রাস্টের সুফি সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী' দেশ-বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বহু অনুষ্ঠানে মাইজভাণ্ডারী সংগীত পরিবেশন করে আসছে। এছাড়াও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ কালচারাল ডেলিগেট হিসেবে গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দল ২০১৬ সালে মিশর গমণ করে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২য় আন্তর্জাতিক সুফি উৎসব, ২০১৯ সালে গোষ্ঠীর ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকার মাঠে 'জাতীয় মাইজভাণ্ডারী গানের মেলা' আয়োজন, শিল্পকলা একাডমিতে ইন্টারন্যাশনাল সুফি ও ফোক ফেস্টে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও গান বাংলা'র যৌথ প্রযোজনায় জাতীয় অনুষ্ঠান 'শেকড়ের সন্ধানে' গোষ্ঠীর শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে।
- সম্প্রতি ট্রাস্টের মিডিয়া ও কালচারাল উইংয়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে নিয়মিতভাবে সুফি গানের অনুষ্ঠান 'মরমিয়া' প্রচারিত হচ্ছে।
- মহিলাদের সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায়, পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 'আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক' মহিলা সংগঠন 'দি মেসেজ' ও 'আলোর পথে' নিয়মিতভাবে মাসিক মহিলা মাহফিল ও মাসয়ালা-মাসায়িল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে।

- যুব সমাজের আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং আত্মোন্নয়নমূলক একটি যুব সংগঠন 'তাজকিয়া' নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- এই ট্রাস্ট ধর্মের সঠিক চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বিষয়ে নিয়মিতভাবে চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।
- ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী এশীয় অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১২ সালের ১২–১৩ ডিসেম্বর জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক সংলাপে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক উদ্বাস্তু ও রাষ্ট্রবিহীন মানুষদের সুরক্ষা দেওয়ায় বাধ্যবাধকতার বিষয়টি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের বিধানের আলোকে একজন ধর্মীয় নেতা (ঋধরঃয খবধফবৎ) হিসেবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
- বিগত ২০১৪ সালের ১০-১২ মে "ইসলাম ধর্মে ইজতিহাদ তথা 'মুক্ত চিন্তা ও কিয়াসের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত'-এর গুরুত্ব" শীর্ষক কনফারেন্স তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৯৫টিরও অধিক মুসলিম দেশের এক হাজার শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ মতামত প্রকাশ করেন যে, বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলাম যে কোন সময়ে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। কনফারেন্সে ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ২০১৯ সালের নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্-এ, ২০২০ সালে আমেরিকার বস্টনস্থ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অব মেড্ফোর্ড 'আইসিসিএম'-এ, ২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন ও ফ্লোরিডায় 'পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল' এবং 'শানে রাহমাতুল্লিল আলামীন কনফারেন্স'এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে "ইসলামি দর্শন, সভ্যতা এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা" সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

➢ সেপ্টেম্বর ২০২২ ও জুন ২০২৩ অত্র ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টনস্থ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ 'নিউ ইংল্যান্ড শাখা' আয়োজিত 'পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল'এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। সেপ্টেম্বর ২০২২ ফ্লোরিডায় 'শানে রাহমাতুল্লিল আলামীন কনফারেন্স'এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'ইসলামি দর্শন, সভ্যতা এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

➢ ২০২৩ সালের ০২ ডিসেম্বর বস্টনস্থ ক্যামব্রিজ সিটির ১০১ রজার স্ট্রিট স্টুডিও হলে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা উইং 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমি'র উদ্যোগে আমেরিকার নিউইংল্যান্ডে বিভিন্ন শ্রেণিপেশায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা নির্বাচিত বাংলাদেশী কৃতিজনদের অংশগ্রহণে "সুফি দৃষ্টিভঙ্গি: শান্তি এবং ন্যায় বিচার" শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় সভাপতি হিসেবে তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

➢ ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আমেরিকার বস্টন শাখার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল ২০২৪' ও ১৫ নভেম্বর ২০২৪ SPIRITUAL WISDOM OF SUFISM IN ADDRESSING GLOBAL POLITICAL AND MORAL CRISES বিষয়ে আলোচনায় সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন এবং ১৭ নভেম্বর ২০২৪ নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং হলে A SPIRITUAL EVENING অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

➢ বিশেষ জনকল্যাণমূলক সেবার আওতায় এই ট্রাস্ট জনগণের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সহায়তায় প্রতি শুক্রবার এবং দরবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস সার্ভিস চালু করেছে।

➢ বিশেষ দিবসে ও বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে ন্যায্যমূল্যে খাবারের দোকান, সুপেয় পানীয় জল, ওযু, অস্থায়ী টয়লেট এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মৃত নয় বরং জীবিত

সাধারণত মানুষের ধারণা বা বিশ্বাস মৃত্যু শুধু এক প্রকার। কিছু লোকের এমনও ধারণা যে পরকাল বলে কিছু নেই। মানুষ কবরে মাটির সাথে মিশে যাবে। মৃত্যু প্রধানতঃ দুই প্রকার – আদি ও হাকিকী। আদি সাধারণ মানুষের মৃত্যু; আল্লাহ্‌র নবি ও অলিদের মৃত্যু হাকিকী। আদি শব্দের অর্থ বাস্তব আর হাকিকী শব্দের অর্থ কৌশলগত। যারা হাকিকী মৃত্যুবরণ করেন তাদেরকে মৃত বলতে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নিষেধ ঘোষণা করেন, "যারা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। যদিও তোমরা অনুভব করতে পারো না" (সূরা বাক্বারা : ১৫৪)। "আর যারা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাহাদিগকে মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত। তাদের কবরে আল্লাহ্ রিযিক বা আহার্য প্রেরণ করেন" (সূরা আল্ ইমরান : ১৬৯)। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের পরকালীন জীবন সাধারণত মৃত ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা স্বতন্ত্র বা আলাদা। তাদের দেহ পচে গলে যায় না। ওফাতের পর তাঁদের কোন কোন জনকে ঘামতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ নশ্বর, তাঁরা অবিনশ্বর। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে মৃত বলে ধারণা করতেও নিষেধ করেছেন। কবর জীবনেও তাঁরা আল্লাহ্‌র অপার নিয়ামত লাভ করে থাকেন। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ (দ.) বলেন; "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অলিরা মৃত্যুবরণ করেন না; বরং তারা এক ঘর হতে অন্য ঘরে গমন করেন। মৃত্যু হল বন্ধু বন্ধুর সাথে মিলনের সেতু বিশেষ" (আল্ হাদিস, লুবালুল আখ্‌বার)।

বাদশাহ্ আলমগীরের মাযার ভাঙ্গা অভিযান

মোগল সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব দেখলেন যে, হিন্দুস্থানে মাযারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক এক মাযারে এক এক ধরণের কর্মকাণ্ড। এভাবে চলতে দিলে আসলের চেয়ে নকল মাযারে দেশ ছেয়ে যাবে। কোরআন-হাদিস মতে অলি-আউলিয়া তো মরেন না, কবরেও জীবিত থাকেন। তিনি মাযারে শায়িত অলিদেরকে ঠিক কি বেঠিক পরীক্ষা করে দেখতে মনস্থ করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন– মাযারে গিয়ে আমি তিনবার সালাম পেশ করবো। যে সব মাযার হতে সালামের উত্তর আসবে সেগুলো থাকবে, বাকিগুলো ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। সৈন্য সামন্ত নিয়ে শুরু হলো বাদশার মাযার ভাঙ্গা অভিযান। প্রথমে তিনি হযরত নূর কুতুবুল আলম (র.)-এর মাযারে গিয়ে সালাম দিলেন। উত্তর নেই, হুকুম দিলেন মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। এভাবে যেতে যেতে পৌঁছলেন সুলতানুল হিন্দ, আতায়ে রাসূল, খাজায়ে খাজেগান গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনউদ্দিন চিশ্তির (র.) মাযারে, সালাম দিলেন– আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা এয়া সুলতানুল হিন্দ্। উত্তর নেই। এক দুই তিন বার। কোনই উত্তর নেই। বাদশাহ্ ভেবে হয়রান তিনিও কি মুর্দা? অবশেষে রওজা পাক হতে আওয়াজ হয়, ওয়া আলাইকুম আস্সালাম এয়া হুজ্জতে আলমগীর। বাদশাহ্ আলমগীর জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর দোষ মাফ করবেন, সালামের উত্তরে দেরী হল কেন? হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ বললেন, আউলিয়ারা সবসময় তাদের সমাধিতে থাকেন না। তাদের কেউ নিজ পীরের দরবার, কেউ গাউসুল আযমের দরবার, কেউ রাসূলে আকরাম (দ.)-এর দরবারে, কেউ বারিতা'লার দরবারে থাকেন। তাই সালামের উত্তর সহসা মিলে না। প্রথম সালামের সময় আমি দরবারে নববীতে ছিলাম। আপনার উগ্র ব্যস্ততা দেখে অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হলাম। যে সব মাযার ভেঙ্গেছেন সবগুলো পুনঃ তৈরি করে দিন। তাঁরা সকলেই জীবিত। এই নির্দেশে সরকারি খরচে ধ্বংস করা মাযারগুলো পুনঃনির্মিত হয় (সূত্রঃ ভারতের ইতিহাসঃ মুগল আমল)।

দুই মহাত্মার আলাপন

নক্‌শবন্দিয়া ত্বরিকার ইমাম হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি (র.) একদিন গাউসুল আযম দস্তগীর হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) রওজা শরিফে উপস্থিত হয়ে আরজি করলেন, “হে জগতের সাহায্যকারী, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কেননা আপনি জগতের ফরিয়াদ মঞ্জুরকারী, আপনাকে সকলে দস্তগীর বলে জানে”। রওজা শরিফ হতে উত্তর আসে– “হে জগতের নক্‌শাকারী, আপনাকে সকলে নক্‌শবন্দ বলে; আপনি আমার দিকে নজর করুন যেন আমার অন্তঃকরণে ‘আল্লাহ্’ শব্দ নক্‌শা হয়ে যায়। শেখ বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি যেদিকে দৃষ্টিপাত করতেন, ‘আল্লাহ্’ শব্দ নক্‌শা হয়ে যেত। সেজন্য তিনি জগতে নক্‌শবন্দি বলে খ্যাত।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর এক মুরিদ মাওলানা আদিয়াত উল্লাহ্ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। উক্ত মাওলানা বলেন, আমার পীরের ওফাতের পর একদিন আমি আবেগের সাথে বললাম, হযরত আকদাসকে এ জগতে আর দেখতে পাবো না। আমার সুখ দুঃখের কথা আর কাকে বলবো। আমার প্রাণাধিক গাউসুল আযম তো আর নেই। এ চিন্তা করে অতি প্রত্যুষে মসজিদ পুকুর ঘাটে অজু করতে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম পুকুরের পূর্বপার্শ্বে একটি আম গাছের তলায় হুজুর সৈয়্যদেনা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবাক চিত্তে তাকালাম; আর ভাবতে লাগলাম কী ব্যাপার। তিনি তো পরলোক গমন করেছেন। ‘এখানে কোথা হতে আসলেন’ না জানি আমার দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে কিনা? তিনি নীচুস্বরে আমাকে নির্দেশ দিলেন “মিঞা এক লোটা অজুর পানি দাও তো”। লোটায় পানি ভরে উপরে উঠে দেখি তিনি সেখানে নেই। আলাপের সুযোগ হারিয়ে আমি হতাশ, দুঃখিত ও ভীতকম্পিত অবস্থায় ঘরে ফিরলাম। আমার বিশ্বাসের কপাট উন্মুক্ত হল যে, আল্লাহ্‌র মাহবুব আউলিয়ারা চির অমর ও বিরাজমান, তাঁরা যথা ইচ্ছা গমন করতে পারেন (সূত্র: গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত)।

তাফসিরকুল সম্রাট আল্লামা হযরত জালাল উদ্দিন সূয়ূতি (র.) তাঁর ‘শর্‌হুস্ সুদুর’ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, হযরত নাসির উদ্দিন নিশাপুরী (র.) বলখ শহরের বড় কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন– একদা এক নতুন লাশ দাফন

করার জন্য কবর খনন করতে পাশের একটি পুরাতন কবর ভেঙ্গে যায়। দেখলাম সে কবরে একজন লোক দোজানু কেবলা মুখ হয়ে বসে আছেন। তার কোলে একখানা কিতাব খুব সুন্দর সবুজ অক্ষরে লেখা, কবরটিও সবুজ আলোতে আলোকিত। তিনি জোরে জোরে কোরআন শরিফ পাঠ করছেন। কবরে সূর্যের আলো পড়লে তিনি আমাকে দেখে বললেন কিয়ামত কি হয়ে গেছে? আমার কবর ভাঙ্গলো কেন? আমি বললাম হুজুর কিয়ামত হয়নি। পাশে নতুন কবর খনন করতে আপনার কবরের পাশ ভেঙ্গেছে। তখন তিনি বললেন, কবরের যে ইটগুলো খসে পড়েছে তা দিয়ে পুনঃ বন্ধ করে দাও। আমি কবরটি বন্ধ করে দিলাম (সূত্রঃ শর্‌হুস্ সুদুর, পৃষ্ঠা ৮০)।

ওফাতের পর শারীরিক দর্শন

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) বেসালের পরেও কেউ কেউ দেখেছেন। কাকেও তিনি আগের মত "নামায পড়বেন সমস্যা থাকবে না"। কাকেও তিনি বলছেন, "আমি মারা যাইনি আল্লাহ্‌র অলিরা মরে না", অনুধাবনের জন্য ৪টি কেরামত প্রকাশ করলাম। ১৯৮৮ সালের ২৬ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল বেলা মাইকে ঘোষণা শুনে এক প্রতিবেশী খবর দিলেন শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (ক.) গত রাতে চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে ইন্তিকাল করেছেন; আজ বিকাল ৪ ঘটিকায় ভাণ্ডার শরিফে নামাযে জানাযা। জ্বরে ভুগে ক'দিন ধরে কাজীর দেউরী বাসায় শয্যাশায়ী। তাই তাঁর অসুখের খবরও জানতাম না। বিছানায় শুয়ে অনেক্ষণ কেঁদে শান্ত হলাম। শরীর খুবই দুর্বল জ্বরও ছাড়ে নি। জানাযায় অংশগ্রহণ সম্ভব নয় বিধায় আস্তে আস্তে নিকটস্থ দামপাড়া ব্যাটারী গলিতে তাঁর আস্তানা শরিফে শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম; সময় সকাল ৯টা। বারান্দায় দরজা বরাবর দক্ষিণমুখী হয়ে শাহানশাহ্ বাবাজান পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে বসে আছেন। তাঁকে দেখে খুশিতে ওফাতের কথা একেবারে ভুলেই গেলাম। একটু তফাতে থাকতেই বললেন, 'আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসুন'। দোকান থেকে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট কিনে নিয়ে দেখি তিনি সেখানে নেই। ভিতরে আছেন মনে করে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। অতঃপর আমার স্মরণ হয় আমি তো তাঁর ওফাতের খবর শুনেই এসেছিলাম।

তবে আমি কার সাথে কথা বললাম! সিগারেটের প্যাকেটসহ আসন শরিফে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। মনে প্রশ্ন জেগে রইলো, জীবন-মৃতুর এ খেলা বাস্তব না অলীক?

বর্ণক: মৌলবী সৈয়দ নুরুল হক শাহ্, পিতা- আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরেবাংলা (র.), কাজীর দেউরী, চট্টগ্রাম।

বাবাজানের কফিন হুজরা শরিফে রাখা। অনেক লোকের ভিড়। এক নজর দেখতে গিয়ে দেখি বাবাজান মুখে কী যেন বিড়বিড় করে বলছেন। বিস্ময়ে হতচকিয়ে গেলাম। সবাই বলে, 'মারা গেছেন', আমি দেখলাম 'জীবিত'। তখন থেকে দাফন পর্যন্ত যতবার আমি বাবাজানকে দেখেছি ততবার একইরকম দেখেছি। তাঁর এই জীবন্ত স্মৃতি নিয়ে এক যুগ পর আমি এখনো বেঁচে আছি। আমার দু'চোখে তিনি চির অমর।

বর্ণক: জমিল আহামদ সওদাগর, পিতা-মৃত পছন মিঞা, গ্রাম-মানিকপুর, উপজেলা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম।

এমনি অভিজ্ঞতা আরও বহুজনের। আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। প্রথম জানাযা সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় জানাযার জন্য বাবাজানের কফিন রাখা হয়েছিল গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের সামনের বারান্দায়। তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক যারা দেখেন নি কিংবা বার বার দেখেও তৃপ্ত নন এমন বিপুল মানুষের চাপ ও অনুরোধে গিঁট খুলতে কাফনের ভিতর হতে মুখের ফুঁতে কাফনের কাপড় নড়ে উঠে বাতাস আমার মুখেও লাগে। জীবনের এই অভূতপূর্ব ঘটনায় ভয় বিস্ময়ে শরীরের কাঁপুনিতে স্থির থাকতে না পেরে; কী করে বারান্দার উত্তরের লোহার গেট লাফিয়ে প্রচণ্ড ভিড় এড়িয়ে হক মন্‌জিলে পালিয়ে আসলাম সেটাও আরেক বিস্ময়। শরীর ঠিক হতে বহুক্ষণ সময় লাগে।

বর্ণক: জীবনী লেখক ও সাধারণ সম্পাদক, এন্তেজামিয়া কমিটি, গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

আমি পেশাগত কাজে ঢাকা ফার্মগেটে গিয়েছিলাম। রিক্‌শা থেকে নামতেই ৫০/৬০ গজ দূরে অন্য এক রিক্‌শাতে শাহানশাহ্ বাবাজানকে বসে সিগারেট টানতে দেখলাম। দু'জন লোক হাতজোড় করে নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিতো জানি যে, তিনি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাই আমার

কৌতুহল বেড়ে যায়। সতর্ক দৃষ্টিতে ভিড় এড়িয়ে কাছে যেতে চেষ্টা করি। কিন্তু পথচারীর সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার সামনে দৃষ্টি দিতে দেখি বাবাজান রিক্‌শা কিংবা করজোড়ে দাঁড়ানো লোকগুলো কিছুই আর নেই, দিন দুপুরে স্বপ্ন ভঙ্গের মত সব মিলিয়ে গেল।

বর্ণক: জামাল উদ্দিন, গজল ও অংকন শিল্পী, আইডিয়েল প্রোডাক্টস, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

আউলিয়াগণ জীবিত

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নবি হযরত উযায়ের (আ.) একশত বছর পর পুনঃ জীবিত হওয়া (সূরা বাক্বারা ঃ ২৫৯) এবং আসহাবে কাহাফ ও তাঁদের কুকুর ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে জেগে উঠেন (সূর কাহাফ: ১২)।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.) বলেন–

(ক) কবরে শায়িত আল্লাহ্‌র অনেক মকবুল বান্দা – হাজার হাজার জীবিত ব্যক্তির চেয়ে মানুষের অধিক উপকার করে থাকেন।

(খ) তাঁদের কবরের মাটিও মানুষের উপর ছায়াদাতা – লাখো জীবিত ব্যক্তি এ কবরবাসীদের ছায়ায় রয়েছে। মোদ্দাকথা কোরআন, হাদিস ও আল্লাহ্‌র মাহবুব আউলিয়াকেরামের এসব ঘটনাবলী থেকে এ কথাই দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত যে, ওফাতের পরও তাঁরা জীবিত এবং অনন্ত কর্মময় তাঁদের জীবন।

জীবনের হেথায় শেষ নয় ওপারে রয়েছে চিরন্তন। সবুজ গাছ যেমন বের হয়ে আসে জ্বলন্ত কয়লা অনুক্ষণ (সূরা ইয়াসিন : ৮০)।

ভুলি কেমনে আজো যে মনে

এ মহান অলি-উল্লাহ্‌র কথা জীবন-জীবনান্তে কখনো ভুলবার নয়। কতবার পাশে বসিয়ে ভাল ভাল নাস্তা চা দিয়ে মেহমানদারী করেছেন, দীর্ঘ আলাপনে মন ভরিয়েছেন এবং নিজের গাড়িতে করে নানাস্থানে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। প্রথম দেখা ১৯৭৮ সালে। তারপর কামিল পরীক্ষার জন্য দোয়া চাইতে যাই পরীক্ষা চলার মাঝখানে। আবার গেলে আমার নামের সাথে 'আল কাদেরী' শব্দ যোগ করে ডাকলেন। তাতেই বুঝেছিলাম পরীক্ষা পাশের দোয়া কবুল হয়েছে। কেউ আমাকে কাদেরী সাহেব ডাকলেই তাঁর কথা মনে পড়ে যায়। একদিন অনুরোধে

আমাদের বাড়ি রওয়ানা হলেন। বাড়ি থেকে ১ মাইল পশ্চিমে পৌঁছে আবার মাইজভাণ্ডার শরিফ ফিরে যেতে চাইলে অনুনয় করাতে চোখ বন্ধ করেই বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। ভয়, শঙ্কা ও আনন্দে তখন আমি দিশেহারা। ভয় শঙ্কা এজন্য যে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আহত হন! তিনি ইতিপূর্বে আমাদের বাড়ি তো নয়ই আমাদের গ্রামেও কখনও আসেন নি। তবু সোজা গিয়ে আমাদের ঘরেই ঢুকলেন। ভাল লেপ তোষক ও চাদর দিয়ে সাজানো বিছানায় আরাম করলেন। অনুমতি নিয়ে মিলাদ ও জিকির মাহ্ফিলের আয়োজন করলাম। মাওলানা সাহেবেরা এসে পৌঁছলে খাট থেকে নেমে গিয়ে তাদেরকে সেখানে বসার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। অতঃপর সকলের সাথে তিনিও নীচে বসলেন। মাহ্ফিল শেষে তাঁকে দোয়া-মোনাজাত করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি নিজে না করে উপস্থিত যোগ্য আলেমদের বাদ দিয়ে এ অধমকেই মোনাজাতের নির্দেশ দিলেন। অন্যদের সাথে তিনিও মোনাজাতে হাত তুললেন এবং সকলের সাথে 'আমিন' বললেন। হুজরা শরিফে তাঁর সাথে মিলাদ মোনাজাত করার বহু দুর্লভ সুযোগ আমার নসিব হয়েছে। আমাদের বাড়িতে থাকাকালীন হাদিয়া নজরানা-টাকা ও দ্রব্যসামগ্রী যা পেয়েছেন এক মহিলাকে দিয়ে দেন। খবর নিয়ে জেনেছি মহিলাটি বড় অভাবে ছিল। ঘন ঘন যাওয়া আসা করাতে তাঁর জজ্বিয়াতের (প্রখরতা) কিছু প্রভাব আমার উপর পড়লে ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবকিছু ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়। তখন আমি চট্টগ্রাম শহর বক্সিরহাট ছমদিয়া মার্কেটে কাপড়ের ব্যবসা করতাম। শেষে একেবারে পাগলপ্রায় হয়ে যাই। মা-বাবাসহ পরিবারের সকলের কান্নাকাটিতে তিনি আমাকে ছেড়ে দেন।

আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি। শেষে দোকানটা বিক্রি করে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলি। অতঃপর নিকটে উপস্থিত হলে মুখে কিছু বলার আগেই জজ্বাহালে বলতে লাগলেন, 'সবসময় টাকা টাকা কর কেন? বিদেশ যাওয়ার চিন্তা কর কেন? 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জিকির করতে পার না? অন্তর্যামী অন্তরের কথা যখন বলেই দিলেন আমিও আর্জি করলাম, বাবাজান, পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা না হলেতো চলে না; তাই বিদেশ যেতে চাই! দয়া করে অনুমতি দিন। অনুমতি পেয়ে আবুধাবী চলে যাই। কয়েক বছর পর দেশে ফিরে দেখা করলে খুশি হয়ে হুজরা শরিফের ভিতরের কক্ষে ডেকে নিয়ে একখানা গালিচায় বসিয়ে অনেক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ করেন। ছোট ভাইকে বিদেশ পাঠাতে দোয়া চেয়ে তাঁর জন্য

কী আনবে আর্জি জানালে প্রথমে কিছু লাগবেনা বলে জানান। বার বার অনুরোধে একখানা গালিচা আনতে বলেন। বিদেশে তাঁর দয়ায় ছোট ভাই উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক উন্নতি করে। আবুধাবীতে ফল-মুলের বিরাট পাইকারী ব্যবসা। আমরা চার ভাই কয়েকজন কর্মচারী ও ভ্যান গাড়ি দিয়ে ব্যবসা করছি। তাঁর অপরিসীম দয়া মেহেরবাণীতে আমাদের পরিবার এখন স্বচ্ছল ও সুখী।

স্বর্ণকার যেমন খাঁটি সোনা, কর্মকার যেমন উত্তম লোহা, এক ডাক্তার যেমন অন্য ডাক্তারকে ভাল চেনেন তেমনি কোন অলি উল্লাহ্ই অন্য অলি সম্পর্কে সঠিক বলতে পারেন। তাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ক'জন সুন্নী আলেম মাওলানা ও দেশের ক'জন পীর সাহেবের নাম উল্লেখ করে কামেল কিনা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। আলাপ হচ্ছিল চলমান গাড়িতে দুজন পাশাপাশি বসে। কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর রসালো মন্তব্যে আমার সাথে তিনিও হেসে উঠেন। চট্টগ্রাম শহরের আছদগঞ্জ ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ শামশুল হুদা[১] (র.) সাহেব কেমন জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'তিনি অনেক বড় অলি-উল্লাহ্'। বললাম তাঁরা বংশানুক্রমে কাদেরীয়া ত্বরিকার পীর, খাস সৈয়দ বংশ এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পীর। আবার অধ্যক্ষ হুজুরের কাছে শুনেছি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী বায়াত হতে ইচ্ছুক কিছু লোককে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন।

মাদ্‌রাসায় পড়ার সময় একবার প্রিয়নবি হযরত রাসূলে করিম (দ.)-কে স্বপ্নে দেখার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন থেকে আমার চোখ খুঁজে ফিরছিল সেই অপরূপ সুন্দরকে। প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিল শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী আমার সেই স্বপ্ন সুন্দরেরই প্রতিরূপ। আল্লাহ্‌র মহান দরবারে নিত্য ফরিয়াদ, এই সুন্দরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেন জীবন মরণ হাসর নসর পর্যন্ত অটুট থাকে। তাই 'ভুলি কেমনে, আজও যে মনে পড়ে বার বার'।

বর্ণক: আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল সবুর আলকাদেরী, পিতা-মৃত গুরা মিঞা সওদাগর, গ্রাম-উত্তর সর্তা, থানা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম।

১. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার জাফতনগর ইউনিয়নের তেলপারই গ্রামে তাঁর বাড়ি ও মাযার। ৫ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর তাঁর ওফাত বার্ষিকী উরস শরিফ। ওফাত ১৯৯৫ খৃ:। জীবনের প্রায় ৫০ বছর শিক্ষকতা করে তিনি কয়েক হাজার আলেম তৈরি করেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতে তাঁর হাজার হাজার মুরিদান ও ভক্ত অনুসারী রয়েছে।

শাহানশাহ্ বাবাজানের যোগ্য উত্তরসূরি
মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী

"আল্লাহ্‌র এই সুসংবাদ তাদের জন্য যারা সুদৃঢ় বিশ্বাসে স্মরণ করে ও সৎ কর্মশীল। [হে মোহাম্মদ (দ.)] আপনি বলুন, এর জন্য (ফলপ্রসূ ইসলামী জীবন শিক্ষা দান) নিকটজনের ভালবাসা ব্যতিত আমি তোমাদের নিকট হতে কোন বিনিময় চাইনা" [সূরা শূরা : ২৩ (আয়াতাংশ)]।

হে মানবগণ, আমি তোমাদের মধ্যে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা ধরে থাকলে আমার পরে তোমরা কখনও পথহারা হবেনা' যার একটি অপরটি হতে বড়। তোমাদের হাতে কিতাবুল্লাহ্ (কোরআন) এবং আমার আহ্‌লে বাইত – বংশধরগণ (হাদিস গ্রন্থ মিশ্‌কাত বাব আহ্‌লুল বাইত)।

আলো ছাড়া অন্ধকারে পথ চলা যেমন সম্ভব নয়; তদ্রুপ জ্যোতির্ময় অধ্যাত্ম, পুরুষের শিক্ষা দীক্ষা ও সঙ্গ ব্যতিত ইহ এবং পরকালীন মুক্তিও অসম্ভব। এজন্য নবিয়ে করিম (দ.) হতে বেলায়তের উত্তরাধিকারের অভিষেক চলে আসছে যুগ যুগান্তর ধরে। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর একমাত্র ছেলে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (জন্ম ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯, ৫ পৌষ)কে শৈশবকাল হতে এ লক্ষ্যে গড়ে তোলেন।
১৯৭৩–৭৪ সালে আফ্রিকার ইথিওপিয়া ও বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় পিতার পবিত্র কণ্ঠ থেকে একাধিকবার শুনা গেছে, "শিশুরা খাওয়ার জন্য একটু দুধও পাচ্ছে না, আমার হাসান মিয়া না বাঁচলে দুনিয়াতে কোন শিশু বাঁচবে না"। মাত্র ৫ বছর বয়সে কোটি কোটি শিশুর প্রাণ প্রতীকে পরিণত হন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.)। ফটিকছড়ি উপজেলার ছিলোনীয়া নিবাসী দরবার শরিফ স্টোরের সাবেক ম্যানেজার খায়রুল বশর মাস্টার একদা হক মন্‌জিলে দেখা করলে বলেন, "তাঁর মা হাসান মিয়াকে পড়া একবার শিখিয়ে দিলে মুখস্ত হয়ে যায়। হাসান মিয়া আউলিয়ার গোষ্ঠী অলি জী"।
সাত বছর বয়সে খত্‌না পরবর্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুন্দর জামা কাপড় পরিধান করে সালাম করতে গেলে প্রায় দেড় ঘন্টা হুজরা শরিফের খাটে বসিয়ে রেখে পিতা ছেলেকে এক নজরে চেয়ে থাকেন। আমরা ক'জন একবার হুজরা শরিফে দেখা করলে সুইচের সাথে এলোমেলো জড়ানো কিছু ইলেকট্রিক তার দেখিয়ে

বলেন, "সেখানে যে ইলেকট্রিক আছে আমি কি জানতাম! এগুলো ধরতে গেলে হাত ধরে টান দেয়। হাসান মিয়া আমাকে তিনবার বাঁচিয়েছে"।

'আমি যে কাজটা করি কড়াভাবেই করি এবং তাতে উপকার আসে। যেমন হাসানকে বাহির থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া না নিতে এক Principle করে ফেলেছি; তাতে ক্ষতি হবে, লাভ হবে না' শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর ডায়েরীতে লেখা সিদ্ধান্ত। ১৯৭৭ সালে এক দোকানদারের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে 'হাসান মন্‌জিল' নাম ফলকটি তৈরি করিয়ে তৎকালীন বড় কাচারির চালের উপর লাগান এবং ৬ মাস পর সরিয়ে নিতে বলেন। ১৯৭৮ সালে বাবাজান জজ্‌বা হালে এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ সহ উপস্থিত সদস্যদের এই বলে মন্‌জিলের অফিস হতে বের করে দেন যে, "এখনও বাবাজান আছেন। আমার এখানে উরসের নামে তালটি ফালটি চলবে না; আপনারা চলে যান", আমরা ঘেরার বাইরে গেলে সলুক অবস্থায় পিছন হতে আবার ডেকে বলেন, "হাসান মিয়া আপনাদের ডাকছেন; আপনারা কাজ চালাতে পারবেন। অতঃপর আবার আমরা কাজে তৎপর হই"।

শেখ মুজিবুর রহমান বাবুল বলেন, আমাদের আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেনের বাসায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী ও তাঁর একমাত্র শাহ্‌জাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.) একবার একসঙ্গে মিলিত হলে আমার বাবাকে লক্ষ্য করে বলেন, "আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে কি কোন ভিন্নতা আছে? আমরা দু'জনের মধ্যেও নাই; হাসান মিয়া আল্লাহ্‌র মস্তবড় অলি"। বাকলিয়ার বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা তাহের উদ্দিনকে বলেন, "আমার হাসান মিয়া আল্লাহ্‌র মস্তবড় অলি, মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছেন; সাধ্যমত সমীহ-সম্মান করবেন"।

ফটিকছড়ি উপজেলার দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী জেলা দায়রা জজ আবুল মনসুর সিদ্দিকী এক অনুষ্ঠানে বলেন, শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন হলেও ছেলের লেখাপড়ার বিষয়ে সজাগ ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে শিক্ষকতা করার সময় একবার দরবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে আমাকে বলেন, "আমার হাসান মিয়া চট্টগ্রাম চৈতন্য গলিতে খালার বাসায় থেকে শহরে লেখাপড়া করে। আপনি গিয়ে ইংরেজি কেমন পড়তে পারে দেখে একটু শিখিয়ে দেবেন কি?" নির্দেশ পালন করে জানিয়েছিলাম, উনি মেধাবী, লেখাপড়ায় আগ্রহী, ইনশাআল্লাহ্ ভাল করবেন। শুনেছি মায়েরও ইচ্ছা ছেলে বিদ্যাশিক্ষায় জ্ঞানীগুণি হয়ে যেন দাদার মত জ্ঞান চর্চা

ও মানবতার সেবায় নিয়োজিত হন। স্কুল কলেজে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিশিষ্ট আলেমদের নিকট সম্পন্ন হয় তাঁর প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা।

ওফাতের দিন ভোরে চেয়ারে বসিয়ে, তাবার্‌রুক খাইয়ে এবং পতেঙ্গা থেকে কক্সবাজার সৈকত পরিভ্রমণে সফর সঙ্গী করে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী নিজ একমাত্র ছেলেকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা দিয়ে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের মওলায়ী ক্ষমতার উত্তরাধিকারী অছি মনোনীত করে যান। ছেলে তখন ১৯ বছর বয়সের কলেজ ছাত্র। ফলে জাগতিক লেখাপড়া, ত্বরিকতের ইবাদত-রিয়াজত এবং গাউসিয়া হক মন্‌জিলের গদিনশীন হিসেবে সব্যসাচীর মত ভক্ত-অনুরক্তদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনার কাজ একই সাথে চালিয়ে যেতে হয়। ১৯৯৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজিতে অনার্স সহ এম.এ. পাশ করেন। ১৫ মাঘ ২৯ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রশাসক জনাব সেকান্দর হোসাইন মিঞার তৃতীয় কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইতিমধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিনয়ে তিনি সর্বশ্রেণির মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সুন্দর বর্ণনা চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণ-এর ৮ অক্টোবর ১৯৯৮ সংখ্যায় 'ইদরিস আলমের কলাম'-এ প্রকাশিত। খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ কলাম লেখকের মন্তব্য, বিশ্ব অলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হকের ইন্তিকাল উপলক্ষে শহরে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। হযরতের একমাত্র পুত্র সম্পর্কে আমাকে কাদেরী বলেছিলো, অতি উচ্চ শিক্ষিত, সজ্জন ও সুদর্শন। এই বিনয়ী যুবক সম্পর্কে উৎসুক হয়ে পড়ি স্বাভাবিকভাবেই। শাহ্‌জাদা হাসানের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় খুব অল্প সময়ের জন্য নূর মোহাম্মদের মেয়ের বিয়েতে। বোধ হয় বদি অথবা নূও মোহাম্মদ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।

শোয়েব কিছুদিন আগে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তার ইচ্ছা হলো মাইজভাণ্ডার যাবে এবং হাসানের সাথে দেখা করবে। তিনি শুক্রবারে বাড়িতে থাকেন। দরবার শরিফে আগত লোকজনদের দেখা দেন ও তাদের আকুতি আর্তি মন দিয়ে শোনেন।

মাইজভাণ্ডার থেকে ফিরে শোয়েব বলল, বিকেল বেলা পর্যন্ত তারা শাহ্‌জাদা হাসানের সঙ্গেই ছিলো। সেখানে আহার করে ও জুমার নামায পড়ে। মনে হয়

কথাটা শোয়েবই তুলেছিলো। আমার লেখার কথা। তিনি বললেন আমিতো নিয়মিত পড়ি। তবে ইদানিং লেখার ধার কমে গিয়েছে। খানিকটা যেন আপোষকামীতা এসেছে।

তাঁর মন্তব্যই প্রমাণ করে তিনি অতিশয় প্রাজ্ঞ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সময় সচেতন। তাঁর কথাটা পুরোপুরি সত্য। আমি অকপটে স্বীকার করছি, লেখায় একটা আপোষকামীতা এসেছে। এটা তাঁর যেমন চোখে পড়েছে আমিও এতে ভুগছি দারুণ মর্মজ্বালায়। মাননীয় হাসান .... আমি যেদিন আপনাকে দেখেছি, সেদিনই মনে হয়েছে আপনি নফ্‌সে জাকিয়া, আপনি ইয়াহিয়া, আপনি সিরাজ ভ্রাতা মেহেদী। আপনি যেন সেই যুবক, যে রাভী নদীতে হারিয়ে যাওয়ার পর যার জন্য সম্রাট জাঁহাঙ্গীর এক বছর শোক পালন করেছিলেন। আপনাকে আমার খুব আপন মনে হয়। আপনাকে দেখতে ইচ্ছে হয় খুব। দোয়া করুন যেন লেখায় ধার আসে।

জীবনে এমন দেখিনি

ফটিকছড়ি উপজেলার নির্বাহী অফিসার হিসাবে ৪ বছর (১৯৮৫–৮৯) দায়িত্ব পালন করেছি। চাকুরিতে যোগদানের পর পর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ যিয়ারত করি। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর নাম শুনে দেখা করতে গেলাম। তাঁর দরবারের প্রবেশ মুখে মসজিদ পুকুরের উত্তর পাড়ে দু'সারি দোকান। তাই গাড়ি প্রবেশে অসুবিধা তদুপরি কাঁচা রাস্তা। দেখা করে দোয়া চাইলাম, তিনি সম্মতি জানালেন। কমিটির সভাপতি-সম্পাদককে বললাম, কোন ভদ্রলোকের বাড়ির সাথে তো দোকান থাকতে পারে না। দোকানগুলো কেন বসিয়েছেন, ভাড়ার জন্য? ওনারা বললেন, জায়গার মালিক দরবার নয় অন্যরা; তাই দোকানগুলো উঠানো সহজ নয়। তবু মনে মনে ঠিক করলাম, সুযোগ পেলে মসজিদের সম্মুখ হতে পুকুর পাড় হয়ে বাড়ির গেট পর্যন্ত দোকান মুক্ত করবো। পুকুর ও পুকুর পাড়ে কিছু খাস সরকারি অংশ দেখে শাহানশাহ্ বাবার ছেলের নামে আবেদন করলে তা মঞ্জুরী দিয়েছি। বাবার নির্দেশমত দোকান উচ্ছেদ করে ইট বিছানো পাকা ঘাট ও রাস্তা নির্মাণে প্রধান ভূমিকা রাখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শ্রেণিবন্ধু প্রধানমন্ত্রী মিজান চৌধুরী'র আর্জি আবেদন ও দোয়া চাইতে বহুবার তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনি আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। আমার পরিবারের

জন্য বহু দোয়া মেহেরবাণীও পেয়েছি। তাঁর ঐতিহাসিক জানাযা এবং রওজা শরিফের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। কয়েকজন মন্ত্রীর মাইজভাণ্ডার শরিফ সফরকালীন প্রটোকল দায়িত্ব পালন করেছি। তন্মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক শিক্ষা, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সাবেক ধর্মমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ.কে. আমিনুল ইসলাম, সাবেক যুব উন্নয়ন এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এসব ডাকসাইটে দেশের সেরা রাজনীতিবিদদেরকে তাঁর সাক্ষাতে ভয়ে কাঁপতেও দেখেছি। দীপ্ত জজ্‌বাহালে কেইবা তাঁর সম্মুখে স্বাভাবিক কথা বলতে পারে? আবার শান্ত সলুক অবস্থায় ছোট্ট শিশুর অনাবিল কর্মকাণ্ড মধুর হাসি ও অপার্থিব আন্তরিক ব্যবহারে নিজের সত্ত্বাকে ক্ষণিকের তরে হলেও ভুলে যায়নি তেমন দর্শনার্থী কেউ ছিলেন বলেও মনে হয় না। দীর্ঘ চাকুরি জীবনে কত শ্রেণি পেশার লোকের সাথে মিশেছি। কিন্তু জীবনে এমন লোকের দেখা আর পাইনি। তাঁর মধ্যে আমি এক নিষ্পাপ শিশুকে দেখেছি।

বর্ণক: তফজ্জল আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফটিকছড়ি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গিয়ে তাঁর সাথে আলাপচারিতার চেষ্টা কোনদিন করিনি। তাঁকে একনজর দেখাই সৌভাগ্য মনে হত। তিনি ছিলেন সার্বিকভাবে আল্লাহ্ পাকের সাথে একাত্ম। তা না হলে তাঁর মাধ্যমে বিশ্বজোড়া ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক যেসব কেরামত প্রকাশ পেয়েছে, তা কখনো সম্ভব হতো না। অর্ধেক পৃথিবী সফর করেছি তাঁর মত দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিনি।[১]

বর্ণক: আলহাজ্ব বজলুস সত্তার, সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (মাওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত), সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে অতি নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যতই দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। কখনো যাচাই করার দুর্মতি হয়নি। বুকভরা ভক্তি নিয়ে মনে মনে নিজেকে নিবেদন করতে চেষ্টা করেছি। তাঁর কল্যাণের ছায়া কতটুকু আমার উপর পড়েছে জানিনা। কিন্তু বিশ্বাস করি ভক্ত শেষতক নিরাশ হয়না। আমার আকুতি তাঁর অজানা নয়।

বর্ণক: অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, সম্পাদক, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।

১৯৮৮ সালে এক সফরের সময় অনুরোধে তিনি আমার গুলশানের বাসায় উঠেন। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক সাহেব (সাবেক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী ১৯৯৬–২০০১) দোয়াপ্রার্থী হলে দুজনকে লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বলেন, আপনারা দুজন তো এক জায়গার লোক। বললাম, আমরা দেশে এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছি যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঠিক রাখাও সম্ভব হয় না। আত্মীয় উল্লেখে তিনি আমার মনকে এমন এক গভীর মমতায় ভরিয়ে তোলেন যেরূপ জীবনে আর কারো কাছ থেকে পাইনি। আমি গুনাহ্গার বান্দা, তিনি আমাকে বহু কিছু দিতে চাইলেও নিতে জানিনি।

বর্ণক: মিজানুর রহমান চৌধুরী (সাবেক প্রধানমন্ত্রী ১৯৮৬–৮৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), উত্তরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব নিয়ে বিদেশী জাহাজে কাজ করতে গিয়ে কতবার ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়েছি। ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের পর বিদেশী সাহায্য সামগ্রী নিয়ে একসাথে আসা বহু জাহাজের জট সরিয়ে বার্থিং দিতে বন্দরে দিনরাত কাজ চালাতে হয়েছে। বিরতি ছাড়া দুই শিফ্‌ট অর্থাৎ ১৬ ঘন্টার অধিক একটানা কাজ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ মহান কর্মীপুরুষ আমার অফিসার কলোনীর বাসায় ক'বার অবস্থানে দেখেছি– খাওয়া নেই, গোসল নেই, বিশ্রাম নেই, দিন রাত একটানা নিজের কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত। এমন নজিরবিহীন অক্লান্ত কাজের লোক জীবনে অন্যটি দেখিনি।

বর্ণক: ক্যাপ্টেন রমজান আলী, সাবেক ডেপুটি কনজারভেটর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর।

প্রজ্ঞার আলোকে তিনি ছিলেন দেদীপ্যমান সূর্যের প্রাণবন্ত অস্তিত্ব। অজেয় জীবন চর্চায় স্রষ্টার সকল সুন্দরতম উপাদানকে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী ধর্ম-বর্ণ শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানকে তিনি স্বীকৃতি দেন আধ্যাত্মিক ভাববাদিতার সাযুজ্যে। আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের সত্যকে তিনি নিরন্তর দ্বন্দ্ব হতে তুলে নিয়ে আপন শ্রীমন্ত স্বভাবের শৈল্পিক সৌন্দর্যে ও ছন্দের প্রজ্ঞা ও প্রেমের নির্যাসে সখ্যতার অসাধারণত্বে একীভূত করেছিলেন[২]। সুফি সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে এ বিষয়ে অন্য কাউকে এমন দেখা যায় না।

বর্ণক: শওকত হাফিজ খান রুশ্নি – বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব; সাব-রেজিস্ট্রার, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

সূত্র:

১। যা ভাষায় বর্ণনাতীত, আলহাজ্ব বজলুস সাত্তার, শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা-৪৩, ৪৪।

২। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রজ্ঞা ও প্রেমের মহামিলন তীর্থ, শওকত হাফিজ খান রুশ্নি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২০।

তবু আমারে দেব না ভুলিতে

॥ ১ ॥

"আমি চিরতরে দূরে চলে যাব,
তবু আমারে দেব না ভুলিতে"।

কথা কয়টি কবি নজরুলের বহুল শ্রুত ও গীত একটা আবেগময় গানের প্রথম কলি। যে হস্তাক্ষর শোভা পাচ্ছে, তা শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র হাতের। ওফাতের ২৯ বছর আগে একটা ডায়রীর পাতায় হৃদয়ের কোন বেদনা-বিধুর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে তিনি কবি নজরুলের এই অনুপম শব্দমালা অবলম্বন করেছিলেন কে জানে!!
শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই। তবে তিনি আছেন লক্ষ লক্ষ আশেক-ভক্তজনের হৃদয়ে। এই আশেক-ভক্তরা তাঁকে ভুলেননি, ভুলতে পারেননি। হ্যাঁ, তিনিই তাঁকে ভুলতে দেননি। আপদে-বিপদে-বঞ্চনায়, মানব জীবনের অনির্বচনীয় অসহায়তায়, পথের দুর্গমতায়, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ভয়াবহতায়, মরুভূমিতে বিরান মৃত্যুক্ষুধায়, গহীন অন্ধকারে নিঃসঙ্গতায় জালেম-বিবেকহীনের নিষ্ঠুরতায় বিপন্ন আদম-সন্তানেরা যখন নিরীহ খরগোশ শাবকের চেয়েও অসহায় অবস্থায় পড়ে এমনকি আর্তনাদ করার ভাষা এবং শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে সম্বিতহারা হয়ে পড়ত; হযরত নূহ্ নবির (আ.) কিশ্তির মতো বেবাম দরিয়ায় আশা-ভরসা ছেড়ে ভেসে পড়ত; তখন জলপাই পাতা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে আসা ফেরেশ্তারূপী কবুতরের মত, আল্লাহ্র বিমূর্ত রহমতের ন্যায় ঐ বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত অসহায়-সম্বিতহারা মানুষের পাশে বরাভয় দিয়ে যিনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নিযুত-লক্ষবার; ঐ লোক সকল তাঁকে কীভাবে ভুলতে পারে? তাঁকে ভুলবার সকল রাস্তাতো তিনিই বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনিই তো অবচেতন মনে গুণ গুণ করে গেয়ে উঠতে পারেন– 'চিরতরে আমি দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেবনা ভুলিতে'।
হ্যাঁ, আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারবেন না। তিনি অর্থাৎ হযরত শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীই ভুলতে দেননি। তাঁর মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা, করুণা, মেহেরবাণী, দয়া উপচিকীর্ষা প্রভৃতি অগণিত কল্যাণময় কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তিনি বিস্মিত হননি, হবেন না। প্রচণ্ড খরায়

মৃদু-মন্দ দখিনা হাওয়া যখন তপ্ত, ক্লান্ত শরীর ছুঁয়ে যায়; তখন মনে হয়, বুঝি শাহানশাহ্ তাঁর প্রিয় সন্তানদের গায়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। ঝড়-তুফানের প্রলয় নাচনে প্রকৃতি যখন ক্রুদ্ধ ছোবল মারতে থাকে, তখন তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ঐশী সহায়তা কামনা করে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ অনুভব করে তিনি বুঝি সাহসী হয়ে মনের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। নিত্যদিনের ঝুট-ঝামেলা, প্রত্যাশা, চাহিদা ও অনটনের দ্বন্দ্বে বিক্ষত বুকে যখন হতাশার রক্ত ঝরতে থাকে, আর দু'চোখে নেমে আসে অন্ধকার; তখন মরিয়া হয়ে টিকে থাকার প্রত্যয়ী মানুষের নয়নে তিনি যেন আশার আলো হয়ে জ্বলে উঠেন! ...... তাঁকে ভোলা যায় না। তিনি বিস্মৃত হবার নন।

কবি নজরুলের গানের যে কলিটা তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত মোবারকে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে গানের অন্যান্য পংক্তির শব্দমালার আয়নায় বিম্বিত হয়ে আছে তাঁর নিত্য অনুপম উপস্থিতি–

"আমি চিরতরে দূরে চলে যাব,
তবু আমারে দেবনা ভুলিতে।
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশে,
বেনী যাবে যবে খুলিতে॥
তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন,
রোদন হইয়া আসিব তখন তোমার
বক্ষে ঝুরিতে॥
আসিবে তোমার মরমোৎসবে কত
প্রিয়জন কে জানে,
মনে পড়ে যাবে– কোন সে ভিখারী
পায়নি ভিক্ষা এখানে।
তোমার কুঞ্জ পথে যেতে হায়!
চমকি থামিয়া যাবে বেদনায়,
দেখিবে, কে যেন মরে মিশে আছে
তোমার পথের ধূলিতে॥"

.... সত্যিই তো; তিনি তাঁকে ভুলতে দেননি। তিনি বাতাস হয়ে জড়িয়ে ধরেন। বেদনা-বিধুর ভক্ত-হৃদয়ে তিনি 'রোদন হইয়া ...... ঝুরিতে' আসেন। সকলের পরমোৎসবে তিনি প্রিয়জনের মতো হাজির থাকেন স্মরণের অবয়বে। শুধু পথের ধূলিতে নয়; তাঁর চলার পথের দু'পাশের বৃক্ষরাজির পত্র-পুষ্পের আন্দোলনে, মৃত্তিকার গভীরের স্পন্দনে যেন তিনি সর্বদা বিরাজমান।

॥২॥

প্রত্যেক মহৎ মানুষের মধ্যে থাকে একটা সৃজনশীল কবি হৃদয়। সৃজনশীল কবি হৃদয় মানেই কল্যাণমুখী কর্ম তৎপরতার এক অন্তহীন উৎস। পৃথিবীর যতো নিঃস্বার্থ মহান পয়গম্বর, অলি-দরবেশ, সমাজসেবক-রাজনীতিবিদ, দার্শনিক – তাঁদের সবার মনের গহীনে একজন কবির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের অধিকাংশ জনই রচনা করে গেছেন পবিত্র কবিতার চরণ– যা মানুষকে মুগ্ধ করে, ভালো করে, সৎ করে, আকুল করে। এঁদের মতোই শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীরও ছিল একটা কবি হৃদয়। কবিতা হয়তো লিখেননি তিনি ...... কিন্তু তাঁকে যারা দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তারা লক্ষ্য করেছেন এক অনুপম কাব্য ও ছন্দময়তা। তিনি প্রায়শ কোরআনের সুললিত ছন্দোময় অনুপ্রাস-ঝংকৃত আয়াত উচ্চারণ করে আগতজনের আর্জি-ফরিয়াদের জবাব দিতেন। সে উচ্চারণ বুঝবার, মর্ম উপলব্ধি করার শক্তি যার থাকতো, তিনি সহজেই তা বুঝে নিতে পারতেন। প্রায়শঃ গৃহে কিংবা অন্য কোথাও অবস্থানকালে, কিংবা যানবাহনযোগে চলমান অবস্থায়, কিংবা অকম্প ভাব-বিভোর অবস্থায়, কিংবা 'জালালিয়াতের' সৃজনশীল তপ্ত মধুর মুহূর্তগুলোয় কবিতা আউড়িয়ে যেতেন তাঁর অপূর্ব গম্ভীর সুন্দর বাচন-ভঙ্গীতে'। হ্যাঁ, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব আকর্ষণীয় ও সুললিত। সে কণ্ঠস্বর শুনবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, তার কর্ণকুহরে তা আজো ঐশী আওয়াজের মতো অনুরণিত হয়। সেই ধ্বনি আজো তার স্মৃতির ভাণ্ডারে এক অমূল্য স্মৃতি-রত্ন হিসেবে সঞ্চিত আছে। ..... হ্যাঁ, তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশের জন্যে, অন্যের হৃদয়ের গভীরে তা সহজে প্রবিষ্ট করানোর জন্যে কবিতার চরণ কিংবা গানের কলি প্রয়োগ করতেন।

'আধ্যাত্মিক শিল্প' 'সৃষ্টি-মঙ্গলের কবি' যারা; জাহেরীভাবে দৈহিক বিলুপ্তি তাঁদের কল্যাণার্থে– যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনা। শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) রাব্বুল আলামীনের অশেষ

করুণাধারায় স্নিগ্ধ এক মহান 'অধ্যাত্ম শিল্পী', এক বর্ণাঢ্য 'সৃষ্টি মঙ্গলের কবি' ঝলমলে আলোয় চৌদিক প্রোজ্জ্বল করার বিভাময় ক্ষমতা সম্পন্ন এক আলোকধারা। তাঁর সত্ত্বা, তাঁর রূহ্ কেবল অবিনশ্বরই নয়; সতত সক্রিয় এবং পুষ্প-ফসলময়।

হক্কুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র অধিকার) এবং হক্কুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) এই বিশাল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের অঙ্গীকার নিয়ে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব। সৃজন করার জন্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে দিয়েছেন পরোপকার তথা সৃষ্টির কল্যাণের কতগুলো কাজ বা শর্ত। হক্কুল ইবাদ আদায় করা হলে সেটাই চূড়ান্ত পরিণামে হক্কুল্লাহ্ আদায়ের খাতে জমা হয়ে যায়। মানুষ শুধু স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত হবার ক্ষমতাই লাভ করেনি; তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার গৌরবেরও অধিকারী হয়েছে। এই দুই মহান গৌরবভার বহন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন কঠোর রিয়াযতের, সংযমের, সাধনার। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই সাধনার চূড়ান্ত পরীক্ষায় অতি সফলভাবে উত্তীর্ণ এক তাপস। জীবদ্দশায় সর্বদাই পরাহিত অতিবাহিত করেছেন প্রতি মুহূর্ত। দূর করেছেন অভাবীর অভাব। মুছে দিয়েছেন বেদনার্তের অশ্রু। মলিন মুখে ফুটিয়েছেন হাসি। অন্ধজনকে দিয়েছেন আলো। মূক-ভাষাহীনের মুখে ফুটিয়েছেন ভাষা। জীবদ্দশার মতো তাঁর কল্যাণময়তা এখনও সক্রিয়। এখনো দুঃখী জন, বঞ্চিত জন তাঁর দরবারে এসে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। চোখের পানিতে বুক ভাষায়। অসহায়ের কান্না তাঁর দরবারের উসিলায় আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়ে তোলে। নেমে আসে রহমতের ধারা নরোম স্নিগ্ধ আলোর মতো। গুঁড়ি গুঁড়ি মৃদু মধুর বৃষ্টির মতো। আর বেদনার্ত অসহায়ের মুখে ফোটে হাসি। সে হাসিতে ঝলমল করে উঠে তাঁর পবিত্র দরবার। এভাবেই পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির অঢেল রহমত আর সৌন্দর্যপুষ্ট বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের শাপলা-আঙ্গিনায় আমাদের এই মহান সৃষ্টি-মঙ্গলের কবি প্রতি মুহূর্তে রচনা করে যাচ্ছেন কল্যাণ-মঙ্গল-শুভ-সুন্দরের প্রোজ্জ্বল ঐশী পদাবলী। আমাদের মহান 'আধ্যাত্মিক শক্তি' মানুষের হৃদয়ের ক্যানভাসে এঁকে চলেছেন মহান স্রষ্টার মহিমার ছবি। এই মহান আধ্যাত্ম শিল্পী শাপলা ভরা কাজল-জলের পাশে বসে গেয়ে চলেছেন দাউদ নবির মতো ঐশী সঙ্গীত। এই

মহান আধ্যাত্ম শিল্পী আপন বিভোর মনে বাজিয়ে চলেছেন প্রিয়ের বিচ্ছেদ বেদনা বিধুর 'রুমীর রূহানী বাঁশী'। আর ঐ ছবি, ঐ গান, ঐ সুরে ভরে উঠে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের 'ঐশী আলোর জলসা ঘর'। তাঁর রূহানী উপস্থিতির উত্তাপ ও মাধুরী বিমন্ডিত 'ঐশী আলোর জলসাঘরে' প্রতিনিয়ত আসছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-চাকমা-টিপরা নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। কেউ আসেন বিপদ থেকে ত্রাণ লাভর জন্যে দোয়া চাইতে, কেউ আসেন দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের প্রত্যাশায়, কেউ আসেন মানুষের আদালতে ইনসাফ না পেয়ে সুবিচারের ভরসায়। জাগতিক-আধ্যাত্মিক সকল প্রকার কল্যাণের প্রত্যাশী হয়ে এখানে আসেন মানুষ। তাঁদের প্রত্যয় – মানবিক সীমবাদ্ধতা এখানে নেই। এখানে কল্যাণ, শুভাশীষ ও ঊর্ধ্ববিকাশের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পার্থিব সসীমতা থেকে মুক্ত এ ভাণ্ডার। এখানে দেশপতি-ধনপতি-শ্রমজীবী-সর্বহারা ছাত্রছাত্রী নারীপুরুষ সবাই এক কাতারের ভিখারী। এখানে সবাই সমান। এখানে সবাই আসেন প্রাণের তাগিদে, ত্রাণের প্রত্যাশায়। আসেন সংসারী, আসেন ব্যবসায়ী, আসেন রাজনীতিবিদ, আসেন বাউল, আসেন গায়ক, আসেন ফকির, আসেন আশেক। আসেন পীর-মাশায়েখের অন্বেষায় সংসার বিরাগী ভক্ত-হৃদয়-যারা খুঁজে ফিরে পরম প্রিয়কে।

বিরহী ভক্তজনের আকুল ক্রন্দন শুনে তিনি আসেন। দুঃখী-বঞ্চিত জনের ফরিয়াদ শুনে তিনি আসেন। অত্যাচারিত মজলুমের আর্তনাদ শুনে তিনি আসেন। অসহায়ের সহায় হয়ে তিনি আসেন। তিনি আসেন অবয়বহীন রহমতের সুবাতাস হয়ে, তিনি আসেন কায়াহীন আশীর্বাদের পুষ্প হয়ে, তিনি আসেন অশেষ মেহেরবাণীতে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন হয়ে। আর দেখেন– "কোন্ সে ভিখারী পায়নি ভিক্ষা এখানে'।

রওজা শরিফ জড় বস্তু হলেও পবিত্র সত্ত্বার সংস্পর্শে রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) উস্‌তুনে হান্নানা বা খেজুর গাছের মিম্বরের মত প্রাণবন্ত। যেখানে আর্জি আবেদন মনের পবিত্রতায় গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

১. ঋণ স্বীকার: স্মরণের অবয়বে, সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) – মাহবুব উল আলম, মাসিক আলোকধারা, অক্টোবর/১৯৯৯।

চিঠিপত্র আদান-প্রদান

দেশ-বিদেশ হতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকেরা তাঁর কাছে চিঠিপত্র লিখতেন। ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ আর্জি আবেদন থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পর্যন্ত ছিল চিঠির বিষয়বস্তু। পাকিস্তান আমলের জেনারেল আয়ুব খান সরকারের কেন্দ্রিয় শিল্পমন্ত্রী এ.কে. খান সাহেব একবার একখানা হাত চিঠি পাঠান। চিঠিতে দেশ ও তাঁর পরিবারবর্গের মঙ্গলের জন্য দোয়া চাওয়া হয়। সময়কালটা বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর। তাই প্রসঙ্গত দেশের মঙ্গল হবে কিনা জানতে চাইলে বলেন, 'মঙ্গলের জন্যই তো আল্লাহ্ দেশ-দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন; অমঙ্গল হবে কেন? দেখছেন না আল্লাহ্র রহমত অবিরত বর্ষিত হচ্ছে!' ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাধক ফকির লোকশিল্পী সিলেটের হাসন রাজার বংশধর প্রখ্যাত দার্শনিক জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্যাডে দু'টি পত্র লিখেছিলেন। তন্মধ্যে একখানা পাঠ করে শুনাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শুনে মন্তব্য করেন, 'বইয়ে লেখা দর্শনতো উপরি বিষয়, আমরা তো মূল সত্যকে নিয়ে আছি'। [প্রেরিত চিঠিপত্রের মধ্য হতে নমুনা স্বরূপ একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি চিঠি-------------? উত্থাপন করলাম।] তিনি কোন চিঠির জবাব দিয়েছেন বলে জানা যায় না। ইন্তিকালের এক যুগ পরও তাঁর নামে চিঠি আসে। চিঠি লেখক হয় তাঁর ওফাত সম্পর্কে জানেন না অথবা আল্লাহ্র অলির অবিনশ্বর সত্ত্বার কাছেই তারা লিখে যাচ্ছেন।

রওজা-মাযার যিয়ারত পরিদর্শন

হযরত শাহ্ জালাল (র.), সিলেট শহর, সিলেট।
হযরত শাহ্ পরান ইয়ামেনী (র.), সিলেট।
হযরত শাহ্ আলী বোগদাদী (র.), মিরপুর, ঢাকা।
হযরত শাহ্ শরফুদ্দিন চিশ্‌তি (র.), হাইকোর্ট, ঢাকা।
হযরত শাহ্ দায়েম উল্লাহ্ (র.), আজিমপুর কবরস্থান, ঢাকা।
হযরত শাহ্ গোলাপ (র.), বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
হযরত শাহ্ প্রকাশ বড় ভাইয়া (র.), শান্তিনগর, ঢাকা।
হযরত শাহ্ গেছু দরাজ প্রকাশ কল্লা শহীদ (র.), আখাউড়া।
হযরত শাহ্ আশরাফ আলী চাঁন্দপুরী (র.), দুখাইয়া, চাঁন্দপুর, কুমিল্লা।
হযরত শাহ্ অলি উল্লাহ্ রাজাপুরী (র.), রাজাপুর, কুমিল্লা।
হযরত শাহ্ পাগলা মিঞা (র.), ফেনী।
হযরত শাহ্ বার আউলিয়া আস্তানা শরিফ, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ কালু (র.), শিতলপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আল্লামা শফিরুর রহমান হাশেমী (র.), উত্তর সলিমপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ বদর আউলিয়া প্রকাশ বদর শাহ্ (র.), বদরপাতি, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র কদম শরিফ নক্‌শা ও কদম মোবারক কবরস্থান, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ মামা ভাগিনা জামাল শাহ্ (র.) কামাল শাহ্ (র.), টাইগারপাস, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত শাহ্ নজির শাহ্ (র.), স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ জুন শাহ্ (র.) ও চৈতন্য গলি কবরস্থান, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত শাহ্ আমানত (র.), জেল রোড, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত শাহ্ মিসকিন (র.), ড. এনামুল হক সড়ক, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত শাহ্ সোলতান বায়েজিদ বোস্তামী (র.) আসন শরিফ, চট্টগ্রাম।
হযরত গরীব উল্লাহ্ শাহ্ (র.) ও কবরস্থান, দামপাড়া, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত শাহ্ আবদুল আজিজ (র.) প্রকাশ ফকির মৌলভী, পাঠানটুলী চৌমুহনী, চট্টগ্রাম শহর।

হযরত শাহ্ হাফেজ নজির শাহ্ (র.), পাঠানটুলী, চট্টগ্রাম শহর।
হযরত শাহ্ মোহসেন আউলিয়া (র.), রুস্তমহাট, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আমিরুজ্জমান (র.) ও সোলেমান শাহ্ (র.), পটিয়া, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ গরীব আলী (র.), নলান্দা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ পেটান শাহ্ (র.), লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আহমদ হোসাইন, শাহ্ মন্‌জিল, চুনতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ মতি ফকির, গশ্চি, রাউজান, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ অসিয়র রহমান ফারুকী (র.), চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আমিনুল হক হারবাংঙ্গীরি (র.), চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ কাজী আসদ আলী (র.), আহ্‌লা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ এজাবত উল্লাহ্ (র.), সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আশরাফ শাহ্ (র.), রাউজান, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ ফকির তাকিয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ সুলতান উদ্দিন বাচাশাহ্ (র.), কাউখালী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আবদুর রহমান (র.), পূর্ব ফরহাদাবাদ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ মতিউর রহমান (র.), পূর্ব ফরহাদাবাদ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
দরবারে মূসাবিয়া, নুর আলী মিয়া হাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আল্লামা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.), ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ শাহজাহান শাহ্ (র.), ধলই, হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আমিনুল হক পানি শাহ্ (র.), ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আবদুল জলিল চৌধুরী প্রকাশ বালুশাহ্ (র.),সাদেকনগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ বাচামিয়া প্রকাশ বাচাশাহ্ ফতেপুরী (র.), ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ হাদী বাদশাহ্ আউলিয়া (র.), শাহ্‌নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

হযরত শাহ্ আল্লামা রিজওয়ান উদ্দিন প্রকাশ রিজওয়ান শাহ্ (র.), শাহ্নগর, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আল্লামা আবদুল হাদি কাঞ্চনপুরী (র.), কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আল্লামা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (র.), কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ নবিদুর রহমান (র.), নানুপুর বাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ আল্লামা আবদুল সালাম ইছাপুরী (র.), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সফরের আসন, দমদমা কবরস্থান, দমদমা, মাইজভাণ্ডার শরিফ।
হযরত শাহ্ আউলিয়া শাহ্, কালীপুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
হযরত শাহ্ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (র.), সন্তোষ, টাঙ্গাইল।
তিন নেতার মাযার– শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, রমনা, ঢাকা।

তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র ঘুরেছেন এবং ভারতের আগরতলা আসাম অঞ্চলেও সফর করেছেন বলে শুনেছি। আমি সঙ্গে ছিলাম না বলে আর কোন্ কোন্ মাযারে গেছেন প্রমাণ অভাবে জানানো গেলো না।

বর্ণক: মৌলভী আবদুল কুদ্দুস ইসলামাবাদী, সফরসঙ্গী, আজিমনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ত্বরিকত পরিচিতি

শজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

'শাইখে ফা'ল আস্ত্ বেআলা সোঁ হক, বা মুরিদাঁ বে সোখন গুয়াদ সবক'

শাইখে ফায়ালগণ স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত, মাধ্যমবিহীন।

০১. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সায়্যিদিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল আউলিয়া, শাফিঈল মোযনিবিন, খা-তামিন নাবিয়্যিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া আউলিয়ায়ি উম্মাতিহি ওয়াসাল্লামা তাসলিমান কাসিরান কাসিরা।

০২. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি আমীরুল মোমিনীন আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত আলী ইবনে আবি তালিব কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

০৩. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুস্ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

০৪. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুস্ সালেকিন হযরত সৈয়দ ইমাম জায়নুল আবেদীন কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

০৫. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল ওয়াসেলিন হযরত সৈয়দ ইমাম মোহাম্মদ বাকির কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

০৬. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল কামেলিন হযরত সৈয়দ ইমাম জাফর সাদেক কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

০৭. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল আলম হযরত সৈয়দ ইমাম মূসা কাযেম কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

০৮. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুস্ সাক্বলাইন হযরত সৈয়দ ইমাম আলী ইবনে মূসা রযা কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

০৯. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল ওয়াসেলিন হযরত শায়খ মারুফ করখী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১০. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সুলতানুল মাহ্বুবিন হযরত শায়খ সির্‌রি সক্বতী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১১. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল আসফিয়া হযরত জুনায়েদ বাগদাদী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১২. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সুলতানুল আওলিয়া হযরত আবু বকর শিবলী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১৩. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি মাহ্বুব-উস্ সালেকিন হযরত শায়খ আবদুল আযিয তামিমী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১৪. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি ইমামুল কামেলিন হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তামিমী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১৫. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল আওলিয়া হযরত আবুল ফারাহ ইউসুফ ত্বরতূসি কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১৬. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুস্ সাক্বলাইন হযরত মাওলানা আবুল হাসান কোরাইশী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১৭. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি শায়খুশ্ শুয়ূখ্ হযরত শায়খ ইবনে মোবারক আবু সায়িদ মাখযূমী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

১৮. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি হযরত শায়খুশ্ শুয়ূখ কুত্‌বুল আলম গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

১৯. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সুলতানুল আরেফিন হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২০. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল আরেফিন হযরত শাহ্ সুফি নিযামুদ্দিন গজনবি কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২১. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সাফিউল্ আসফিয়া হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোবারক গজনবি কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২২. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি হাদিউল আশেকিন হযরত শাহ্ সুফি নজমুদ্দিন গজনবি কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৩. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সুলতানুল মাহ্বুবিন হযরত শাহ্ সুফি কুত্‌বুদ্দীন রওশন জমীর কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৪. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি হাদি ইলাল্লাহ্ হযরত শাহ্ সুফি ফজলুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৫. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি যুব্‌দাতুল কামেলিন হযরত শাহ্ সুফি মাহমূদ কাদেরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৬. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সুলতানুল মুক্বার্‌রাবিন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ নাসিরুদ্দিন কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৭. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি ইমামুল মাশায়েখ হযরত শাহ্ সুফি তকীউদ্দীন কাদেরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৮. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি মাক্‌সুদুত্ ত্বালেবিন হযরত শাহ্ সুফি নিযামুদ্দিন কাদেরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

২৯. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সৈয়দুল আরেফিন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহলুল্লাহ কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩০. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি কুদ্‌ওয়াতুস্ সালেক্বিন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জাফর হোসাইনী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩১. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি মাত্বলুবুত ত্বলেবিন হযরত শাহ্ সুফি খলিলুদ্দিন কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩২. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি কুত্‌বুল আকতাব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মুন্‌য়িম কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৩. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সাহেবুত্ তাযিম ওয়াত্ তাক্‌রিম মুতাওয়াক্কাল আলাল হাইয়িল কাইয়িম হযরত শাহ্ সুফি মোহাম্মদ দায়িম উল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৪. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি হাদিয়ে আশেকীন হযরত শাহ্ সুফি আহমদুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৫. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি হাদী ইলাল্লাহ্ হযরত হাজী শাহ্ সুফি লকিতুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৬. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি হাজীউল হারামাইন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ সালেহ লাহোরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৭. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি মাত্‌লুবুত্‌ ত্বালেবিন, যুবদাতুল আরেফিন, সুলতানুল মোক্বার্‌রবিন, কুত্‌বুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বিন, নূরুল আলম, খাতেমুল আউলিয়া, ফরদুল আফরাদ, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

- ইলাহি বি-হুর্‌মাতি গাউসুল আযম বিল বিরাসাত কুত্‌বুল আক্বতাব হযরত শাহ্‌ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।
- ইলাহি বি-হুরমাতি কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৮. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সুলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোক্বারা, অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৯. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি রূহুল আরেফিন, সুলতানুল মাশুকিন, অলিয়্যুল আলামিন, শাহানশাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৪০. ইলাহি বি-হুর্‌মাতি সাহেবে মাক্বামাত, মাখযানে কাশ্‌ফ কারামাত, মাম্বায়ে ফুয়ূযাত, মাযহারে গাউসুল আযম, রাহবারে আলম হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী মাদ্দা যিল্লুহুল আলী।

- অছি-এ গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর পীরে তাফাইয়ুজ হিসেবে গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর নাম বরকতের জন্য শাজরাহ্‌ শরিফে উল্লেখ করা হল।
- গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র আধ্যাত্মিক নির্দেশে তদ্বীয় পৌত্র অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রথমে কুত্‌বুল ইরশাদ শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কাছে বায়াত হন। এ কারণে বরকতের জন্য তাঁর পবিত্র নাম শাজরাহ্‌ শরিফে উল্লেখ করা হল। উল্লেখ্য, হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী'র ওফাতের পর সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী পুনরায় তাঁর দাদা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কাছ হতে বায়াত কবুল করেন এবং তিনি তাঁর দাদার মনোনীত গদীনশীন হিসেবে দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাজ্জাদানশীন হিসেবে অভিষিক্ত হন।

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN 978-984-8083-07-9